হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস

রামবহাল তেওয়ারী

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস

রামবহাল তেওয়ারী

বিশ্বভারতী গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ

শান্তিনিকেতন

HINDI SAHITYER ITIHAS
(History of Hindi Literature)
by
Rambahal Tiwari

প্রকাশ মাঘ ১৩৯৫
ফেব্রুআরি ১৯৮৯

প্রচ্ছদ শমীন্দ্র ভৌমিক

প্রকাশক সুব্রত চক্রবর্তী
বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন

মুদ্রক তিলক দাস । শ্রীলক্ষ্মী প্রেস বোলপুর

মূল্য পঁচাত্তর টাকা

পূজ্য পিতৃদেবের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

আমাদের দেশে ভাষা যেমন অনেক, তার সাহিত্যও তেমনি বিচিত্র। সাহিত্যের এই আপাত বৈচিত্র্যের মূলে আছে নিগূঢ় ঐক্য। এই ঐক্যের স্বরূপ জানতে ও বুঝতে হলে, প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তার ইতিহাসের পরিচয়ও আবশ্যক। তার থেকেই আরও গভীরে যাওয়া সম্ভব। বিষয়টির গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনুধাবন করে কয়েক বছর আগে 'বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন' বিভাগ ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় প্রকাশের পরিকল্পনা নেয়। সেই অভিনব প্রয়াসের প্রথম 'ফসল' এই **হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস** গ্রন্থখানি। বইটিতে আলোচনার সন্দর্ভে বাংলা সাহিত্যের যুগ-প্রবৃত্তি ও সাহিত্যকৃতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের পারস্পরিক যোগাযোগের দিক্‌টিও ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক রামবহাল তেওয়ারীর আন্তরিক সহযোগিতায় এই সহজ সাবলীল ও উপাদেয় গ্রন্থখানি সুধী সমাজকে উপহার দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। বইটির সমাদর আমাদের পরিকল্পনার ক্রমরূপায়ণে উৎসাহ যোগাবে— সে কথা বলাই বাহুল্য।

সুব্রত চক্রবর্তী
সম্পাদক
গবেষণা প্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন

ভূমিকা

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস যেমন বিশাল তেমনি বিচিত্র। এই বিশালতা ও বৈচিত্র্য স্থান ও কাল উভয়তই। সুবিস্তৃত হিন্দী ভাষী অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তিত এবং সমৃদ্ধ হয়ে আজ এক বিশিষ্ট ভাষা ও সাহিত্যে পর্যবসিত হয়েছে। বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

ভাষার বিচারে 'হিন্দী' শব্দটির দুইটি অর্থ পাওয়া যায়। প্রথমটি সাধারণ এবং ব্যাপক। হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের ভাষা হিন্দীই। যদিও স্থানভেদে ভাষাভেদও কতকটা ঘটে যায় স্বাভাবিক কারণেই। সে যাই হোক, এই বিস্তৃত ভূখণ্ডটি হিন্দীভাষী অঞ্চলরূপে চিহ্নিত। সাধারণভাবে মানুষের শিক্ষা, পত্রালাপ, ভাবের আদান-প্রদান, কোর্ট-কাছারী এবং সংবাদপত্রের ভাষা খড়ীবোলী হিন্দী। এই বিরাট ক্ষেত্র জুড়ে গত হাজার বছরে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তা হিন্দী সাহিত্য রূপেই পরিগণিত। এই ব্যাপক অর্থে চাঁদবরদাঈ, বিদ্যাপতি, কবীর, জায়সী, তুলসী, সূরদাস, মীরা ও মৈথিলীশরণ— সবাই হিন্দী কবি। যদিও তাঁদের কবিতার ভাষা বিভিন্ন, এক নয়। সুতরাং হিন্দী অনেকগুলি ভাষার সমুচ্চয়। তাতে ব্রজভাষা, ব্রজবুলি, মৈথিলী, ভোজপুরী, অবধী, রাজস্থানী, দক্ষিণী, উর্দু, হিন্দুস্থানী এবং খড়ীবোলী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত ভাষা সন্নিবিষ্ট। এই ভাষা কয়টির সাহিত্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়াও এমন কিছু উপভাষা ও বিভাষা আছে— যাতে সাধুসাহিত্য না থাকলেও লোকসাহিত্যের অভাব নেই। কয়েকটি তো লোকসাহিত্যে বেশ সমৃদ্ধ। মগহী, বুন্দেলী, কন্নৌজী, পাহাড়ী ও বাগঁরু— প্রভৃতি তার নিদর্শন। সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'হিন্দী' শব্দটি বেশ ব্যাপক

ও গভীর অর্থবহ। দ্বিতীয় অর্থটি বিশিষ্ট অর্থাৎ সীমিত ও ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত। ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে উল্লিখিত ভাষাগুলির কেবল একটিই হিন্দী নামে পরিচিত। যার প্রচলিত নাম খড়ীবোলী। মূলের বিচারে খড়ীবোলীও মৈথিলী, অবধী, ব্রজভাষা ও রাজস্থানীর মতোই সুপ্রাচীন। এদের সকলের উদ্ভব ও বিকাশ অপভ্রংশ থেকে। কিন্তু খড়ীবোলী দীর্ঘদিন ধরে কথাবার্তার ভাষা রূপেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে— পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত। তাতে সাহিত্য-সৃজন হয় নি। যদিও আমির খসরু, কবি গঙ্গ, নরসিংহ মেহতা এবং নামদেব প্রমুখ কবির অল্প-স্বল্প রচনায় খড়ীবোলীর পরিচয় দুর্লভ নয়। আধুনিক যুগে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রমুখের প্রচেষ্টায় খড়ীবোলী প্রথমে গদ্যসাহিত্য এবং পরে কাব্যসাহিত্যের বাহনরূপে স্বীকৃতি পায়। পরিশেষে খড়ীবোলীই হিন্দীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা হিন্দী সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সময় হিন্দীকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে থাকি, আর ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় সীমিত অর্থে। হিন্দী সাহিত্যের যে সব ইতিহাস লেখা হয়েছে তাতে হিন্দীর ব্যাপক অর্থই স্বীকৃত। আমরাও তাই করেছি। সম্প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যের বাহনরূপে অন্যান্য ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা গেলেও সাধারণভাবে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের ভাষা যে খড়িবোলী তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সুতরাং 'হিন্দী'কে সাহিত্যিক-সন্দর্ভে ব্যাপক এবং ভাষা-প্রসঙ্গে সীমিত অর্থে গ্রহণ করা অসমীচীন হবে না।

হিন্দী আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য। কিন্তু তার বিবর্তন ও সমৃদ্ধি লাভের বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না বললেই হয়। তার প্রধান কারণ বাংলায় হিন্দী সাহিত্যের তেমন ইতিহাস নেই। অবশ্য ব্রজনন্দন সিংহের 'হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৫৭) নামে ছোটো একখানি বই ছিল। সেটিও দীর্ঘদিন ধরে আর পাওয়া যায় না। অথচ অপরাপর ভারতীয় ভাষায় হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থের

অভাব নেই। কোনো কোনো ভাষায় একাধিক গ্রন্থও আছে। ইংরেজিতে আছে অন্তত পাঁচটি। পক্ষান্তরে হিন্দীতে বাংলা সাহিত্যের একাধিক গ্রন্থ সুলভ। তাই আজও বাংলায় হিন্দী সাহিত্যের উপযোগী ইতিহাস কেন লেখা হয় নি— তা ভাবলে অবাক লাগে। দীর্ঘদিনের এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রয়াস।

সুখের বিষয়, বাংলায় হিন্দী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ক্রমশ প্রবলতর হচ্ছে। তাই বাংলা পত্র-পত্রিকায় এবং কোনো কোনো গ্রন্থে সীমিত পরিসরে হিন্দী সাহিত্যের চর্চা মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। তাতে কৌতূহল বেশী থাকলেও তৃপ্তির উপাদান থাকে কম। বহির্বঙ্গে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসূচীতে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসও নির্দিষ্ট। কিন্তু বাংলায় হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের অভাবে তাঁদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সর্বোপরি বাংলায় সাধারণ পাঠকও আজ হিন্দীসাহিত্য ও তার ইতিহাস, তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বৈশিষ্ট্য এবং গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছেন। যুগপৎ এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার যথাসম্ভব নিবৃত্তি এবং তার উত্তরোত্তর পরিবৃদ্ধিতে বর্তমান গ্রন্থটি সহায়ক হবে আশা করি। উপরন্তু বাংলা সাহিত্য ও তার ইতিহাস-অনুরাগীর পক্ষে হিন্দীসাহিত্য ও তার ইতিহাসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তুলনা করে বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সহজে চোখে পড়ে না, যে বিশিষ্টতার গুরুত্ব সম্যক বোঝা যায় না, পাশা-পাশি রেখে হিন্দীর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দী ও বাংলার সাম্য ও বৈষম্য, উভয়ের মধ্যে প্রথম যোগসূত্র, তার পুষ্টি ও ব্যাপ্তি এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রেরণা, প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুধাবন সহজ হবে।

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ-কালের বিচারে হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মিল থাকলেও তাদের বিবর্তন ধারা কিন্তু পুরোপুরি এক নয়।

হিন্দী সাহিত্য যেন সংগোপনে তার প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। আর বাংলা সাহিত্য বেছে নিয়েছে তার স্বভাবসুলভ স্বতন্ত্র পথ। তাই হিন্দীতে যখন রাসো-কাব্য, ভক্তিকাব্য ও রীতিকাব্য লেখা হয়েছে, বাংলায় তখন লেখা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য ও চরিতসাহিত্য। বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব পদাবলী— ভক্তিসাহিত্য রূপে স্বীকৃতি পেলেও, তা হিন্দী ভক্তিসাহিত্যের মতো প্রবল নয়। বাংলায় রীতিকাব্য রচিত হয়নি বললেই হয়। হিন্দীর এই মধ্যযুগ তার ভক্তিসাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য প্রভৃতি শাখার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট ও বিচিত্র রূপ নিতে সাহায্য করেছে। আধুনিক যুগে এসে হিন্দী সাহিত্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে যুগধর্ম, বিদেশী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের সংস্পর্শ এবং অনুপ্রেরণা থাকলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দীর যোগ ও প্রেরণালাভই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের মতোই হিন্দী সাহিত্যেরও আদিকাল, মধ্যকাল ও আধুনিককাল ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপ লাভ করেছে। এই বৈষম্য সাহিত্যের বিষয়, মান-পরিমাণ, স্বরূপ ও গুরুত্বের বিবেচনায় অহেতুক মনে হয় না। হিন্দী সাহিত্য তার স্বকীয়তা, বৈচিত্র্য ও বিশালতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে আধুনিক যুগেই। তাই এই যুগটির ব্যাপ্তি ও গুরুত্বই তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক।

হিন্দীতে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে অনেকগুলি। পণ্ডিতদের মধ্যে সন-তারিখ নিয়ে বিবাদ না থাকলেও ঐকমত্যও নেই। এক্ষেত্রে আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের বইটির গুরুত্ব সমধিক। বর্তমান গ্রন্থে রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (১৯৩২), হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'হিন্দীসাহিত্য : উদ্ভব ঔর বিকাশ' (১৯৫২) এবং কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা প্রকাশিত—'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' (ষোলো খণ্ড)— প্রভৃতি গ্রন্থের সকৃতজ্ঞ সহায়তা নিয়েছি। আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের পুস্তকে ১৯১৮ ; হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর গ্রন্থে

১৯৫২ এবং নাগরী প্রচারিণী সভার সুবৃহৎ ইতিহাসে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের কথা আছে। আর বর্তমান গ্রন্থে আছে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে কালসীমাও অতিক্রান্ত। মুদ্রিত হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে অপ্রাপ্য এমন কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য এবং আলোচনা সংযোজিত হোলো এ-গ্রন্থেই প্রথম। বইটি পড়ে অনুরাগী পাঠকের মনে যদি হিন্দী সাহিত্যকে আরও নিবিড়ভাবে জানবার অভিলাষ জাগে, মূল হিন্দী সাহিত্য পাঠের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনার সার্থক প্রয়াস দেখা দেয়— তাহলেই আমার শ্রম ও লক্ষ্য চরিতার্থ বলে মনে করব।

বিশাল হিন্দী সাহিত্যের বিপুল সামগ্রী একটি গ্রন্থে যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। নানা কারণে গ্রন্থের সুবৃহৎ কলেবরও কাম্য নয়। তাই হিন্দী সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ প্রধান ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত সাহিত্যিকদের সুনির্বাচিত সাহিত্য-কৃতির যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই নিবৃত্ত হতে হয়েছে। বহু গৌণ এবং কিছু অগৌণ সাহিত্যসেবী বাদ পড়েছেন। অনেকের নাম ও রচিত গ্রন্থের কয়েকটির উল্লেখমাত্র করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বইটি বড়ো হয়ে পড়েছে। সন-তারিখের জন্য প্রধানত রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' এবং ক্ষেমচন্দ্র 'সুমন'-রচিত 'দিবঙ্গত হিন্দী সেবী' প্রথম খণ্ড (১৯৮৩ দ্বিতীয় সং) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৩ প্রথম সং)-এর উপর নির্ভর করেছি। অন্য উৎসও ব্যবহৃত হয়েছে সকৃতজ্ঞ চিত্তে। তবে প্রত্যাশিত সব তিথির সন্ধান সম্ভব হয় নি। আর যা পাওয়া গেছে তা সর্বৈব নির্ভুল— এ-কথাও বলা যায় না। তবে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য তিথিই গৃহীত হয়েছে।

মূল গ্রন্থে কোনো কোনো সন্দর্ভের শীর্ষ-নাম না থাকলেও, পাঠকের সুবিধার কথা ভেবে 'বিষয়-ক্রমে' তা দিয়ে দেওয়া গেল। একই কারণে কোনো কোনো শীর্ষ-নামের বদলও করতে হয়েছে। তবে

সহৃদয় পাঠক এই প্রথম প্রয়াসের সমস্ত দোষ-ত্রুটি 'ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে' দেখবেন এমন ভরসা রাখি।

যাঁদের সস্নেহ উৎসাহদান ও পরামর্শে এ-গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে তাঁদের সবাইকে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার নানাস্তরে আনুকূল্য পেয়েছি পত্নী—শ্রীমতী ইন্দিরা তেওয়ারীর কাছে। কল্যাণীয়া সংগীতা, সুগীতা ও কল্যাণীয় সুগত ত্রিপাঠীর সানন্দ সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুস্তক প্রকাশনা ও সৌষ্ঠব সম্পাদনা বিষয়ে শ্রীসুব্রত চক্রবর্তীর আন্তরিকতা এবং শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিকের তৎপর সহকারিতা আমাকে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ করেছে। তাঁদের জানাই সানন্দ সাধুবাদ।

সবশেষে স্মরণ করি— শ্রীলক্ষ্মী প্রেসের [বোলপুর] শ্রীতিলক দাস ও শ্রীসুকুমার ঘোষের কথা। কল্যাণীয় সুকুমারের সুবিবেচনা ও কর্মনৈপুণ্য আমার বিশেষ প্রীতি ও সন্তোষের হেতু হয়েছে।

'সাহিত্য সেতু' । শান্তিনিকেতন
শ্রীপঞ্চমী ১৩৯৫

রামবহাল তেওয়ারী

বিষয়-ক্রম

অবতারণা

হিন্দী ভারতের একটি সুবিশাল অঞ্চলের সাহিত্য-ভাষা। তার বিস্তার রাজস্থান ও পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিহারের পূর্বপ্রান্ত এবং উত্তর প্রদেশের উত্তর সীমা থেকে মধ্যপ্রদেশের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। উৎস ও শ্রেণীর বিভিন্নতার জন্য অনেকগুলি মৌখিক ভাষার চল এই অঞ্চলে। সাহিত্যেও একটি ভাষার ব্যবহার হয়নি বরাবর। তবু এই বিস্তৃত অঞ্চলের সাহিত্যের ভাষাকে সাধারণভাবে 'হিন্দী'ই বলা হয়। কারণ উপাঞ্চল-ভেদ ও নাম-ভেদ সত্ত্বেও ওই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অপভ্রংশ ভাষা প্রকৃতি-প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যে প্রায় এক ও অভিন্ন। অনুরূপ অভিন্নতা লক্ষিত হয় হিন্দী সাহিত্যের বাহন বিভিন্ন ভাষাতেও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে 'হিন্দী' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে বেশ গভীর ও ব্যাপক অর্থে।

মধ্যদেশীয়, প্রাচ্যমধ্যা ও প্রাচ্যা-প্রাকৃতের পরবর্তী স্তরের পশ্চিমা হিন্দী, পূর্বী হিন্দী এবং পশ্চিমা মগধীয়— অপভ্রংশসাহিত্য হিন্দী সাহিত্যের পূর্বরূপ বলে পরিগণিত। অল্প-স্বল্প প্রাদেশিক বিশিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে একই সাহিত্যিক অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। সে যুগের কবিরা তাতেই কবিতা-রচনা করেছেন। পরবর্তী হিন্দী সাহিত্যের বিকাশ অপভ্রংশের ভিত্তিভূমিতেই সম্ভব হয়েছে। তা হলেও 'প্রাচীন হিন্দী' বলতে অপভ্রংশ বোঝায় না। তবে 'গ্রাম্য' বা লৌকিক অপভ্রংশের পদ, দোহা; প্রাকৃত পৈঙ্গলে উদ্‌ধৃত অধিকাংশ শ্লোক ও 'সন্দেশ-রাসক' প্রভৃতির— ভাষা, শৈলী, কাব্য-ভাব, সজ্জা ও ছন্দ পরবর্তী হিন্দী সাহিত্যে প্রায় অবিকৃতভাবে এসে গেছে। অপভ্রংশ যুগের জৈন-সাহিত্য, বিশেষ করে জৈন চরিত-সাহিত্য, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের 'সিদ্ধ-সাহিত্য' এবং 'নাথ-সাহিত্য'

প্রভৃতিও নানাভাবে হিন্দী সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। একটি কথা মনে রাখা দরকার এবং তা হল— উল্লিখিত সাহিত্য যে সব সময় পূর্বোক্ত ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রচিত হয়েছে এমন নয়, বেশ কিছু রচিত সে সীমার বাইরেও।

খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকেই হিন্দী সাহিত্যের প্রারম্ভ। এই সময়কার প্রামাণিক গ্রন্থ হেমচন্দ্রের 'প্রাকৃত ব্যাকরণ', মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ-চিন্তামণি', রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোষ'; আব্দুর রহমানের 'সন্দেশ রাসক' এবং লক্ষ্মীধর রচিত ও প্রাকৃতপৈঙ্গলে সংকলিত লোকভাষার শ্লোক; সন্দিগ্ধ গ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ রাসো' ও 'পরমাল রাসো' প্রভৃতি। এসব রচনার ভাষা অপভ্রংশ এবং লৌকিক। ক্রিয়া-বিভক্তির বিচারে লোকভাষা বেশ অগ্রসর। তবে মধ্যদেশীয় ভাষার সীমায় রচিত প্রামাণিক গ্রন্থের হদিশ চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে এখানে ব্রজভাষা ও অবধী ভাষার সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এই দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়সীমাকে আমরা হিন্দী সাহিত্যের আদিকাল বা বীরগাথা কাল বলতে পারি।

হিন্দী সাহিত্যের সঠিক প্রারম্ভ চতুর্দশ শতক থেকে। যদিও দশম শতক থেকেই কবিরা লোক ভাষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি যে অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ— বিজয়পাল রাসো, হাম্মীররাসো, কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা প্রভৃতি গ্রন্থ। আবার এই সময় লোক ভাষায় বা দেশ ভাষায় যেসব কাব্য রচিত হয়েছে তাতে অপভ্রংশের রূপ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তৎসম শব্দের ব্যবহারও ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। সূরদাস প্রমুখ কবিদের রচনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কবিতার ভাষা ক্রমে ক্রমে অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে কথ্য ভাষার মতো সহজ-সাবলীল গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে লেগেছে। ভাব-ভাষা ও বিষয়বস্তুর বিচারে নবীনতা দেখা দিল। হিন্দী সাহিত্যে একটি বাঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রাচীনতা থেকে পূর্ণমুক্তি না ঘটলেও,

কৃত্রিমতা কমেছে, মানবজীবনের প্রতি আস্থার সূচনা আভাসিত হয়েছে। নির্গুণ-ভক্তি, রামভক্তি ও কৃষ্ণভক্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠল সাহিত্যভাষা— ভোজপুরী, অবধী ও ব্রজ ভাষা পঞ্চদশ শতকে। এই কালটি চিহ্নিত 'ভক্তিকাল' রূপে। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রীতিকাব্যের সূচনা। রীতিকাব্যের যুগ 'রীতিকাল' নামে অভিহিত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তার বিস্তার। প্রাচ্য কাব্যশাস্ত্রানুসারী রচনার যুগ এটি। কাম-শাস্ত্র, অলংকার-শাস্ত্র ও রস-শাস্ত্র রচিত হয়েছে পূর্বপন্থানুসরণে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আধুনিক যুগ। প্রাক্ আধুনিক যুগে হিন্দী সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল ব্রজভাষা। আধুনিক যুগে ব্রজভাষার বদলে 'খড়ী হিন্দী'র প্রতি সাহিত্যিকরা আকৃষ্ট হন। খড়ীহিন্দীর প্রচার শুরু হয় দ্রুত-গতিতে। অনেকের ধারণা খড়ীহিন্দী পুরোপুরি আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাস্তবে তা নয়। আকবরের সমকালীন কবি 'গঙ্গ' রচিত 'চন্দ-ছন্দ-বরনন কী মহিমা' গ্রন্থের ভাষা আধুনিক খড়ীবোলীর প্রায় সমগোত্রীয়। তাতে সৎসম শব্দের প্রয়োগও আছে পর্যাপ্ত মাত্রায়। মিরাট ও দিল্লী অঞ্চলের কথ্যভাষা হল এই খড়ী হিন্দী। পরবর্তীকালে দিল্লীর এই শিষ্ট ভাষা অধুনা হিন্দীভাষী অঞ্চল নামে পরিচিত ভূখণ্ডে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। অষ্টাদশ শতকে এই ভাষা উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রসারলাভ করে নানা কারণে। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভিক মুহূর্তে হিন্দীর খড়ীবোলী গদ্যের সূত্রপাত হল। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। অতঃপর ব্রজভাষা ক্রমে ক্রমে অব্যবহার্য হতে লাগল। তার স্থান নিল খড়ীহিন্দী। অবশেষে মুখের অকৃত্রিম ভাষা খড়ীহিন্দীই সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠল আর পদ্য ও গদ্যের যোগ্য বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সাগ্রহ চর্চা, ব্যাপক প্রয়োগ ও সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাহন হবার ফলে বর্তমানে হিন্দী ভাষা বললে 'খড়ীবোলী' এবং হিন্দী সাহিত্য বললে 'খড়ী-বোলীতে রচিত সাহিত্য'ই বোঝায়। তবে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস

বলতে আমরা অবহট্ট যুগ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের অষ্টম *দশকের শেষ পর্যন্ত* রচিত হিন্দী সাহিত্যের প্রসঙ্গই বুঝব।

আমরা ভালো ইতিহাস বলব তাকেই, যাতে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেশের ইতিহাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে সাহিত্যের প্রবণতা ও অপরাপর প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় এবং বাহ্যপ্রভাব তথা অন্য অনুপ্রেরক শক্তির সঙ্গে আন্তরিক হৃদ্যতা ও জীবনরসের দিক্‌দর্শন করানো যায়। আমরা জানি— 'প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেখানকার জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির ঘনীভূত প্রতিবিম্ব' সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, জনগণের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের স্বরূপেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব চিত্তবৃত্তির পারম্পর্য পরীক্ষা করে সাহিত্যিক পারম্পর্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধানই— সাহিত্যেতিহাসের উদ্দেশ্য। জনচিত্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও ধার্মিক পরিস্থিতি ও প্রবণতার দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং সেই সব স্বরূপের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও দরকার হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণের চেষ্টায়, লক্ষ রাখতে হবে— কোনো বিশেষ যুগে জনগণের রুচি কিভাবে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার পোষকতাই বা কিভাবে হল, কার দ্বারা হল! এই সব কথা মনে রেখে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকালকে সাধারণভাবে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১. আদি কাল বা বীরগাথা কাল— খ্রীস্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতক (৯০০-১৪০০)।

২. মধ্য কাল— (১৪০০-১৮৫০) :—

 ক. পূর্বমধ্য কাল বা ভক্তিযুগ— খ্রীস্টীয় চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ (১৪০০-১৬৫০)।

 খ. উত্তরমধ্য কাল বা রীতিযুগ— সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ (১৬৫০-১৮৫০)।

৩। আধুনিক কাল বা খড়ীবোলী-যুগ— উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত (১৮৫০-১৯৮১)।

আদিকাল

(৯০০-১৪০০)

প্রাকৃতের শেষ অবস্থা 'অপভ্রংশ' থেকেই হিন্দী সাহিত্যের উদ্ভব বলে অনুমান করা হয়। অপভ্রংশ বা প্রাকৃতাভাসযুক্ত হিন্দী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় তান্ত্রিক এবং যোগমার্গী বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক রচনায়। যার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক। নবম শতকের শেষ দশকে অনুরূপ অপভ্রংশেই কিছুটা ভিন্ন ধরনের ভাষার সাহিত্যিক রচনাও মেলে। এর পর এই ভিন্নধর্মী ভাষার প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। তাই হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবযুগ বা আদিকাল রূপে খ্রীষ্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতকের পরিধি চিহ্নিত হতে পারে।

হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগের প্রারম্ভিক পর্বের সাহিত্যের বাহন মুখ্যত দোহা ছন্দোবন্ধ। ধর্ম, নীতি, শৃঙ্গার, যুদ্ধ— সকল বিষয়ের রচনাই দোহাতে পাওয়া যায়। রাজাশ্রিত কবি ও চারণদের দল একদিকে যেমন নানাভাবে কবিত্ব করে রাজা ও রাজসভাসদ্‌দের মনোরঞ্জন করতেন অপরদিকে তেমনি আশ্রয়দাতা নৃপতিদের শৌর্য-বীর্য কীর্তনও করতেন। এই জাতীয় বীরত্বগাথা নিয়ে বেশ কয়েকটি গাথাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচিত হয় সে যুগে। এই বিশিষ্টতার কথা মনে রেখে কেউ কেউ এই যুগকে 'বীরগাথাকাল' নামেও অভিহিত করেছেন।

দশম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত হিন্দী সাহিত্যের নিদর্শনরূপে যা পাওয়া যায় তা অপভ্রংশ কাব্যভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন-

তর, লোকভাষায় রচিত। গদ্যে কিছু কিছু তৎসম শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়, কিন্তু পদ্যে তদ্ভব শব্দেরই একাধিপত্য। এ রচনার কাব্যরূপ, কাব্যসংস্কার ও ছন্দের বিচারে অপভ্রংশের ছাপ সুস্পষ্ট। অপভ্রংশের দুটি রূপ— জৈন সাধকদের রচনাপ্রভাবিত এবং লোক-ভাষার প্রভাব-পুষ্ট। সে যুগের সাহিত্যকেও অনুরূপভাবে দু-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি প্রামাণিক ও সন্দিগ্ধ দুই কোটির। 'পৃথ্বীরাজ রাসো' 'পরমালরাসো' জাতীয় রচনা বহুল পরিমাণে পঠিত ও গীত হত, তাই তা বিকৃত ও পরিবর্তিতরূপে পাওয়া গেছে। ব্যতিক্রম সম্ভবত প্রাকৃত পৈঙ্গলমের কিছু পদ বা শ্লোক। রাজপুতানা বা রাজস্থানের প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাব্য 'ঢোলামারু'র প্রামাণিকতাও সন্দেহাতীত নয়। লোক ভাষার সাহিত্য রক্ষা পেয়েছে লোকমুখেই। সুতরাং তার আদি মধ্য ও অন্ত রূপ নির্ধারণের কোনো উপায় নেই। তবে বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্মের আশ্রয় পেয়ে কিছু কিছু লোকভাষার সাহিত্যও সুরক্ষিত হতে পেরেছে। সে যুগের লোকভাষার সাহিত্য রক্ষার তিনটি পথ ছিল— রাজাশ্রয়, ধর্মাশ্রয় ও লোকমুখ। রাজনৈতিক প্রতিকূলতার ফলে—মধ্য অঞ্চলের সাহিত্য রাজাশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়, ধর্মাশ্রয়লাভও ছিল অসম্ভব, তাই লোকমুখ পরম্পরায় আত্মরক্ষার পথই তার পক্ষে সুলভ ছিল। কোনো কোনো চারণকবির রচনা এইভাবেই লোকমুখে রক্ষা পায়। 'পৃথ্বীরাজ রাসো' বা জাগনিকের 'আল্‌হা' এই জাতীয় রচনা। সুতরাং এদের সন্দিগ্ধতা থেকেই যায়। এই প্রসঙ্গে 'খুমান রাসো', 'বীসলদেব রাসো', 'হাম্মীর রাসো', 'বিজয়পাল রাসো' প্রভৃতি গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যায়। 'রাসো' শব্দের মূল সম্ভবত 'রসায়ন' অর্থাৎ 'কাব্য'। 'রাসক' ও 'রহস্য' থেকেও 'রাসো' শব্দের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। 'রাসক' একপ্রকার ছন্দ ও কাব্যরূপ। সুতরাং 'রাসক' থেকে 'রাসো' হওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক 'রসায়ন' 'রাসক' ও 'রাসো'-কে ব্যাপক অর্থে 'কাব্য' শব্দের পর্যায়বাচী অভিধা রূপে গ্রহণ করা যায়। এখানে এযুগের কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়ে দু-চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

খুমান রাসো—মূল কাব্যটির রচয়িতা কবি দলপতি বিজয় নবম শতকের প্রারম্ভে এটি রচনা করেন। চিতোরের রামচন্দ্র থেকে রাবল খুমান পর্যন্ত আটজন রাজার কীর্তিকথা কাব্যটিতে বর্ণিত। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। রাজাদের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টম জন খুমান নাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত দ্বিতীয় খুমানের শাসনকালে কাব্যটি রচিত (৮১৩-৮৩৩ খ্রী.)। কবি জৈনসাধু শান্তিবিজয়ের শিষ্য ছিলেন। ভাষা, বিষয় ও রচনা-কালের বিচারে কাব্যটি হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগের পূর্ববর্তী কৃতি-রূপে গ্রহণ করা বিধেয়।

বীসলদেব রাসো—'বীসলদেব' সাম্ভররাজ চতুর্থ বিগ্রহরাজের উপনাম। তাঁর সভাকবি নরপতি নাল্‌হ আশ্রয়দাতা রাজার বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনার মানসে ১২১২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১১৫৫ খ্রীস্টাব্দে 'বীসলদেব রাসো' কাব্য রচনা করেন। তিনি কাব্য রচনাকাল এইভাবে উল্লেখ করেছেন— [দ্বাদশোত্তর > বহোত্তর > বহেত্তর]

বারহ সৌ বহেত্তর হাঁ মঝারি। জেঠ বদী নবমী বুধবারি।
নালহ রসায়ন আরম্ভই। সারদা তূঠী ব্রহ্ম কুমারি॥

অর্থাৎ বারো শ' বারোর মাঝামাঝি জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি বুধবারে নাল্‌হ 'রসায়ন' রচনা আরম্ভ করেন। তাতে ব্রহ্মকন্যা সারদা তুষ্ট হলেন। ৩১৬টি শ্লোক ও ১০০ পৃষ্ঠার কাব্যটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মালবের ভোজ পারমার-কন্যা রাজমতীর সঙ্গে বীসলদেবের বিবাহ বর্ণিত। দ্বিতীয় অংশে রাজমতীর প্রতি অসন্তুষ্ট রাজা বীসলদেবের ওড়িষ্যায় গমন ও সেখানে এক বৎসর বাস। তৃতীয় ভাগে রাজমতীর বিরহ ও বীসলদেবের প্রত্যাবর্তন এবং শেষ-ভাগে রাজমতীর পিতৃগৃহে গমন ও সেখান থেকে বীসলদেবের আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনার কাহিনী বর্ণিত। ইতিহাসের বিচারে বীসলদেব রাজা ভোজ পারমারের পরবর্তী। উভয়ের মধ্যে প্রায় শতাধিক বৎসর কালের ব্যবধান। তবে বীসলদেবের বীরত্ব ও পরাক্রম সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে মুসলমানদের পরাস্ত করেছিলেন মনে করা হয়।

বীসলদেব রাসোর ১৫টি পুঁথি পাওয়া গেছে। কাব্যের ভাষা রাজস্থানী হলেও হিন্দীর মিশ্রণ ঘটেছে দেখা যায়। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সে যুগে ব্রজ বা মধ্যদেশের ভাষার আশ্রয়ে একটি সাহিত্যিক ভাষা গড়ে উঠছিল। চারণদের মুখে যার পরিচয় 'পিঙ্গল ভাষা'। প্রাদেশিক কথ্যভাষার সঙ্গে মধ্যদেশীয় ভাষার মিশ্রণের ফলে যে ভাষার সৃষ্টি হল—তাই ব্রজভাষা বা কেবল 'ভাষা' নামে পরিচিত হল। তারই আর এক নাম 'পিঙ্গল'। সে যুগের ছন্দশাস্ত্র রচয়িতা পিঙ্গলাচার্যের নামানুসারে পরিচ্ছন্ন অর্থে ব্রজভাষার নাম হল 'পিঙ্গল'। কারণ চারণদের মুখে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ব্রজ-ভাষার জুড়ি ছিল না। পিঙ্গলদেবের আর এক নাম 'নাগ'। তাই শৌরসেনী প্রাকৃত বা ব্রজভাষার সমার্থকরূপে 'নাগ-ভাষার'ও ব্যবহার দেখা যায়। অপভ্রংশ পুষ্ট রাজস্থানী ভাষা অভিহিত হত 'ডিঙ্গল' নামে।

বীসলদেব রাসোতে শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য। যদিও রাসোতে সাধারণভাবে বীররসেরই প্রাধান্য থাকার কথা। বীসলদেব রাসোর একটি শ্লোক—

পরণবা চাল্যো বীসল রায়। চউরাস্যা সহু লিয়া বোলাই।
জান-তনী সাজতি করউ। জীরহ, রঁগাওয়ালী পহরজ্যো টোপ॥

—সব সামন্তদের ডেকে নিয়ে বীসলরায় বিবাহে চললেন। রঙীন বস্ত্র ও টুপি পরে বরযাত্রদল সাজল।

হিন্দী সাহিত্যের আদি যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলেও বীসলদেব রাসোর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

পৃথ্বীরাজ রাসো—চাঁদবরদাঈ (১১৬৮-১১৯২) হিন্দী সাহিত্যের প্রথম কবি এবং তাঁর কাব্য 'পৃথ্বীরাজ রাসো' প্রথম মহাকাব্যরূপে গণ্য। দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের সভাকবি এবং পরম বন্ধু ছিলেন চাঁদ বরদাঈ। চাঁদের জন্ম পাঞ্জাবে। তাঁর ও পৃথ্বীরাজের জন্ম ও মৃত্যু তিথি একই। চাঁদ ছিলেন পণ্ডিত ও সাহিত্য-শাস্ত্রবিশারদ কবি।

তাঁর আড়াই হাজার পৃষ্ঠার কাব্যটি উনসত্তরটি 'সময়' বা সর্গে বিভক্ত। শৌরসেনী অপভ্রংশে প্রচলিত সে যুগের প্রায় সব ছন্দেরই প্রয়োগ আছে কাব্যটিতে। তবে কবিত্ত (ছপ্পয়) দুহা, তোমর, ত্রোটক, গাহা এবং আর্যা প্রভৃতি বন্ধের প্রয়োগই বেশি। বাংলায় কাশীরাম দাসের মহাভারতের মতোই রাসোর শেষাংশ (দশটি সর্গ) কবিপুত্র জল্হণ রচিত। বন্দী পৃথ্বীরাজের সঙ্গে গজনী যাবার সময় চাঁদকবি পুত্রের হাতে অসমাপ্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দিয়ে সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়ে যান।—

আদি অন্ত লগি বৃত্তি মন, ব্রন্নি গনী গনরাজ।
পুস্তক জল্হণ হত্থ দৈ চলি গজ্জন নৃপকাজ॥···
রঘুনাথ চরিত হনুমন্ত-কৃত ভূপ ভোজ উদ্ধরিয় জিমি।
পৃথ্বীরাজ সুজস কবি চন্দকৃত চন্দ নন্দ উদ্ধরিয় তিমি॥

—কাব্যটি পরিসমাপ্ত করার ইচ্ছা থাকলেও রাজা বন্দী হওয়ায় কবি পুত্র জল্হণের উপর কাব্যসমাপনের ভার দিয়ে রাজার সঙ্গে গজনী চলে গেলেন। হনুমন্তকৃত রঘুনাথচরিত যেমন রাজা ভোজ সমাপ্ত করেছিলেন তেমনি চাঁদকৃত পৃথ্বীরাজ কাহিনীও সমাপ্ত করে কবিপুত্র যশের অধিকারী হন। গ্রন্থটিতে পৃথ্বীরাজের বৃত্তান্ত যেভাবে বর্ণিত তা পুরোপুরি ইতিহাস সম্মত নয়। ইতিহাস সম্মত তথ্য পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে। ইতিহাস বিরোধী তথ্য, ভাষা প্রভৃতির বিচারে সন্দেহের অবকাশ থাকায়— চাঁদ বরদাঈকে পৃথ্বীরাজের সভাকবি এমন-কি, তাঁর সমসাময়িক কবিরূপেও অনেকে স্বীকার করতে চান না। কারণ এটিতে প্রক্ষিপ্ত অংশের বাহুল্য ঘটেছে। চাঁদ কবির রচনা বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, অন্য কবিও নিজের রচনাকে চাঁদরচিত বলে চালিয়ে দিয়েছেন। উদয়পুরের রাজা অমর সিংহ ১৬২১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে সংগ্রহ ও সংকলন করে গ্রন্থটির বর্তমান রূপ দেন। তবে চাঁদ কবির রচনা যে তাতে একেবারে নেই তা নয়। চাঁদের রচনাংশে ভাষা, ছন্দ এবং

রচনাশৈলীর প্রাচীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। পৃথ্বীরাজ রাসো থেকে বীর রসাত্মক কয়েকটি পংক্তি—

বজ্জিয় ঘোর নিসান রান চৌহান চহুঁ দিস।
সকল শূর সামন্ত সমরি বল জন্ত্র মন্ত্র তিস॥
উট্‌ঠিরাজ প্রিথিরাজ বাগমনো লগ্‌গ বীর নট।
বঢ়ত তেগ মনবেগ লগত মনো বীজু ঝট্ট ঘট॥
থকি রহে শূর কৌতিগ গগন, রঁগন মগন ভই সোন ধর।
হৃদি হরষি বীর জগ্‌গে হুলসি হুরেউ রঙ্গ নব বত্ত বর॥

—চারিদিকে চৌহানরাজের ঘোর ডংকা বেজে উঠেছে। তাই সমস্ত শূরবীর ও সামন্তদল শক্তি-অস্ত্র ও মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। রাজা পৃথ্বীরাজ উঠলেন, বাগিচায় বীর যোদ্ধাদের যেন নাচ শুরু হল। রথের বেগ তীব্র হয়ে উঠল। তা দেখে আকাশের দেবগণ হতপ্রভ হয়ে পড়লেন। রক্তস্নানে পৃথিবী লাল হয়ে উঠল। হৃদয়ের হর্ষে বীরগণ জেগে উঠলেন—তাঁদের রক্তে নতুন উদ্যম বয়ে গেল।

বীর রসের প্রাধান্যের জন্য চাঁদকবি ছয় চরণের স্তবক ছপ্পয় ব্যবহার করছেন সমধিক। ছপ্পয়ের শেষ দুই-চরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। এতে রাসক ছন্দেরও প্রয়োগ আছে। অপভ্রংশ কাব্যশৈলীর অনুসরণে চাঁদ কবি শুক ও সারির কথোপকথনের সাহায্যে কাহিনীর রূপদান করেছেন। বর্তমানে পৃথ্বীরাজ রাসোর বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অবশ্য প্রচলিত রাসোর সংক্ষিপ্ত রূপ ভিন্ন উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো বিশেষত্ব নেই।

এ যুগের অন্য উল্লেখযোগ্য কবিকৃতি হল— ভট্ট কেদারকৃত— **'জয়চন্দ্র প্রকাশ'** ও মধুকর ভট্টের **'জয়ময়ঙ্কজস চন্দ্রিকা'**, শার্ঙ্গধরের **'হাম্মীর রাসো'** ও নল্লসিংহ রচিত **'বিজয়পাল রাসো'** (১৩৫৫ বি.), আমীর খুসরোর **পহেলী** (ধাঁধা) ও **মুকরী** প্রভৃতি। ভট্ট কেদার ও মধুকর জয়চাঁদের সমসাময়িক দুজন ভাট বা চারণকবি ছিলেন। তাঁদের কাব্য ও জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জয়-

চাঁদের যশ বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাঁরা উল্লিখিত কাব্য দুটি রচনা করেন। শার্ঙ্গধরের 'হাম্মীর রাসো' বইটি পাওয়া গেছে। তবে ভাষার অতি বিকৃতির ফলে তার মূল রূপটি কেমন ছিল বোঝা যায় না। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ গ্রন্থের কয়েকটি পদে হাম্মীরের বীরত্ব বর্ণিত থাকায় সেগুলি শার্ঙ্গধরের রচিত বলে মনে করা হয়। অনুরূপ একটি পদ—

পিন্ধউ দিঢ় সণ্ণাহ বাহ উপ্পর পক্খর দই।
বন্ধু সমদি রণ ধসউ সামি হাম্মীর বঅণ লই।
উড্ডল ণহপহ ভমউ খগ্গ রিউ সীসহিঁ ডারউ,
পক্খর পক্খর ঠেল্লি পেল্লি পব্বঅ অফ্ফালউ।
হম্মীর কজ্জু জজ্জল ভণই কোহাণল মুহমহ জলউ।
সুরতাণ-সীস করবাল দই তেজ্জি কলেবর দিঅ চলউ॥

—বাহুর উপর ঢালদিয়ে দৃঢ় বর্ম পরুক, প্রভু হাম্মীরের বচন নিয়ে আত্মীয়দের থেকে বিদায় নিয়ে রণে মাতুক। আকাশে উড়ে চলুক, শত্রুর মাথায় খড়্গ পড়ুক, ঢালে ঢালে ধাক্কা মেরে পর্বত উপড়ে ফেলুক ; হাম্মীরের কাজে (কবি-সেনাপতি) হজ্জল বলেন— মুহুর্মুহু ক্রোধানল জ্বলুক। সুলতানের মাথায় করবালি দিয়ে কলেবর ত্যাগ করে স্বর্গে চলা যাক।

আমীর খুসরো সম্ভবত ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দে লিখতে শুরু করেন। তিনি কেবল সুকবিই ছিলেন না, বিদ্বান এবং মেধাবীও ছিলেন। তাঁর রচনা এত বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল যে জনে-জনে মুখে-মুখে বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতিলাভও তার ভাগ্যে ঘটে। তাহলেও সেগুলির সাহিত্য-মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। খুসরো সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বলবন, আলাউদ্দীন ও কুতুবুদ্দীনের (মোবারক শাহ) শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি মুখ্যতঃ ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করলেও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় দোহা, সমিল পংক্তি ও ধাঁধা রচনাতেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বহু গানও তিনি লিখেছেন। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হল তাঁর খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার প্রয়োগ। যেমন—

একথাল মোতী সে ভরা। সবকে সির পর ঔধাঁ ধরা।।
চারোঁ ওর ওয়হ থালী ফিরে। মোতী উসসে এক ন গিরে।।
অর্থাৎ—
একটি থালায় মণিতে ভরা। সবার মাথায় উবুড় করা।।
চৌদিকে থালা ঘোরে ভেসে ভেসে। একটিও মণি পড়ে না খসে।।[১]

খড়ীবোলীর এই ধাঁধার পর সে যুগের মুখের ভাষায় রচিত খুসরোর একটি গীতের অংশ বিশেষ উদ্‌ধৃত করছি।—

মেরা জোবনা নবেলরা ভয়ো হৈ গুলাল।
কৈসে গর দীনী বক্স মোরী মাল।
সূনী সেজ ডরাবন লাগৈ, বিরহা অগিন মোহি ডস ডস জায়।

—ভরা যৌবনে প্রিয় কি করে আমাকে ছেড়ে আছে? শূন্য বিছানায় বড়ো ভয় পাই আর বিরহের আগুন যেন বার বার ছোবল মারছে।

গানের অংশটিতে সে যুগের লোক ভাষার উপর পরবর্তী কালের প্রলেপ পড়ে যে-রূপটি দাঁড়িয়েছে তা ব্রজভাষা-গোত্রীয়।

সন্দেশ রাসক মুলতানের কবি আবহুর রহমানের (খ্রীস্টীয় একাদশ —ত্রয়োদশ শতক?) একটি সুন্দর সুললিত প্রণয়কাব্য হল 'সন্দেশ রাসক'।

কাব্যটির হুটি সংস্কৃত টীকা পাওয়া গেছে। কাহিনী বেশ সরস ও মর্মস্পর্শী। মুলতান-আগত কোনো পথিকের সাক্ষাৎ পেয়ে এক বিরহিণী নারী, যার পতি মুলতান গেছে, ছয় ঋতুর তার বিরহ-ব্যথা বর্ণনা করে পতির উদ্দেশ্যে কিছু 'সন্দেশ' পাঠিয়েছে। 'সন্দেশ' করুণ-আর্তিতে পূর্ণ। তাই পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা থাকলেও তা হৃদয়ানুভূতির ব্যঞ্জনাকে খর্ব করতে পারে নি। সব নিয়ে 'সন্দেশ রাসক' একটি মহত্ত্বপূর্ণ বিরহকাব্য যার বৈশিষ্ট্য সে যুগের অন্যান্য কাব্যকৃতিকে ম্লান করে দিতে পারে।

আল্‌হাখণ্ড—কালিঞ্জর বা মহোবার রাজা চন্দেল পরমালের রাজসভার কবি জাগনিক মহোবার প্রখ্যাত যোদ্ধা আল্‌হা ও উদলের (উদয় সিংহ) বীরত্বকাহিনী নিয়ে এমন তেজস্বিতাপূর্ণ আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য কাব্য-গাথা রচনা করেন যা অতি সহজেই সর্বজনপ্রিয়তা লাভ করে। সমগ্র উত্তর ভারতে তার প্রসার ঘটে। জাগনিকের রচিত গ্রন্থ বা সংকলন পাওয়া যায় নি কিন্তু উত্তর ভারতের গ্রামে গ্রামে 'নট' বা 'নেটুয়া' রূপে পরিচিত আল্‌হা গায়কদের সাক্ষাৎ এখনো মেলে। এই বীরগাথা আল্‌হা নামেই পরিচিত। বুঁদেলখণ্ড ও মহোবার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আল্‌হার প্রচলন সমধিক। জনমুখে গীত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে আল্‌হার ভাষা ও কাহিনীর প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। তবে জাগনিকের বহুল প্রযুক্ত ৩১ মাত্রার ছন্দটি 'বীর' বা 'আল্‌হা'-ছন্দ নামে আজও প্রচলিত। নানা স্থানে লোকমুখে প্রাপ্ত আল্‌হা সংগ্রহ করে মি. চার্লস্ ইলিয়ট, জর্জ গ্রিয়র্সন এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথ 'আল্‌হা খণ্ড' নামে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটিতে ৫২টি যুদ্ধ এবং বহু বিবাহের বর্ণনা আছে। আল্‌হা উদল পরমাল সখা জয়চাঁদের হয়ে পৃথ্বীরাজের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে উৎসাহপ্রদ বীর রসাত্মক গ্রন্থটি থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করা গেল—

গুস্‌সা হুইকেঁ পৃথ্বীরাজ তব। তুরতে হুকুম দিয়ো করবায়॥
বত্তী দৈ দেউ সব তোপন মেঁ। ইন পাজিন কো দেউ উড়ায়॥
ঝুকে খলাসী তব তোপন পর। তুরতৈ বত্তী দঈ লগায়॥
দগী সলামী দোনোঁ দল মেঁ। ধুঅনা রহ্যো সরগ মঁডরায়॥
তোপেঁ ছুটীঁ দোনো দল মেঁ। রণ মেঁ হোন লগে ঘমসান॥
অরর-অরর-অর গোলা ছুটেঁ। কড়-কড় করৈঁ অগিনিয়া বান॥
রিম ঝিম-রিম ঝিম গোলা বরসেঁ। সননন পরী তীর কী মার॥

পৃথ্বীরাজের আদেশে আল্‌হা উদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ কী ভয়ংকর রূপ নিল তাই এস্থলে বর্ণিত। ধ্বন্যাত্মক শব্দ

ব্যবহার ও ভাষার অ-প্রাচীনতা সুস্পষ্ট। বীর ছন্দের সার্থক উদাহরণ-রূপে উদ্‌ধৃত অংশটি অনবদ্য।

বিদ্যাপতি :—'মৈথিল কোকিল' কবি বিদ্যাপতি 'অভিনব জয়দেব' নামেও অভিহিত। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বিচিত্র অনুভূতির বিবিধ পদ রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। চতুর্দশ শতকের এই খ্যাতি-মান কবি মিথিলাধিপতি শিব সিংহের সভারত্ন ছিলেন। আনুমানিক ১৩৬০ খ্রীঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৈথিল ভাষার বৈষ্ণব পদ উত্তরকালে পরিবর্তিত হয়ে বাংলার রূপ লাভ করে। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যের কবিরূপেও স্বীকৃত। অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরের দেশভাষা অর্থাৎ অবহট্ট ভাষায় তিনি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থা-গারে কীর্তিলতার সন্ধান পান। এ গ্রন্থে ত্রিহুতের রাজা কীর্তিসিংহের বীরত্ব, উদারতা ও গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি বর্ণিত। দেশভাষা অপভ্রংশে দোহা, চৌপাঈ, ছপ্পয় প্রভৃতি মাত্রিক ছন্দোবন্ধের নিদর্শন আছে। পূর্বী অপভ্রংশের একটি দৃষ্টান্ত :—

> রজ্জ লুব্ধ অসলানবুদ্ধি বিক্কম বলে হারল।
> পাস বইসি বিসবাসি রায়, গয়নেসর মারল ॥
> মারন্ত রায় রণ রোল পড়ু মেইনি হা হা সদ্দ হুঅ।
> সুররায় নয়র নাঅর রমনি বাম নয়ন পফ্‌ফুরিঅ ধুঅ।
>
> —কীর্তিলতা ২।২।৬-৯

—বুদ্ধি পরাক্রম ও শক্তিতে পরাস্ত হয়েও রাজ্যলোভী শয়তান অসলান বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজা গণেশ্বরকে মেরে ফেলে। রাজার মৃত্যুর পর যুদ্ধে হৈ হৈ পড়ে গেল। ইন্দ্রাবতীতে ললনাদের বাম চোখ নাচতে লাগল। অমঙ্গল দেখা দিল।[২]

বিদ্যাপতির অপভ্রংশের একটি বৈশিষ্ট্য হল তাতে দেশভাষার শব্দ অপেক্ষাকৃত বেশি। অবশ্য তৎসম শব্দও বাদ পড়েনি। বিদ্যাপতির রচনা

থেকে অনুমান করা যায় কাব্যভাষা ক্রমে ক্রমে দেশ ভাষার দিকে অগ্রসর হয়েছে। ফলে তাতে তৎসম শব্দ ব্যবহারের সংকোচ ধীরে ধীরে কেটে গেছে। 'ভৃঙ্গ' ও 'ভৃঙ্গী'র সংলাপশৈলীতে রচিত কীর্তিলতায় প্রাকৃত ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য ও কাব্যরসের বিচারে কীর্তিলতা সার্থক গ্রন্থ। তাতে প্রাচীন মৈথিলীর লক্ষণ বজায় আছে। কীর্তিপতাকা একটি প্রেম কাব্য। কাব্যগুণ ও ভাষার বিচারে কীর্তিপতাকার স্থান কীর্তিলতার পরেই।

বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠা প্রধাণতঃ তাঁর পদাবলীর জন্য। তাঁর পদাবলীর ভাষা সে যুগের মিথিলার কথ্যভাষা। প্রধাণতঃ শৃঙ্গার বিষয়ক পদই তিনি রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণকে নায়ক ও রাধিকাকে নায়িকা রূপে কল্পনা করে জয়দেবের অনুকৃতিতে যে সব গান তিনি রচনা করেছেন পদলালিত্য ও ভাবমাধুরীতে সেগুলি অনুপম। তাই তা উত্তরকালে বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যার বৈষ্ণবভক্ত কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে এবং ঐসব অঞ্চলের ভক্তি সাহিত্যে নতুন প্রাণধারা ও নবীন সৃষ্টির আবেগ সঞ্চারিত করে। তাই পূর্ব ভারতে 'বিদ্যাপতি-পদাবলী' প্রায় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত। যদিও শৈব বিদ্যাপতি এই পদগুলি রচনা করেছেন শৃঙ্গার কাব্যরূপে, ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে নয়। তাই হিন্দী সাহিত্যে তাঁকে বৈষ্ণবভক্ত কবিরূপে সবাই মান্য করেন না। তবে সাম্প্রতিককালে গীতগোবিন্দ যেমন আধ্যাত্মিক রচনারূপে গ্রাহ্য, বিদ্যাপতির পদও অনুরূপ কারণে বৈষ্ণব পদের মর্যাদায় ভূষিত। বিদ্যাপতির পদগুলি বর্তমানে হয় ব্রজবুলি নয় বাংলা রূপ গ্রহণ করেছে— মৈথিলী আর নেই। পরবর্তী কালের বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রেরণার উৎসরূপে বিদ্যাপতির পদকে অস্বীকার করা চলে না। চণ্ডীদাসের রচনায় রাধা সুকুমারমতি কোমল স্বভাবা বালিকা। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা বিলাসপ্রিয়া ও বিদগ্ধা। রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমলীলা শারীরিক ভাবপক্ষকে অতিক্রম করে হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তিসৌকর্যে পাঠক ও ভক্তমনকে সহজেই আবিষ্ট

করে। পক্ষান্তরে হিন্দী ব্রজভাষার কবিতায় বিদ্যাপতির পদের প্রভাব পড়েছে— সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বিদ্যাপতির মৈথিলী পদে শিবসিংহ ও রাণী লক্ষ্মীমার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

সরস বসন্ত সময় ভল পাবলি, দছিন পবন বহ ধীরে।
সপনহু রূপ বচন ইক ভাখিয়, মুখসে দূরি করু চীরে॥
তোহর বদন সম চাঁদ হোঅথি নাহিঁ, কৈয়ো জতন বিহ কেলা।
কৈ বেরি কাটি বনোবল নবকৈ, তৈয়ো তুলিত নহিঁ ভেলা॥
লোচন তুঅ কমল নহিঁ ভৈসক, সে জগকে নহিঁ জানৈ।
সে ফিরি জাই লুকৈলহু জল ভয়েঁ, পঙ্কজ নিজ অপমানৈ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু বর জোবিত, ঈসভ লছমি সমানে।
রাজা 'সিবসিংহ' রূপ নরায়ন 'লখিমা' দেই প্রতি ভানে॥

—বিদ্যাপতি (২০১০), পদ—৩৬

—সরস বসন্ত বেশ সময় পেল। মলয় বইতে শুরু হল। স্বপ্নে যেন একজন পুরুষ বললেন— মুখের কাপড় তোলো। বহু চেষ্টা করেও বিধি তোমার মুখের মতো সুন্দর চাঁদকে গড়তে পারেনি। বার বার কাট-ছাঁট করেও চাঁদকে তোমার মুখের যোগ্য করতে পারে নি। আর তোমার ওই মুখের মতো না হতে পেরে কমল জলে লুকিয়েছে। বিদ্যাপতি বলছেন, হে শ্রেষ্ঠ যুবতি শোন, একমাত্র এ-ভবই লক্ষ্মীর সমান। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ, পত্নী লখিমাকে সব কথা জানালেন।

হিন্দী সাহিত্যের আদিকালটিতে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে রাখা যায়— (ক) জৈনধর্মাশ্রিত কাব্য, (খ) সিদ্ধ ও নাথ পন্থীদের রচিত কাব্য এবং (গ) সন্দেশ রাসক— কীর্তিপতাকা আদি আশ্রিত কাব্য। প্রাসঙ্গিকভাবে তৃতীয় বিভাগ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। এখানে প্রথম দুটি শাখা নিয়ে দু-এক কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে সিদ্ধ ও নাথ সাহিত্য।

খ্রীষ্টীয় ৮০০ থেকে ১১০০ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তন্ত্র সাধকদের আধিপত্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক শাখা 'বজ্রযান'-পন্থী সাধক 'সিদ্ধ' এবং শৈব মতাবলম্বী সাধক 'নাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সেই পরিচয় আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সিদ্ধগণ তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে সাধনা পদ্ধতিতে, কোনো বিশেষ শক্তি বা দেবতা-বিশেষকে সমস্ত সৃষ্টির মূল রূপে গ্রহণে, মন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনায়, ভৌতিক সিদ্ধিতে গুহ্য বামাচারে এবং গুরুর মাহাত্ম্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। জনসাধারণের কাছে তাঁরা শ্রদ্ধা, ভয় ও বিস্ময়ের পাত্র ছিলেন, কারণ তাঁরা কোনো বিশেষ অজ্ঞাত এবং অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন।— অন্তত সাধারণ লোকে তাই মনে করত।

সিদ্ধসাধকদের রচনা দু-শ্রেণীর— 'দোহাকোষ' ও 'চর্যাপদ'। 'দোহাকোষে' ধার্মিক সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে নৈতিক উপদেশ বর্ণিত। আর চর্যাপদে তাঁদের ধর্মাচরণেরই ছন্দোবদ্ধ রূপ সন্ধ্যা ভাষায় বিধৃত। কয়েকজন প্রখ্যাত পদকর্তা হলেন— সরহপা, শবরপা, লুইপা, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীনপা, জালন্ধরপা, কারাহপা, তিলোপা, নারোপা এবং মৈত্রীপা ইত্যাদি।

কাব্যমূল্যের বিচারে 'দোহাকোষ' কোনো কোনো অংশে উল্লেখযোগ্য। রচনায় শৃঙ্গার রসের আভাস থাকলেও তা মূলতঃ নিবৃত্ত্যাত্মক। শাস্ত্রানুচারীদের প্রতি কটাক্ষ করার সময় মাঝে মাঝে হাস্য, ব্যঙ্গ এবং ক্রোধের ব্যঞ্জনাও এসে গেছে। এগুলি প্রতীকাত্মক-শৈলীতে রচিত। দোহাকোষের ভাষা অপভ্রংশ, কিন্তু চর্যাপদের ভাষায় সিদ্ধদের স্থানীয় লোকভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। ফলে ভাষা কিছুটা ভিন্নরূপ নিয়েছে। তাই চর্যাপদের ভাষায় হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার সে যুগের লক্ষণ চোখে পড়ে। তবু চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে পরবর্তীকালের বাংলার যেমন প্রবল সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তেমন অন্য ভাষার নয়, তাই বাংলা ভাষার পূর্ব-রূপ বলে চর্যাপদের ভাষাকে

চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুতরাং চর্যাপদের আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

দোহাকোষে দোহার প্রয়োগই বেশি। তবে সে দোহা ১৩+১১=২৪ মাত্রার না হয়ে ১৩+১২=২৫ মাত্রার। চর্যাপদে রাগ-রাগিণীসহ 'পাদাকুলক' ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ হয়েছে। দোহা সোরঠা ছাড়াও কবিতার অন্য রূপও চর্যাপদে মেলে।

এই সিদ্ধ পদকর্তাদের একজন জালন্ধরনাথ। তাঁর শিষ্য গোরখনাথ। গোরখনাথ তন্ত্রাচারের জটিল ও বীভৎস বামাচারের আওতামুক্ত একটি বিশুদ্ধ যোগমার্গ নির্দেশ করেন। সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর যোগমার্গ-এর প্রচার ঘটে। নানা স্থানে গোরখনাথ তাঁর শিষ্যগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী কালে এই শিষ্যগণ স্ব স্ব মতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন। এইভাবে গোরখনাথের অনুযায়ীদের অন্তত পক্ষে বারোটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

সিদ্ধদের তুলনায় গোরখনাথ উদার এবং নীতিনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর সাধনায় যেমন সুফীদের প্রেম-ভাবনা, বৌদ্ধদের 'মনোমারণ' প্রক্রিয়া এবং সহজযানীদের সাদা-মাটা জীবনের স্বীকৃতি ছিল, তেমনি হঠযোগীদের 'নাড়ি-চক্র' বিষয়ক সাধনার প্রতিও আনুকূল্য ছিল। 'ইড়া-পিঙ্গলা', 'কুণ্ডলিনী' প্রভৃতির কথা ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে বহুস্থানে বহুবার থাকলেও নাথপন্থীরা তাতে একটি রহস্যের আবরণ জুড়ে যেন নবীনতা প্রদান করেছেন। গোরখনাথ তাঁর সাধনাপথে আত্মসংযমের মহত্ত্ব বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। এমন কি "নারী" তাঁর সাধনায় সাধকের কষ্টিপাথরের সম্মান লাভ করেছে।

জৈন আচার্যদের রচিত অপভ্রংশ গ্রন্থ ধর্মাশ্রিত হয়েও কাব্যাত্মক হয়ে উঠেছিল। তাঁদের রচনায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কথাসাহিত্য ও স্তোত্রজাতীয় সাহিত্য পাওয়া যায়। এ যুগে জৈন সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে স্বয়ম্ভূর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈন

রচনায় বীর ও শৃঙ্গার রসের বাহুল্য থাকলেও তার পরিণতি নির্বেদ-মূলক শান্তরসে। পরবর্তী কালের হিন্দী সাহিত্য ছন্দঅলংকার যোজনা এবং ভক্তিমূলক ভাবধারা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এ যুগের জৈন সাহিত্য দ্বারা বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।

হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগ 'বীরগাথা' কাল নামেও চিহ্নিত। কারণ এ যুগের অধিকাংশ রচনাতেই বীরত্বকাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ—আদি স্থান পেয়েছে। তবে বীর রসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যরসের সার্থক সৃষ্টিও কবিরা করেছেন। তার পরিমাণও খুব কম নয়। বিশেষ করে বীর রসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে শৃঙ্গার রস। এযুগেও শৃঙ্গার রস যখন সরস ও সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যেমন—

কবরী কিরি গুম্ফিত কুসুম করম্বিত
জমুণ ফেণ পাবন্ন জগ।
উতমঙ্গ ফিরি অম্বর আধোঁ অধি
মাঁগ সমারি কুঁবার মগ।

—হিন্দীসাহিত্য কা ইতিহাস পৃ. ৫১

—শুভ্র ফুলে সুসজ্জিত কবরী যেন জগৎ পবিত্রকারী যমুনার ফেনা, আর মাথার মাঝামাঝি সুশোভিত সিঁথি যেন আকাশের মাঝখানে গঙ্গা। এ প্রয়োগ এক কথায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় রচনাও সে যুগে সুলভ।

আলোচনায় দেখা গেল সাহিত্যিক মানদণ্ডে আদিযুগের হিন্দী-রচনা অপভ্রংশেরই কিছুটা প্রাগ্রসর স্তরের, কিন্তু ভাষার বিচারে তা অপভ্রংশের সীমারেখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। তাতেই ভবিষ্যতের হিন্দীভাষা ও কাব্যের রূপ অঙ্কুরিত হয়েছে বলা যায়। প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোনো যুগের প্রারম্ভিক স্তরে ভাষার যে রূপ থাকে যুগটির পরিসমাপ্তির ক্ষণে

তাতে লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটে যায়। ভাষা যদি উদ্ভবের স্তরে থাকে তবে এই পরিণতি বা পরিবর্তন তেমন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। কিন্তু পরিবর্তন ঘটেই। অপভ্রংশের শেষ স্তরের সঙ্গে চতুর্দশ শতকের লোকভাষা বা কথ্যভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপভ্রংশের উপর লোকভাষার প্রভাব ও মিশ্রণের ফলে ভাষা যে নবরূপ ধারণ করে তার ভিত্তির উপরেই পরবর্তী কালের হিন্দী ভাষার সৌধটি দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

সাধারণভাবে মহারাজ হাম্মীরের বিষয়আশ্রিত কাব্যের রচনা-কাল (খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক) পর্যন্ত সময়কে হিন্দী সাহিত্যের বীরগাথাকাল বা আদিকাল রূপে গণ্য করা হয়েছে। তারপরই এদেশে মুসলমান রাজত্বের সূচনা এবং ক্রমে ক্রমে তার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা ঘটে। হিন্দু রাজারা যেন উৎসাহ-উদ্যম হারিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। তাঁরা মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করলেনই না, উপরন্তু নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে যুদ্ধ-কলহ করতেন তাও ত্যাগ করলেন। দেশের এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন এবং প্রশাসককুলের নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহ মনোভাবের ফলে জনচিত্তেও পরিবর্তন দেখা দিল। মুসলমানের শাসন ও বিরোধিতা থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রয়াস এবং তার হৃদয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম ও মহৎ অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বতঃস্ফূর্ত উৎকণ্ঠা দেখা দিল স্বাভাবিক কারণে।

এইভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোভাব ও বিচার-বিশ্লেষণ শক্তিতেও পরিবর্তন লক্ষিত হল। মানুষ আত্মরক্ষা ও ধর্ম-রক্ষার জন্য দেব-দেবীর আশ্রিত হ'ল। পুরাণ ও ইতিহাস-আশ্রিত ধর্মভাব নতুন করে গ্রহণ করল মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই সেই ধর্মভাব মানুষের জীবন থেকে দূরে থাকতে পারল না। ধর্মকে আশ্রয় করে মানুষ নিজের নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, মানবতাবোধ এবং ঐহিক ও পারলৌকিকবোধ ও বিশ্বাস প্রকাশ করতে চাইল। এই বোধ ও বিশ্বাস সাহিত্যে উঁকি-মারতে লাগল। সাহিত্যের পট-

পরিবর্তিত হ'ল। সূচনা ঘটল ধর্মমূলক সাহিত্যের। এই ধর্ম বা ভক্তি আশ্রিত কাব্য-রস ধারা দিয়েই হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগের পূর্বভাগ গঠিত ও বিশিষ্টতা-মণ্ডিত। তবে এই ভক্তিকাল বা পূর্বমধ্যকালে ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য ছাড়া অন্য প্রকার কাব্য বিশেষ করে বীর রসাত্মক কাব্য বা কবিতা যে একেবারে রচিত হয়নি তা নয়। তবে সামগ্রিকভাবে বীরগাথা কালের স্রোত অতিমাত্রায় মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল। সে যাই হোক, হিন্দী সাহিত্য পুরোপুরি আত্মস্থ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ভক্তি-কালেই। ভাব-ভাষা ও ছন্দের বিচারে হিন্দীকাব্য স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এযুগেই।

---

১. আকাশ

২. আমাদের বামনেত্রের নৃত্য মঙ্গল-সূচক মনে করা হয়, কিন্তু এখানে অমঙ্গল-সূচক বলা হয়েছে। তখন সম্ভবত তাই মনে করা হত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব-মধ্যকাল : ভক্তিযুগ
(১৪০০-১৬৫০)

হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগ ব্যাপ্তি (১৪০০-১৮৫০), পরিমাণ এবং উৎকর্ষের বিচারে বিশেষভাবে গৌরান্বিত। এই যুগের প্রধান সৃষ্টি ভক্তিকাব্য এবং রীতিকাব্য। তাই যুগটি দুটি উপস্তরে বিভক্ত। প্রথম উপস্তরটি (১৪০০-১৬৫০) পূর্ব-মধ্যকাল বা ভক্তিযুগ এবং দ্বিতীয়টি (১৬৫০-১৮৫০) উত্তর মধ্যকাল বা রীতিযুগ নামে অভিহিত হয়।

হিন্দী সাহিত্যের আদিকাল যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি ও অস্থিরতার কাল। দেশে রাজনৈতিক শান্তি ও স্থৈর্য আসতে সময় লাগে। হিন্দু রাজা ও প্রজাদের নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও নিশ্চেষ্ট দেখে মুসলমান শাসকগণ রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে প্রয়াসী হলেন। প্রয়াসী হলেন নানাভাবে হিন্দু-সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে আর মুসলমান সংস্কৃতিকে হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। জীবনযাত্রায় নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে রূপান্তরিত করতেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস দেখা গেল হিন্দুদের মধ্যেও। আবার হিন্দু ধর্মকে আঁকড়ে ধরে মুসলমানদের অত্যাচার ও অবিচার থেকে বাঁচবার উপায়ও খুঁজতে লাগলেন একদল। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে যে ধর্মভাবনা ছিল, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতার বিষয়ে যে বিশ্বাস ছিল, তা সুযোগ পেয়ে প্রবল রূপে আত্মপ্রকাশ করল। হিন্দুধর্ম নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথধর্ম প্রভৃতির সাধনা নানাপ্রকার তন্ত্রাচার ও অনাচারে পূর্ণ হওয়ায় তার কুফল থেকেও

জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তাল ভক্ত কবিদের উপর। তারই ফলে সকল সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিভিন্ন রকমের ধর্মভাবনার মূলকে আশ্রয় করে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সামান্য ধর্মভাবনা এবং তার রূপায়ণের জন্য প্রকৃষ্ট সাধনপথ নির্দেশের প্রচেষ্টাও দেখা দিল। অতঃপর ধর্মভাবনার যে পুনরুজ্জীবন ঘটল, যে ধর্মজোয়ার দেখা দিল— তাতে কেবল হিন্দু-জনগণই নয় এদেশে বসবাসকারী বহু মুসলমানও যোগ দিলেন। প্রেমময় ভগবানের কল্যাণরূপের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় ভক্ত কবির দল হিন্দু ও মুসলমানের অন্তরে সমানভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেন। পারস্পরিক ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করতে উদ্‌বুদ্ধ করলেন। এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সাধক রামানুজাচার্য (১০১৬-১১৩৭ খ্রীঃ) ও গুজরাটের স্বামী মধ্বাচার্য (১১৯৭-১২৭৬) প্রমুখ ধর্মাচার্যদের শিষ্যসম্প্রদায় সগুণভক্তি— অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্মত ধর্মাচরণের প্রচলন করেন। অন্যদিকে বাঙালি কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের সুললিত পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রেমভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণব পদের গায়ন ও মননও আরম্ভ হল। সময় বুঝে আবির্ভূত হলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) দেশে বইয়ে দিলেন প্রেমের বন্যা। বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনকেন্দ্র হওয়ায় হিন্দী সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালে। রামানুজাচার্যের শিষ্যপরম্পরার স্বামী রামানন্দ (১৪০০-১৪৭০) রামভক্তি সাধনার প্রচারে ব্রতী হয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। অপর দিকে স্বামী বল্লভাচার্য (১৪৭৮-১৫৩০) কৃষ্ণের প্রেমরসপূর্ণ উপাসনার প্রবর্তন করে মানুষের হৃদয়রাজ্য অধিকার করলেন। এই-ভাবে রামভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি শাখার পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং তার আশ্রয়ে যে সব অভিনব কাব্যসৃজন শুরু হল তার ফলে হিন্দীসাহিত্য নতুন বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হয়ে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হল।

এই সময় আবার এমন একদল সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটল, যাঁরা রাম ও কৃষ্ণের পরম বিরোধী না হলেও সমর্থকও ছিলেন না।

তাঁরা ছিলেন একেশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা তাঁদের সাধনার সমিধ্ সংগ্রহ করেছেন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জীবনভূমি থেকে। তাঁদের মতে— 'বেদ-শাস্ত্র পড়ে লাভ নেই, লাভ নেই তন্ত্রাচার পালনেও। বাহ্যিক পূজা-আর্চা সব ব্যর্থ, কারণ ঈশ্বর তো সর্বত্র সব বস্তুতেই বিরাজমান। অন্তর্মুখী সাধনাতেই তাঁকে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় 'জীবকে শিব'জ্ঞানে গ্রহণ করলে। হিন্দু ও মুসলমানে কোনো ভেদ নেই, শুদ্ধ সাধনপথ উভয়েরই অনুকূল। জাতি ধর্ম প্রভৃতির যে পার্থক্য তা অজ্ঞানতার নামান্তর।' বলাই বাহুল্য এই সাধক-সম্প্রদায়ে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানও এসে মিলিত হন। এইরূপ অভিনব সাধনার সামান্য ভক্তিপথ নির্দেশ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সাধক 'নামদেব' (১২৬৭-১৩৫০ খ্রীঃ)। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সবাইকে সমান চোখে দেখতেন ও সমন্বয়ের পথ দেখাতেন। তাঁর ভক্তি সাধনার এই সাধারণ পথটি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়রূপ লাভ করে কবীরের সাধনায়। কবীর এই সাধনার পথ ও লক্ষ্য সুস্থির করে তার নাম দিলেন "নির্গুণপন্থ" বা গুণাতীত ঈশ্বরের সাধন পথ। পূর্ববর্তী নাথপন্থী যোগীদের সাধনা অনুরূপ হলেও তা হৃদয়ানুভূতি ও প্রেমার্তি থেকে বঞ্চিত ছিল। কবীর তাকে প্রেমার্তিপূর্ণ ও হৃদয়বেদ্য করে তুললেন। ক্রমে ক্রমে সুফীমতাবলম্বী মুসলমান সাধকগণও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ও সাধনা শুরু করলেন। এ বিষয়ে তাঁরা বিস্ময়কর নবীন উদ্যম দেখালেন। কবীর নিরাকার ঈশ্বরের সাধনপথ নির্দেশের জন্য বেদান্তের আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ বেদান্তে নিজ অভিমতের সমর্থন খুঁজে পেলেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে নির্গুণ-নিরাকার ঈশ্বরভক্তির পথ গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় বলে গৃহীত হল। এই সাধকদের দল বা সম্প্রদায় পরিচিত হল 'নির্গুণ-পন্থী' রূপে। আর রামানন্দাচার্য ও বল্লভাচার্যের প্রদর্শিত সাধনপথের পথিকরা পরিচিত হলেন সগুণপন্থী রূপে। এই সব আচার্যদের উপদেশবাণী, তাঁদের শিষ্যদের বাণী এবং রচনার সংকলন নিয়ে হিন্দী সাহিত্যের যে কাব্যধারাটি গড়ে উঠল সাধারণভাবে তার

দুটি শাখা— নির্গুণ ভক্তির ধারা ও সগুণ ভক্তির ধারা। নির্গুণ ভক্তি-ধারার আবার দুটি উপবিভাগ— 'জ্ঞানাশ্রয়ী' ও 'প্রেমমার্গী'। সগুণ ভক্তিধারাতেও দুটি উপবিভাগ—'রামভক্তি' শাখা ও 'কৃষ্ণভক্তি' শাখা। ধর্মাশ্রিত হলেও বিষয় বৈচিত্র্য শিল্পসৌকর্য ও সমৃদ্ধির বিচারে ভক্তিযুগের হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে অন্য কোনো যুগের হিন্দী সাহিত্যের তুলনা চলে না। তাই হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে ভক্তিযুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে।

লক্ষনীয় হল—চতুর্দশ শতক পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্য ও তার ভাষার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। বস্তুত হিন্দী সাহিত্যের প্রারম্ভ ও সমৃদ্ধি এই ভক্তিযুগেই লক্ষিত হয়। প্রায় আড়াইশো (১৪০০-১৬৫০) বৎসর ধরে এই বিচিত্র সমৃদ্ধির ক্রিয়া চলতে থাকে। এযুগের ধর্মসাধনার মূল এবং প্রধান লক্ষ্য সংক্ষেপে বলতে গেলে এইরকম—

ক. **নির্গুণপন্থী : জ্ঞানাশ্রয়ী শাখা**—প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-লোপ এবং ঐক্যস্থাপন-প্রয়াসের ফলে গড়ে ওঠে এই সাধনার ধারা। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাস্ত্রানুমোদিত ভক্তিসাধনার কঠোরতা ও বৈষম্যের প্রতি সাধারণ মানুষের মনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তাই এই সাধনার প্রথম ও প্রধান হোতা হিন্দু সন্ত কবিসম্প্রদায়ই। এই সাধনায় তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র আনবার সম্ভাবনা দেখতে পান। মুসলমান সম্প্রদায় একেশ্বরবাদী, 'মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ' ছাড়া অন্য ঈশ্বর তাঁরা মানেন না। বিভিন্ন দেবদেবী এবং তাঁদের পূজাতেও তাঁরা বিশ্বাস করেন না। হিন্দুদেরও অনেকে একাধিক ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। তাঁদের মতে সব দেবদেবীই একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। ফলে হিন্দুদের নির্গুণবাদ ও মুসলমানদের একেশ্বর-বাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। নির্গুণবাদে খোদার একত্ব ও নিরাকারত্ব সমন্বিত। জ্ঞানী-সাধক বা সন্ত-কবিসম্প্রদায় নির্গুণ-বাদিতার আশ্রয়ে রাম ও রহিমের একত্ব-বিধান করে হিন্দু ও

মুসলমানের বিভেদরূঢ়িতার বিরোধিতা করে দুই সম্প্রদায়কে এক করতে চাইলেন। সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্ম-সংস্কৃতি-রুচি ও মানবতা-বোধের স্পর্শের সাহায্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাইলেন। বলাই বাহুল্য এই ধারার প্রবর্তক কবীর দাস। জন্ম ও বৃত্তি-সূত্রে তিনি যাই হোন, স্বামী রামানন্দের শিষ্য হওয়ায় তাঁকে হিন্দুই বলতে হয়। তাছাড়া, তাঁর প্রবর্তিত বিধান ও বিশ্বাসকে প্রধানত হিন্দুরাই পুষ্ট ও প্রাগ্রসর করেছেন।

খ. **নির্গুণপন্থী : প্রেমাশ্রয়ী শাখা**।— মুসলমান সন্ত ও সুফী মতবাদীদের সঙ্গে কবীরের সাধনা ধারার সমন্বয়ের ফল— এই প্রেমাশ্রয়ী শাখা। মুসলমান সুফী সম্প্রদায় ও নির্গুণপন্থী হিন্দুদের মধ্যে এমন কি ভক্তপ্রাণ সাধারণ হিন্দুর মধ্যেও মূলগত কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সুফী মতবাদীরা হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদ (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বরের প্রতিরূপ) থেকে খুব একটা পৃথক মত পোষণ করেন না। গোঁড়া মুসলমান অপেক্ষা তাঁদের মনোভাব উদার ও সহিষ্ণু। তাঁদের বিচারে ঈশ্বর প্রেমপাত্র বা 'ভালোবাসার ধন'। তাঁরা হিন্দু প্রেম-আখ্যান অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। এইভাবে প্রেম কাহিনীর মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের ধর্মমত বা সিদ্ধান্তের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। এই শাখার উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মালিক মোহাম্মদ জায়সী। তাঁর কল্পিত কাহিনীতে প্রেমের পথই মহত্ত্বভূষিত হয়েছে। লৌকিক প্রেমের সাহায্যে জায়সী-সম্প্রদায় সেই 'প্রেমতত্ত্বে'র আভাস দিয়েছেন যা ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের মিলন সাধনে সক্ষম; যাতে প্রেমার্তির ব্যঞ্জনা বিশ্বময় ব্যাপ্তিলাভ করে এবং লোকাতীত রূপ নেয়। এইসব প্রেম-আখ্যানে মানুষের দুঃখে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এমনকি বৃক্ষ-লতা প্রভৃতিও সহানুভূতি-সম্পন্ন ও সমব্যথী হয়, সাড়া দেয়, চোখের জল মোছে— যা পুরোপুরি হিন্দু কাহিনীর বিশেষত্ব।

সগুণপন্থী কাব্যধারার স্রষ্টা সেইসব কবি যাঁরা তাঁদের ইষ্ট

দেবতার পূজা-আর্চায় মগ্ন ছিলেন। তাঁদের বিবেচনায় ভগবদ্ভক্তি দিয়েই দেশ তথা জাতির কল্যাণ-সাধন সম্ভব। তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি ভক্ত ও নির্লোভচিত্ত। রাজ-রাজড়ার সঙ্গে ও তাঁদের আশ্রয়ে থাকার বিরোধী ছিলেন তাঁরা। তাঁদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— মুসলমানদের সঙ্গেও তাঁদের কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা বা ভাবের আদান-প্রদান তাঁরা পছন্দ করতেন না। এই সগুণভক্তিমার্গ যা প্রকারান্তরে অবতারবাদী পৌরাণিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, দু-ভাগে বিভক্ত, যথা— রামভক্তিশাখা ও কৃষ্ণভক্তিশাখা।

সগুণপন্থী : রামভক্তিশাখা—এই শাখার প্রথম আভাস দেন 'স্বামী রামানন্দ'। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের সময় দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবভক্তি বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। যাঁরা এই ভক্তিকে সবল করে তুলেছিলেন সেই সাধকগণ 'আলওয়ার' ভক্তরূপে পরিচিত। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বারোজন। তাঁদের মধ্যে ন'জন তো ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত। তাঁরা নানা অস্পৃশ্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁদের সম্প্রদায়েরই উত্তর সাধক হলেন রামানুজাচার্য (খ্রীস্টীয় একাদশ শতক)। আলওয়ারদের সাধনা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই পরবর্তীকালে তা শাস্ত্রানুমোদন লাভ করে ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে। আলওয়ার মতে ধর্মের চোখে মানুষ সমান হলেও সমাজের ভেদনির্ভর মর্যাদাও অক্ষুন্ন থাকবে। সে যাই হোক, রামানুজাচার্য সিকান্দার লোদীর সময়ে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। সিকান্দারলোদী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন— এমনও শোনা যায়। রামানুজের পরেই তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্কাচার্য (১০১৪-১০৬২) আর একজন উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব গুরু। তিনি বৃন্দাবন অঞ্চলে বাস করতেন এবং দ্বৈতাদ্বৈত অথবা ভেদাভেদ তত্ত্বের উপাসনা নির্দেশ করেন। এই শাখার পরবর্তী কালের আর একজন গুরুস্থানীয় সাধক হলেন রামানন্দ (১৪০০-

১৪৭০)। তিনি রামভক্তি আন্দোলনের মহাগুরু রূপে পূজিত। তিনি ছিলেন উদারমনা মহাপণ্ডিত। প্রয়াগের কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান তিনি। রাম ও সীতার উপাসক রামানন্দ পুরোপুরি গুরুপন্থানুসারী ছিলেন না। গুরু ছিলেন বৈষ্ণব, রামানন্দ হলেন রামভক্ত আবার তাঁর শিষ্য কবীর হলেন— নির্গুণ-ভক্তির সাধক। রামানন্দ-মত-অনুসারী রামভক্তগণ রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার মনে করে পূজা ও উপাসনা করেন। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছে রামানন্দ রাম-সাধনার পথ সুগম ও প্রশস্ত করেন। তাঁর মতে ভগবদ্ভক্তিতে কোনো-প্রকার বাছ-বিচার থাকা উচিত নয়। তিনি কর্ম ও শাস্ত্রমর্যাদার সমর্থক ছিলেন। সব জাতির লোককে একত্র করে তিনি রামভক্তির উপদেশ দান ও রামনামের মহিমা প্রচার করতে লাগলেন। অল্প-দিনেই রামায়ণ কাহিনীর আকর্ষণ ও শিক্ষা নব-নব ভক্ত মনকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করতে লাগল। তাই রাম-নাম-গান ও উপাসনা সহজেই চারিদিকে প্রসার লাভ করল। বহু ভক্ত কবি রামের উদ্দেশ্যে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে প্রকারান্তরে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন হিন্দী কাব্যসাহিত্যকে। এই শাখার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গোস্বামী তুলসীদাস।

সগুণপন্থী : কৃষ্ণভক্তিশাখা—চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের যে আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল তার আদি উৎস মধ্বাচার্য (১১৯৭-১২৭৬)। অতঃপর শ্রীবল্লভাচার্য (১৪৭৮-১৫৩০) এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৩) সেই কৃষ্ণোপাসনা-ধারাকে বলিষ্ঠ, বিশিষ্ট এবং গতিশীল করেছেন। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের স্থাপনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-সাধনায় তাঁর ভক্তিভাবনার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে নাম-সংকীর্তনকেই চৈতন্যদেব বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর ভক্তি ছিল প্রেমোন্মাদে ভরা।

বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন

প্রকাণ্ড বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সচ্চিদানন্দের উপাসনা প্রচার করেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম। তিনি সর্বগুণান্বিত পুরুষোত্তম। বল্লভাচার্য কৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রতি বাৎসল্যভাব পোষণ করতেন। তাঁর মতে গোলোক বৈকুণ্ঠের অংশবিশেষ, তাতে যমুনা, বৃন্দাবন, নিকুঞ্জরূপী ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও পরম সার্থকতা। এই শাখার প্রধান কবি ছিলেন সূরদাস। শ্রীহিতহরিবংশজী (জন্ম ১৫০২ খ্রী.) শ্রীরাধিকার উপাসনাকে প্রাধান্য দিয়ে শ্রীরাধিকাবল্লভীয় সম্প্রদায় স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রে রামদাস, তুকারাম, নামদেব (১২৭০-১৩৫০), জ্ঞানেশ্বর প্রমুখ সাধক মহাত্মারাও কৃষ্ণভক্তিশাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা মারাঠীতে কাব্য রচনা করলেও হিন্দীতেও অল্প-স্বল্প পদ রচনা করেছেন। গুজরাটের ভক্তকবি নরসিংহ মেহতাও (১৫০০-১৫৮০) হিন্দীতে কয়েকটি ভক্তি-মূলক গীতিকবিতা রচনা করেন। কৃষ্ণভক্তিশাখার সাধকরা উপাস্য দেব-দেবীর গুণ-গান, পবিত্রমনে আত্মনিবেদন, কবিতার সাহায্যে ইষ্টদেবের স্তব-স্তুতিএবং জীবন-মুক্তির জন্য ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা— পরম কর্তব্য মনে করতেন। তাঁরা প্রথমে ভক্ত-সাধক এবং পরে কবি ছিলেন। এবার হিন্দীসাহিত্যের ভক্তিযুগের শাখা-ভিত্তিক পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। প্রথমে নির্গুণ ধারার জ্ঞানাশ্রয়ী শাখার কথা।

নির্গুণধারার জ্ঞানাশ্রয়ী ভক্তিশাখা

জ্ঞানাশ্রয়ী শাখার কবিরা প্রধাণত সন্ত বা সাধক। তাঁরা তাঁদের বাণী দোহা, শ্লোক বা পদের আকারে ব্যক্ত করতেন, তাই তাঁরা কবিও। সাধারণভাবে 'মধ্যযুগের সন্ত কবি' নামেই এঁরা সবাই পরিচিত। এই কবিরা ছিলেন নিরাকার নির্গুণবাদী এবং নাম-সংকীর্তন-স্মরণ-ভজনকেই উপাসনা বলে মনে করতেন। প্রচলিত সংস্কার বা রূঢ়িতা এবং মিথ্যা জাঁক-জমক ও বাহ্যিক পূজাঅর্চনার তাঁরা বিরোধিতা করতেন। এই গুরুবাদী সাধকদের কাছে গুরু ছিলেন ঈশ্বরতুল্য। জাতির ভেদ তাঁরা মানতেন না। মুসলমানদের মতোই হিন্দুদেরও অকারণ ও অহিতকর জাতিভেদ না থাকাই শ্রেয় মনে করতেন তাঁরা। সাধারণভাবে মানবধর্ম মানতেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানতেন না। মানতেন না বর্ণাশ্রমও। তবে ব্যক্তিসাধনায় বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের ধর্মমত বা বাণী প্রচারের ভাষা ছিল স্বতন্ত্র, সহজ, সরল অথচ শক্তিশালী। তাঁরা দেশের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন। তাই তাঁদের ধর্মপ্রচারের ভাষায় নানা অঞ্চলের কথ্যভাষার শব্দ এসে আশ্রয় নিত। নানাস্থানের কথ্যভাষার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এই শক্তিশালী ইস্পাতের মতো ভাষাকে বলা হত 'সাধুক্কড়ী' বা ভবঘুরে সাধুর খোলামেলা ভাষা। 'নির্গুণপন্থী' কবিদের মধ্যে কবীরের প্রসঙ্গই প্রথমে আসে।

কবীর—(১৩৯৯-১৪৯৫) এই জ্ঞানাশ্রয়ী শাখার শ্রেষ্ঠ সন্ত-কবি যে কবীর দাস তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।[১] জন্ম ১৪৫৬ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বলে অনুমিত। বিধবা ব্রাহ্মণীর সন্তান কবীর কাশীর সদ্য-ধর্মান্তরিত এক জোলার গৃহে মানুষ হন। তাঁর

স্ত্রীর নাম 'লোঈ' এবং পুত্র-কন্যার নাম যথাক্রমে 'কামাল' ও 'কামালী'। সামাজিক লোক-লজ্জায় মাতা লহতারা 'তলাব' অর্থাৎ জলাশয়ের তীরে সদ্যোজাত পুত্রকে ত্যাগ করেন। নীরু ও নীমা জোলাদম্পতি তাঁকে মানুষ করেন। শৈশব থেকেই কবীর ভগবদ্ভক্ত ও সংস্কারবিরোধী ছিলেন। তিনি সাধুসন্তদের সান্নিধ্য ভালোবাসতেন। এইভাবে বহু সাধু-ফকির ও মহাত্মাপুরুষের সংস্পর্শে এসে কবীর অনেক কিছু জানতে ও শিখতে সক্ষম হন। লেখা-পড়া না শিখলেও কবীর ছিলেন দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। তাই ক্রমে ক্রমে বহু মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রবুদ্ধ হয়েও শেষে রামানন্দের শিষ্যত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কৌশলে রামানন্দের শিষ্যত্ব লাভও করেন। কিন্তু রাম-নাম সংকীর্তন ও প্রচারের দীক্ষা লাভ করেও কবীর পুরোপুরি রামানন্দের পথে গেলেন না। তিনি স্ব-অনুভূতি এবং স্ব-বোধে চালিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে সমানভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ সম্প্রদায় ভুলে ও ত্যাগ করে কবীরের সম্প্রদায়ভুক্ত হতে লাগল। কবীর যে-রামের কথা বলতেন তিনি অবতারী দশরথ-পুত্র নন, তিনি নিরাকার ব্রহ্ম। কবীর বলতেন—

দশরথ সুত তিহুঁ লোক বখানা।
রাম নাম কা মরম হৈ আনা।

—বিশ্বের লোকে দশরথপুত্র ধনুর্ধর রামরূপেই তাঁকে চেনে, কিন্তু রাম-নামের প্রকৃত মর্ম বোঝে না। অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মের খোঁজ পেতে তাঁদের এখনো অনেক দেরি।

কবীর হিন্দুদের জ্ঞান-মার্গের সঙ্গে সুফীদের বিচার-পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে প্রেম ও উপাসনার বিষয় করে তুললেন। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ, সুফীদের ভাবাত্মক রহস্যবাদ, হঠযোগীদের সাধনাত্মক রহস্যবাদ এবং বৈষ্ণবদের অহিংসা ও প্রপত্তিবাদের সঙ্গত সমন্বিত

রূপ হল— 'কবীরপন্থ' বা কবীর প্রবর্তিত 'নির্গুণ সাধন-মার্গ'। তিনি বলতেন—

সাধো, এক রূপ সব মাহীঁ।
অপনে মন বিচার কৈ দেখো কোঈ দূসরা নাহীঁ।

—সর্বত্রই একই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। মনে বিচার করলেই বোঝা যায় কেউ-ই অপর বা দ্বিতীয় নয়।

বেদ-বেদান্তের তত্ত্বও এসে গেছে কবীরের বাণীতে। তাঁর প্রেম-তত্ত্ব পরে সুফীরাও গ্রহণ করেছেন। হিংসার জন্য তিনি মুসলমানদেরও ছেড়ে কথা বলেন নি—

দিনভর রোজা করত হৈঁ, রাতি হনত হৈঁ গায়।
য়হ তো খূন, ওয়হ বন্দগী, কৈসে খুসী খুদায়।

—মুসলমানরা সারাদিন রোজা রেখে রাত্রে গো-হত্যা করে; একদিকে হিংসা অন্যদিকে বন্দনা— তাতে কি ঈশ্বরকে খুসী করা যায়? এইভাবে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ক্রিয়া-কাণ্ডের নিন্দা করেছেন। জাতি-ধর্ম ও ক্রিয়া-কাণ্ডের ঊর্ধ্বে মানুষকে সমান চোখে দেখার ও তাকে ভালোবাসার জ্ঞান-শলাকা বিতরণ করেছেন তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাম ও রহিমের একত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর ভাষা, ভঙ্গি, প্রতীক ও উপকরণ সবই সাধারণ মানুষের জীবন থেকে গৃহীত। সহজ সুরে সহজ ভাষায় তিনি গভীর কথা বলতে চেয়েছেন। আবার মাঝে মাঝে রহস্যাত্মক ও ধাঁধাপূর্ণ ভঙ্গিতে এমন সব গুহ্য কথা বলেছেন যা বোঝা সহজ নয়, কিন্তু বলার ভাষা ও ভঙ্গি এমন আকর্ষণীয় যে সাধারণ লোকে সহজেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হত, পরে অর্থ বুঝত। যেমন—

১. নৈয়া বিচ নদিয়া ডূবতি জায়।
২. কবীরদাস কী উল্টী বানী
বরসে কম্বল ভীজে পানী।

—নৌকোর মাঝে নদী ডুবে যায়।
—কবীরের গূঢ় কথা বোঝা দায়,
জল ভেজে কম্বল বরষায়!

আবার ভাবাত্মক রহস্যবাদের একটি দৃষ্টান্ত—

মুঝকো ক্যা তূ ঢূঁঢ়ে মৈঁ তো তেরে পাস মেঁ।

—আমায় বৃথায় খুঁজিস ওরে, আমি যে তোর পাশেই!

এখানে সুফীভাবধারার প্রভাব লক্ষিত হয়। কবীরের এই ধরনের হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় অভিমত প্রকাশের রীতি 'আদিকালের' সিদ্ধ-সাধক ও হঠযোগীদের সন্ধ্যাভাষা ব্যবহারের ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি পূর্বীমিশ্রিত ভোজপুরীতে উপদেশ দিতেন। তবে তার যে 'সাধুক্কড়ী' রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, অবধী প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। কবীর কোনো কিছু লিখে যান নি। তাই তাঁর বাণী শিষ্যপরম্পরায় প্রচারিত ও সংগৃহীত হয়েছে পরবর্তী কালে। কবীরের সংগৃহীত বাণী 'বীজক' বা মূল নামে পরিচিত। বীজকের তিনটি ভাগ— রমৈনী, সবদ, এবং সাখী। 'রমৈনী' ও 'সবদ' হচ্ছে গান বা পদ। তার বাহন ব্রজভাষা এবং 'পূরবী বোলী'। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ক উপদেশ প্রধানত 'সাখী'তে বিধৃত। সাখীর ভাষা খড়ীবোলী আশ্রিত সাধুক্কড়ী।[২]

কবীরের পদ জ্ঞানরস-ভক্তিরস ও কাব্যরসে পরিপূর্ণ। জাতি ধর্ম ও প্রচলিত সংস্কার নাশকারী বিপ্লবী গুরুরূপে কবীর অসাধারণ ও অনন্য। সহজ সত্যকে নিরাবরণ করে প্রকাশের অকুতোভয় শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী কবীর সে যুগের ক্রান্তদর্শী মহানায়ক। 'ভারতপন্থ' কথাটি এবং তার ধারণা কবীর দাসেরই অবদান। তার থেকে 'ভারতপথ' এবং 'ভারতপথিক' প্রভৃতি শব্দগুলি আমরা পেয়েছি।[৩] কবীরের একটি পদ—

দুলহিনী গাবহু মঙ্গলচার।
হমরে ঘর আয়ে রাম ভরতার।
তন রতি করি মৈঁ মন রতি করিহোঁ, পাঁচো তত্ত বরাতী॥
রামদেব মোহি ব্যাহন আয়ে, মৈঁ জোবন মদমাতী।
সরীর সরোবর বেদী করিহোঁ ব্রহ্মা বেদ উচারা॥
রামদেব সঁগ ভাঁবরি লেহোঁ ধন ধন ভাগ হমারা।
সুর তেতীসোঁ কৌতুক আয়ে মুণিবর সহস অঠাসী॥
কহৈ কবীর মোহি ব্যাহি চলে হৈঁ পুরুষ এক অবিনাসী।

—তোমরা সবাই মঙ্গল গান কর, আমার ঘরে আজ রাম স্বামী-রূপে এসেছেন। আমার দেহ মন রতি হবে, পঞ্চতত্ত্ব হবে বরযাত্র, রাম যৌবনমদে মত্ত আমাকে বিয়ে করতে এসেছেন। দেহ-বেদীতে ব্রহ্মার মন্ত্রোচ্চারণে রামের সঙ্গে সাতপাক ঘুরব— আমার কি সৌভাগ্য! ত্রেতিশ কোটি দেবতা ও অষ্টাশি সহস্র মুনি কৌতুক দেখতে এসেছেন। আর এক অবিনাশী পুরুষ আমাকে বিয়ে করে নিয়ে চলেছেন।

এখানে কবীর জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ পতি-পত্নীর প্রতীকে তুলে ধরেছেন। তিনি জীবাত্মাকে স্ত্রী এবং পরমাত্মাকে পুরুষ রূপে গ্রহণ করেছেন।

রবিদাস—(আ ১৪৪৫-১৫৭৫) রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের একজন হলেন রবিদাস বা রৈদাস। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। জাতিতে ছিলেন চর্মকার বা চামার অর্থাৎ মুচি। সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য হলেও কবীর দাসের মতোই তিনিও কোনো গ্রন্থাদি রচনা করেন নি। তবে তাঁর বিপুল উপদেশাবলী 'রৈদাসজী কী বাণী' এবং 'রৈদাস রামায়ণ' নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনায় আত্ম-নিবেদন এবং পরমাত্ম বিরহের বেদনা পরিব্যাপ্ত। তাঁর জ্ঞানানুভূতি প্রেমানুভূতির

প্রলেপে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর সঙ্গে কম সন্ত-কবিরই তুলনা চলে। তাঁর পদ অতি সহজেই পাঠক শ্রোতা এবং ভক্তচিত্তকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করতে পারে। পাঠক সহজেই তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি একস্থলে বলেছেন, 'হে ভগবান এ আবার কেমন প্রীতি, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই বিষম প্রীতির কথা ভাবলেই আমার বুদ্ধি লোপ ঘটে যায়। পারস্পরিক প্রীতিতে এমন হওয়া দরকার যাতে তুমি যেমন আমাকে দেখতে পাও যেন আমিও তোমাকে তেমনি দেখতে পাই'—

'তূ মোহিঁ দেখৈ হোঁ তোহিঁ দেখোঁ, প্রীতিপরস্পর হোঈ।
তূ মোহিঁ দেখৈ তোহিঁ ন দেখোঁ, য়হি মতি বুদ্ধিসব খোঈ।'

রৈদাস তাঁর পদে কবীর, নানকদেব, সধনা ও সেনা নাঈ প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি কাশীতে বাস করতেন। ধন্না ও মীরাবাঈ সশ্রদ্ধচিত্তে রৈদাসের নামোল্লেখ করেছেন। মীরাবাঈ তাঁকে গুরু বলেও অভিহিত করেছেন। শান্ত নিরীহ-নিরহংকারী ভক্তমনের ভাবের প্রকাশ ভঙ্গিও বেশ উপযোগী। তাঁর পদের ভাষা ও ভঙ্গি বেশ সরল, পাণ্ডিত্যের স্পর্শমাত্র নেই। 'সাধো' সম্প্রদায়টি রৈদাসের ঐতিহ্যবাহী বলে মনে হয়। 'সন্তবাণী' ও 'গুরুগ্রন্থ সাহেব'এও তাঁর বাণী সংকলিত। রৈদাসের একটি পদ—

প্রভুজী তুম চন্দন হম পানী। জাকী অঙ্গ-অঙ্গ বাস সমানী।
প্রভুজী তুম বন ঘন হম মোরা। জৈসে চিতওয়ত চন্দ চকোরা॥
প্রভুজী তুম মালী হম বাগা। জৈসে সোনহিঁ মিলত সুহাগা॥
প্রভুজী তুম স্বামী হম দাসা। ঐসী ভগতি করৈ রৈদাসা॥

—এখানে ভক্তকবি প্রভুকে চন্দন, ঘন-বন, মালী ও স্বামীরূপে দেখে নিজের যথাক্রমে পানী (জল), মোর (ময়ূর), বাগ (বাগান) ও দাস-রূপ কল্পনা করেছেন। এ দুয়ের মধুর প্রত্যাশিত সম্পর্ক এবং ফলশ্রুতি কল্পনা করে কবি নিজেকে ধন্য বলে, সার্থক বলে মনে

করেছেন। এখানেই রৈদাসের ভক্তি অনুপম ও অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে।

দাদূ দয়াল—রাজপুতানার প্রখ্যাত সাধক কবি দাদূদয়ালের (১৫৪৪-১৬০৩) জন্ম আমেদাবাদে বলে কথিত। তিনি ব্রাহ্মণ, ধুনুরী অথবা মুচির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন— তা নিয়ে মতভেদ আছে। বাংলা বাউল পদে 'দাউদ' বা 'দাদূ-বন্দনা' পাওয়া যায়। তাতে মনে হয়, তাঁর পূর্বনাম ছিল 'দাউদ' পরে 'দাদূ' হয়। দাদূ কিশোর বয়সেই 'বুদ্ধানন্দ' গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সাম্ভরে 'ব্রহ্ম সম্প্রদায়' স্থাপন করেন। গরীব দাস ও মিসকীন দাস ছিলেন তাঁর তুই পুত্র। গরীব দাস ভালো কবি ছিলেন। সম্রাট আকবর দাদূর সাধনা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ফতেপুর সিক্রিতে একটি সাধু সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে। এই 'সৎসঙ্গ' প্রায় চল্লিশ দিন ধরে চলেছিল।

তুলসীদাসের সমসাময়িক এই সন্ত কবির ধর্মসাধনা ও জীবনধারা কবীর-প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত ছিল। তাঁর বাণীতে কবীরের উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তবে কবীর যা ছিলেন দাদূ ঠিক তাই ছিলেন না। তাঁর স্বভাবে কবীরের মতো উগ্রতা ছিল না। তিনি সহজ-নম্র ভঙ্গিতে সমাজের দোষত্রুটি নির্দেশ করেছেন এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিনম্র অথচ বীরোচিত পথ-নির্দেশ করেছেন।

দাদূর তুই শিষ্য সন্তদাস এবং জগন্নাথ দাস তাঁর বাণী বা উপদেশ সংগ্রহ করেন 'হরড়েবাণী' নামে। পরে রজ্জব 'অঙ্গবন্ধু' নামে নতুন করে তার সম্পাদনা করেন। সহজ মধুর গুণের জন্য দাদূর বাণী কোনো কালেই লোকপ্রিয়তা হারায়নি। তাই যুগে যুগে বহুবার বহু জনের দ্বারা তাঁর বাণী সম্পাদিত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন বাংলা অনুবাদসহ দাদূর বাণীর সম্পাদনা করেছেন 'দাদূ' নামে

(১২৩৪ খ্রী.)। বলাই বাহুল্য এই সংকলন ও সম্পাদনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কবীরের মতো দাদূও সাধারণ জীবন থেকেই উপমা-রূপক সংগ্রহ করেছেন। তবে তাঁর উপদেশ সাধারণভাবে সহজ সরল। তাঁর পদে যেখানে ব্যক্তিগত ভগবানরূপে নির্গুণ নিরাকার নিরঞ্জনের উপলব্ধি ঘটেছে, সেখানে দাদূর কবিত্বশক্তি স্ব-অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সেখানে প্রেমের অনবদ্য চিত্ররূপ সুফী সাধকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁদের মতোই তিনিও 'প্রেম'-এর মধ্যেই ভগবানের রূপ ও সান্নিধ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর বিরহের পদে অসীমের জন্য সীমার যে কাতর আর্তি প্রকাশ পেয়েছে তা সহজেই সহৃদয় পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে।

পশ্চিমী রাজস্থানী মিশ্রিত পরিমার্জিত হিন্দী ভাষার শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় দাদূর পদে। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মনে তাঁর ভাষা সহজেই আবেদন জাগায়। গুজরাটি, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী ভাষার পদও তিনি লিখেছেন। আরবি-পারসির শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনবোধে। ঈশ্বরের ব্যাপকতা ও সদ্গুরুর মাহাত্ম্যের সারবত্তায় এবং জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা ও বিভেদের অসারতায় দাদূ দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সহজ সুরে সহজ কথা বলতে গিয়ে দাদূ তাঁর সহজ-বিনম্র ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। পরবর্তী কালে দাদূর অনুগামীরা 'দাদূ-পন্থী' নামে পরিচিত হয়েছেন। তাঁরা তিলক-কণ্ঠী প্রভৃতি ব্যবহার করেন না; 'সত্তারাম' বলে পরস্পরকে অভিবাদন করেন। জয়পুরের নিকট 'ন-রানা'র কাছে 'ভরানা' পাহাড়ে দাদূ দেহরক্ষা করেন। দাদূর একটি পদ—

> ভাঈ রে, অ্যায়েসা পন্থ হমারা।
> দ্বৈ পংখ রহিত পন্থগহ পূরা অবরন এক অধারা।
> বাদ বিবাদ কাহু সোঁ নাহী মৈঁ হূঁ জগ মেঁ ন্যারা॥

সমদৃষ্টিসূঁ ভাঈ সহজমেঁ আপহি আপ বিচারা।
মৈঁ, তৈঁ মেরী য়হ মতি নাহিঁ নিরবৈরী নিরবিকারা॥
পূরণ সবৈ দেখি আয়া পর নিরালম্ব নিরধারা।
কাহূ কে সঙ্গী মোহ ন মমিতা সঙ্গী সিরজনহারা॥
মনহী মন মনসূ সমঝিঁ স্যানা আনন্দ এক অপারা।
কাম কল্পনা কদে ন কী জৈ পূরণ ব্রহ্ম পিয়ারা।
এহি পথ পহুঁচি পার গহি দাদূ, সোঁ তত সহজ সঁভারা॥

—ভাই রে এই হল আমার পথ। দলাদলিহীন পথই নির্বলদের ভরসা। আমার সঙ্গে কারো বাদও নেই বিবাদও নেই— আমার পথ এমনি অদ্ভুত। সহজভাবে চিন্তা করলেই সমদৃষ্টির উপযোগিতা বোঝা যায়। আমার-তোমার বা আমি-তুমির বোধহীন শত্রুহীন ও বিরোধ-বিকারহীন মতই— আমার মত। সবাই তাঁকে (ঈশ্বরকে) পরিপূর্ণভাবে দেখে কিন্তু তিনি নিরালম্ব-নিরাধার। সুতরাং কারো সঙ্গে মোহ-মমতা না রেখে বিধাতাকেই সঙ্গীরূপে গ্রহণ করা বিধেয়। কাম-কল্পনার কোনো কদর করি না। একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্মই আমার প্রিয়। এপথ ধরেই দাদূ পার পেতে চলেছেন, সুতরাং এটাই 'সন্তারের' (গন্তব্যস্থানের) সহজ পথ।

•

গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৮)—মধ্যযুগে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, সাধনা এবং সমাজ ব্যবস্থাকে যাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, সেই মহাত্মাদের মধ্যে প্রথম সারির একজন হলেন গুরু নানক। তাঁর জন্ম পাঞ্জাবের রাঈ-ভোঈর অন্তর্গত তালবন্দী গ্রামে। বর্তমানে এই স্থানটি 'নানকাকানা' নামে পরিচিত এবং পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতার নাম কালুচাঁদ খত্রী এবং মাতা তৃপ্তাদেবী। তাঁর স্ত্রীর নাম— সুলক্ষণী এবং দুই পুত্রের নাম শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। শ্রীচাঁদও সাধক ছিলেন। তিনি 'উদাসী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। নানক শৈশব থেকেই ত্যাগব্রতী এবং সাধুসেবা অনুরাগী ছিলেন। প্রবল

পরাক্রমী ও প্রভাবশালী শিখ সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক নানকই। হিন্দী সাহিত্যে শিখ সম্প্রদায়ের গুরুত্বের কারণ মুখ্যত দুটি। —শিখ সম্প্রদায়ে নানকদেবের পরও নয়জন গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা নিজেরা যেমন ধর্মাশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তেমনি অন্যদের, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদেরও উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন সাহিত্য-সৃজনে। তাই হিন্দী সাহিত্যে আত্মিকবল ও চারিত্র্যশুদ্ধি-মূলক সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তাঁদের দান অবশ্যই স্বীকার্য। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের (১৬৬৬-১৭০৮) সময়ে নানকদেব এবং অপর গুরুদের বাণী 'গুরুগ্রন্থসাহেব' নামে সংকলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে নানকের পূর্ববর্তী অন্য সাধক-কবিদের রচনাও সংকলিত। তাই গুরুগ্রন্থসাহেব ধর্ম মনোভাবাপন্ন মানুষ এবং হিন্দী সাহিত্যানুরাগীদের কাছে অমূল্য রত্নভাণ্ডার স্বরূপ।

নানক শৈশব থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। সংসারের সাধারণ কাজের চেয়ে জনহিতকর, ভগবদ্বিষয়ক কাজেই, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবাতেই তাঁর বেশী অনুরাগ ছিল। তিনি সমাজ ও পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে 'কবীরে'র নির্দেশিত পথই তাঁর কাছে শ্রেয় বলে প্রতিভাত হয়। তাই পাঞ্জাবেই নির্গুণ-ব্রহ্মের উপাসনা শুরু করেন। কবীরের মতোই তিনিও লেখা-পড়া জানতেন না কিন্তু ভক্তিভাবে বিভোরচিত্ত হয়ে 'ভজন' গাইতেন। 'ভগবৎ-নাম'-এর উপাসক হলেও তিনি কবীরের মতো জটিল রহস্য-ময়তার বা সন্ধ্যাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তিনি অতি সহজ সরল পদ্ধতিতে ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাংগঠনিক শিক্ষাও দিয়েছেন। তিনি পাঞ্জাবী, ব্রজভাষা এবং খড়ী হিন্দীতে পদ রচনা করেছেন। নানক সরল, উদার ও নিরহংকার চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পদে সংসারের অনিত্যতা, ভগবদ্ভক্তি এবং সাধক স্বভাবের উপযোগিতার সুন্দর সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। নানকদেবের বাণী 'সবদ' (শব্দ) বা গেয়পদ, সলোক (শ্লোক) বা দোহাবদ্ধ সাখী প্রভৃতি সযত্নে গুরুগ্রন্থ

সাহেবে সুরক্ষিত। নানক সবাইকে সহজ ভঙ্গিতে সমানভাবে উপদেশ দিয়েছেন— পরম আপন জনের মতো। বলতেন— 'ওরে ভাই বড়ো পুণ্যের ফলে মানবজন্ম পাওয়া গেছে! সেটি মিথ্যাচারের জালে জড়িয়ে ফেলে অকারণ কাটিয়ে দিস নি!'—

রৈণ গঁবাঈ সোই কৈ, দিবসু গবাঁইয়া খাই।
হীরে জৈসা জনমু হৈ, কউড়ী বদলে জাই॥

—ঘুমিয়ে কাটল রাত আর খেয়ে কাটল দিন; হীরের মতো জীবন কানাকড়ির দামেই চলে যাচ্ছে।

নানকদেবের একটি পদ—

জো নর দুখ নহিঁ মানে।
সুখ সনেহ অরু ভয় নহিঁ জাকে, কঞ্চন মাটী জানৈ॥
নহিঁ নিন্দা নহিঁ অস্তুতি জাকেঁ লোভ মোহ অভিমানা।
হরষ সোক তৈঁ রহে নিয়ারো, নহিঁ মান-অপমানা॥
আসা মনসা সকল ত্যাগি কৈ জগ তে রহে নিরাসা।
কাম ক্রোধ জেহি পরসৈ নাহিন তেহি ঘট ব্রহ্ম নিবাসা॥
গুরু কিরপা জেহি নর পৈ কীহ্নী তিহ্ন য়হ জুগুতি পিছানী।
নানক লীন ভয়ো গোবিন্দ সোঁ জ্যো পানী সঙ্গ পানী॥

—যে ব্যক্তি দুঃখকে স্বীকার করে না, সুখ, স্নেহ, ভয়, নিন্দা স্তুতি, লোভ ও অভিমান— যার নেই, যার কাছে 'সোনা মাটি, মাটি সোনা', শোক-আনন্দ যাকে স্পর্শ করে না, মান-অপমানবোধ যার নেই, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষামুক্ত নিরাশ জীবন যার, কাম-ক্রোধ যাকে স্পর্শ করতে পারে না, তার মধ্যেই ব্রহ্মের বাস। যার প্রতি গুরুর কৃপা হয় সেই এ যুক্তি বুঝতে পারে। তাই নানক গোবিন্দের সঙ্গে এমন-ভাবে মিশে গেছেন, জলের সঙ্গে যেমন জল মিশে যায়।

সুন্দরদাস (১৫৯৬-১৬৮৯)—দাদূর শিষ্যদের মধ্যে সুন্দরদাস ছিলেন সর্বাধিক শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত। খাণ্ডেলওয়াল বংশীয় বৈশ্য সুন্দর-

দাসের জন্ম জয়পুরেব 'দ্যৌসা' নগরে। তাঁর পিতার নাম ছিল পরমানন্দ এবং মাতার নাম ছিল সতী। শৈশবেই সুন্দরদাস দাদূর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে কাশীতে এসে দীর্ঘকাল ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাই তাঁর কাব্যসাহিত্য অলংকার-শাস্ত্র সম্মত। নির্গুণপন্থী সাধকদের মধ্যে একমাত্র সুন্দরদাসই সুশিক্ষিত ছিলেন এবং বিধিবৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। দেশের বহুস্থানে ভ্রমণ করে সুন্দর দাস বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বাস্তবজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। তাই লোক-ভাষা, লোকধর্ম ও সাধারণ মানুষকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখলেও তার মধ্যে 'সুন্দরবিলাস'ই বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছে। 'কবিত্ত' ও 'সবৈয়া' ছন্দোবন্ধে গ্রন্থটি রচিত। যদিও সে যুগের অন্য কবিদের রচনায় দোহা-চৌপাঈ প্রভৃতিরই বেশী ব্যবহার চোখে পড়ে। কেবলমাত্র ঈশ্বরভক্তি ও মানব প্রেমই নয়, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়েও সুন্দরদাস কাব্য রচনা করেছেন। এমনকি, গুজরাট, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য এবং পূর্বাঞ্চল নিয়েও তিনি বেশ উপভোগ্য উক্তি-ঋদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন। পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে বলেছেন— 'ব্রাহ্মণ খত্রিয় বৈসরু সূদর-চারোই বর্ণকে মচ্ছ বঘারত।' 'অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চার বর্ণকেই মাছ জাতে তোলে।

পরিমার্জিত ব্রজ ভাষায় রচিত সুন্দরদাসের কাব্য সরস ও সাহিত্যগুণমণ্ডিত। শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বিদগ্ধ ব্যবহার ঘটেছে তাঁর রচনায়। অকারণ মিলের খেলা ও এলোমেলো বাক্য-ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। তবে সব মিলিয়ে দেখা যায় অতিমাত্রায় নিয়মনির্ভর হওয়ার ফলে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে কৃত্রিমতার ছোঁয়া লেগেছে। সুন্দরদাসের একটি পদ—

> বৌলি এ তৌ তব জব বোলিবে কী কছু হোয়,
> না তৌ মুখ মৌন গহি চুপ হোয় রহি এ।
> জোরি এ তৌ তব জব জোরিবে কী রীতি জানে,
> তুক ছন্দ অরথ অনূপ জামেঁ লহি এ॥

গাইয়ে তৌ তব জব গাইবে কো কণ্ঠ হোয়,
শ্রবণ কে সুনত হী মনে জায় গহিয়ে।
তুক ভঙ্গ ছন্দ ভঙ্গ, অরথ মিলৈ ন কছু,
সুন্দর কহত অ্যায়েসী বাণী নহিঁ কহি এ॥

এখানে সুন্দরদাস কবির প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন— বলার উপযুক্ত কিছু থাকলেই মুখ খোলা উচিত, তা না হলে চুপ থাকাই শ্রেয়। রচনার বিধান জেনে তারপর লিখতে চেষ্টা করা উচিত, যাতে ছন্দ, অর্থ ও মিলের সার্থক সমন্বয় ঘটতে পারে। গাইবার মতো গলা থাকলেই গান গাওয়া উচিত, যাতে শ্রোতার প্রাণ-মন জুড়িয়ে যায়। ছন্দ নেই, মিল নেই, আর অর্থও বোঝা যায় না— এমন কিছু না-লেখাই ভালো।

ধর্মদাস (১৪১৮-১৪৪৩-এর মধ্যে জন্ম ?)—বাঁধওয়গড়ের সম্পন্ন বণিক পরিবারের সন্তান ধর্মদাস শৈশব থেকেই ভক্তিপ্রাণ ছিলেন। সাধুসেবা, তীর্থদর্শন ইত্যাদিতে তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। সগুণোপাসক ধর্মদাস তীর্থপর্যটনের সময় মথুরার পথে কবীরের সাক্ষাৎ পান। তখন কবীরের প্রতিষ্ঠা সর্বজন বিদিত। কবীর ধর্মদাসের সঙ্গে ধর্মালোচনা প্রসঙ্গে মূর্তিপূজা, তীর্থাটন, দেবপূজা প্রভৃতির অসারতা ব্যাখ্যা করেন। তাতে প্রভাবিত হয়ে ধর্মদাস নির্গুণভক্তির সাধনার দিকে আকৃষ্ট হন। অসার ভেবে তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ বিলিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে কবীরের প্রধান শিষ্য হয়ে উঠলেন। কবীরের পর আনুমানিক কুড়ি বছর তিনি তাঁর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বাণীও সন্ত সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে আদৃত হয়। তিনি যে কয়টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 'সুখনিধান' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ছত্তিসগঢ়ে তাঁর গদি আছে বলে মনে করা হয়। কবীরের মতোই তিনিও আধ্যাত্মিক বিরহের পদ রচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় পূর্বী হিন্দীর প্রভাব সমধিক। তিনি বাদ-বিতণ্ডার কচকচিতে না গিয়ে সহজ সরলভাবে

প্রেমতত্ত্বের কথা বলেছেন। তাতে মাঝে মাঝে কাব্যরস এবং সৌন্দর্য-মাধুরীও ফুটে উঠেছে। যেমন—

ঝরি লাগৈ মহলিয়া গগন ঘহরায়।
খন গরজৈ, খন বিজুলী চমকৈ, লহরি উঠৈ সোভা বরনি ন জায়।
সুন্ন মহল সে অমৃত বরসৈ, প্রেম অনন্দ হ্বৈ সাধু নহায়॥
খুলী কেবরিয়া, মিটী অঁধিয়ারিয়া, ধনি সতগুরু জিন দিয়া লখায়।
ধরম দাস বিনবৈয় কর জোরী, সতগুরুচরণ মেঁ রহত সমায়॥

—বাড়ির মাথায় বর্ষার আকাশ ভেঙে পড়ছে। খনে গরজাচ্ছে, খনে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর যে তরঙ্গ খেলছে, তার শোভা বর্ণনাতীত। শূন্য থেকে অমৃত ঝরছে, আর তাতে সাধুরা প্রেমানন্দে স্নান করছে। কপাট খুলল, আঁধার দূর হল— ধন্য সেই সৎগুরু যিনি তা প্রত্যক্ষ করান। যাতে সৎগুরুর চরণে অচলাভক্তি থাকে— তার জন্য ধর্মদাস করজোড়ে প্রার্থনা করছেন।

এখানে আধ্যাত্মিক ভাব লোক-ভাষা ও লোকছন্দের অপরূপ সমন্বয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

মলূক দাস (১৫৭৪-১৬৮২)—এলাহাবাদ জেলার 'কড়া'তে ক্ষত্রিয় বংশে মলূক দাসের জন্ম হয়। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে তিনি নির্গুণ সাধক রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য সন্ত কবিদের সঙ্গে তার বাণী ও সাধনার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর গদি বা 'আখড়া' কড়া, জয়পুর, গুজরাট, পাটনা, মুলতান, নেপাল ও কাবুলে পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সম্ভবত নয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তার মধ্যে মাত্র দুটি— 'রত্নখান' ও 'জ্ঞানবোধ'ই পাওয়া গেছে। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে অন্য সন্তদের মতোই সমানভাবে উপদেশ দিতেন। তাঁর ভাষায় আরবি-পারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ভাষা বেশ পরিণত এবং সুন্দর। তাঁর ছন্দজ্ঞানও ভালো ছিল। 'কবিত্ত'-এর সুন্দর ও সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয় তাঁর রচনায়।

তাঁর কোনো কোনো পদ বেশ সরস ও সাহিত্যধর্মী। আত্মবোধ, বৈরাগ্য এবং প্রেম-প্রীতি বিষয়ক তাঁর পদগুলি বেশ সুখপাঠ্য ও সুগেয়। মলূক দাসের একটি পদ—

না ওয়হ রীঝে জপ-তপ কীহ্নে না আতপ কে জারে।
না ওয়হ রীঝে ধোতী নেতী, না কায়াকে পখারে॥
দয়া করৈ ধরম মন রাখৈ ঘর মে রহৈ উদাসী।
অপনা সা দুখ সবকো জানে তাহি মিলে অবিনাসী॥
সহে কুসবদ বাদহু ত্যাগে ছাঁড়ে গর্ব গুমানা।
ওয়হী রীঝ মেরে নিরংকার কী কহত মলূক দিওয়ানা॥

—জপ-তপ বা কৃচ্ছ্র সাধনে, বস্ত্র আভূষণ বা কায়ক্লেশে তাঁকে (প্রভুকে) সন্তুষ্ট করা যায় না। জীবে দয়া ও ধর্মে মতি রেখে নিরাসক্ত গৃহী যদি সকলের দুঃখকে নিজের বলে অনুভব করে তবেই সে অবিনাশীর সাক্ষাৎ পাবে। কুকথা বা নিন্দা অম্লান বদনে সহ্য করে, তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থেকে এবং গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করেই সেই 'নিরঙ্কার'কে সন্তুষ্ট করা যায়। বাউল মলূক দাসের এই হল সিদ্ধান্ত।

মলূক দাস অতিমাত্রায় ঈশ্বর নির্ভর এবং খোসমেজাজি ছিলেন। হিন্দী জগতে সুপ্রচলিত অলসদের বিখ্যাত 'গুরুমন্ত্র' তাঁরই রচিত।—

অজগর করৈ না চাকরি, পঞ্ছী করে ন কাম।
দাসমলূকা কহ গয়ে, সবকো দাতা রাম।
অর্থাৎ—
অজগরে করে না চাকুরি পাখিতে করে না কাম।
মলূক দাসের বিশ্বাস, সকলেরই দাতা রাম।

অক্ষর অনন্য—সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে অক্ষর অনন্য বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি একজন প্রতিভাশালী সাধক-কবি ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 'দাঁতিয়া' রাজ পৃথ্বীচাঁদের দেওয়ান ছিলেন। পরে

বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম 'দাঁতিয়া'র 'সেনুন্থরা' গ্রামে। বেদান্ত ও যোগ বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারমধ্যে রাজযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, বিবেকদীপিকা ও অনন্য-প্রকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ধর্মোপদেশ বৈরাগ্যমূলক, তাই ভবসাগর পার হবার জন্য যোগ ও ভজন নির্দেশ করেছেন। অক্ষর অনন্যের একটি পদ—

য়হভেদ স্নৌ পৃথ্বিচন্দরায়। ফল চারহু কো সাধন উপায়॥
য়হ লোক সধৈ সুখ পুত্র বাম। পরলোক নসৈ বস নরক ধাম॥
পরলোক লোক দোউ সবৈ জায়। সোই রাজযোগ সিদ্ধান্ত আয়॥
নিজ রাজযোগ জ্ঞানী করন্ত। হঠি মূঢ় ধর্ম সাধত অনন্ত॥

কবি চারপ্রকার ফল লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন। এই লোকে সুখ ও পুত্র প্রতিকূলতা করে, পরলোক নষ্ট হলে নরকে স্থান হয়, লোক-পরলোকে সবাই যাওয়া আসা করতে পারে। রাজযোগের সিদ্ধান্তও তাই। জ্ঞানী ব্যক্তি তার রাজযোগ সাধনে ব্রতী হয় আর হঠ-যোগ সাধকরা মূঢ়ের মতো তথাকথিত ধর্মসাধনে নিরত থাকে।

এই আলোচ্য কবিদের ছাড়াও হিন্দু-মুসলমান, জৈনী ও শিখ-সম্প্রদায়ের বহু সাধক কবি 'নিগুর্ণপন্থ' গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বাণী ও উপদেশে একদিকে যেমন ধর্মের প্রসার ঘটেছে অন্যদিকে তেমনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যেরও অল্পবিস্তর উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছে। এইসব কবির মধ্যে রজ্জবজী (ষোড়শ শতক), গরীবদাস (ষোড়শ শতক), জম্ভনাথ, (১৪৫১-১৫৩৫) শ্রীহরিদাস, নিরঞ্জনী (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক), শেখ ফরীদ, গুরু অঙ্গদ (ষোড়শ শতক), গুরু অমর দাস (১৪৭৯-১৫৭৪), আনন্দঘন (সপ্তদশ শতক) নিশ্চলদাস, জগজীবন দাস (অষ্টাদশ শতক), চারণদাস, ভুলনদাস, মানীসাহেব, বুল্লাসাহেব, সহজো বাঈ (অষ্টাদশ শতক), দয়াবাঈ (অষ্টাদশ শতক), তুলসী সাহেব (অষ্টাদশ শতক), পলটু দাস,

সধনা, সেনা, পীপা ধন্না, বাওরী সাহিবা, কমাল, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নির্গুণ সন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন গোপকন্যা ক্ষেমা বা ক্ষেমাশ্রী। তিনি কবীরের শেষ জীবনে আত্মপ্রকাশ করেন। এই উচ্চ মার্গের সাধিকার সঙ্গে আলাপ করে কবীরও উপকৃত হয়েছিলেন।[৪] মরমীয়া সন্ত সাধকদের মধ্যে তাঁর বাণী আজও শোনা যায়। চর্যাপদের—"দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়?"-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর একটি উক্তিতে যা বাংলা করলে দাঁড়ায়—'অঙ্কুর ও বীজ কী আর গাছের মধ্যে ফেরে?' তাঁর একটি পদে 'প্রাণের স্বরূপ বর্ণিত'। সেই পদটি রবীন্দ্রনাথকে এত গভীরভাবে মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁর Personality গ্রন্থের What is Art প্রবন্ধে শিল্পের ব্যক্তিগত রসাভিজ্ঞতার আলোচনা প্রসঙ্গে তার, উল্লেখ ও অনুবাদ করেছেন। মূল পদটি হল—

নওয়ৌ প্রাণ বীজ অস ভুজ উচঁ ভুজ নীচা।
ঝূলত রূপ রাগ জস রস যো অন্তর বীচা॥
মিলত মিলত মিলত হৈ মিলা নহিঁ তব হূঁ।
দিসত দিসত দিসত হৈ দীসা নহিঁ অব হূঁ॥
আতে প্রাণ সিয় নওয়ৌ জাতে প্রাণ।
নওয়ৌ প্রাণ প্রগট হৈ নওয়ৌ চাহির খান॥
নওয়ৌ প্রাণ হৈ নবৌ সাগর আগনি।
নওয়ৌ প্রাণ কমল কোমল নওয়ৌ বজ্রসালনি॥
নওয়ৌ প্রাণ করেজ অস দউ ভুজ দউ বাঁহ।
আগে পিছে পসারত হৈ এক ধূপ এক ছাঁহ॥
নওয়ৌ প্রাণ ঘর আপন হৈ নওয়ৌ বাহির বীরান।
নওয়ৌ প্রাণ সুখ আনন্দ হৈ নওয়ৌ দুঃখ হৈরান॥
চলত চলত চলত হৈ থীর সকল ঠহরায়।

গহির গহির কৌন হৈ সংতত মৌন লহরায়॥

—রবীন্দ্রভাবনা, (পত্রিকা) মার্চ ১৯৭৮ পৃ. ১৯

—সংসারের আদি অন্ত, রূপ-অরূপ, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আপন-পর, চাঞ্চল্য-স্থৈর্য, গভীরতা-অগভীরতা— সবই সেই প্রাণের লীলা, নব-নব প্রাণের নিত্য-নবীন রূপ। প্রাণ-অঙ্কুরেরই বিবিধ ও বিচিত্র নবোদ্‌গমের লীলাখেলা এই বিশ্বজগৎ।

এই সম্প্রদায়ের সন্ত কবিদের মধ্যে এমন কবির সংখ্যা খুবই কম যাঁদের রচনা সাহিত্য পদবাচ্য। অধিকাংশ সাধক নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁরা মানুষকে জাতি, ধর্ম সম্প্রদায় প্রভৃতির সংস্কার থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেন নি। নতুন নতুন সন্ত-পন্থ প্রবর্তিত ও অনুসৃত হতে থাকায় দেশের জন-মানসে ও সাহিত্যে তার প্রভাব স্থায়ী হবার কম সুযোগ ঘটত। কবীর দাসের পুত্র কামাল স্বয়ং পিতার ঐতিহ্য বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন।— 'বুড়া বংশ কবীর কা উপজেঁ পূত কমাল'। এই প্রবাদই তার সাক্ষ্য বহন করে। দাদূ দয়ালের ধ্বজাবাহীদের মধ্যে জগজীবন সাহেব 'সত্যনামী' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপদেশের লক্ষ্য ছিল— সাধারণ জ্ঞান চর্চা। দুলনদাস, তোঁবর দাস, পহলবান দাস, তুলসী সাহেব, গোবিন্দ সাহেব, ভীখা সাহেব, পলটু সাহেব প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নির্গুণবাদী সাধক সম্প্রদায়ের সাধনায়—দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কিছু কিছু আভাস মেলে। কোনো কোনো গোষ্ঠীর ধর্মচেতনায়, বেদান্তের জ্ঞানতত্ত্ব, যোগীদের সাধনতত্ত্ব ও সুফীদের প্রেমমাধুরী যেমন মেলে তেমনি সাধারণভাবে ঈশ্বরভক্তিও মেলে। আপাতভাবে এইসব বিভিন্নতা থাকলেও এই সন্ত সাধকগণ একটি বিশেষ উদার ধর্ম ও সুমহৎ সংস্কৃতির সূত্রে সে যুগের বিশাল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। আজ সে কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। জন্মসূত্রে এবং ভাষার বিচারে আঞ্চলিক হয়েও

মধ্যযুগের সন্তসাধকগণ চিন্তায় ও সাধনায় ছিলেন সর্বভারতীয়। বেদ-উপনিষদের যুগে যে মহা ঐক্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল ঋষিমুখে, মধ্যযুগে ভিন্ন ভাষায়, ভিন্নতররূপে তা আবার সানন্দে উদ্‌ঘোষিত হল অশিক্ষিত সন্ত-সাধকদের আটপৌরে উদার কণ্ঠে ও উদার ছন্দে।

নির্গুণধারার প্রেমাশ্রয়ী ভক্তিশাখা

মধ্যযুগের নির্গুণ উপাসক ভক্তদের দ্বিতীয় শাখায় সুফী কবিরা প্রেম-গাথায় প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তারই সাহায্যে আরাধ্য-দেবকে পাওয়ার পথ নির্দেশ করেছেন। এই প্রেম-গাথা-কাব্য পঠন-শ্রবণ ও চিন্তনের ফলে মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়। লৌকিক প্রেম তো প্রকারান্তরে সেই কথাই বলে।

'সুফী' অর্থাৎ 'বিলাসশূন্য সরল জীবন যাপনকারী'। Sophos আগত হলে সুফীর অর্থ জ্ঞানী, পণ্ডিত। সুফীরা গুরুবাদী। সর্বেশ্বর-বাদে বিশ্বাসী সুফীরা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের প্রেমের সম্পর্কে আস্থাশীল। সংগীতানুরাগী এই সম্প্রদায়টি গোঁড়া ইসলামপন্থীদের তুলনায় হিন্দুদের অধিকতর নিকটবর্তী।

জীবাত্মা যখন পরমাত্মার বিয়োগে অতিশয় কাতর হয়ে পড়ে সেই সময় যোগ্য গুরুর নির্দেশ পেলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। তাই সুফী সাধনার মূল কথা 'প্রেম' ও 'প্রেমের পীড়া'। প্রেমার্তির সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতি 'আত্মার প্রকৃত স্বরূপ' দেখিয়ে দেয়। অদ্বৈতবাদে ও সুফী-বাদে অনেকটা সাম্য লক্ষিত হয়।

ভারতীয় বিচার-ধারায় সুফী মতবাদের প্রভাব পড়তে শুরু হয় খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে। সুফীদের ছ'টি গোষ্ঠী সময়ে সময়ে ভারতীয় ভাবধারাকে স্পর্শ করেছে। গোষ্ঠী ছ'টি হল—

১. চিশ্‌তিয়া (দ্বাদশ শতক) ২. সোহ্‌রাবর্দিয়া (দ্বাদশ শতক)
৩. কাদিরিয়া (পঞ্চদশ শতক) ৪. নক্সবন্দিয়া (পঞ্চদশ শতক)
৫. মদারিয়া এবং ৬. অধমিয়া।

চিশ্‌তিয়া গোষ্ঠীর মুইনুদ্দীন চিশ্‌তির প্রভাবই ভারতে সমধিক লক্ষিত হয়। মুইনুদ্দীনের শিষ্য 'খ্‌াজা কুতুবুদ্দীন কাকী' এবং তাঁর শিষ্য 'ফরীতুদ্দীন' 'শকরগঞ্জে'র নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা হিন্দুদেরও গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। 'শকরগঞ্জের প্রধান শিষ্য নিজামুদ্দীন ঔলিয়া'র শিষ্য শৃঙ্খলার একজন হলেন মালেক মোহাম্মদ জায়সী। তিনি অবধী ভাষায় 'পদ্মাবত' কাব্য রচনা করেন। হিন্দী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য হ'ল এই 'পদ্মাবত'। হিন্দীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাব্য তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'র পরই এই প্রেম-কাব্যটির স্থান। কুতুবনের 'মৃগাবতী', মঞ্ঝন-কৃত 'মধুমালতী' এবং উসমান রচিত 'চিত্রাবলী' প্রভৃতি কাব্যও হিন্দীর প্রেম-গাথা রূপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নির্গুণ সন্ত সাধকরা যে জাতি-বর্ণহীন উদার এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াস শুরু করেন সুফী সাধকদের দ্বারা তা আরও পুষ্ট এবং প্রসারিত হয়। সন্ত কবিরা যা জ্ঞানের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন— সুফী কবিরা তা করতে চাইলেন প্রেমের মাধ্যমে। তাই সুফীদের প্রেমের ধারা ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত এবং জনপ্রিয় হতে লাগল স্বাভাবিক কারণেই।

সুফী কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই মুসলমান। লৌকিক কাহিনী কাব্য বা প্রবন্ধ-কাব্যের সহায়তায় তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রেমের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁরা। এই লৌকিক গাথাগুলি কোনো না কোনো হিন্দুগাথার উপর আধৃত। এই কাহিনী চয়নে তাঁদের উদারতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। সকলের প্রেমকাব্যের শৈলী একই। ভাষা মিষ্ট-মধুর কথ্য অবধী। রামচরিত মানস অবধীতে লেখা হলেও

তার ভাষা পরিষ্কৃত, মার্জিত ও সংস্কৃতনিষ্ঠ। কোনো প্রেম-কাব্যে পাঁচটি চৌপাঈ-এর পর একটি দোহা আবার কোনোটিতে সাতটি চৌপাঈ-এর পর একটি দোহা ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] তুলসীদাসের রামচরিত মানসে আটটি চৌপাঈ-এর পর দোহার প্রয়োগ হয়েছে। সৌন্দর্য বর্ণনা অথবা বিরহের বর্ণনাতেই প্রেম-গাথার কাব্যময়তা সমধিক পরিস্ফুট। প্রকৃতির শোভাচিত্রণে কবিরা যে মাধুরী ও রম্যতা প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন, তা অন্যত্র দুর্লভ। প্রকৃতি তো পরমাত্মার বিচিত্র রম্যরূপের ভিন্নতর প্রকাশ মাত্র। তাই তার দর্শনে তাঁরা যেমন বিভোর তেমনি ভাবুক হয়ে উঠতেন। আর বিরহবর্ণনায় যেন কবি আপনচিত্তের বিয়োগ-ব্যথারই অনুপম রূপায়ণ করেছেন। তাই নিরীহ মর্মস্পর্শী এবং করুণ-রসাশ্রিত বিরহ বর্ণনা অনন্য-অলংকার হয়ে উঠেছে প্রেম কাব্যের। সুফী কবিদের প্রেম-গাথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—

১. এই প্রেমাখ্যানমূলক কাব্যগুলি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রানুসারী সর্গ-ভিত্তিক নয়, পারসি 'মসনবী'-ভিত্তিক। ঈশ-বন্দনা, পয়গম্বর স্তুতি, সমসাময়িক শাসক-প্রশস্তি দিয়ে কাব্যের সূচনা।

২. সবগুলি কাব্যেরই ভাষা অবধী এবং ছন্দোবন্ধ 'দোহা' ও 'চৌপাঈ'।

৩. হিন্দু-জীবনের কাহিনী এবং লৌকিক প্রেমের সাহায্যে ঐশ্বরিক প্রীতি প্রতিপাদিত।

৪. কবিরা প্রায় সকলেই মুসলমান হলেও হিন্দুদের ধর্ম ও জীবনযাত্রা বিষয়ে তাঁরা বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন।

৫. ধর্মের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে তাঁরা উদারভাবে প্রেমতত্ত্ব প্রচারে অভিনিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন।

আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে মোল্লা দাউদ নামে জনৈক

সুফী সন্ত কবি 'চন্দাবৎ' বা 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন সর্বপ্রথম। তবে সেই কাব্যগ্রন্থটি পাওয়া যায় নি।

কুতুবন (পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ)— ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে শেরশাহের পিতা জৌনপুরের শাসক হোসেন শাহের দরবারে কুতুবন থাকতেন।[৬] তিনি চিশ্‌তী বংশের শেখ বুরহানের শিষ্য ছিলেন। ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'মৃগাবতী' প্রেমকাব্য রচিত হয়। কবি জায়সীর কাব্যেও মৃগাবতীর উল্লেখ আছে। কাব্যটিতে চন্দ্রগিরি রাজ্যের রাজকুমার ও কাঞ্চনপুরের রাজকুমারীর প্রেম-কাহিনী বর্ণিত। রাজকুমারী মৃগাবতী ওড়ার মন্ত্র জানতেন। তিনি একবার রাজকুমারকে ছেড়ে উড়ে পালিয়ে যান। রাজকুমার তাঁর বিয়োগ-ব্যথায় বৈরাগী হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পথে এক রাক্ষসের কবল থেকে এক সুন্দরী রমণীকে উদ্ধার করেন। পরে সেই রমণীকে (রুক্মিণী) বিবাহ করেন। কিন্তু মৃগাবতীর খোঁজও চলতে থাকে। অবশেষে অনেক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে মৃগাবতীর সঙ্গেও তাঁর মিলন হয়। দুই পত্নীসহ রাজকুমার স্বদেশে ফিরে আসেন। একদিন শিকারের সময় হাতির পিঠ থেকে পড়ে রাজকুমারের মৃত্যু হয়। দুই রানীই সতী হন। আখ্যানের মাঝে মাঝে প্রেম সাধনার প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে মনোরম আলোচনা আছে। যা সাধকদের পক্ষে দিশা-নির্দেশের সামিল। কাব্যটির রহস্য-বর্ণনাও পাঠকদের মনে দাগ কাটে। প্রেমাস্পদের মধ্যে ঐশ্বর্য-বুদ্ধি এবং কঠোর সাধনার দ্বারা তার প্রাপ্তি এবং মাধুর্যভাবের কাছে ঐশ্বর্যভাবের পরাভব— এই হল সুফীদের আধ্যাত্মিক আদর্শ। এখানে প্রেমাস্পদা হল ভগবানের প্রতীক এবং প্রতারণা করে তার উড়ে-যাওয়াকে প্রেমের সত্যতা-পরীক্ষা হিসাবে গণ্য করা যায়। কারণ সুফী কবিরা প্রেমিককে সর্বদা অনেক বিপদ-আপদের ভিতর দিয়েই নায়িকার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যা প্রেমনিষ্ঠার সূচক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তা গভীর সাধনার দ্যোতক।

মঞ্ঝন (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ)—মধুমালতী কাব্যের রচয়িতা মঞ্ঝন উত্তর প্রদেশের বহ্‌রাইচের পূর্বস্থিত অনূপগঢ় নগরের অধিবাসী ছিলেন। ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ কাব্যের কাহিনী মৃগাবতী অপেক্ষা পরিণত ও উপাদেয়। কনেসর নগরের রাজা সূরজভানের পুত্র রাজকুমার মনোহর এবং মহারস নগরের রাজকুমারী মধুমালতীর প্রেম এবং বিরহের কথা বলা হয়েছে কাব্যটিতে। কাব্যটির কল্পিত কাহিনী হল এইরূপ—

কয়েকজন পরী নিদ্রিত রাজকুমার মনোহরকে তুলে নিয়ে রাজকুমারী মধুমালতীর প্রমোদ কক্ষে রেখে আসে। পরের দিন জেগে উঠে রাজকুমার মধুমালতীকে প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু পরে ঘুমিয়ে পড়লে আবার তাঁকে পরীরা যথাস্থানে রেখে আসে। রাজকুমারী রাজকুমারের প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। আর রাজকুমার সাধুর বেশে রাজকুমারীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পথে বিপদে-পড়া প্রেমা নামে এক যুবতীর প্রাণ রক্ষা করেন। প্রেমার মা মনোহরের সঙ্গে প্রেমার বিবাহ দিতে চান, কিন্তু প্রেমা রাজকুমারকে 'দাদা' বলে গ্রহণ করে। তারা দুজনে মধুমালতীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে মধুমালতীর সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ হয়। মধুমালতীর মাতা রূপমঞ্জরী মেয়ের সঙ্গে একজন অপরিচিত যুবককে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন। শাপের ফলে মধুমালতী পাখি হয়ে উড়ে যেতে যেতে রূপসাদৃশ্যের জন্য তারাচাঁদ নামে এক যুবককে মনোহর ভেবে তার হাতে ধরা দেন। খাঁচায় বদ্ধ মধুমালতী তারাচাঁদকে সমস্ত কথা খুলে বলেন। তারাচাঁদ পাখিকে মহারস নগরে নিয়ে গেলে রূপমঞ্জরী তাকে আবার মানবীরূপ দেন এবং তারাচাঁদের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তারাচাঁদ মধুমালতীকে বোন বলে স্বীকার করায় মায়ের ইচ্ছা অপূর্ণ ই থেকে যায়। একদিন যোগীর বেশে মনোহর এবং প্রেমা এসে উপস্থিত হয়। অবশেষে মধুমালতীর সঙ্গে মনোহরের বিবাহ হয়। প্রেমাকে

দেখে তারাচাঁদ মুগ্ধ হয়। কাহিনীটি এখানেই খণ্ডিত। তবে প্রেমার সঙ্গে তারাচাঁদের যে বিবাহ হয়ে থাকবে সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ-কাব্যে কবি নায়ক-নায়িকার অতিরিক্ত উপনায়ক ও উপ-নায়িকার কাহিনী সংযোজিত করেছেন। এটি নূতনত্বের পরিচায়ক। কাহিনীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বচরিত্র তারাচাঁদ ও প্রেমার সহানুভূতি, সংযম এবং নিঃস্বার্থপরতার সুন্দর চিত্র এঁকেছেন কবি। অনন্তপ্রেমের জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী স্বরূপ চিত্রিত করে কবি মঞ্চন প্রেম-তত্ত্বের ব্যাপকতা এবং নিত্যতার আভাস দিয়েছেন। সুফীদের মতানুসারে সমস্ত বিশ্ব-সংসার এমন একটি রহস্যময় প্রেমসূত্রে গ্রথিত যে, তার সাহায্যে মানুষ স্বয়ং প্রেম-মূর্তির সাক্ষাৎ পেতে পারে। সুফী সন্তরা সর্বত্রই সেই প্রেম-মূর্তির প্রচ্ছন্ন জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ ও কৃতার্থ হন। মধুমালতীর রূপ বর্ণনার সাহায্যে সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে ঐশিকরূপের প্রতি সংকেত করা হয়েছে। কারণ প্রেম-প্রকৃতি ও ভগবান অভিন্ন।

মালেক মোহাম্মদ জায়সী (১৪৯৫-১৫৪২)—প্রেমাশ্রয়ী কাহিনী-কাব্য রচয়িতা সুফী সন্ত কবিদের প্রতিনিধি স্থানীয় মালেক মোহাম্মদ জায়সীর জন্ম গাজীপুরে হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। তিনি দেখতে সুশ্রী ছিলেন না। বসন্ত রোগে তাঁর একটি চোখ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি নিজেকে শুক্রাচার্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি কালাও ছিলেন। প্রথম দর্শনে বধির, কানা ও কুৎসিৎ দর্শন জায়সীকে দেখে শেরশাহ হেসে ওঠেন। তাতে জায়সী প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন—"মোহি কা হঁসেসি কি কোহরহি ?"— কুটে ! আমাকে দেখে হাসছ কি ? শেরশাহ লজ্জিত হয়ে পড়েন। পরে 'জায়স' (রায়বরেলী) নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন এবং ২৫ বা ৩০ বৎসর বয়স থেকে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাই জায়সের অধিবাসী কবি 'জায়সী'

নামে পরিচিত হলেন। তিনি প্রখ্যাত সুফী ফকীর শেখ (মুহী উদ্দীন) মোহেদীর শিষ্য ছিলেন। তিনি 'পদ্মাবত' 'অখরাওট' এবং 'আখিরী-কলাম' নামে তিনটি কাব্য রচনা করেন। তবে কাহিনীর বিস্তার, প্রবন্ধ-কৌশল এবং কাব্যময়তার বিচারে হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমাখ্যান হল 'পদ্মাবত'। প্রকৃতপক্ষে পদ্মাবতই জায়সীকে লোকপ্রিয়তার শিখরে তুলেছে। পদ্মাবতের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও ৯২৭ হিজরীসনে অর্থাৎ ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে তার রচনা শুরু হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে সিংহাসনারূঢ় শেরশাহের প্রশস্তি আছে। সম্ভবত গ্রন্থ সমাপ্তির পরবর্তীকালে এই অংশটি যুক্ত হয়েছিল।

'অখরাওটে' অ-কারাদি ক্রমে বর্ণমালার এক-একটি বর্ণ নিয়ে প্রেমের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর, জীব, সৃষ্টি ও প্রেম বিষয়ে বিচার-বিবেচনাও আছে। 'আখিরীকলাম' বা 'অন্তিম বচনে' 'কয়ামত' অর্থাৎ 'শেষ-বিচার' বর্ণিত। জায়সীর শ্রেষ্ঠ কৃতি 'পদ্মাবত' প্রমাণ করে যে কবির হৃদয় কবিত্বমণ্ডিত, কোমল এবং 'প্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ' ছিল। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিতেই কাব্যটির গূঢ়তা, গম্ভীরতা এবং সরসতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পদ্মাবতীর প্রেমের কাহিনী বেশ সরস ও পরিণত। ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। প্রথমার্ধ লোক-প্রচলিত ধারণা ও কল্পনায় রঞ্জিত এবং অপরার্ধ কিছুটা ইতিহাস আশ্রিত। অবধী ভাষায় ছন্দ ও অলংকার যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংযোজিত হয়েছে। কবি হিন্দু দেব-দেবীর প্রসঙ্গও সশ্রদ্ধচিত্তে এনেছেন। জ্যোতিষ, হঠযোগ এবং দাবা খেলার জ্ঞানের ভালো পরিচয় দিয়েছেন কবি। তাঁর বিরহ বর্ণনায় প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে সমস্ত সংসারের সহানুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। পশু-পক্ষী গাছ-পালার হৃদয়েও বিরহ বেদনার ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্ণনায় মাঝে মাঝে অত্যুক্তি থাকলেও বিরহের তীব্র অনুভূতিই প্রধান।

'পদ্মাবতে'র কাহিনীটি সুপরিচিত। তাতে সিংহলের রাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে চিতোরের রাজা রতনসেনের প্রেম-চিত্রিত হয়েছে। রাজকুমারীর শুক 'হীরামন' তাঁর বর খুঁজতে বের হয়। চিতোররাজ রতন সেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা শুনে মুগ্ধ হন। বহু রাজপুরুষ সহ সাধুর বেশে তিনি সিংহলে উপস্থিত হন। সেখানে পার্বতী মন্দিরে ক্ষণিকের জন্য পদ্মাবতী ও রতন সেনের সাক্ষাৎ হয়। ফলে উভয়ের মনে অসহ্য বিরহের সঞ্চার হয়। অবশেষে প্রেমের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিংহলগড়ে প্রবেশ করতে গিয়ে রতন সেন বন্দী হন। অন্য সাধুবেশী রাজপুরুষেরা আক্রান্ত হয়েও শিবের কল্যাণে বিজয়ী হন। শেষ পর্যন্ত সিংহলরাজ গন্ধর্বসেন পদ্মাবতীর সঙ্গে রতন সেনের বিবাহ দেন। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে রতন সেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোরে ফিরে আসেন। পদ্মাবতীর রূপের টানে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি চিতোর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রতন সেনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর 'নাগবতী' এবং 'পদ্মাবতী' দুই রানীই জহরব্রত পালন করেন। কাহিনীর শেষে 'গোরা ও বাদলে'র অপূর্ব যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রতারক আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুতরাও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। পরবর্তীকালে 'গোরা ও বাদলে'র বীরত্বের কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত ও সুচিত্রিত হয়েছে। পদ্মাবতীর কাহিনীটি সুপ্রাচীন হলেও গোরা ও বাদলের কাহিনী সংযোজনে এবং সুন্দর বর্ণনা ও উপস্থাপনে জায়সীর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট।

রহস্যবাদী কবি জায়সীর হাতে কাহিনীটি আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত হয়েছে। যেমন—

তন চিতউর, মন রাজা কিন্হা। হিয় সিংঘল, বুধি পদমিনী চিন্হা॥
গুরু সূআ জেহ পন্থ দিখাওয়া। বিনু গুরু জগৎকো নিরগুন পাওয়া॥
নাগমতী য়হ দুনিয়া ধন্ধা। বাঁচা সোঈ ন এহি চিত বন্ধা॥
রাঘব দূত সোঈ সৈতানূ। মায়া অলাউদীঁ সুলতানূ॥

গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি সুফী সাধককে জানিয়ে দিয়েছেন— দেহ হল চিতোর, মন হল রাজা, হৃদয়-সিংহল এবং বুদ্ধি-পদ্মিনী, গুরু হল শুক, গোলকধাঁধা হল নাগমতী, শয়তান-রাঘব এবং মাতা বা মায়া হলেন সুলতান। সিংহলের পদ্মিনী বা হৃদয়স্থিত বুদ্ধিকে কিভাবে পাওয়া সম্ভব— সে কথাই জায়সী বলেছেন এ-কাব্যে। প্রেম বর্ণনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রেমের গভীর গম্ভীর ব্যঞ্জনাই এ কাব্যের প্রধান লক্ষ্য।

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় কবির দুটি পংক্তি— (দোহা)

নয়ন জো দেখা কঁওয়ল ভা নির্মল নীর সরীর।
হঁসত জো দেখা হংস ভা দসন জ্যোতি নগহীর।
দেখামাত্র—
নয়ন দুটি কমল হল, শরীর বিমল নীর।
হাসির রেখা হংস হল দশন-নগ হীর॥ (হীর=হার)

কাব্যধর্মিতার বিচারে পদ্মাবতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নাগমতীর বিরহ-বর্ণনা। নাগমতীর নিষ্কপট নিরীহ এবং সরল বিরহানুভূতি সত্যই মর্মস্পর্শী। মাত্র দুটি পংক্তিতে বিরহের প্রকাশ লক্ষিতব্য—

রহৌঁ অকেলি গহে এক পাটী। নৈন পসারি মরোঁ হিয় ফাটি॥···
চহুঁ খণ্ড লাগৈ অঁধিয়ারা। জোঁ ঘর নাহঁী কন্ত পিয়ারা॥
—একা পড়ে থাকি খাট-সেঁটে। চোখ চেয়ে মরি বুক ফেটে॥
চারিদিক দেখি ঘন আঁধার। ঘরে নেই হায়! প্রিয় আমার॥

জায়সীর এই আখ্যান-কাব্যটি আরাকানের শাসক সচিব—মগন ঠাকুরের প্রোৎসাহনে কবি আলাওল (১৬০৮-১৬৭৪) সম্ভবত ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় অনুবাদ করেন।[৭] আলওল মূল কাব্যটির রচনাকাল ৯২৭ হিজরী সনই নির্দেশ করেছেন। তিনি আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন।

উসমান—জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের (১৬০৫-১৬২৭) কবি উসমান গাজীপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শাহ নিজামুদ্দীন চিশ্‌তির সম্প্রদায়ের হাজী বাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি 'মান' উপনাম গ্রহণ করেছিলেন। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'চিত্রাবলী' কাব্যটি রচিত হয়। তাতে নেপালের রাজা ধরণীধরের পুত্র সুজানকুমারের সঙ্গে রূপনগরের রাজকুমারী চিত্রাবলীর প্রেম-আখ্যান বিবৃত হয়েছে। একজন অপদেবতা রূপনগরের একটি উৎসব দেখাবার ছলে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারকে রাজকুমারী চিত্রাবলীর চিত্রশালায় রেখে আসে। রাজকুমারীর চিত্রে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারও একটি আত্মকৃতি তৈরি করে তার পাশে রেখে দেন। তা দেখে রাজকুমারীও প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। চিত্রদর্শনে প্রেমের সঞ্চার ভারতীয় সাহিত্যে নতুন নয়। তবে কাব্যের অন্যান্য বিষয় যথানিয়মে ঘটেছে। কাব্যে কাবুল, কান্দাহার, খোরসান, রোম, শ্যাম, মিশর, ইস্তাম্বুল, গুজরাট সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ বর্ণনার সঙ্গে ইংরেজের দ্বীপের প্রসঙ্গও এসেছে।— 'বলং দীপ দেখা অংরেজা। তহাঁ জাই জেহি কঠিন করেজা॥'

উসমান তাঁর চিত্রাবলীতে পুরোমাত্রায় জায়সীর অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন। মাঝে মাঝে বিষয়, ঘটনা, বাক্য, বাক্যাংশ প্রভৃতি জায়সীর 'উদ্‌ধৃতি' বলে মনে হয়। জায়সীর পূর্বে কবিরা পাঁচটি চৌপাঈ-এর পর একটি দোহা লিখতেন, কিন্তু জায়সী লিখেছেন সাতটি চৌপাঈ-এর পর একটি দোহা। ওসমানও তাই করেছেন। কাহিনীর ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ— সবই আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত। বিরহ-বর্ণনায় ছয় ঋতুর প্রসঙ্গ বেশ সরস ও মনোহর।

সপ্তদশ শতকের কবি 'জান'হাঁসীওয়ালে শেখ মোহাম্মদ চিশ্‌তির শিষ্য এবং প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তাঁর অর্ধশতাধিক রচনার মধ্যে একুশটিই প্রেমগাথা। তার মধ্যে কনকাবতী, কামলতা, মধুকর মালতী, রত্নাবতী এবং ছীতা— উল্লেখযোগ্য।

কবি কাসেম শাহের কাব্যগ্রন্থ 'হংস জওয়াহির'ও প্রেমকাহিনী আশ্রিত। দিল্লীর বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের (১৭২১-১৭৪৮) সমসাময়িক কবি নূর মোহাম্মদের দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল—'ইন্দ্রাবতী' (১৭৪৪) ও 'অনুরাগ-বাঁসুরী' (১৭৬৪)। তিনি পারসী ভাষার কবি এবং 'কাময়াব' নামে 'শায়েরী' করতেন। তাছাড়া ফাজিলশাহ, শেখ নিসার (য়ুসুফ জুলেখা) বুদ্ধিসাগর (কথাকঁওয়লাবতী), শেখ নবী (জ্ঞানদীপ) হোসেন আলি (পুহুপাবতী), প্রভৃতি কবিরাও প্রেম কাহিনী রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে দামোঁ, হরিরাজ, মোহন দাস প্রভৃতি হিন্দু কবিদের প্রেম-আখ্যান রচনার প্রসঙ্গও স্মরণীয়। 'প্রেম-চিনগারী', 'নূরজহাঁ', 'ভাষা প্রেমরস' 'প্রেমদর্পণ', 'কামরূপ কী কথা' প্রভৃতি আরও প্রেম কাব্য পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রেমাশ্রয়ী কাব্য রচনার ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীনতর হলেও একেবারে লোপ পায় নি। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এইসব প্রেম কাহিনীর রচনা-প্রয়াস সক্রিয় ছিল। তবে উৎকর্ষের বিচারে এই শেষ পর্যায়ের কাহিনী-কাব্য তেমন সার্থক হতে পারে নি। তা ছাড়া ভক্তিকালের প্রারম্ভিক যুগেই নতুন করে রামভক্তি এবং কৃষ্ণ-ভক্তিশাখা জোর ধরতে থাকে। পরে তার প্রভাব এত প্রবল হয় যে নির্গুণ শাখার জ্ঞানাশ্রয়ী এবং প্রেমাশ্রয়ী উভয় উপ-বিভাগই দুর্বল হয়ে পড়ে নব সৃষ্টির বিচারে। ক্রমে ক্রমে সগুণভক্তি শাখা বলিষ্ঠ-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার প্রচার-প্রসারও দ্রুত তালে ঘটে। কারণ দীর্ঘ দিনের ভগবানের অবতারে বিশ্বাস এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির ভালো-মন্দের জন্য তাঁর উপর নির্ভরতা সুপ্ত হয়ে বিরাজ করছিল মানুষের মনের সংস্কারে। উপযুক্ত পরিবেশে প্রয়োজন বুঝে তার জাগরণ ও বহিঃপ্রকাশ ঘটল এই যুগে— সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সগুণধারার ভক্তিশাখা

মধ্যযুগে হিন্দী সাহিত্যে ভক্তিরস ও ভক্তির সুরই প্রধান। অবতারবাদের উপরে সগুণভক্তির প্রতিষ্ঠা। ভগবানের নাম কীর্তন, শ্রবণ ও মনন— নিয়েই ভক্তি সাহিত্যের সৃষ্টি। এই ভক্তির ধারা উত্তর ভারতে সবেগে বহমান ছিল। নবম-দশম শতকের পর সাধারণভাবে ভারতীয় সাহিত্যে 'দশাবতার' নিয়ে ভক্তি সাহিত্য বা 'দশাবতার চরিত' কাব্য লেখা শুরু হয়। সেইসব রচনায় দশাবতারের স্তুতি এবং চরিত ভক্তিবিনম্রচিত্তে বর্ণিত হত। তবে দশাবতারের মধ্যে 'রামাবতার' ও কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। রাম ও কৃষ্ণ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়ে মানুষের মনকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব ক্রিয়া ও লীলার আশ্রয় নেওয়ার ফলে এই দুই অবতারই প্রমুখতা লাভ করে। তুলসী দাসেয় আবির্ভাবের পর উত্তর ভারতে রামভক্তির প্রাবল্য দেখা দেয়। কৃষ্ণ-অবতার তার বিচিত্র মানবীয় রস, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্যের জন্য সার্বভৌম আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠল।

রাম ও কৃষ্ণ অবতারের মধ্যে আবার কৃষ্ণ-অবতারের কল্পনা প্রাচীনতর ও ব্যাপক মনে করা হয়। পৃথিবীতে ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' হলেও রাম-ও কৃষ্ণ-অবতারের দুষ্টদমন রূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে লাগল লীলাময়রূপে। তাঁদের এই লীলাময় রূপই সাধারণ মানুষকে, ভক্তসম্প্রদায়কে সহজে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে থাকে। কৃষ্ণাবতারের দুটি প্রধান রূপ— কৃষ্ণ 'যদুকুলের প্রধান', 'অরি-ঘাতক' এবং 'বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্'; অপরদিকে 'গোপাল', 'গোপীজনবল্লভ' ও 'রাধাকান্ত কৃষ্ণ'। প্রথম রূপটি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উপলব্ধ, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত নবীন। রামাবতারের

কথাও অর্বাচীন নয়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অবতার প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের উল্লেখ হয়েছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রাম অবতারের প্রসঙ্গ রয়েছে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত রাম দুষ্টদমনকারী মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে চিত্রিত। পঞ্চদশ শতকের পর হিন্দী সাহিত্যে তিনি লীলাময় রামরূপে আলোচিত। তবে তাঁর উভয় রূপই অম্লান। অষ্টাদশ শতকের পর রামচরিত প্রেমের মধুর ভাবে সিক্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে অভিনবতা মণ্ডিত হয়েছে। এইভাবে রাম ও কৃষ্ণ চরিতের বিবর্তন ঘটেছে এবং তারই ভিত্তিতে দুটি পৃথক সবল ভক্তিসাহিত্য শাখা গড়ে উঠেছে— রামভক্তিশাখা ও কৃষ্ণভক্তিশাখা নামে। এবার শাখাদুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে আসা যাক্।

সগুণধারার রামভক্তিশাখা

ভক্তিযুগের প্রারম্ভিক কালে দুটি বিশিষ্ট বিচারধারা প্রবাহিত ছিল— সিদ্ধ ও নাথপন্থীদের যোগ সাধনার ধারা এবং রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য ও মধ্বাচার্যের বৈষ্ণব-ভক্তিধারা। নাথ ও সিদ্ধ সাধকদের প্রয়াসে ভক্তিপথের বাহ্যাড়ম্বর এবং প্রদর্শনশীলতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ সজাগ এবং সতর্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু এর ফলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হল বেশি। নাথ ও সিদ্ধদের উপদেশের বাইরের অর্থগ্রহণে বহুদিন নিবদ্ধ থাকাতে সাধারণ মানুষ উপদেশের মূলে প্রবেশের আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে সাধারণভাবে পূজা পাঠ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং বিবিধপ্রকার চর্চা ও আলোচনাকে অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করল। শিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও মূল্যবোধ কমে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে নানাপ্রকার অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে

লাগল। যখন সমাজের এইরূপ পরিস্থিতি— তখনই আবির্ভাব ঘটল তুলসীদাসের। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মন্থন করে, নানাস্থানে ভ্রমণ করে সমাজের অবস্থা এবং তার কারণ অনুধাবন করলেন। অবশেষে লেখনী ধারণ করে ফাঁকা উপদেশ-দাতা এবং শ্রোতাদের শাসন করলেন। সামাজিক আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে অনিয়ন্ত্রিত সমাজকে সুশৃঙ্খল জীবনপথের সন্ধান দিলেন। জ্ঞানমার্গের সাধক ও উপদেশকগণ লোকচেতনায় যে অকারণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন; তাতে মানুষের মনের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তুলসীদাসের কাব্য সেই অস্থির জন-চেতনার সম্মুখে শান্ত, সুন্দর প্রকৃতিস্থ জীবনবেদ তুলে ধরল। ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত মানব জীবনের একটি সুব্যবস্থিত, সুনির্দিষ্ট, সুনিশ্চিত এবং প্রত্যাশিত রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। তাতে জীবনের প্রতি আস্থা বাড়ল, সমাজ ব্যবস্থিত পথে অগ্রসর হল, সামাজিক আদর্শের প্রতি লোকের আকর্ষণ ও রুচি বেড়ে গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় জীবনের বিশেষ এক সংকট কালে লোক-রক্ষক রামের শুভ-সমাবির্ভাব ঘটিয়ে তুলসীদাস জনচিত্তের অপসৃয়মাণ বিশ্বাসকে কেবল রক্ষাই করেন নি, বলিষ্ঠতাও দান করেছেন।

তুলসীদাসের রামকাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতার সহায়তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কাজ সাধিত হল। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, বৈষ্ণবদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাস্য দেবদেবী নিয়ে অনৈক্য, বৈষ্ণব ও শৈবদের মত-পার্থক্যজনিত কলহ— এক কথায় বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাপ্রকার অসাম্য, বৈরিতা এবং আত্মম্ভরিতা তুলসীদাসের বিশাল, ব্যাপক এবং গভীর ভক্তি-ভাবনার সাহায্যে চিরকালের জন্য মুছে গেল। প্রয়োজনে তিনি ধমক ও তিরস্কারের আশ্রয় নিতেও ইতস্ততঃ করতেন না। তুলসীদাসের রামভক্তি ছিল এমনই বলিষ্ঠ ও সক্রিয়।

তবে রামভক্তির ধারা তুলসীদাসের পূর্বেও ছিল। যদিও এমন সবল ছিল না। রামানুজাচার্যের শিষ্য রামানন্দ বিষ্ণুর উপাসনা না করে

তাঁর অবতারের অন্যতম রামচন্দ্রকে বেছে নিয়ে, মানুষের পক্ষে কল্যাণকর মনে করে একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। রামানন্দের আবির্ভাব পঞ্চদশ শতকে (১৪০০-১৪৭০)। তিনি জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই এই সগুণভক্তির অধিকারী বলে মেনে নিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন কেবল ব্রাহ্মণগণ, কিন্তু রামানন্দ রামভক্তি-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন সকলের জন্য। তাই তাঁর শিষ্যরূপে কবীর দাস, রবিদাস, সেননাঈ এবং রাজাপীপা প্রমুখদের পাওয়া যায়। রামানন্দ রচিত দুইটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—'বৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর' এবং 'শ্রীরামার্চন পদ্ধতি'। তবে বিনয় ও স্তুতির কিছু হিন্দী পদও তিনি লিখেছেন। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দেশের বিভিন্ন অংশে রামভক্তির প্রচার-প্রসারে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁরা মাঝে মধ্যে রামভক্তিমূলক বিচ্ছিন্ন পদও রচনা করতেন। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হিন্দী সাহিত্যে রামভক্তির পরমোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে গোস্বামী তুলসীদাসের রচনার মাধ্যমেই। তাঁর সর্বতো-মুখী প্রতিভা ভাষাকাব্যের প্রচলিত সকল পদ্ধতির কেন্দ্রমণি করে তোলে তাঁর সৃষ্টি ও সাহিত্যকে। রামভক্তির বিশদ-বিপুল-বিচিত্র এবং অদ্বিতীয় কাব্যসম্ভারে তুলসীদাস হিন্দী সাহিত্যকে যে বলিষ্ঠতা এবং পরিণতি দান করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর প্রয়াসের ফল সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দী সাহিত্যকে প্রভাবিত এবং উৎসাহিত করেছে এবং করবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

> '…জনসাধারণের চিত্ত হচ্ছে দেশের যথার্থ ভূমি; যেখানে স্বভাবত প্রকৃতির প্রেরণায় ফসল ফলে, সে হচ্ছে সর্বজনের চিত্ত-ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে যথার্থ সৃষ্টির অধিকারের পথে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ব্যাঘাত জন্মাতে পারবে না। দেশের সেই সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র থেকে তুলসীদাসের অধিকার কোনো কালেই যাবে না। তাঁর দান স্থায়ী মহান প্রতিভার বিকাশ

নিয়ে কালের প্রভাবকে অতিক্রম করে চিরকাল দেশকে সমৃদ্ধ করবে।'

—রবীন্দ্র-জীবনী। চতুর্থ খণ্ড (১৯৬৪), পৃ. ২৪৬

তুলসীদাস দুবে (দ্বিবেদী)—উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলার রাজাপুরে তুলসী দাস (১৫৩২-১৬২৩) জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তিনি 'সোরো'র অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম দুবে এবং মাতার নাম হুলসী। জন্মের সময় বিসদৃশ আচরণের জন্য পিতামাতা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। মাতুলালয়ে দাসীর কাছে থেকে তিনি মানুষ হতে থাকেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি নরহরি দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর কাছে শুনতেন রামকাহিনী। পরে গুরুর সঙ্গেই বারাণসীতে যান। সেখানে বেদ বেদাঙ্গ, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেন। পনেরো বৎসর কাল এই অধ্যয়ন চলে। তাঁর পত্নীর নাম রত্নাবলী। পত্নীর প্রতি অনুরাগ আতিশয্যের ফলে তাঁরই নিষ্ঠুর তিরস্কার মিশ্রিত উপদেশেই তুলসী দাসের মনে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য চালিত তুলসী দাস গৃহত্যাগ করে কাশী থেকে অযোধ্যা, জগন্নাথপুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদরিকাশ্রম ও পরে কৈলাস এবং মানস-সরোবর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ শেষে চিত্রকূটে বসবাস শুরু করেন। এখানেও বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও সন্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৫৭৪ সালে অযোধ্যায় রামচরিতমানস লিখতে শুরু করেন। দুই বৎসর সাত মাসে তা সম্পূর্ণ হয়। তবে 'কিষ্কিন্ধা' কাণ্ডটি কাশীর রচনা। ক্রমে ক্রমে তুলসীদাসের ভক্তি ও সাহিত্যিক খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গুণগ্রাহী ও অনুরাগীদের মধ্যে আব্দুর রহিম খানখানা, রাজা মানসিংহ, নাভাজী, মধুসূদন সরস্বতী এবং রাজা তোডরমল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তুলসীদাসের রচনায়, পূর্ববর্তী বা প্রচলিত কাব্যভাষা, শৈলী

এবং কাব্যরূপের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তিনি প্রচলিত ব্রজভাষা ও অবধীকে সার্থকভাবে কাব্যের বাহন করেছেন। প্রচলিত ছন্দোবন্ধের মধ্যে ছপ্পয়, গীত, কবিত্ত ও সবৈয়া, দোহা, চৌপাঈ, সোরঠা প্রভৃতির তুলসীদাস সুচিন্তিত এবং সার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধকাব্য শিল্পের এবং কাব্যরসের বিচারে অভূতপূর্ব। আসলে সে যুগে সম্ভাব্য সকল কবি ও তাঁদের কাব্যের বৈভবে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর রচনাকে। তাই তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা তাঁকে হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছে। এখানে তুলসীদাস প্রযুক্ত বিভিন্ন কাব্য-শৈলী বা ছন্দোবন্ধের পরিচয় দেওয়া হল।—

ছপ্পয়—

কতহুঁ বিটপ ভূধর উপারি পরসেন বরক্খত।
কতহুঁ বাজি সো বাজি মর্দি গজরাজ করক্খত॥
চরণ চোট চটকন চকোট অরি উর সির বজ্জত।
বিকট কটক বিদ্দরত বীর বারিদ জিমি গজ্জত॥
লঙ্গূর লপেটত পটকি ভট, 'জয়তি রাম জয়' উচ্চরত।
তুলসীস পবননন্দন অটল জুদ্ধ ক্রুদ্ধ কৌতুক করত॥

—হি. সা. ই. (১৯৭৩) পৃ. ৯৩।

প্রথম চার পংক্তি ২৪ মাত্রার রূপমালা এবং শেষ দুই পংক্তি ২৮ মাত্রার সার ছন্দোবন্ধে রচিত। এখানে হনুমানের যুদ্ধ প্রণালী চিত্রিত হয়েছে। —হনুমান উপড়ে ফেলে বন-পাহাড়ের বৃষ্টি করছে, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়া ও ঐরাবতের ধাক্কা লাগিয়ে তাদের আহত করছে। শত্রুর বুকে ও মাথায় আঘাত হেনে বিকট সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে তুলছে, মেঘের মত গর্জন করে ও লেজে শত্রুকে জড়িয়ে আছাড় মেরে রামচন্দ্রের জয় ঘোষণা করছে। এই ভাবে উন্নতশির পবননন্দন ক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধ নিয়ে যেন কৌতুক করছে।

গীত—

জৌ হোঁ মাতুমতে মহঁ হ্বৈহোঁ।
তৌ জননী জগ মেঁ য়া মুখ কী কহাঁ কালিম ধ্বৈহোঁ?
ক্যোঁ হোঁ আজু হোত সুচি সপথনি কৌন মানিহৈঁ সাঁচী?
মহিমা মৃগী কৌন সুকৃতী কী খল বচ বিসিষহু বাঁচী?

—গীতাবলী

বিদ্যাপতি ও সুরদাসের প্রযুক্ত এই গীতপদ্ধতি তুলসীর হাতে আরও সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠেছে। গীতাবলীর রচনায় সুরদাসের অনুস্মৃতি অনুভূত হয়। ভক্তকবি ভরতের মুখে কৌশল্যাকে বলছেন—

মা, তুমি ও আমি যা কে তাই। হে জননী, এ মুখের কালি এ জগতে ধুয়ে ফেলা কি সম্ভব? আজ বার বার শপথের কথা বলে নির্দোষ সাজতে গেলে কে বিশ্বাস করবে? মহিমা খলের আশ্রয় নিলে তার সুকৃতি নষ্ট হতে বাধ্য।

সবৈয়া—

রামকো রূপ নিহারত জানকি, কঙ্কন কে নগ কী পরছাহীঁ।
য়াতেঁ সবৈঁ সুধি ভূল গঈ, কর টেকি রহী, পল ডারতি নাহীঁ॥

—গীতাবলী

—২৩ মাত্রার পংক্তি ব্যবহারে রসানুকূল শব্দ যোজনা লক্ষণীয়।[৮] অংশটি বাংলায় দাঁড়ায়—

রামের স্বরূপ নেহারে জানকী কাঁকনে শোভিত হীরেতে।
তাতেই বিভোর, ভুলে গেল সব, শির স্থাপি নিজ করেতে।

কবিত্ত—

প্রবল প্রচণ্ড বরিবণ্ড বাহুদণ্ড বীর,
ধায়ে জাতুধান, হনুমান লিয়ো ঘেরিকৈ॥

মহাবল পুঞ্জ কুঞ্জবারি জ্যোঁ গরজি ভট,
জহাঁ তহাঁ পটকে লঙ্গূর ফেরি ফেরি কৈ।

অথবা

বালধী বিসাল বিকরাল জ্বাল লাল মানো,
লংক লীলিবে কো কাল রসনা পসারী হৈ।
কৈ ধোঁ ব্যোম বীথিকা ভরে হৈঁ ভূরি ধূমকেতু,
বীররস বীর তরবারি সী উঘারী হৈ॥

—কবিতাবলী

অক্ষরবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত) রীতির ৩১ মাত্রার পংক্তিতে ভয়ানক রস সৃষ্টিতে কবির অনুকূল শব্দ-সংযোজন এবং সাফল্য লক্ষণীয়।[৭]

নীতি উপদেশমূলক সূক্তির দোহা রামচরিত মানস ও দোহাবলীতে আন্তরিকতার সঙ্গে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।—

রীঝি আপনী বূঝি পর, খীঝি বিচারবিহীন।
তে উপদেশ ন মানহী, মোহ মহোদধি মীন॥
লোগন ভলো মনাওয় জো, ভলো হোন কী আস।
করত গগন কো গেণ্ডুআ, সো সঠ তুলসীদাস॥
কী তোহি লাগহি রাম প্রিয়, কী তু রাম প্রিয় হোহি।
দুই মহঁ রুচৈ জো সুগম সোই কীবে তুলসী তোহি॥

—দোহাবলী

মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত রীতির দোহা ও চৌপাঈ রচনায় ভক্তিযুগের কবিগণ বিশেষ উৎসাহ এবং উৎকর্ষ দেখিয়েছেন সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। উপরে দোহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, এখানে চৌপাঈ-এর কয়েকটি পংক্তি দেওয়া গেল—

বন্দউঁ গুরুপদ পদুম পরাগা। সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা॥
অমিয় মূরি ময় চূরন চারূ। সমন সকল ভবরুজ পরিবারূ॥

সুকৃত সম্ভু তনু বিমল বিভূতী। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী॥
জন মন মঞ্জু মুকুর মলহরনী। কিয়ে তিলক গুনগন বস করনী॥
—রামচরিত মানস, বালকাণ্ড।

সুতরাং সে যুগের হিন্দী কাব্যজগতের প্রায় সব রকম রচনা-শৈলীই (ছন্দোবন্ধ) তুলসীদাস ব্যবহার করেছেন বলা চলে।

দৃষ্টির প্রসারতার জন্যই তুলসীদাস উত্তর ভারতের জন মানসে প্রেমাভিষেক লাভ করেছেন। ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি তিনি। তাঁর কাব্য ব্যক্তিগত সাধনা ও লোকজীবনের সাধনায় পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে মানব মনকে মুগ্ধ ও উদ্‌বুদ্ধ করেছে। ভক্তির উচ্চ শিখরে উঠেও তুলসীদাস লোক পক্ষ ত্যাগ করেন নি। তাই তাঁর বাণী সর্বৈব মঙ্গলকর রূপে গৃহীত হয়েছে। আজ ঘরে ঘরে রামচরিতমানস পঠিত, গীত ও আলোচিত হচ্ছে। রামচরিত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে— 'এক শব্দকে ইক্‌কীশ অর্থ'— অর্থাৎ এক একটি শব্দের একুশ রকমের অর্থ পাওয়া সম্ভব। এর থেকেই গ্রন্থটির প্রচার প্রসার, চর্চা-আলোচনার ব্যাপ্তি ও অর্থ-ব্যঞ্জনার গভীরতার পরিচয় অনুমান করা যায়। মানুষের জীবনকে সরস, সুন্দর-সহজ, নীতি-ধর্ম-বোধ-সমৃদ্ধ সুরুচি-সম্মত করে গড়ে তুলেছে তুলসীদাসের এই রাম-কাব্যটি। হিন্দী-ভাষীদের জীবন নানাভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রামচরিত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁরা যখন তখন অবলীলাক্রমে রামচরিতমানসের দোহা, চৌপাঈ প্রভৃতি উদ্‌ধৃত করে অনায়াসে আবৃত্তি করেন। নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের মতোই এই রামায়ণটি লোকের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে জীবনের দিশারী।

ভারতীয় জীবনচর্যা ও ধর্ম-সাধনার প্রতিটি শাখা-প্রশাখাতেই তুলসীদাস শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য নিয়ে বিচরণ করেছেন। তার থেকে উপযোগী সারবস্তুটুকু গ্রহণ করেছেন এবং তার সুন্দর, সুললিত ও

সন্তুলিত অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন রামচরিতমানসে। তুলসীদাসের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ভারত যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে তাঁর রামচরিতে। তারই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কবির রম্যরচনা-ভঙ্গি, প্রবন্ধ-পটুতা, সহৃদয়তা, ভক্তি-মনস্কতা এবং লোকহিতৈষণার সমন্বয়। ইতিবৃত্ত, বিষয়-বর্ণনা, ভাব-ব্যঞ্জনা ও সংলাপ প্রভৃতি কথাকাব্য বা প্রবন্ধকাব্যের প্রত্যেকটি দিকই তুলসী রামায়ণে লক্ষিত হয়। তবে সবকিছুই পরিমিত ও সুশৃঙ্খলিত। মানব-মনের গভীরের কোমল স্পর্শকাতর অনুভূতির ঘটেছে যথাযথ রূপায়ণ। প্রসঙ্গানুকূল ভাষার ব্যবহার তুলসীদাসের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার একটি বিশেষ দিক্। ভাব বা রস-অনুযায়ী ভাষা মৃদু বা কঠোর হয়েছে; বিদ্বানের মুখে সংস্কৃতানুসারী এবং সাধারণ মানুষ ও নারী-মুখে 'ঠেঠ বোলী' বা কথ্য-ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। ধ্বনি-সৌন্দর্য এবং গীতি-মাধুরী সৃষ্টির প্রয়াসও সুস্পষ্ট। অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক্ হল শৃঙ্গার রচনায় কখনও স্বাভাবিকতা ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘিত হয়নি। সংস্কৃতি ও শোভনতার সীমা এবং মর্যাদা মান্য করেও তাঁর রচনা সূক্ষ্ম ও সার্থক ভাবব্যঞ্জনা-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

তুলসীদাস পূর্ব-প্রচলিত প্রাপ্ত রাম-প্রসঙ্গ নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। নব-নব প্রসঙ্গ সৃষ্টির কল্পনা বা উদ্ভাবনার চেষ্টা করেন নি। 'লোক হিতায়' তিনি মাঝে মাঝে উপদেশ দান, সুপথ নির্দেশ এবং সগুণভক্তির প্রকৃতি বিবেচনাও করেছেন। তাঁর রচিত বারোটি গ্রন্থের মধ্যে পাঁচটি বড়ো এবং সাতটি ছোটো। দোহাবলী, কবিত্ত রামায়ণ, গীতাবলী, রামচরিতমানস ও বিনয় পত্রিকা প্রথম পর্যায়ভুক্ত এবং রামললানহছূ, পার্বতীমঙ্গল, জানকীমঙ্গল, বরওয়ৈ রামায়ণ, বৈরাগ্য সন্দীপনী, কৃষ্ণগীতাবলী ও রামাজ্ঞা প্রশ্ন দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। আরও বহু গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়, কিন্তু সবগুলির সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। যেমন—কড়খা রামায়ণ, কুণ্ডলিয়া রামায়ণ, ছপ্পয় রামায়ণ, পদাবলী রামায়ণ, সঙ্কট-মোচন, ছন্দাবলী

রামায়ণ, রোলা রামায়ণ, ঝূলনা রামায়ণ, হনুমান বাহুক, হনুমান চলীসা, রাম-শলাকা, রাম সত্‌সঙ্গ, তুলসী সত্‌সঈ এবং কলি-ধর্মার্থনিরূপণ।

রামচরিত মানস তুলসীদাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সে যুগের হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৃতিরূপেও এই রামায়ণটি স্বীকৃত। তুলসীদাস ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে এটির রচনা শেষ করেন।[১০] ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ধারকরূপে গ্রন্থটি কেবল ভারতেই নয় বহির্বিশ্বেও সমাদৃত ও অনূদিত। বাংলায় রামচরিত মানসের অন্তত দশটি অনুবাদ হয়েছে। এখনও হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। তবে তুলসী রামায়ণের নানা কারণে যেমন প্রচার প্রসার ও গুরুত্ব লক্ষিত হয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের তেমন হয় না। তাছাড়া এই দুই ভাষার কবি ও কবিকৃতির মধ্যে সমতা অপেক্ষা বৈষম্যই অধিক।

গীতাবলী—এই গেয় কাব্যটি তুলসীদাস ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেন। এতে রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ আছে। কাব্যটির কথাবস্তু রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে প্রায় একই। এতে সাতটি কাণ্ড এবং ৩৩০টি ছন্দ বা শ্লোক ও স্তবক আছে। শৃঙ্গার, করুণ ও বাৎসল্য রসের কোমল দিকটিই এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত। বালকাণ্ডের বর্ণনায় বেশ সরসতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

বিনয় পত্রিকা—সম্ভবত ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়। রাগ-রাগিণী সহযোগে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে 'বিনয়' বা প্রার্থনা ও স্তুতি বিষয়ক পদের সংকলন—এই গ্রন্থটি। পদগুলি বেশ উচ্চ স্তরের। প্রায় তিনশো পদ সংকলিত হয়েছে। স্তুতি বিষয়ক পদে সংস্কৃতনিষ্ঠা সহজেই অনুমেয়। তবে কোনো কোনো পদ সহজ সরল প্রাঞ্জল ব্রজভাষায় রচিত।

কবিত্ত রামায়ণ বা 'কবিতাবলী'—১৬০৮-১৬১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থে কবিত্ত, (ঘনাক্ষরী) সবৈয়া, ছপ্পয় ও ঝূলনা ছন্দ[১১]

প্রযুক্ত হলেও 'কবিত্ত' ছন্দেরই প্রাধান্য। কবিত্ত ও ঘনাক্ষরী একই ছন্দের দুই নাম। কবিত্ত বা বাক্‌ছন্দ-নির্ভর ভাষায় তুলসীদাস রামচরিত্র চিত্রিত করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে রাম-কাহিনীর প্রচারের জন্য। কবিত্তে রচিত রামায়ণ বলেই গ্রন্থটির নাম 'কবিত্ত রামায়ণ'। 'কবিত্ত' বললে একপ্রকার ছন্দ ও ওই ছন্দে রচিত কবিতা— দুই বোঝায়। তাই কেউ কেউ রচনাটিকে কবিত্তাবলী বা কবিতাবলীও বলেন।

বরওয়ৈ রামায়ণ—আনুমানিক ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে বরওয়ৈ ছন্দে[১২] সম্পূর্ণ রাম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; তাই এর নাম 'বরওয়ৈ রামায়ণ'। এতেও সাতটি কাণ্ড আছে। অলংকারিতার প্রভাব থাকায় এটিকে প্রাক্‌তুলসী পর্বের রচনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু রামের প্রতি তুলসীর ঈশ্বরভাবনার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকায় সন্দেহের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু তুলসীর রচনা-কৌশলের একটি দিক বলিষ্ঠ হয়ে ফুটে ওঠে।

দোহাবলী—এ গ্রন্থে ৫৭৩টি দোহায় উপদেশ বা ভগবদ্ভক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। রামচরিতমানস ও রামাজ্ঞা প্রশ্নাবলীর কিছু কিছু দোহা এখানেও পাওয়া যায়। বাহুপীড়া বিষয়ক বেশ কয়েকটি দোহাও এতে স্থান পেয়েছে। এটি একটি সংকলন গ্রন্থ বলে মনে হয়। সম্ভবত ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে এটি রচিত বা সংকলিত হয়।

ভক্ত, সমাজ-সুধারক, লোক-নায়ক-কবি, পণ্ডিত ও ভবিষ্যদ্রষ্টা তুলসীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। বিশেষ করে জ্ঞান ও ভক্তির গভীরতা এবং কবি-প্রতিভার অদ্বিতীয়তার ফলে তুলসী-দাস হিন্দী সাহিত্যে রামকাহিনীকে জ্ঞান-ভক্তিশিক্ষা ও সাহিত্য রসাস্বাদনের বিচারে উৎকর্ষ ও সম্মানের যে শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্য কবি-সাহিত্যিক আজ অবধি তার ধারে কাছে পে

পারেন নি। এখানে তুলসী একক এবং অনন্য। তুলসীদাসের অতুলনীয় লোকপ্রিয় এবং প্রভাবশালী রচনার কাছে পরবর্তীকালের সব সাহিত্য-প্রয়াসই ম্লান হয়ে পড়ে। অবশ্য রাম কাহিনী-আশ্রিত কাব্যের সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য।

রামানন্দের শিষ্যসম্প্রদায়ের সাধক অনন্তানন্দের শিষ্য কৃষ্ণদাস পয়হারী ('পওহারী') এবং তাঁর শিষ্য স্বামী অগ্রদাস ভালো কবি ছিলেন। রামভক্তির ধারাকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন। ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'গলতা' মঠের সেবক ছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর ভাষা বেশ পরিণত ও লালিত্যযুক্ত। শ্রীরামের লীলা চিত্রণকালে তাঁর দৃষ্টি শোভা ও সুষমার প্রতিই নিবদ্ধ থাকত। তাই তাঁর রচনা বেশ চিত্তাকর্ষক। যেমন—

কুণ্ডল ললিত কপোল জুগল অস পরম সুদেসা।
তিন কো নিরখি প্রকাশ লজত রাকেস দিনেসা॥
মেচক কুটিল বিসাল সরোরুহ নৈন সুহায়ে।
মুখ-পঙ্কজ কে নিকট মনো অলি ছৌনা আয়ে॥

—কুণ্ডল শোভিত কপোল দুটি কি সুন্দর! তার দ্যুতির কাছে পূর্ণচন্দ্র ও সূর্যের আভাও ম্লান। কমলের মতো বিশাল ও কৃষ্ণ কটাক্ষযুক্ত নয়ন দুটির শোভা কি অপূর্ব! মুখ-পদ্মের কাছে যেন দুটি কালো ভ্রমর-শাবক এসে জুটেছে।

স্বামী অগ্রদাসের প্রাপ্ত চারটি গ্রন্থ— 'হিতোপদেশ উপখাণ বাওয়নী', 'ধ্যানমঞ্জরী', 'রামধ্যান মঞ্জরী' এবং 'কুণ্ডলিয়া'।

নাভাদাসজী—রামভক্তিশাখার প্রধান কবি তুলসীদাস ছাড়া অন্য যে সব কবি এই শাখাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কাব্যকৃতি দিয়ে অলংকৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন 'নাভাদাস'। তিনি তুলসী-দাসের সমকালীন। তুলসীদাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

তিনি তুলসীদাসকে কলিযুগের 'বাল্মীকি'—'কলি কুটিল জীব নিস্তার হিত, বাল্মীকি তুলসী ভয়ো'— বলে অভিহিত করেছেন। তিনি গুরু অগ্রদাসের প্রেরণায় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ (১৫৮৫ খ্রী.) রচনা করেন। ৩১৬টি ছপ্পয় স্তবকে ভারতের দুই শত জন ভক্তের চরিত বর্ণনা করেছেন। তাতে অতীতের ভক্ত যেমন আছেন তেমনি সমসাময়িক ভক্ত-কবিও আছেন। আছেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রমুখ সাধকও। এই অপূর্ব গ্রন্থে ভক্তদের জীবন বৃত্তান্ত নেই, আছে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যসূচক প্রসঙ্গ। ভক্ত ও সাধুদের প্রতি মানুষের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগানোই বইটির উদ্দেশ্য। তাই পরবর্তীকালে এই ধরনের বই লেখার একটি প্রবণতা দেখা দেয়। সুতরাং ভক্ত কবির উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হয়েছে বলা যায়। গ্রন্থটির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল কবি সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলে উদারচিত্তে সব শ্রেণীর ভক্তের যশ-কীর্তন করেছেন। ভক্তসমাজে তাই গ্রন্থটি মহাসমাদৃত। তবে এই গ্রন্থেই ভক্তদের নামের সঙ্গে নানাপ্রকার 'সিদ্ধাই' অর্থাৎ অলৌকিক কর্মক্ষমতা-জ্ঞাপক কাহিনীর সংযোজন ঘটেছে। নাভাদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস বাবাজী বা লালদাস নামে জনৈক বৈষ্ণবভক্ত এই অনুবাদ করেন। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকে সাতাশটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর এ-গ্রন্থের গভীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রন্থটির শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নীতি-সিদ্ধান্ত সংকলিত হয়েছে। এই সব কারণে গ্রন্থটি সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[১৩]

প্রিয়াদাস—নাভাজীর শিষ্য প্রিয়াদাস 'ভক্তমাল' গ্রন্থের একটি বৃহৎ টীকা রচনা করেন, কবিত্ত ও সবৈয়া ছন্দে। তাতে জীবন বৃত্তান্তের চেয়ে ভক্তদের 'সিদ্ধাই'— চমৎকারিত্বের শক্তির উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে নাথ সিদ্ধাদের এবং বৈষ্ণব ভক্তদের পার্থক্য

সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাথ-সিদ্ধদের 'তপ' ও যোগের উপর নির্ভরতা ছিল আর বৈষ্ণবদের নির্ভরতা ছিল ভগবানের উপর। তাই ভক্ত ও ভগবানের দূরত্ব অনেক কমে গেল। এর ফলে ভক্তরা অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। বাংলার মতোই 'ভক্তমাল' গ্রন্থটির 'মারাঠী' ও 'ওড়িয়া' ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়েও ভক্তমালের অনুকরণে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুতরাং নাভাদাস ও প্রিয়াদাসের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের একটি ক্ষীণ উজ্জ্বল রেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বলা যায়।

এই সময়ের আরও দুইজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন প্রাণচাঁদ চৌহান এবং হৃদয়রামজী। তাঁরা নাটকের মতো সংলাপধর্মী পদ্ধতিতে রামকাহিনী বিবৃত করেছেন। বাস্তবে এটিও কাব্যেরই একটি ভিন্নতর রূপ। কারণ কথোপকথন ছাড়া নাটকের অন্য কোনো গুণ বা লক্ষণ এতে নেই। প্রাণচাঁদ 'রামায়ণ মহানাটক' (১৬১০ খ্রী.) এবং হৃদয়রাম সংস্কৃত হনুমন্নাটকের ছায়া অনুসরণে হিন্দী 'হনুমন্নাটক' (১৬২৩) লিখেছেন। উভয়ের নাটকের লক্ষ্য রামচরিত চিত্রণই।

রীওয়াঁ রাজদরবারে রামানন্দী সম্প্রদায়ের বেশ প্রভাব ছিল। মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ ও রঘুরাজ সিংহ প্রমুখ ভক্ত নৃপতিগণও রাম-চরিত নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। অযোধ্যার যুগলানন্যশরণ প্রমুখ কবিরা রামকে শৃঙ্গার রসের নায়ক-রূপে বর্ণনা করে কাব্যরচনা করেছেন। যমুনা ও তার তটবর্তী বিহারস্থলীর মতো সরযূ তটের চিত্রণ হয়েছে। এর পরই কবি কেশবদাসের প্রসঙ্গ আসে। রীতিগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি দেখালেও রামকাব্যও তিনি রচনা করেছেন।

কেশবদাস (১৫৫৫-১৬১৭)—রামচন্দ্রিকা (১৬০১) কেশবদাসের রামবিষয়ক কাহিনীকাব্য। বাল্মীকিদ্বারা স্বপ্নে নির্দেশিত হয়ে কাব্য

রচনায় তিনি ব্রতী হলেও প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি ছন্দ ও অলংকার প্রধান হয়ে উঠেছে। বিদ্বান পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যই কেশবদাস যেন রামচন্দ্রিকা রচনা করেন। নানা-প্রকার সংলাপ রচনাতেই কবি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তাই রাম-চন্দ্রিকা সম্পর্কে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই; পরবর্তী অধ্যায়ে রীতিযুগে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

কবি লালদাস সীতারামের লীলাবিষয়ক 'অবধবিলাস' (১৬৪৩), 'বালভক্তি নেহ প্রকাশ' (১৬৯৩) এবং 'দয়ালমঞ্জরী' রচনা করেন। মাধবচরণ দাসের 'গুণ-রাম-রাসো' (১৬১৮), ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' (১৬২২) এবং কবি সেনাপতির (জন্ম ১৫৮৯) 'কবিত্তরত্নাকর' (১৬৪৯)— গ্রন্থও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে রামভক্তিকে শৃঙ্গার ভাবনায় রঞ্জিত করে মাধুর্য উপাসনার প্রথা শুরু হয়। সম্ভবত রামভক্তির উপর কৃষ্ণভক্তির প্রভাবের ফলেই তা সম্ভব হয়। রামচরিত-মানসের টীকাকার অযোধ্যার রামচরণদাস এই নব ধারার প্রবর্তক। তিনি পতি-পত্নী-ভাবের উপাসনার প্রবর্তন করেন। রামভক্তির এই নূতন শাখাটির নাম হয়— 'স্বসুখী শাখা'। স্ত্রীবেশ ধারণ করে 'লালসাহেব' অর্থাৎ স্বামী রামের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ষোড়শ কলায় সজ্জিত হয়ে সীতার ভাবে ভাবিত হওয়া— এই শাখার সাধকের লক্ষণ। বলাই বাহুল্য 'সখী'-সম্প্রদায়েরই একটি শাখা এটি। রামায়ণের টীকা ছাড়া 'দৃষ্টান্ত-বোধিকা', 'কবিতাবলী রামায়ণ', 'পদাবলী রামচরিত্র' এবং 'রসমালিকা' নামক পাঁচটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এ-সব গ্রন্থে মাধুর্যভাবের ভজন গানও আছে।

উনবিংশ শতকের কবি 'জানকীচরণ' রচিত 'প্রেমপ্রধান' ও 'সিয়ারামমঞ্জরী' গ্রন্থ দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেও তা অপ্রকাশিতই থেকে গেছে।

রামভক্তিধারার অপর একজন ভক্ত কবি হলেন উত্তর প্রদেশের গোণ্ডাজেলার অশোকপুরের ক্ষত্রিয় সন্তান বনাদাস (১৮২১-১৮৯২)। শৈশব থেকেই রামচরিত মানসে তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি ৬৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে ৬৩টি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিংহের সম্পাদনায় মুদ্রিত হবে আশা করা যায়। 'প্রবোধক রামায়ণ' (১৮৯২) 'বিস্মরণসম্ভার' (১৯৫৮), 'গুরুমাহাত্ম্য' (১৯৭১) এবং উভয় প্রবন্ধক 'রামায়ণ' (১৯৮০) মাত্র এই চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাবা বনাদাসের প্রয়াসে রামভক্তি শাখার ধারাটি কিছুটা গতিলাভ করতে পারত। কিন্তু গ্রন্থগুলি অপ্রকাশিত থাকায় তা সম্ভব হয় নি।

সখী সম্প্রদায়ের অন্য একটি শাখার নাম 'তৎসুখী শাখা'। এই শাখার প্রবর্তক উনবিংশ শতকের শ্রীজীবারাম, যাঁর সম্প্রদায়-নাম 'যুগলপ্রিয়া'। 'পদাবলী' ও 'অষ্টযাম' তাঁর দুটি গ্রন্থ। জীবারাম বিহারের ছাপরার অধিবাসী। সখীভাবের প্রচারকদের মধ্যে অযোধ্যার যুগল নারায়ণশরণের নামও উল্লেখযোগ্য। রীওয়াঁর রাজা রঘুরাজ সিংহ এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণার্থ চিত্রকূটে বৃন্দাবনের অনুরূপ 'প্রমোদকানন' নির্মাণ ও চিত্রকূটকে কুঞ্জশোভিত করেন। অযোধ্যাতেও এই সখী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার ঘটে। এই ভাবে রামভক্তিশাখার পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে অশ্লীলতারও স্পর্শ ঘটে, বিকৃতিও ঘটে। কল্পিত আচার্য 'কৃপানিবাসে'র নামে 'কৃপানিবাস পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে। তাতে অশ্লীল পদের ছড়াছড়ি। তবে এই ধারা কোনোদিন শক্তিলাভে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। হলেও তা মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধূমকেতুর মতো জ্বলে উঠে আবার নিজেই নিভে যাবে।

সগুণধারার কৃষ্ণভক্তিশাখা

উত্তর ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই কৃষ্ণভক্তির ঐতিহ্য থাকলেও বল্লভাচার্যের আবির্ভাবে যেন তাতে নবীন শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রাকৃত জনচরিত্রের স্তর থেকে সাহিত্য ভগবল্লীলার স্তরে উন্নীত হল। মহাপ্রভু বল্লভাচার্য কৃষ্ণের লীলা গানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লীলাপ্রসঙ্গ থাকলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের কৃষ্ণলীলা তার থেকে পৃথক। দেশের পরবর্তী কৃষ্ণলীলা কাব্যে গীতগোবিন্দের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য খ্রীস্টীয় ১৪৭৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সাধনপথ 'পুষ্টিমার্গ' নামে পরিচিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই জীব প্রেমনির্ভর ভক্তির দিকে প্রবৃত্ত হয়। ভগবানের এই অনুগ্রহেই পোষণ বা পুষ্টি ঘটে। তাই এই অনুগ্রহ যা পুষ্টিভিত্তিক পথ 'পুষ্টি-মার্গ'। জীবের তিনটি স্তর— প্রবাহজীব, মর্যাদাজীব ও পুষ্টিজীব। যারা সাংসারিক ব্যাপারে আসক্ত এবং আবদ্ধ তারা সাধারণ স্তরের প্রবাহজীব। সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে যারা চলতে চায় তারা লোক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, মধ্য স্তরের মর্যাদাজীব। যারা একান্তভাবে ভগবানের উপর নির্ভরশীল, ভগবানে বিশ্বাসী, ফলে তাঁর অনুগ্রহে পুষ্টিলাভ করে অবশেষে নিত্যলীলায় লীন হয়ে যায়— তারা উচ্চ স্তরের পুষ্টিজীব। বল্লভাচার্য রচিত চারটি মুখ্য গ্রন্থ হল— 'পূর্ব মীমাংসাভাষ্য', 'উত্তর মীমাংসাভাষ্য', 'অনুভাষ্য' এবং 'ভাগবদ্-সুবোধিনী টীকা' প্রভৃতি। তাঁর রচিত বলে অনুমিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে

ভারতের বিভিন্ন অংশে পর্যটন করে বল্লভাচার্য স্বমতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমিতে 'গদী' বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লভ সম্প্রদায়ের উপাসনা বা সেবা-বিধিতে ভোগ, রাগ, বিলাস প্রভৃতি গৃহীত। পরে এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাঁদের উপাস্য দেব ও উপাসনাপদ্ধতি নিয়ে সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেন। এই ভক্তিরসাশ্রিত ও গেয় পদ হিন্দুর জীবনে নতুন স্বাদ ও সরসতা এনে দেয়। এই কৃষ্ণভক্তি সংগীত রচনায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকও যোগ দেন। সাধারণভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই সকলে রচনা করেছেন ও গান করেছেন। ক্রমে ক্রমে রাধাকৃষ্ণের মধুর ভাবোপাসনা দক্ষিণ ভারতে প্রসারলাভ করে। রাধাভাবে কৃষ্ণকে বন্দনা করার প্রথা দাঁড়িয়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে দেবদাসীর প্রথা প্রচলিত হল। পিতা-মাতা নিজের কন্যাকে মন্দিরের পূজাদাসীরূপে নিবেদন করতেন। বিগ্রহের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেন। দেবদাসীরা মন্দির-পূজার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। 'অন্দলি'— এইরূপ একজন সাধিকা ছিলেন। সুফী উপাসনা বিধিতেও মধুরভাবের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই সুফীভাবের প্রভাবে সে যুগের বৈষ্ণব সাধক-সাধিকারা আভ্যন্তর মিলন, মূর্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব ও অবস্থার সমর্থন ও স্বীকরণ করেন। মীরাবাঈ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপরও এই প্রভাব কতকটা সক্রিয় ছিল— বললে অন্যায় হবে না।

দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার সৌন্দর্য বর্ণনায় সমৃদ্ধ। মাত্রিক বা কলাবৃত্ত ছন্দে গেয়পদ রচনার প্রথা সম্ভবত সে যুগে বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। জয়দেবের পর মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ রচনা করেন। সুতরাং দেখা

যাচ্ছে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গেয় পদের উৎসভূমি পূর্বভারত, ক্রমে সে ধারা পশ্চিম ভারতে বিস্তার লাভ করে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাছে বাংলার পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন বিশেষভাবে ঋণী। চণ্ডীদাসের রাধিকা— সরলা, সুকুমারমতী বালিকা, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকা বিদগ্ধা-বিলাসবতী। বিদ্যাপতির পদে ধ্বনি, অলংকার এবং বাহ্য সৌন্দর্যের প্রাধান্য ভাবের অভিব্যক্তির সহায়ক। পদের আকর্ষণও তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রজ-ভাষার কবিতায় বিদ্যাপতির পদের বিশেষ প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। তবে হিন্দী সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের লীলা-আধৃত কাব্য শাখাটি বল্লভাচার্য ও জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিশ্রণ বা সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, একথা বলা যায়।

হিন্দী সাহিত্যের কৃষ্ণভক্তি শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সুরদাস মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের শিষ্য ছিলেন। গুরুর প্রেরণাতেই তিনি ভগবানের সগুণরূপের গান বেঁধেছেন ও গেয়েছেন। বল্লভাচার্য কৃষ্ণের বাল্যলীলার উপাসনাতেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। বল্লভাচার্যের পুত্র বিট্‌ঠল-নাথ পুষ্টিমার্গী সাধকদের মধ্য থেকে আটজন প্রধান ভক্ত কবিকে নির্বাচিত করে তাঁদের 'অষ্টছাপ' সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরূপে নির্দিষ্ট করলেন। তাঁদের মধ্যে চার জন— সূরদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দ-দাস ও কুম্ভনদাস— বল্লভাচার্যের এবং বাকি চার জন— নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস, ছীতস্বামী ও গোবিন্দ স্বামী— বিট্‌ঠলনাথের শিষ্য ছিলেন। তাঁরা সবাই সুকবি হলেও সূরদাস ও নন্দদাস ছিলেন সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রথম চার জন কবির কথা 'চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা' এবং শেষ চার জনের বিষয় 'দো সৌ বাওয়ন বৈষ্ণবন কী বার্তা' গ্রন্থে সংকলিত।

সূরদাস (১৪৭৮-১৫৮২)—হিন্দী সাহিত্যের অন্যান্য ভক্ত কবিদের মতোই সূরদাসের জন্মতিথি জন্মস্থান এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে

সর্ববাদীসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত নেই। প্রামাণিক ঐতিহাসিক সামগ্রীর অভাব এবং কিম্বদন্তীর আধিক্যই তার কারণ। সূরদাসের রচনা ও অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন আলোচক বিভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন।

তবে অনুমিত হয়, খ্রীস্টীয় ১৪৯৩ থেকে ১৫৬৩ সনের মধ্যেই সূরদাস বর্তমান ছিলেন। তাঁর জন্ম মথুরার সন্নিকট 'রুণকতা' গ্রামে। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু তাও তর্কাতীত নয়। 'চৌরাশী বৈষ্ণবন কী বার্তা' গ্রন্থানুসারে সূরদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাত্র ছ বৎসর বয়সেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হওয়ায় গ্রামের বাইরে বৃক্ষতলে বাস করতে থাকেন। আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানে থেকে ব্রতভঙ্গ-আশঙ্কায় তরুণ সাধক অন্যত্র চলে যান। ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সুকণ্ঠ সাধক ছিলেন বলে সহজেই তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও গড়ে ওঠে। পরে বল্লভাচার্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বল্লভাচার্য তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং গোবর্ধন পর্বতে শ্রীনাথ-জীর মন্দিরে কীর্তনসেবার ভার তাঁকে অর্পণ করেন। তাঁর রচিত ও গীত পদগুলি পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। সূরদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। তবে 'সূর-সাগর', 'সূর-সারাবলী' ও 'সাহিত্য-লহরী'-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুমান করা হয়, একলক্ষ পঁচিশ হাজার পদ সূরদাস লিখেছিলেন। তবে পাঁচ হাজারের মতো পদই পাওয়া গেছে।

সূরদাসের কাব্য প্রধানত গীতিকাব্য। প্রবন্ধ বা আখ্যান কাব্যের আভাস থাকলেও তাকে বিচ্ছিন্ন বা মুক্তক রচনারূপেই গণ্য করা সমীচীন। গীতিকবি সূরদাসের গীতিকাব্য গীত বা গানেরই নামান্তর। স্বরচিত সংগীতের সুর ও লয় সম্পর্কে সূরদাস সজাগ ছিলেন। সমগ্র কৃষ্ণচরিত থেকে তিনি এমন কয়েকটি মর্ম-প্রভাবী অংশ বেছে নিয়েছেন, যা একদিকে স্বসম্প্রদায়ের ধর্ম-ভাবনার প্রকাশ ঘটায় আবার অন্যদিকে পাঠক ও শ্রোতার মনে ভক্তি-তরল সুকুমার ভাবনার সঞ্চরণ ঘটায়।

এই তরল— গভীর অনুভূতিই গীতিকাব্যের প্রাণ। সূর রচনাবলীর আখ্যানময়তা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসারী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সূরদাস কোনো সামাজিক বিধি-বিধান নির্দেশ করেন নি। মানবজীবনের সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণও করেন নি। তবে মানবজীবনের যে বাৎসল্য ও শৃঙ্গার-রসের দিকৃটিকে গ্রহণ করেছেন, তার এমন কোনো সূক্ষ্ম বা তুচ্ছ ভাগ নেই যা তাঁর লেখনীস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। বালসুলভ প্রতিটি প্রবৃত্তি, মাতৃবাৎসল্যের প্রতিটি দিক, বাল্যকালের ঘটনা—আদি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া সুরসাগরে সংযোগ-শৃঙ্গারের পারস্পরিক প্রেম, সৌন্দর্য-চিত্রণ ও রূপ-লিপ্সার বর্ণনাও সার্থক এবং মনোগ্রাহী হয়েছে। বিরহ-আর্তি-মূলক তাঁর 'ভ্রমরগীত'গুলি তরল মাধুরী এবং বাক্‌বৈচিত্র্যে অনুপম অনুভূতি এনে দেয়। কাব্যভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যশিল্পও উচ্চস্তরের। গীতের তিনটি বৈশিষ্ট্য— তন্ময়তা, সংগীতময়তা ও সংক্ষিপ্ততা। সূরদাসের রচনায় এ তিনের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষিত হয়। ভাব ও ভাষা বেশ স্বাভাবিক এবং উপযোগী। তবে অনুবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তির ফলে *গতানুগতিকতার অনুসরণে কোনো কোনো পদ* অনাবশ্যক শিল্প-কণ্টকিত হয়ে পড়েছে।

সূরের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতি, কবীরদাস প্রভৃতির রচনার ভাব অথবা ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গান পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকলেও কৃষ্ণচরিত গায়কদের মধ্যে সূর-দাসকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে রামচরিত গায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের কথা স্মরণ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দী-কাব্যগগনে তুলসীদাস ও সূরদাস যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র-সদৃশ। এই দুই ভক্তশ্রেষ্ঠ কবির বাণীতে যে তন্ময়তা আছে অন্যদের মধ্যে তা নেই। তাঁদের প্রভাবেই হিন্দী কাব্য অমরত্বের অধিকারী হয়েছে। সরসতার ফলেই ভক্তির স্রোত পরিশুষ্ক হতে পারে নি। সূরদাসের রচনা সম্পর্কে বলা হয়—

উত্তম পদ কবি গঙ্গকে, কবিতাকো বলবীর।
কেশব অর্থ গম্ভীর কো, সূর তীন গুণ ধীর।

এখানে সুরকে সংস্কৃত কবি মাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুরদাসের রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

বালক কৃষ্ণ বিষয়ক—

ক. সোভিত কর নবনীত লিয়ে।
ঘুটুরন চলত রেমু তন মণ্ডিত, মুখদধি লেপ কিয়ে।
—কি অপূর্ব করে নবনীত শোভা!
রেণু মাখা গায়ে হামাগুড়ি দেয়,
ঠোঁটে-দই মনোলোভা!

খ. মৈয়া কবহিঁ বঢ়েগী চোটী।
কিতিক বার মোঁহি দূধ পিয়ত ভঈ, ওয়হ অজহূঁ হৈ ছোটী।
তূ জো কহতি 'বল' কী বেনী জ্যোঁ। হৈ্বে হৈ লম্বী মোটী।

—মা, আমার মাথার বেণী কবে বড়ো হবে? কতদিন ধরে তো দুধ খাচ্ছি তবু তা ছোটোই রয়ে গেল। আর তুমি যে বল, দাদার মতোই আমার বেণীও লম্বা ও মোটা হবে।

কেবল বাৎসল্য রসই নয়, শৃঙ্গার রসের সৃষ্টিতেও সুরদাস সার্থক।[১৪]

ধেনু দুহৎ অতিহী রতি বাঢ়ী।
এক ধার দোহনি পহুঁচাওয়ত, এক ধার জহঁ প্যারী ঠাঢ়ী॥
মোহন করতেঁ ধার চলতি পয়, মোহনি মুখ অতিহী ছবি বাঢ়ী।

—ধেনু দোহনে প্রণয় গভীর হল। (কৃষ্ণ) দুধের একটি ধার দুধের পাত্রে রাখেন এবং অপরটি পৌঁছে দেন যেখানে তাঁর প্রিয়া দাঁড়িয়ে। সুন্দর আঙুলের দুধের ধারের অমৃতস্পর্শে মোহিনী রাধার মুখচ্ছবি সুন্দরতর হয়ে উঠল।

কৃষ্ণ-বিরহে কাতর ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ গোপবালাদের চিত্র—

মধুবন! তুম কত রহত হরে?
বিরহ বিয়োগ শ্যামসুন্দর কে ঠাঢ়ে কোঁ্যা না জরে?
তুম হো নিলজ, লাজ নাহিঁ তুমকো, ফির সির পুহুপ ধরে।
সসা স্যার ঔ বনকে পখেরূ ধিক ধিক সবন করে।
কৌন কাজ ঠাঢ়ে রহে বন মেঁ, কাহে ন উকঠি পরে?

—ওহে মধুবন! কেমন করে সবুজ হয়ে আছ? শ্যামরায়ের বিরহের আগুনে আস্ত পুড়ে মরলে না কেন? তুমি নির্লজ্জ, তোমার লজ্জা নেই, তাই এর পরও তুমি মাথা তুলে রয়েছ, তাতে আবার ফুলও ফুটছে! শশক, শেয়াল এবং বনের পাখি-পাখালিরা সবাই তোমাকে ধিক্কার দিচ্ছে। আর কি কাজে মিছে দাঁড়িয়ে রইলে, শুকিয়ে মরলে না কেন?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সূরসাগরের সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্য পূর্ণ অংশ 'ভ্রমরগীত'। তাতে গোপবালাদের বচন-বক্রতা অত্যন্ত মনোহর হয়ে উঠেছে। এটি সূরদাসের অতুলনীয় প্রয়াস বলা যায়। কৃষ্ণবিরহ জনিত ব্যথাকে গোপিনীদের হৃদয় থেকে নির্মূলভাবে উপড়ে ফেলার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান এবং যোগের কথায় উদ্ধব তাদের প্রভাবিত করতে চাইছেন। তাই নানাভাবে উপদেশ দিচ্ছেন তাদের। আর গোপবধূরা কখনও তাঁকে তিরস্কার করছে; আবার কখনও বা কাতর আবেদন-নিবেদন জানাচ্ছে। উদ্ধবের বহু কথা শোনার পর তারা যেন মরিয়া হয়ে বলছে—

উধো! তুম অপনো জতন করৌ।
হিতকী কহত কুহিত কী লাগৈ, কিন বেকাজ ররৌ?
জায় করৌ উপচার আপনো, হম জো কহতি হৈঁ জী কী।
কছূ কহত কছুবৈ কহি ডারত, ধুন দেখিয়ত নহিঁ নী কী॥

—হে উদ্ধব! তুমি নিজের প্রতি যত্নবান হও। তোমার হিত কথা আমাদের অহিতের মতো শোনাচ্ছে। কেন বৃথা চেষ্টা করছ? আমাদের কথা শোনো। গিয়ে নিজের ব্যবস্থা করো। কী কথা বলতে কী কথা বলে বসছো; তোমার রকম-সকম ভালো ঠেকছে না।

সগুণ ও নির্গুণ ভাবোপাসনার প্রসঙ্গ তর্কাতীত পদ্ধতিতে এনে সূরদাস বিষয়টির মহত্ব বৃদ্ধি করেছেন। অবশেষে সগুণ উপাসিকা গোপবধূরা নির্গুণ সাধনার তিরস্কার করে বলছে—

সুনিহৈ কথা কৌন নির্গুণকী, রচি পচি বাত বনাওয়ত।
সগুণ সুমেরু প্রগট দেখিয়ত, তুম তৃণ কী ওট দূরাওয়ত।

—কে শুনবে তোমার নির্গুণ-তত্ত্ব? বানিয়ে বানিয়ে যত কথা বলছ! সগুণব্রহ্ম সুমেরুর মতোই সুপ্রকাশ, তাঁকে তুমি তৃণ দিয়ে আড়াল করতে চাও?

দেখা যাচ্ছে কবি সূরদাস যখন যে ভাবটিকে যে রসের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, উপযুক্ত ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের সাহায্যে তাতে সহজেই সফল হয়েছেন। অনবদ্য হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টি।

তাই বলা চলে, 'সূরদাস যখন তাঁর প্রিয় বিষয়ের বর্ণনা শুরু করেন, তখন অলংকার শাস্ত্র যেন হাত জোড় করে তাঁর পিছু পিছু ছোটে। উপমার যেন বান ডেকে যায়, রূপকের যেন বৃষ্টি হতে থাকে। সংগীতের প্রবাহে কবি স্বয়ং ভেসে চলে যান। আত্ম-হারা হয়ে পড়েন। কাব্যে এরূপ তন্ময়তার সঙ্গে শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সামঞ্জস্য খুবই দুর্লভ। ···কাব্যগুণের এই বিশাল বনস্থলীর একটি সহজ স্বাভাবিক সৌন্দর্য রয়েছে। সে-সৌন্দর্য সেই অকৃত্রিম বনভূমির মতো, যার স্রষ্টা আপন সৃষ্টির সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছেন।"[১০]

নন্দদাস (আ: ১৫৩৩-১৫৮২ খ্রী.)—সূরদাসের প্রায় সমকালীন অষ্টছাপ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত ভক্তকবি নন্দদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে তাঁকে তুলসীদাসের অনুজ বলে মনে করা হয়। তুলসীদাস 'ভাষায় রামায়ণ' রচনা করেন তাতেই উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নন্দদাস ভাষায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনা করেন।

গোস্বামী বিট্‌ঠলনাথের শিষ্য নন্দদাস একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রতিভাশালী ভক্ত-কবি ছিলেন। তাঁর পঁচিশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে রাস-পঞ্চাধ্যায়ী, সিদ্ধান্ত পঞ্চাধ্যায়ী, অনেকার্থ মঞ্জরী, মানমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, বিরহ মঞ্জরী, ভ্রমরগীত, গোবর্ধনলীলা, শ্যাম সগাঈ, রুক্মিনী মঙ্গল, সুদামা চরিত, ভাষা দশমস্কন্ধ এবং পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় বিভিন্ন কাব্যরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী' ও 'সিদ্ধান্ত-পঞ্চাধ্যায়ী' প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী'র সরস-অনুবাদ। 'সিদ্ধান্ত-পঞ্চাধ্যায়ী'তে ভক্তি সিদ্ধান্তের কয়েকটি বিধান বর্ণিত। ভাষা বেশ বলিষ্ঠ ও সুললিত। 'অনেকার্থ' 'ধ্বনি-মঞ্জরী' ও 'নামমালা'— অভিধান গ্রন্থ বলা যায়। রূপমঞ্জরীতে ভক্তি-আশ্রিত প্রেম কাহিনী বর্ণিত। রসমঞ্জরী 'নায়িকা-ভেদ'-জাতীয় গ্রন্থ। 'বিরহমঞ্জরী' ও 'ভ্রমরগীত' গ্রন্থদ্বয়ে বিরহের রূপ চিত্রিত। 'শ্যাম-সগাঈ'তে ক্রীড়ারত রাধাকৃষ্ণের বিবাহের প্রসঙ্গ সরসভাবে বর্ণিত। পদাবলীর পদে নন্দদাসের প্রতিভা অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভক্তি-সিদ্ধান্তের পাঠক ও জ্ঞাতা নন্দদাসের কাব্য বিচার-পদ্ধতি-সম্মত এবং পুষ্টিমার্গ-অনুসারী। ভ্রমরগীতে গোপিনীরা উদ্ধবের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক করেছে। সূরদাসের গ্রাম্য সরল গোপবধূ তারা নয়। নির্গুণের চেয়ে সগুণভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপন্নতায় সূরদাস প্রেমকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করেন, কিন্তু নন্দদাসের তূণে খরতর যুক্তিতর্কের বাণ বিদ্যমান। তাছাড়া ধ্বনিমাধুরী, অলংকার যোজনা, বলিষ্ঠ ও মার্জিত ভাষা প্রভৃতি নন্দদাসকে উচ্চস্তরের কবিরূপে প্রতিষ্ঠা দেয়।

শব্দানুপ্রাসের ঝংকারে পাঠক অভিভূত হয়ে পড়ে। অষ্টছাপের অন্য কোনো কবি শব্দগঠন ও ধ্বনি-বিন্যাসে নন্দদাসের মতো চাতুর্য ও নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। নন্দদাসের রচনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি—

তাহী ছিন উডুরাজ উদিত রস রাস সহায়ক।
কুঙ্কুম মণ্ডিত বদন প্রিয়া জনু নাগরি নায়ক ॥
কোমল কিরন অরুন মানোঁ বন ব্যাপি রহী য়োঁ।
মনসিজ খেল্যো ফাগু ঘুমড়ি ঘুরি রহ্যো গুলাল জ্যোঁ॥
ফটিক ছটা সী কিরন কুঞ্জরন্ধ্রন জব আঈ।
মানহুঁ বিতত বিতান সুদেস তনাওয় তনাঈ ॥
তন লীনো কর কমল যোগমায়া সী মুরলী।
অঘটিত ঘটনা চতুর বহুরি অধরন সুর জু রলী ॥

রাসপঞ্চাধ্যায়ী

—রাসের সহায়ক উডুরাজ (চাঁদ) তমোভেদ করে উদিত হলেন। কুমকুম রঞ্জিত মুখে প্রিয়া যেন নায়িকা আর নায়ক একমাত্র তিনি। কোমল কিরণের লালিমায় যেন বন-ব্যাপ্ত, মনসিজ যেন ঘুরে ঘুরে আবীর-গুলাল খেলছে। ফটিকচ্ছটার মতো কিরণ যখন কুঞ্জরন্ধ্রে প্রবেশ করল— সমস্ত পরিবেশ এক অপরূপ ভাব ও উল্লাসে ভরে উঠল। তখন কৃষ্ণ তাঁর জাদু-বাঁশিটি অধরে ছোঁয়ালেন আর সঙ্গে সঙ্গে যত অঘটিত ঘটনা ঘটতে লাগল।

বাৎসল্যরসের দুটি চরণ—

চিরই চুহ চুহানী সুনি চকঈ কী বাণী।
কহতি জসোদা রাণী জাগো মেরে লাল।
—পাখির কিচির-মিচির ও চক্রবাকের বাণী
শুনে বলেন যশোদা— এবার ওঠো সোনামণি।

গতিশীল চিত্রাবলীর উদাহরণ—

ছবি সোঁ নর্তনি, পটকনি, লটকনি, মণ্ডল ডোলনি।
কোটি অমৃত সম মুসকনি, মঞ্জুলতা থেই থেই বোলনি।

একটি অপরূপ ধ্বনিচিত্র—

নূপুর, কঙ্কন, কিঙ্কন, করতল মঞ্জুল-মুরলী।
তাল, মৃদঙ্গ, উপঙ্গ, চঙ্গ, একহি সুর জু রলী॥
মৃদুল মুরজ-টংকার, তার-ঝঙ্কার মিলি পুনি।
মধুর জন্ত্র কী তার, ভঁবর, গুঞ্জার রলী পুনি॥

কৃষ্ণদাস (আঃ ১৪৯৫-১৫৭৫)—আমেদাবাদের নিকটবর্তী চিলোতরা গ্রামে এক শূদ্র পরিবারে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরল নিয়মনিষ্ঠ কিন্তু আত্ম-সুখ পরায়ণও ছিলেন। আপন যোগ্যতাবলে তিনি শূদ্র হয়েও শ্রীনাথজীর মন্দিরের 'মহান্ত' বা অধিকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন দুর্দম শাসক ছিলেন তিনি। শ্রীনাথজীর মন্দিরের পূজারী থাকতেন বাঙালি ব্রাহ্মণ। তাঁদের প্রতি বিরূপ হয়ে কৃষ্ণদাস অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করে নির্দয় ও নির্মমভাবে তাঁদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে মেরে ধরে বিতাড়িত করেন। —"দ্বৈ-দ্বৈ চার-চার লাঠী বঙ্গালনি কো দীনী।" রূপ ও সনাতন বাঙালী পূজারীদের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হলে তিরস্কৃত হন। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করায় তিনি আচার্য বিট্ঠলনাথের প্রতিও বিরূপতা প্রকাশ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি বিট্ঠলনাথের কৃপা থেকে বঞ্চিত হন নি। গুরু ও সম্প্রদায়ের মান রক্ষার্থ তিনি ভালো-মন্দ যে কোনো কাজই করতে পারতেন। বাহ্যিক আচরণে নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সরলতা, সততা ও ভক্তিনিষ্ঠার অভাব ছিল না তাঁর মধ্যে।

অন্যান্য কৃষ্ণভক্ত কবিদের মতো রাধাকৃষ্ণও রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার শৃঙ্গার বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। 'জুগলমানচরিত্র',

'ভ্রমরগীত' ও 'প্রেমতত্ত্বনিরূপন' নামে তিনটি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন মনে করা হয়। তবে সাহিত্যের বিচারে সুরদাস ও নন্দদাসের সঙ্গে কৃষ্ণদাসের তুলনার প্রসঙ্গই উঠতে পারে না। কৃষ্ণদাসের রচনার একটি দৃষ্টান্ত—

মো মন গিরিধর ছবি পৈ অটক্যো।
ললিত ত্রিভঙ্গ চাল পৈ চলিকৈ, চিবুক চারু গড়ি ঠট্ কৌ্যা॥
সজল শ্যাম ঘন বান নীল হৈব, ফিরি চিত অনত ন ভট্কৌ্যা।
কৃষ্ণদাস কিয়ে প্রান-নিছাবর, য়হ তন জগ সির পটক্যো॥

—গিরিধারীর ছবিতে আমার মন আটকা পড়েছে। চলনের ললিত ত্রিভঙ্গ গতি এবং চিবুকের চারুরূপে মন হারিয়ে যায়। মন সজল শ্যাম-ঘন বাণে লীন, তাই ভুলে আন পথে যাবে না। প্রভুর পাদপদ্মে প্রাণোৎসর্গ করে কৃষ্ণদাস এই শরীর জগৎকে অর্পণ করেছেন।

পরমানন্দ (১৪৯৩-১৫৮৩)—ধর্মগ্রন্থ এবং সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের সূত্রে পরমানন্দের জন্ম ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফরুর্খাবাদ জেলার কনৌজে হয়। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান তিনি। বাল্যকাল থেকে সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। 'অড়েল' নামক স্থানে বল্লভাচার্যের নিকট পুষ্টিমার্গে দীক্ষা নেবার আগেই পরমানন্দ, কীর্তন, ভক্তিগীত প্রভৃতি রচনা করে কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ— 'পরমানন্দ-সাগর'-এ ৮৩৫টি পদ সংকলিত। তিনি উচ্চস্তরের কবি এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পদে ভাষার লালিত্য এবং ভক্তির মাধুর্য লক্ষণীয়। তাঁর একটি পদ শুনে গুরু বল্লভাচার্য কয়েকদিন ভাবাবিষ্ট ছিলেন বলে বিশ্বাস। কৃষ্ণভক্তদের মুখে পরমানন্দের পদ প্রায়ই শোনা যায়। পরমানন্দের দুটি পদ উদ্‌ধৃত করা গেল—

১. কহা করৌ বৈকুণ্ঠহি জায়?
জহঁ নহিঁ নন্দ, জহাঁ ন জসোদা, নহিঁ জহঁ গোপী, গ্বাল ন গায়॥

জহঁ নহিঁ জল জমুনা কো নির্মল, ঔর নহীঁ কদমন কী ছায়।
পরমানন্দ প্রভু চতুর গ্বালিনী, ব্রজরজ তজি মেরী জায় বলায়॥

—বৈকুণ্ঠে গিয়ে কী হবে? নন্দ, যশোদা, গোপিনী, গোপ, ধেনু, যমুনার নির্মল জল এবং কদম্বের ছায়া— কিছুই সেখানে নেই। চতুর ব্রজবালাদের মতোই তিনিও ব্রজধাম ত্যাগ করবেন না। যেতে হয় তো তাঁর বালাই যাক।

২. তনক কনক দোহনী দে দে রী মৈয়া।
তাত-দুহন সিখবন কহ্যৌ মোহি ধৌরী গৈয়া॥
হরি বিষমাসন বৈঠিকে মৃদুকর থন লীন্হোঁ।
ধার অটপটী দেখিকে ব্রজপতি হঁসি দীন্হোঁ॥

—অনুকরণ বৃত্তির এই পদটিতে বালক কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলছেন— মা গো। সোনার দোহনপাত্রটি একটু দাও না। বাবা ধবলী গাইটি দুইতে শিখতে বলেছেন। উঁচু-নীচু জায়গায় বসে বালক কৃষ্ণ কোমল হাতে দুধ দুইতে লাগলেন। এলো মেলো দুধের ধার পড়তে দেখে ব্রজপতি হেঁসেই ফেললেন।

কুম্ভনদাস (আ. ১৪৬৮-১৫৮০)—পরমানন্দের সমসাময়িক ক্ষত্রিয় সন্তান কুম্ভনদাস একজন পরিতুষ্ট মনোভাবের মেজাজী ভক্ত ছিলেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় বিরাট পরিবার নিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করলেও তিনি কখনও কারো কাছে হাত পাতেন নি। কারো দানও গ্রহণ করেন নি। রাজা মানসিংহ দানগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি তাঁকে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। এই প্রকৃতির নির্লোভ, নিরীহ এবং স্পষ্টবাদী ভক্তের দর্শন দুর্লভ। তিনি ভক্তি-ভাবনা ও কীর্তন-মননের জন্যও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। বল্লভাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কালে তিনি নিকুঞ্জ-লীলার সেবাই প্রার্থনা করেন। তিনি অনুরাগের পদ রচনা করেন। সম্রাট আকবর তাঁর ভক্তি ও ব্যক্তিত্বে

প্রভাবিত হয়ে তাঁকে ফতেপুর সিকরীতে আহ্বান করেন। তিনি সিকরী গেলেন ঠিকই কিন্তু তা পণ্ডশ্রম বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাতে তাঁর নির্লোভ নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। অম্লান বদনে বলেন—

সন্তন কো কহা সীক্‌রী সোঁ কাম ?
আওয়ত জাত পনহিয়া টূটী বিসরি গয়ো হরিনাম ॥
জিনকৌ মুখ দেখৈ দুখ উপজত, তিনকো করন পরি সলাম।
কুম্ভনদাস লাল গিরিধর বিন্নু ঔর সবৈ বেকাম ॥

—সাধু-সন্ন্যাসীদের সিকরী গিয়ে কী লাভ ? যেতে আসতে পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেল, ভুলে গেলাম হরিনাম। আর যার মুখ দেখা পাপ, তাকে প্রণাম করতে হল! এ সংসারে কৃষ্ণ ছাড়া সব কিছুই অর্থহীন।

চতুর্ভুজদাস (আ. ১৫৪০-১৫৮৫)—কুম্ভনদাসের পুত্র ও বিঠ্‌ঠল-নাথের মন্ত্রশিষ্য চতুর্ভুজদাস শ্রীনাথজীর সেবাতেই রত ছিলেন। তিনি কথ্য ও সুব্যবস্থিত ভাষায় পদ রচনা করতেন। 'দ্বাদশ যশ' 'ভক্তি-প্রতাপ' এবং 'হিত জু কো মঙ্গল'— নামে তিনটি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। তাঁর পদের সংগ্রহও পাওয়া যায়। বাৎসল্য রসের চিত্রণে চতুর্ভুজদাস নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।—

চুটিয়া তেরী বড়ী কিধোঁ মেরী।
অহো সুবল বৈঠি ভৈয়া হো, হম তুম মাপে এক বেরী ॥
লে তিনকা মাপত উনকী কছু অপনী করত বড়েরী।
লে কর কমল দিখাওয়ত গ্বালন, ঐ্যসী কাহুন কেরী ॥
মোকো মৈয়া দুধ পিয়াওয়ত তাতে হোত ঘনেরী।
চতুর্ভুজ প্রভু গিরিধর ইহি আনন্দ নাচত দৈ ফেরী ॥

—বালক কৃষ্ণ সখা সুবলকে ডেকে বলছেন, এস মাথার বেণী মেপে দেখা যাক। হাতে একটি খড় নিয়ে মেপে নিজের বেণীটিকে বেশ

লম্বা সাব্যস্ত করে বলছেন— মা আমাকে দুধ খাওয়ায় তো, সেই জন্য আমারটি অতি দ্রুত লম্বা ও ঘন হয়েছে। —এই বলে কৃষ্ণ চারিদিকে আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছেন আর ঘুরপাক খাচ্ছেন।

ছীতস্বামী (আ. ১৪৮০-১৫৮৬)—মথুরায় জন্মগ্রহণ করলেও প্রারম্ভিক জীবন ছিল উদ্ধত ও গর্বিত। বিঠ্ঠলনাথের কাছে দীক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে শান্ত ও সংযত হয়ে পড়েন। মথুরার সম্পন্ন পাণ্ডা ছীতস্বামী আকবরের সভাসদ্ বীরবলের পুরোহিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি বহু পদ রচনা করেছেন। তাঁর পদে শৃঙ্গার ছাড়াও ব্রজভূমির প্রতি প্রেমের ব্যঞ্জনাও মেলে। অষ্টছাপের অন্য কবিদের মতো তাঁর পদও মৃদু-মধুর ও সরস। যেমন—

ভোর ভয়ে নবকুঞ্জ সদন তেঁ আওয়ত লাল গোবর্ধনধারী।
লটপট পাগ মরগজী মালা, সিথিল অঙ্গ ডগমগ গতি ন্যারী॥
বিনু গুন মাল বিরাজতি উর পর, নখছত দ্বৈজ চন্দ অনুহারী।
ছীতস্বামি জব চিতয়ে মো তন তব হোঁ নিরখি গঈ বলিহারী॥

—ভোরবেলায় নবকুঞ্জসদনে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। মাথার পাগড়ি ঢিলে, গলার মালা দলিত বিবর্ণ, টলমল পায়ে হাঁটার কি ভঙ্গি! বুকের ওপর নিষ্প্রভমালা এবং দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো নখের ক্ষত হয়েছে। কৃষ্ণের এই রূপচ্ছবি দেখে কবি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

গোবিন্দস্বামী (আ. ১৫০৫-১৫৮৫)—ব্রাহ্মণ সন্তান গোবিন্দদাস বৈরাগ্য নিয়ে বৃন্দাবনে এসে বসবাস করেন। তিনি কেবল কৃষ্ণপ্রেমের পদই লিখতেন না, ভালো গাইতেও পারতেন। বিনোদ-প্রিয় এই ভক্তকবি তাঁর রচিত পদের সুবাদেই অষ্টছাপের অন্তর্ভুক্ত হন। বিঠ্ঠলনাথের এই শিষ্যের গান শুনতে তানসেনও আগ্রহী ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি গান শুনেও যেতেন। গোবিন্দস্বামীর একটি পদ—

প্রাত সময় উঠি জসুমতি জননী গিরিধর সুত কো উবটি হুওয়াওয়তি।
করি সিঙ্গার বসন-ভূষন সজি, ফুলন রচি-রচি পাগ বনাওয়তি।
ছুটে বন্দ বাগে অতি সোভিত, বিচ বিচ চোওয় অরগজা লাবতি।
সুথন লাল ফঁুদনা সোভিত, আজু কি ছবি কছু কহতি ন আওয়তি।
বিবিধ কুসুম কী মালা উর ধরি শ্রীকর মুরলী বেতঁ গহাওয়তি।
লে দরপন দেখে শ্রীমুখকো, গোবিন্দ প্রভু চরননি সির নাওয়তি॥

—ভোরে উঠেই মা যশোদা কৃষ্ণকে স্নান করালেন। ভালো করে বসন-ভূষণে সাজিয়ে পাগড়িতে ফুল গুঁজে দিয়েছেন। মাথায় রঙিন ফিতে শোভা পাচ্ছে, সুগন্ধিত দ্রব্য ও রঙিন কাঠিতে যে শোভা হয়েছে তা সত্যই অবর্ণনীয়। পায়জামার রঙিন গুটিদার দড়িটিও অপূর্ব দেখাচ্ছে। নানা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে শ্রীকরে বাঁশি ধরিয়ে দিয়েছেন। এবার প্রভু দর্পণে শ্রীমুখ দর্শন করছেন।

গোবিন্দ স্বামীর রচনাতে মাঝে মাঝে অলংকার-মোহ প্রকট হয়ে উঠেছে।— (ক-এর অনুপ্রাস)

কুটিল কুন্তল কুণ্ডল কাছিনী, কান্তি কুবলয় ভাষ রে।
কিম্বা কুচিতাধর কুমুক কৌমুদী কুন্দ কৈরব হাসরে॥

অষ্টছাপের কবিরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান এবং রূপ-মাধুরীর বর্ণনায় বিশেষ প্রবণতা দেখিয়েছেন। তবে আপাতভাবে তাঁদের বিচরণক্ষেত্র সীমিতই থেকে গেছে বলা যায়। এই ধারার সূচনার পর লৌকিক রসের পারম্পর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন এই জাতীয় কবিরাই তাতে নবীন প্রাণ সঞ্চার করেন। পরবর্তীকালের সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতার উৎস এখানেই। কৃষ্ণভক্তি-আশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাব-ভাষা ও ছন্দের বিচারে বিস্ময়কর কোনো বৈশিষ্ট্য না দেখালেও অষ্টছাপ গোষ্ঠীর কবিরা পরবর্তী কৃষ্ণ-সাহিত্যের নির্মিতির যেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন তেমনি জনজীবনের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি শাখার নিবিড়

গভীর ও আনন্দময় সম্পর্কটিকে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে রূপ নিতেও সাহায্য করেছেন।

মীরাবাঈ (আ. ১৪৯৮-১৫৪৬)—মেড়তিয়া রাঠোর রত্নসিংহের সন্তান মীরা চোক্‌ড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উদয়পুরের রাণা ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শৈশব থেকেই কৃষ্ণভক্তির দিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। বিধবা হবার পর তিনি প্রকাশ্যে 'সৎ-সঙ্গ' ও সাধুদের মধ্যে নাম সংকীর্তন শুরু করেন। পারিবারিক বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কৃষ্ণপ্রেম-সাধনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মূলত সগুণ ভক্তিমার্গের সাধিকা হলেও তাঁর পদে নির্গুণ ভক্তিধারাও লক্ষিত হয়। সে যুগে সগুণ ও নির্গুণ দুই ধারার সঙ্গে তাঁর প্রেম-সাধনার সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। রবিদাস, তুলসীদাস, রূপ-সনাতন প্রমুখ ভক্ত-কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। রবিদাস ও রূপ গোস্বামীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন— এমন কথাও শোনা যায়। মীরা মিশ্র রাজস্থানী এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাষায় পদ রচনা করেছেন। সব পদেই তাঁর প্রেম-মুগ্ধ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অপূর্ব ভাব-বিহ্বলতা ও আত্মসমর্পণের মধুর আকূতি মীরার ভজনের অতুলনীয় বিশিষ্টতা। তাই তাঁর পদ অহিন্দীভাষী অঞ্চলেও সমানভাবে আদৃত। মীরার প্রেমার্তি সহজ ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি-আশ্রিত হওয়ায় তা অনন্য সাধারণ। মীরার ভজন গায়নে বা শ্রবণে গায়ক ও শ্রোতার হৃদয় স্পন্দিত ও অভিভূত হয়— মীরার রঙে রাঙা হয়ে ওঠে। মীরার চারটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় – 'নরসীজী কা মায়রা', 'গীতগোবিন্দ টীকা', 'রাগগোবিন্দ' এবং 'রাগ সোরঠ কে পদ'।

মীরার সাধনায় নিরাকার ব্রহ্ম অবশেষে সাকার কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন। গীত-নৃত্য-রত মীরাকে যেমন নির্গুণ রহস্যবাদের গায়িকা রূপে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রূপাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি, বিরহাসক্তি এবং কান্তা-সক্তির মূর্তিরূপেও প্রত্যক্ষ করা যায়। নির্গুণ সাধনার হঠযোগ, গুরুবাদ,

নিরঞ্জন-ধ্যান— প্রভৃতিও তাঁর পদে সুলভ। মীরা অসংকোচে মনের কথা ব্যক্ত করেন, দ্বিধা-জড়তা তাঁকে স্পর্শই করতে পারে না। যখন তাঁর হৃদয় ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়— তখন গান আপনা-আপনি কণ্ঠে এসে যায়; ফুটে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর ভাবনা তরল করুণা ও নিরীহতায় পূর্ণ। তাই মীরার পদ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের যথার্থ গীতিকাব্য। আর মীরাও সর্বভারতীয় গীতিকবি। তাঁর মর্মস্পর্শী একটি পদের দুটি পংক্তি—

দরদ কী মারী বনবন ডোলূঁ বৈদ মিল্যা নহিঁ কোয়।
মীরা কী প্রভু পীর মিটৈ জব বৈদ সঁবলিয়া হোয়।

—যন্ত্রণা কাতর চিত্তে বনে বনে ঘুরছি, কিন্তু কাউকে বৈদ্য পেলাম না। হে প্রভু, মীরার ব্যথা তখনই দূর হবে, যখন তোমাকেই বৈদ্য-রূপে পাব।

মীরার একটি সুপরিচিত পদ—

বসে মেরে নৈনন মেঁ নন্দলাল।
মোহনি মূরতি, সাওঁরি সূরতি, নৈনা বনে রসাল।
মোর মুকুট মকরাকৃতি কুণ্ডল অরুন তিলক দিয়ে ভাল।
অধর সুধারস মুরলী রাজতি, উর বৈজন্তী মাল।
ছুদ্র ঘন্টিকা কটিতট সোভিত, নূপুর শব্দ রসাল।
মীরা প্রভু সন্তন সুখ দাঈ, ভক্ত বছল গোপাল।

হিতহরিবংশ (১৫০২-১৫৫২ খ্রী.)—মধ্বাচার্য প্রবর্তিত মাধ্ব-সম্প্রদায়ের একটি শাখা 'রাধাবল্লভী সম্প্রদায়'। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হিতহরিবংশজী মথুরার নিকটবর্তী 'বাদগাঁও' নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা কেশবদাস মিশ্র এবং মাতা তারাবতী। প্রথম জীবনে তিনি মাধ্বপন্থী গোপাল ভট্টের শিষ্য ছিলেন। পরে স্বপ্নে রাধার কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে

রাধাবল্লভী সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য মুখ্যত রাধা এবং প্রাসঙ্গিকভাবে রাধাবল্লভকৃষ্ণ। তাই নাম 'রাধাবল্লভী' সম্প্রদায়। দেখা যাচ্ছে মাধ্বসম্প্রদায় ও রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্যগত এবং উপাসনাগত কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যই বেশী। সুতরাং রাধাবল্লভী সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায় থেকে পৃথকরূপেই গণ্য করা বিধেয়।

হিতহরিবংশ ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনে রাধাবল্লভের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভালো সংস্কৃত জানতেন এবং ব্রজভাষাতে সুন্দর পদ রচনা করতেন। 'হিত চৌরাসী' এবং 'রাধাসুধানিধি' নামে তাঁর দুটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। হিতহরিবংশের শিষ্যদের মধ্যে হরিরামব্যাস, সেবকজী ও ধ্রুবদাস প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরাও কবি ছিলেন। সুন্দর মধুর পদ লিখে তাঁরা যশস্বী হয়েছেন। রচনা-মাধুরীর জন্য হিতহরিবংশ বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর হিত চৌরাসীর টীকা রচনা করেন কবি লোকনাথ। বৃন্দাবনদাস লেখেন— 'হিত জী কী সহস্র নামাবলী' এবং চতুর্ভুজদাস 'হিতহরি-দাসের 'জন্মঅভিনন্দন' রচনা করেন। সুতরাং ব্রজভাষায় কৃষ্ণ-ভক্তির কাব্য ধারার বিবেচনায় হিতহরিবংশের আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

হিতহরিবংশের রচনার একটি দৃষ্টান্ত—

বিপিন ঘন কুঞ্জ রতি কেলি ভুজ মেলি রুচি
স্যাম স্যামা মিলে সরদ কী জামিনী।
হৃদয় অতি ফূল, রসমূল পিয় নাগরী
কর নিকর মত্ত মনু বিবিধ গুন রাগিনী॥
সরস গতি হাস পরিহাস আবেস বস
দলিত দল মদন বল কোক রস কামিনী।
হিত হরি বংস সুনি লাল লাবণ্য ভিদে
প্রিয়া অতি সূর সুখ সুরত সংগ্রামিনী॥

—মিলন বিষয়ক পদে নায়িকা রাধার প্রতিই পদকর্তার মন সমধিক নিবিষ্ট তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যদিও নায়ক কৃষ্ণ যথারীতি বিদ্যমান।

গদাধর ভট্ট—দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সন্তান গদাধর ভট্টের জন্মতিথি প্রভৃতি জানা যায় না। তবে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) দীক্ষাশিষ্য ছিলেন এবং তাঁকে ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। তিনি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং ব্রজভাষাতেও সুন্দর পদ রচনা করতে পারতেন। বৃন্দাবনে দুই জন সাধুর মুখে গদাধরের একটি পদ শুনে জীব গোস্বামী তাঁকে কৃষ্ণপ্রেমের উপাসক হতে উপদেশ দেন একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে।[১৬] তাতেই তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে বৃন্দাবনে এসে মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন (সম্ভবত ১৫১৫-১৬ খ্রী.)। শ্রীজীব গোস্বামী গদাধর ভট্টের যে পদটি শুনেছিলেন সেটি সম্ভবত এই—

> সখী হোঁ স্যাম রঙ্গ রঙ্গী।
> দেখি বিকায় গঈ ওয়হ মূরতি সূরত মাহিঁ পগী।
> সঙ্গ হতো অপনো সপনো সো সোই রহী রস খোঈ।
> জাগেহু আগে দৃষ্টি পরৈ, সখি, নেকু ন ন্যারো হোঈ।
> এক জু মেরী অঁখিয়নি মেঁ নিসি দ্যৌস রহ্যৌ করি ভৌন।
> গায় চরাওয়ন জাত সুন্যো, সখি সো ধোঁ কন্হৈয়া কৌন?
> কাসোঁ কহোঁ কৌন পতিয়াওয়ৈ, কৌন করৈ বকওয়াদ?
> কৈসে কৈ কহি জাতি গদাধর, গূংগে তেঁ গুর স্বাদ?

—ওলো সখি! শ্যামের রঙে রঙিন আমি। তার রূপ দেখেই মজেছি। আর ছাড়ান নেই। সব সময় তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি। এমন কি ঘুমের মধ্যেও সেই রসে ডুবে থাকি। আর চোখ খুললে তাকেই দেখি। মুহূর্তের জন্যও সে চোখের আড়াল হয় না। সদা-সর্বদা আমার নয়নেই তার বাস। শুনলাম কানু

গো-চারণে যাচ্ছে। সখি, সে কোন্ কৃষ্ণ? কাকেই বা বলি, কেইবা বিশ্বাস করবে? আর বাক্-বিতণ্ডা করেই বা কি হবে? ভক্ত গদাধর বলবেই বা কি করে? বোবাতে কি গুড়ের স্বাদ বলে বোঝাতে পারে?

আলোচ্য যুগে আরও বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁদের রচনা লৌকিক রসে সমৃদ্ধ। মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যেও ভক্তিরসের ধারাকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন কেউ কেউ। অনেক কবি ধর্মসাধনায় উৎসাহ দান করেছেন। এখানে এইরূপ কয়েকজন কবির কথা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হল।—

লালচদাস (১৫২৮ খ্রী.)—অবধী ভাষায় দোহা ও চৌপাঈবন্ধে ভগবদ্বিষয়ক কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। 'হরিচরিত্র' এবং 'ভাগবত-দশমস্কন্ধভাষা' নামক গ্রন্থ দুটি তাঁরই রচিত।

সূরদাস মদনমোহন (আকবরের সমকালীন)—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্ত কবি সূরদাস মদনমোহন আকবরের অধীন আমিন-পদে বৃত ছিলেন। তিনি একবার সরকারের তের লাখ টাকা খরচ করে সাধুসেবার ব্যবস্থা করে বৃন্দাবনে পালিয়ে যান। পরে আকবর অবশ্য তাঁকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। তাঁর শব্দ-যোজনা সংগীতানুকূল। উৎকর্ষের জন্য তাঁর অনেক পদ 'সূরসাগরে' মিশে গেছে। খ্রীষ্টীয় ১৫৩৩-১৫৪৩ সনের মধ্যে তাঁর পদগুলি রচিত বলে মনে করা হয়। যশোদার মুখে তাঁর রচিত একটি ঘুম-পাড়ানি গানের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক—

> জসোদা মৈয়া লাল কো ঝুলাওয়ৈ।
> আছে বার কান কো হুলরাওয়ৈ॥
> কনিয়া কনিয়া অঈয়া অঈয়া য়োঁ কহি লাড় লড়াওয়ৈ।
> হুলু হুলু হুলুহুলু হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ কহিকে গোদ লীয়ে খেলাওয়ৈ॥

নরোত্তম দাস (১৫৪৫ খ্রী. বর্তমান ছিলেন)—সীতাপুর জেলার 'বাড়ী' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সরস হৃদয়গ্রাহী কবিতা রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। ভাবুকতাপূর্ণ রচনার জন্যও তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। 'সুদামা-চরিত্র' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-কৃতি। দারিদ্র্যের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় কবির সহৃদয়তা ও অনুভূতিময়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী হরিদাস (১৫৪৩-১৫৬০ কবিতা রচনাকাল)—স্বামী হরিদাস নিম্বার্কাচার্যের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও একটি নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায় 'টট্টি' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তিনি একজন উচ্চস্তরের সংগীত শিল্পী এবং সংগীত আচার্যও ছিলেন। এই ভক্ত সংগীত সাধকের গান শুনতে স্বয়ং আকবর এবং তানসেন ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হতেন। তবে তাঁর পদ সর্বত্র শ্রুতিমধুর ও মোহক হতে পারে নি। যদিও তা ভাবে উৎকৃষ্ট। হরিদাসের পদের তিন-চারটি সংগ্রহ পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'স্বামী হরিদাস জী কে পদ', 'হরিদাস জী কো গ্রন্থ' এবং 'হরিদাস জী কী বাণী'— বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে।

শ্রীভট্ট (জন্ম ১৫৩৮ ও কবিতা রচনাকাল ১৫৬৫)—নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর প্রধান শিষ্য। সহজ-সরল কথ্য-ভাষায় ছোটো ছোটো পদ লিখেছেন শ্রীভট্ট। তাঁর 'জুগলসতক' পদ সংকলনটি বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত ও গীত হয়। 'আদিবাণী' তাঁর আরও একটি গ্রন্থ। শ্রীভট্ট ভালো গাইয়ে ছিলেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন।

ব্যাসজী (কবিতাকাল ১৫৬৩ খ্রী.)—হরিরাম ব্যাস জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বুন্দেল-খণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম দিকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। পরে হিতহরিবংশ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে

'রাধাবল্লভী' সম্প্রদায়ভুক্ত হন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাসজী তর্ক-বিতর্ক করতে খুবই ভালোবাসতেন। তবে দীক্ষা গ্রহণের পর বৃন্দাবনবাসী হন। ফলে তাঁর মনোভাব একেবারে বদলে যায়। নানা বিষয়ে পদ রচনা করলেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং শৃঙ্গারলীলার পদেই তাঁর তন্ময়তা সুপরিস্ফুট। প্রেম-বৈরাগ্য ও ভক্তি বিষয়ক বহু পদ তিনি রচনা করেছেন। আকবরের দরবারেও তাঁর যাতায়াত ছিল। তাঁকে 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী' গ্রন্থের রচয়িতা বলে মনে করা হয়।

ধ্রুবদাস (আ. ১৫৭৫)—সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের কবি ধ্রুবদাস, হিতহরিবংশ প্রভুর স্বপ্নশিষ্য। তিনি প্রধানত বৃন্দাবনেই বাস করতেন। তাঁর রচনার বিষয় ও পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক। দোহা, চৌপাঈ, কবিত্ত, সবৈয়া প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যে তৎকালে প্রচলিত সমস্ত মুখ্য ছন্দেরই প্রয়োগ করেছেন। ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের বর্ণনায় সমধিক প্রবণতা দেখিয়েছেন। তিনি প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'রহস্যমঞ্জরী', 'রসবিচার' ও 'সিদ্ধান্তবিচার' শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। ধ্রুবদাস কোনো কোনো গ্রন্থে সম্বৎ-সনেরও উল্লেখ করেছেন— 'সভা-মণ্ডলীলীলা' (১৬৮১), বৃন্দাবনসৎ (১৬৮৬), রসমঞ্জরী (১৬৯৮)' প্রভৃতি। সুতরাং তাঁর কাব্যরচনার কালপরিধি সম্বৎ ১৬৬০-১৭০০ পর্যন্ত (১৬০৩-১৬৪৩ খ্রী.)। নাভাজীর ভক্তমাল (১৫৮৫-১৬০০) গ্রন্থের অনুসরণে ধ্রুবদাস 'ভক্তনামাবলী'ও রচনা করেন। তাতে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ভক্তদের কথা আছে।

বনারসীদাস (১৫৮৬ খ্রী.)—জৌনপুরের নিবাসী জৈন বনারসী-দাস প্রথম জীবনে খুবই বিলাসী ছিলেন। উত্তরজীবনে ভক্তিমার্গে এসে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। 'বনারসী-বিলাস', 'নাটকসময়সার', 'নামমালা', 'অর্ধকথানক', 'বনারসী পদ্ধতি', 'মোক্ষপদী', 'ধ্রুব-বন্দনা', 'কল্যাণমন্দির ভাষা' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হিন্দীতে প্রথম 'আত্মকথা' (অর্ধকথানক, ১৬৪১ খ্রী.) রচনার শ্রেয় বনারসীদাসেরই।

এই প্রসঙ্গে সে যুগের আরও কয়েকজন কবি ও কাব্যের কথা উল্লেখ করা গেল—

লক্ষ্মীনারায়ণ (প্রেমতরঙ্গিনী)—বলভদ্র মিশ্র (বলভদ্রী ব্যাকরণ, হনুমন্নাটক, গোবর্ধন সতসঈ টীকা, দূষণ বিচার, নখসিখ); প্রেম কবিমোহন, (জন্ম ১৬১৭, কেলিকল্লোল); মুবারক—(অলক শতক, তিলক শতক); গোপাল কবি (বলভদ্র-কৃত 'নখশিখ কী টীকা')। নাগরীদাস, অলবেলী অলিজী, চচ্চা হিত বৃন্দাবনদাস জী, ভগবৎ-রসিক, সুন্দরদাস, চতুরদাস, ভুআল, ধর্মদাস, শুকদেব মিশ্র, রসিক-দাস প্রমুখের নামও কৃষ্ণভক্ত কবিরূপে উল্লেখযোগ্য। এই কবিরা হিন্দী কাব্যে হয়তো তেমন উল্লেখযোগ্য নূতনত্বের সংযোজন করতে পারেন নি—ভাব ও শিল্পের বিচারেও বিস্ময়কর কিছু দিতে পারেন নি, কিন্তু হিন্দীর কৃষ্ণভক্তিশাখাকে তাঁরা যে ধারণ করে রেখেছিলেন এবং সাধ্যমতো পুষ্ট বা বলিষ্ঠ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে কৃষ্ণভক্তি শাখায় নবীন-প্রাণসঞ্চার ঘটে সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই কৃষ্ণপ্রেমের নব সাহিত্যের জয়যাত্রা প্রায় দুই শতাব্দীকাল সবেগে চলল। তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবল হতে থাকে। তাই শেষের দিকে মানুষ তাকে আর ধরে রাখতে পারে নি। পঞ্চদশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাদর্শ আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চারশো বৎসর ধরে যে কৃষ্ণসাহিত্য রচিত হয়েছে তা অতুলনীয়। ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন প্রভৃতি ক্রিয়া বার বার ঘটতে থাকায়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভাষার ব্যবহার হতে থাকায় তা একদিকে যেমন নবীন ভাবাভিব্যক্তির-শক্তি লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি সুন্দর, রুচিশীল মাধুর্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। অতিমাত্রায় ধর্মাশ্রিত ও বিনম্রভাবের বাহন হওয়ায় ভাষামাধুরী যেন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সোজা কথায়—এই কৃষ্ণভক্ত কবিসম্প্রদায় হিন্দী

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেম মাধুরীর যে সুধাস্রোত প্রবাহিত করলেন তার প্রভাবে হিন্দী কাব্যভূমি সর্বদা সরস উর্বর ও আনন্দময় ভাব প্রকাশের শক্তি লাভ করল। তাই মানুষের দুঃখ-কষ্টময় জীবন-আধৃত যে দুঃখবাদ তা এসেও টিকতে পারে নি। এখানেই প্রেমভক্তিশাখা ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের জয়। তাই এই সাহিত্যিকদের আসন যেমন ভক্ত-মনে তেমনি সাহিত্য-রসিকদের হৃদয়েও চির অম্লান ও শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে আছে।[১৭]

লক্ষণীয় বিষয় হল— বর্তমানে এই সাহিত্যধারা আর নিত্য-নব ভাব-চিন্তা ও সৃষ্টিশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। কারণ জীবন-সংঘর্ষে জর্জরিত মানুষ বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ হাতে-হাতে পায় না এ সাহিত্য থেকে। তাই মুষ্টিমেয় ভক্ত ও সাহিত্যরসিকদের মধ্যেই তার পঠন-পাঠন সৃজন-মনন আজ সীমিত। তবে দিবসের বিশেষ ক্ষণে বা জীবনের বিশেষ পর্যায়ে কৃষ্ণসাহিত্য সর্বস্তরের মানুষকেই সঙ্গ ও সান্ত্বনা দান করে থাকে— একথা অস্বীকার করার উপায় নেই; আর ভারতীয় জীবনে তার গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়।

কৃষ্ণভক্তি শাখার আলোচনা থেকে দেখা গেল— বৈষ্ণব সাধক-দের অন্তত সাতটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। যেমন— নিম্বার্ক-সম্প্রদায়, বল্লভী সম্প্রদায়, মাধ্ব-সম্প্রদায়, গৌড়ীয় (চৈতন্য) সম্প্রদায়, রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, সখী সম্প্রদায় ও টট্টী সম্প্রদায়।

জ্ঞানাশ্রয়ী, প্রেমাশ্রয়ী, রামভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি সাহিত্য-ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ এবং স্বতন্ত্র ধারার কবিতাও রচিত হত। অর্থাৎ একই সঙ্গে কবিতার বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত ছিল। এই সময় (১৫৬৩-১৬০৫) ভারতের সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট আকবর। তিনি রাজ্যে যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন তাতে সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পূর্বে রাজাদের দরবারে সম্মানিত হতেন কবিরা। এবার সম্রাটের দরবারে কবিদের সম্মান দান শুরু হল। আবার বীর, শৃঙ্গার এবং নীতিমূলক কবিতা রচনার ধারা আরম্ভ হল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং লোক-জীবন নানাভাবে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয়। তাই হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে আকবরের রাজত্বকাল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় একদিকে যেমন সূরদাস, তুলসীদাস প্রমুখের মতো সাধক কবির, অপরদিকে তেমনি রহিম, গঙ্গ, নরহরি প্রমুখ নিপুণ ভাবুক কবির, আবির্ভাব ঘটেছে। পূর্বাগত সাহিত্য-শৈলীতে নবজীবনের সঞ্চার ঘটেছে। কবি সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি কলাকুশলিগণ যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

আকবরের কাব্য, সংগীত ও শিল্পপ্রিয়তার ফলে তাঁর রাজসভায় গুণিজন-সমাবেশ ঘটে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রোৎসাহনে তাঁর রাজসভায় যে সাহিত্য-সৃষ্টি হত তাকে 'দরবারী সাহিত্য' আখ্যা দেওয়া যায়। আব্দুর্ রহিম খানখানা, নরহরি, গঙ্গ প্রভৃতি আকবরের রাজসভা অলংকৃত করে রেখেছিলেন।

আব্দুর্ রহিম খানখানা (১৫৬৭-১৬২৫)—আমীর খুসরোর (১২৫৪-১৩২৫) মতো খানখানাও তুর্কি, পারসি ও আরবি এবং সংস্কৃত ভাষার

অধিকারী ছিলেন। হিন্দীকাব্যেরও বোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সংস্কৃতি-বোধ ছিল উদার এবং মহৎ। দাতা ও পরোপকারীরূপে আকবরের রাজসভার এই রত্নটি 'দাতাকর্ণ' নামে অভিহিত হতেন। বড়ো যোদ্ধা, দক্ষমন্ত্রী ও উদারমনা সাহিত্যিক ছিলেন তিনি। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালেও তিনি বর্তমান ছিলেন। সাধক কবি তুলসীদাসের সঙ্গেও তাঁর বেশ সৌহার্দ ছিল। তিনি বলতেন — 'গোদ লিয়ে হুলসী ফিরৈ, তুলসী সো সুত হোয়।' অর্থাৎ তুলসীর মতো সন্তান পেয়ে মা-হুলসী সানন্দে তাকে কোলে করে নিয়ে বেড়ান। রহিমের 'বরওয়ৈ নায়িকাভেদ' গ্রন্থের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তুলসীদাস নাকি 'বরওয়ৈ রামায়ণ' রচনা করেন। তিনি বিনোদপ্রিয়, অনাসক্ত মেজাজের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনায় মানবিক রস ও অনাবিল সৌন্দর্য প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। বহু গ্রন্থের রচয়িতা রহিমের 'রহিম দোহাবলী', 'বরওয়ৈ নায়িকাভেদ' 'মদনাষ্টক', 'শৃঙ্গার সোরঠ' এবং 'রাস পঞ্চাধ্যায়ী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রহিম দোহার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করলেও বরওয়ৈ, কবিত্ত, সবৈয়া, সোরঠা প্রভৃতিরও নিপুণ প্রয়োগ করেছেন। 'বরওয়ৈ' ছন্দোবন্ধের স্রষ্টা এবং প্রবর্তক তিনিই।

রহিমের দোহা তাঁকে জনচিত্তে স্থায়ী আসন দান করেছে। জীবনরসের রসিক কবি কাব্য-বিরোধী বৃত্তিধারী হয়েও সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। তিনি হিন্দী রচনায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের চেষ্টাও করেছিলেন।—

কলিত ললিত মালা ওয়া জওয়াহির জড়া থা।
চপল চখব ওয়ালা চাঁদনী মেঁ খড়া থা॥
কটিতট বিচ মেলা পীত সেলা নবেলা।
অলি, বন অলবেলা য়ার মেরা অকেলা॥

—মদনাষ্টক

—পঞ্চদশাক্ষরা মালিনী (।।।, ।।।, ঽঽঽ, ।ঽঽ, ।ঽঽ = ননময়য়) ছন্দের প্রয়োগে প্রথম পংক্তিতে কবি ১৬ অক্ষর ব্যবহার করেছেন। ফলে

মালিনীর ধ্বনি-বিন্যাস বিধি লঙ্ঘিত ও বিঘ্নিত হয়েছে। সে যাই হোক, চাঁদনি রাতে সুন্দর সাজ-সজ্জায় প্রেমিকের প্রতীক্ষারত বর্ণনাটির আকর্ষণ লক্ষণীয়।

দুটি দোহার শ্লোক—

রহিমন ওয়ে নর মর চুকে, জে কহুঁ মাঁগন জাহি।
উনতে পহলে ওয়ে মুয়ে, জিন মুখ নিকসত 'নাহিঁ'॥
রহিমন রহিলা কী ভলী, জো পরসে চিত লায়।
পরসত মন মৈলো করে, সো মৈদা জরি জায়॥

—দোহাবলী

—যারা পরের কাছে হাত পাতে তারা মৃত, তাদেরও আগে মারা গেছে তারা, যারা 'না' বলে দেয়। স্নিগ্ধ মনে পরিবেশন করলে ছোলার বস্তুও উপাদেয় হয়, কিন্তু বিষণ্ণ মনে পরিবেশন করলে ময়দার সামগ্রীও তিক্ত-কষায় হয়ে ওঠে।

গঙ্গ (আ ১৫৩৮-১৬২৫)—খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকের আর একজন দরবারী কবি হলেন গঙ্গ। তিনি স্বীয় কবিত্ব শক্তির সাহায্যে আকবরের রাজসভা রসস্নিগ্ধ করে রাখতেন। তাঁর কোনো স্বতন্ত্র রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই সময়কার অন্য কবিদের কাব্যে উল্লেখ এবং বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত রচনাতেই তাঁর নির্ভীকতা এবং কবিত্ব-শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। রহিম খানখানা তাঁকে বিশেষভাবে মান্য করতেন। শোনা যায় তাঁর বিষয়ে রচিত গঙ্গের একটি পদ শুনে মুগ্ধ হয়ে রহিম তাঁকে লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। পদটি এই—

চকিত ভঁবর রহি গয়ো, গমন নহিঁ করত কমল বন।
অহিফন মনি নহিঁ লেত, তেজ নহিঁ বহত পবন ঘন॥
হংস মান সর তজ্যো চক্ক-চক্কী ন মিলৈ অতি।
বহু সুন্দরী পদ্মিনী পুরুষ ন চহৈঁ, ন করৈ রতি॥
খল ভলিত সেস কবি গঙ্গ ভন, অমিত তেজ রবিরথ খস্যো।
খানান খান বৈরম সুবন জবহিঁ ক্রোধ করি তঙ্গ কস্যো॥

—এই ছপ্পয়টির অর্থ— বৈরাম খানখানার পুত্র (রহিম) যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোড়ার জিন ঠিক করেন, তখন ভয়ে চকিত ভ্রমর কমলবনে যাওয়া ভুলে যায়, নাগ ফণায় মণি ধারণ করতে ভুলে যায়, প্রবল বাতাসও গতিহীন হয়ে পড়ে; হংস মানসরোবর ত্যাগ করে, চখা-চখির মিলন থেমে যায়। সুন্দরী পদ্মিনী রমণীরা পুরুষ সঙ্গ-ইচ্ছা ত্যাগ করে, অমিত তেজ সূর্যদেবও রথ থেকে খসে পড়ে যান।

স্পষ্টবাদিতার জন্য কোনো রাজা বা নবাবের অপ্রীতিভাজন হয়ে কবি গঙ্গকে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি দোহা বলে যান। সেটি এই—

কবহুঁ ন ভঁডুআ রন চঢ়ে, কবহুঁ ন বাজী বম্ব।
সকল সভাহি প্রনাম করি, বিদা হোত কবি গঙ্গ॥

—ভণ্ড কখনও যুদ্ধ করে না, আর বাজী (ঘোড়া) ডঙ্কা-নিনাদ শুনে স্থির থাকতে পারে না। সভাস্থ সকলকে প্রণাম করে গঙ্গ কবি বিদায় নিচ্ছেন।

সম্প্রতি গঙ্গ কবির তিনটি গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে— 'গঙ্গ পদাবলী', 'গঙ্গ-পচীসী' ও 'গঙ্গ রত্নাবলী' নামে।

গঙ্গকে অনেক সময় তুলসীদাসের শ্রেণীতে রাখা হয়। বলিষ্ঠ কাব্যপ্রতিভা ও নির্ভীকতার জন্য বহু কবির নেতারূপে গঙ্গ স্বীকৃত। ভাষার অধিকারও তাঁর উল্লেখ করার মতো। এই দুই কারণে তুলসীদাসের শ্রেণীতে রাখার প্রয়াসে বলা হয়েছে—

তুলসী গঙ্গ দুঔ ভয়ে সুকবিন কে সরদার।
ইনকে কাব্যন্ মেঁ মিলৈ, ভাষা বিবিধ প্রকার॥
—তুলসী গঙ্গ সুকবির কবি রসিক জনের আশা,
তাঁদের কাব্যে সহজ সুলভ বিবিধ প্রকার ভাষা।

গঙ্গ কবির বীর ও শৃঙ্গার রস, ব্যঙ্গ ও হাস্য রস প্রভৃতির নিপুণ চিত্রণ, তাঁর হৃদয়ের সরসতা, বাগ্বৈদগ্ধ্য এবং ভাবুকতার পরিচায়ক।

মহাপাত্র নরহরি বন্দীজন (১৫১৫-১৬১০)—অসনী ফতেপুরের অধিবাসী নরহরি বন্দীজনও আকবরের রাজসভার অলংকার ছিলেন। আকবর তাঁকে 'মহাপাত্র' উপাধিতে সম্মানিত করেন। তিনি প্রধানত ছপ্পয় ও কবিত্ত শৈলী ব্যবহার করতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রুক্মিনীমঙ্গল', 'ছপ্পয়নীতি' এবং 'কবিত্তনীতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি ছপ্পয় শুনে সম্রাট আকবর স্বীয় রাজ্যে গো-বধ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেটি হল—

> অরিহু দন্ত তিন্নু ধরৈ, তাহি নহিঁ মারি সকত কোই।
> হম সন্তত তিন্নু চরহিঁ, বচন উচ্চরহিঁ দীন হোই॥
> অমৃত পয় নিত স্রবহিঁ, বচ্ছ মহি থম্ভন জাবহিঁ।
> হিন্দুহি মধুর ন দেহি, কটুক তুরকহি ন পিয়াবহিঁ॥
> কহ কবি নরহরি অকবর সুনৌ বিনওয়তি গউ জোরে করন।
> অপরাধ কৌন মোহি মারিয়ত, মুয়েহু চাম সেবই চরন॥

—দাঁতে তৃণ নিলে শত্রুও অবধ্য; আমরা সতত তৃণ খাই, দীনভাবেই বচন বলি, আমাদের স্তন থেকে অমৃত-পয় ক্ষরিত হয়, বাছুরকে জেবে দুধ দোওয়া হয়, দুধের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানে কোনো তারতম্য করি না। কবি নরহরি বলছেন— হে আকবর শোনো— কান-জুড়ে (কারণ গোরুর হাত নেই) গাই মিনতি জানাচ্ছে— মৃত্যুর পরও চামড়া দিয়ে তোমাদের পদ-সেবা করি, তবু কোন্ অপরাধে তোমরা আমাদের বধ কর? এ কেমন তোমাদের কৃতজ্ঞতা বোধ?

মহারাজ বীরবল (১৫২৮-১৫৮৫)—গঙ্গাদাসের পুত্র মহেশদাস নারনৌলের তিকবাঁপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বীরবল নামে আকবরের মন্ত্রণাদাতা, সুহৃদ ও বাক্‌পটুবিনোদক রূপে পরিচিত হন। হাস্যরসে তিনি আকবরের মন ও রাজসভা উল্লাসিত করে রাখতেন। তিনি ব্রজভাষায় কবিতাও লিখতেন। কবি কেশবদাসকে বীরবল প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। বীরবলের কোনো গ্রন্থ পাওয়া না-গেলেও কয়েকশত কবিত্তের সংগ্রহ ভরতপুর থেকে

প্রকাশিত হয়েছে। 'ব্রহ্ম' নামে তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর রচনা যেমন অলংকৃত তেমনি সরস। 'সুদামা চরিত' কাব্যটি তাঁরই রচনা বলে অনুমিত।

রাজা তোডরমল (১৫২৩-১৫৮৯)—তোডরমল প্রথমে শেরশাহের কাছে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে আকবরের সময় ভূমিকর বিভাগের মন্ত্রী হন। তিনি কিছুদিন বঙ্গদেশের সুবাদার পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তোডরমলের প্রবণতা পারসি ভাষার দিকে থাকলেও নীতি ও উপদেশ-মূলক পদ তিনি লোক ভাষায় লিখতেন। পারসিভাষার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থটি তাঁকে অমরতা দান করেছে। বইটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

সেনাপতি (জন্ম ১৫৮৯)—অনূপ শহর নিবাসী গঙ্গাধরের পুত্র সেনাপতি হীরামণি দীক্ষিতের কাছে দীক্ষা নেন। এই ভাবুক কবি মুখ্যত রামভক্ত হলেও কৃষ্ণ, শিব, গঙ্গা এবং নির্গুণ সাধকদের মতো 'অন্তস্‌সাধনার' বিষয় নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

দেবদুখ দণ্ডন, ভরত সির মণ্ডন ওয়ে।
বন্দৌ অঘ খণ্ডন খরাউঁ রঘুরাঈ কী॥
—দেবদুখ দণ্ডন, ভরত শির মণ্ডন,
বন্দি অঘ খণ্ডন, রামের পাদুকা দুটি।

তাতে রামের প্রতিই তাঁর ভক্তির প্রগাঢ়তার পরিচয় মেলে। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে সেনাপতির প্রধান পরিচয় ঋতু-প্রকৃতি চিত্রণের অনবদ্যতার জন্য। তাঁর ঋতুবর্ণনা যেমন হৃদয়গ্রাহী ও মানব-রসসিক্ত, তেমনি জীবন্ত। যেন প্রকৃতির সরস-মধুর প্রতিরূপ। ললিত পদে যমক অনুপ্রাসাদির সংযোগের ফলে অপূর্ব চমৎকারিতা এসেছে। তিনি কবিত্ত বা ঘনাক্ষরী-ই লিখতেন। তাঁর দুটি গ্রন্থ— 'কবিত্ত রত্নাকর'

এবং 'কাব্যকল্পদ্রুম' পাওয়া গেছে। কবিত্তরত্নাকর ভক্তিকালের শেষ পর্যায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা। 'মুক্তক কবিত্ত ছন্দে' এটি রচিত। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৃন্দাবনে বাস করতে থাকেন। ভাবে ভাষায় ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে তাঁর রচনা অবিস্মরণীয় বলা যায়। মুক্তক কাব্যকারদের মধ্যে তাঁর স্থান উচ্চে। ঋতুবর্ণনার একটি উদাহরণ—

বৃষ কৌ তরনি, তেজ সহসৌ করনি তপৈ,
জ্বালনি কে জাল বিকরাল বরসত হৈ।
তচতি ধরনি, জগ ঝুরত ঝুরনি, সীরী
ছাঁহ কো পকরি পন্থী পঞ্ছী বিরমত হৈ॥
সেনাপতি নৈক ছুপহরী ঢরকত, হোত,
ধমকা বিষম জো ন পাত খরকত হৈঁ।
মেরে জান পৌন সীরে ঠৌর কো পকরি কাহু
ঘরী এক বৈঠি কহুঁ ঘামৈ বিতওয়ত হৈ॥

—কবিত্ত রত্নাকর

—গরমকালের দুপুরে তাপ চরমে ওঠে। পশু-পাখি এবং অন্য প্রাণীর দল এদিকে ওদিকে ছায়ায় কিভাবে বিরাম লাভ করে— তার সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে এ বর্ণনায়। এই অতি কষ্টদায়ক ক্ষণ আসে কেন? তার কারণ কবি বলেছেন— তাপের চাপে ঠাণ্ডা নিজেই কোথাও আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে যেন তাপ থেকে আত্মরক্ষা করছে। কবির এই সরলতা সহজেই উপভোগ্য।

রসখান (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ)—দিল্লীর পাঠান সর্দার। খুব বড়ো কৃষ্ণভক্ত। গোস্বামী বিট্‌ঠলনাথের কৃপাভাজন। শৃঙ্গার রসের দোহা, কবিত্ত ও সবৈয়া রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সাবলীল ও শব্দাড়ম্বর মুক্ত। তাঁর রচিত কাব্য— 'প্রেম বাটিকা' ও 'সুজান-রসখান'। তাঁর রচিত কয়েকটি পংক্তি—

মানুষ হোঁ তো ওয়হী রসখান
বসৌঁ সঁগ গোকুল গাঁওকে গ্বারন।
জৌ পসু হোঁ তো কহা বসু মেরো
চরৌ নিত নন্দ কী ধেনু মঁঝারন॥
পাহন হোঁ তো ওয়হী গিরি কো
জো কিয়ো হরি ছত্র পুরন্দর ধারন।
জৌ খগ হোঁ তো বসেরো করোঁ
মিলি কালিন্দী কূল কদম্বকী ডারন॥

—মানুষ জন্ম পেলে যেন রসখান হয়ে গোকুলের গোপদের সঙ্গে বাস করি। পশু জন্ম পেলে নন্দের ধেনুদের সঙ্গে চরে বেড়াই। যদি পাথর হই, তো পাহাড় হব যাকে ছত্ররূপে ধারণ করে কৃষ্ণ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। আর যদি পাখি হই, তো যেন কালিন্দীর তটে কদম্বের ডালে অন্য পাখিদের সঙ্গে বাস করি।

হোলরায়—আকবরের সমকালীন হরিবংশ রায়ের আশ্রিত হোলরায় আশ্রয়দাতার যশোগান করতেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। আকবরের সভাতেও তিনি যেতেন। আকবর হোলরায়কে ভূমিদান করেন। শোনা যায় তুলসীদাস হোলরায়কে নিজের জলপাত্র (ঘটি) দান করেন। তাতে হোলরায় বলে ওঠেন—

লোটা তুলসীদাসকো লাখ টকা কো মোল।
—তুলসীদাসের ঘটি, লাখ টাকার পণ্য।

তুলসীদাস সহাস্যে পংক্তি পূরণ করেন—

মোল তোল কছু হৈ নহীঁ লেহু রায় কবি হোল।
—নাও কবি হোলরায়, দর-দাম শূন্য॥

হোলরায়ের রচনায় রাজ-রাজড়ার প্রশংসাই বেশি। সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর কবিতায় কোনো আকর্ষণ ছিল না।

আলোচিত কবিদের ছাড়াও এযুগের অন্য উল্লেখযোগ্য কবি হলেন— ছীহল (ষোড়শ শতক, 'পঞ্চসহেলী', 'বাওয়নী'); কৃপারাম

(ষোড়শ শতক, 'হিততরঙ্গিনী'); আলম (সপ্তদশ শতক, 'মাধবানল', 'কামকন্দলা'); মনোহর কবি (ষোড়শ শতক, 'প্রশ্নোত্তরী'); জমাল (ষোড়শ শতক); কাদির (১৫৭৮); পুহকর কবি (সপ্তদশ শতক, 'রসরতন'); সুন্দর (সপ্তদশ শতক, 'সুন্দর শৃঙ্গার', 'সিংহাসন বত্তিসী', 'বারহ-মাসা'), লালচাঁদ বা লক্ষোদয় (সপ্তদশ শতক, 'পদ্মিনী চরিত্র' ১৬৪৩) —প্রমুখ।

এই কবিদের কবিতার বিষয় যেমন বিভিন্ন, প্রকাশভঙ্গিও তেমনি বিচিত্র। ব্রজভাষা, অবধী, রাজস্থানী এমনকি পাঞ্জাবী ভাষাতেও কেউ কেউ কাব্য রচনা করেছেন। কৃষ্ণভক্তি, রামভক্তি, আশ্রয়দাতার যশোগান, প্রকৃতিচিত্রণ ছাড়াও তাঁরা নীতি-উপদেশ, রীতি-শৃঙ্গার, বীর-চরিত-প্রশস্তি, ভক্তি চরিত নায়ক-নায়িকা-ভেদ এবং মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থার অনুভূতি সূক্ষ্ম বা স্থূলরূপে তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে সেযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে কবিগণ নিপুণভাবে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এই কবিসম্প্রদায়ের অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল— তাঁরা অনেকেই একে অন্যের প্রতি উদারতা এবং শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অধিকাংশ কবিই আকবরের সভাকবি, আশ্রিত কবি অথবা প্রোৎসাহিত কবি ছিলেন। কেউ কেউ সংগীতজ্ঞও ছিলেন। তাতে আকবরের সাহিত্য-সংগীত ও সংস্কৃতি-প্রীতিই সুস্পষ্ট হয়। আকবর নিজেও হিন্দীতে কবিতা লিখতেন। তার প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমন—

১. জাকো জস হৈ জগৎ মেঁ, জগৎ সরাহৈ জাহি।
তাকো জীবন সফল হৈ, কহত অকব্বর সাহি॥

অর্থাৎ—

জগতে যে যশ পেয়েছে, সবাই যাকে মান্য করে—
তারই জীবন সফল লোকে—বলেন শাহ আকবরে।

২. সাহি অকব্বর এক সমৈ চলে কাহ্ন বিনোদ বিলোকন বালহি।
আহট তেঁ অবলা নিরখ্যৌ, চকি চৌকি চলী করি আতুর চালহি॥
ত্যোঁ বলি বেনী সুধারি ধরী সু ভঙ্গী ছবি যোঁ ললনা অরুলালহি।
চম্পক চারু কমান চঢ়াওয়ত কাম জ্যোঁ হাথ লিয়ে অহিবালহি॥

আকবরশাহের শিশুদের কৃষ্ণলীলা-বিনোদ দেখতে যাওয়ার কথা এবং তাঁর আকস্মিক উপস্থিতিতে লীলারত বালক-বালিকাদের পরিস্থিতি কেমন উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল—সে কথাই এখানে বর্ণিত। সভাসদ বীরবলের মৃত্যুর পর আকবর একটি সোরঠায় তাঁর অন্তরের শোক-প্রকাশ করেন।

সামগ্রিকভাবে ভক্তিযুগে হিন্দী কাব্যসাহিতের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে সমৃদ্ধির সেই সৃজনীধারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তে থাকে। ভক্তি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যখন নিঃশেষ প্রায়, অথচ প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব অব্যাহত, তখন প্রেরণার উৎস ভিন্নতর এবং ফলে সাহিত্যের রূপ-রসও ভিন্নতর হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কবি সম্প্রদায় প্রেরণার উৎস রূপে খুঁজে পেলেন সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রকে। সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে আশ্রয় করে হিন্দী সাহিত্য-সৃষ্টির নূতন পথ আবিষ্কৃত হল। খ্যাত-অখ্যাত, প্রতিভাশালী ও সাধারণ বহু কবিই এই নবপথের পথিক হলেন। এই নূতন প্রণালীর নব হিন্দীসাহিত্যে—সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক, সংজ্ঞা, রূপ ও রীতি সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুসরণে ব্যাখ্যাত, নির্ধারিত এবং উদাহরণসহ সৃজিত হয়েছে। সাহিত্য-বিধান ও সাহিত্যিক সিদ্ধান্তের বা রীতি-প্রণালীর প্রাধান্যের ফলে এই যুগের পরিচিতি ঘটল—'রীতিযুগ' বা 'রীতিকাল' রূপে। তবে এই রীতিযুগেও বীরগাথাকাল ও ভক্তিকালের বিভিন্ন প্রকারের কাব্যসৃজনের ধারাও যে অব্যাহত ছিল—সে কথা বলাই বাহুল্য। যেহেতু রীতিগ্রন্থাদি রচনাই এযুগের মুখ্য প্রবণতা তাই ভক্তিপরবর্তী এই কালটি 'রীতিকাল' নামেই অভিহিত হয়।

১. এপ্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। পূর্বে হিন্দী সাহিত্যে কবীরের কোনো প্রকার স্বীকৃতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কবীর সমাদৃত হলে, তাঁর অনূদিত 'Hundred Poems of Kabir' (1915), গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে, পরই 'হিন্দী নবরত্ন' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কবীর গৃহীত হন।
দ্রষ্টব্য. হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী: মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্র (১৯৬৩) পৃ. ২২৫-২৬।

২. দোহা ও চৌপাঈ যোগে রচিত হয় রমৈণী। সাখী হল দোহা এবং 'সব্দ' বা 'শব্দ' হল পদ। সাক্ষী থেকে সাখী, অর্থাৎ গুরুর প্রত্যক্ষ উপদেশ। শব্দ থেকে সবদ, অর্থাৎ গুরুর গেয় উপদেশ।

৩. 'কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্য সাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষ রূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে।'

—রবীন্দ্রনাথ, ইতিহাস, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'।

৪. আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন: 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (১৯৩৫), পৃ. ১১৭।

৫. ৮+৮=১৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বন্ধের নাম চৌপাঈ এবং ১৩+১১=২৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বন্ধের নাম দোহা। পাঁচ, ছয়, সাত অথবা আটটি চৌপাঈর পর 'দোহা'র বিন্যাসকে 'ঘত্তা-দেওয়া' বলে।

৬. ড. সুকুমার সেনের মতে কুতুবনের কাব্যটি বাংলাদেশে রচিত। তাতে আশ্রয়দাতা রূপে বর্ণিত হোসেন শাহ গৌড়াধিপতি। সে সময় জৌনপুরের হোসেন শাহ নাকি বাংলায় এসে আশ্রয় নেন, কুতুবনও তাঁর সঙ্গেই আসেন।

—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ (১৯৭০), পৃ. ১০৫

৭. দ্রষ্টব্য অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (১৯৭৪), পৃ. ২২৩।

৮. মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের ২২ থেকে ২৬ মাত্রার পংক্তি বন্ধকে সবৈয়া বলে। গুরু লঘু বিশিষ্ট একই ক্রমে তিন বর্ণের একটি গণের ৭ বা ৮ বার আবৃত্তিতে সবৈয়া ছন্দোবন্ধ মেলে।

৯. মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের ২৭ এবং তার বেশি মাত্রার পংক্তির রচনাকে কবিত্ত বা ঘনাক্ষরী বলা হয়। আসলে কবিত্ত বা ঘনাক্ষরী একটি ছন্দোরীতি, ভ্রম-ক্রমে ছন্দোবন্ধ নামে পরিচিত।

১০. সংবত সোরহ সৈ ইকতীসা। করহুঁ কথা হরি পদ ধরি সীসা। ১৬৩১ সংবৎ অর্থাৎ ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু অসমীয়া পণ্ডিত শ্রীডিম্বেশ্বর নেওগ,তাঁর অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭) গ্রন্থে এই ১৬৩১ সংবৎকে খ্রীস্টাব্দ রূপে গ্রহণ করেছেন ও কবি কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩২ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন— 'ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় ভিতর চতুর্দশ শতিকাত রচা মাধব কন্দলীর অসমীয়া রামায়ণেই আটাইতকৈ পুরণি বলি প্রমাণিত হয়' (পৃ ১৯৪)। সন-তারিখের বিভ্রান্তি-ভিত্তিক এই অভিমতটির ভ্রান্তি নিরসন পরমাবশ্যক। মাধব কন্দলীর অসমীয়া রামায়ণ যদি চতুর্দশ শতকে রচিত হয়ে থাকে তাহলে তা নিঃসন্দেহে অন্তত উত্তর ভারতের ভাষায় সর্বপ্রাচীন। কারণ ওড়িয়া ভাষায় বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণও ষোড়শ শতকের রচনা। এই চার ভাষার রামায়ণের মধ্যে অসমীয়া-রামায়ণ বাল্মীকির রামায়ণের সরাসরি অনুবাদ বলে মনে করা হয়। সঠিক তথ্যের জন্য আমরা যোগ্য ব্যক্তির প্রতীক্ষায় আছি।

১১. ঝুলনা ২৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তছন্দ। পংক্তিশেষে গুরু-লঘু ধ্বনি থাকে।

১২. বরওয়ৈ ১৯ মাত্রার দ্বিপদী (১২ + ৭) ছন্দোবন্ধ। পংক্তি শেষে গুরু-লঘু ধ্বনি থাকে।

১৩. রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী (১৯০০) কাব্যের সূরদাস, কবীরদাস, তুলসীদাস ও সনাতন এবং অন্যত্র রামানন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে রচিত কবিতাগুলির আধার বাংলা 'ভক্তমাল' গ্রন্থ।

১৪. দ্রষ্টব্য—সূরপদরত্নাবলী (১৯৮৪), পরিশিষ্ট পৃ ১৫৩-২২২।

১৫. ক হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী : হিন্দীসাহিত্য (১৯৫২) পৃ. ১৮৪-৮৫।
খ সূরদাসের পদ ও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনাত্মক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের 'সূরপদরত্নাবলী' (১৯৮৪) গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশের সূরদাস ও চণ্ডীদাস', 'সূরদাসের পদাবলী ও বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বাৎসল্যরস' এবং 'জাতীয় সংহতিতে সূরদাসের পদ' প্রভৃতি রচনা।

১৬. সেই শ্লোকটি হল—

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজযুগ্মনাশ্রিত্যবৃন্দাটবী তৎ পদাকম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তাং কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ ?

—রাধার চরণযুগলের সেবা ছাড়া, বৃন্দাবনে বাসছাড়া এবং তাঁর ভাবে ভাবিত ভক্তদের সঙ্গলাভ ছাড়া শ্যাম সমুদ্রের রসে অবগাহন কি করে সম্ভব ? অর্থাৎ সম্ভব নয়।

১৭. চৈতন্যমত বা গৌড়ীয় মতের সাহিত্যের পৃথক আলোচনার অবকাশ না থাকায় সে আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল। তবে উল্লেখ করা যায় যে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে কেবল ১৬-১৭ জন গৌড়ীয় মতের ভক্ত-কবির কথা স্বীকৃত। কিন্তু ড. প্রভুদয়াল মীতল অনুন্ধান চালিয়ে ১২২ জন কবির সন্ধান পেয়েছেন। দ্রষ্টব্য—চৈতন্য মত ঔর ব্রজ সাহিত্য (১৯৬২) নামক তাঁর গ্রন্থ।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-মধ্যকাল : রীতিযুগ

(১৬৫০-১৮৫০)

আমরা পূর্ব অধ্যায়েই দেখেছি ভক্তিসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও অনাকর্ষক হয়ে পড়ছিল। তার স্থান অধিকার করছিল লৌকিক রসপুষ্ট সাহিত্য। শৌর্য-বীর্য, ভক্তিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাসের ফলে বিলাসিতা এবং শৃঙ্গার রসের দিকে আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে রস, অলংকার, নায়ক-নায়িকাভেদ প্রভৃতি কবিতার উৎস এবং আশ্রয় রূপে স্বীকৃতি লাভ করল। এ-যুগের সাহিত্যে অলংকার শাস্ত্রের প্রাধান্য—'রীতি', 'কবিত্তরীতি' অথবা 'সুকবিরীতি' রূপে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ এই রীতি ও তার প্রয়োগ প্রাধান্যের জন্য আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল এই যুগটিকে রীতিকাল (১৬৪৩-১৮৪৩) বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই যুগের অলংকার-শাস্ত্র আশ্রিত কাব্যকে বলেছেন—'রীতিকাব্য'। তাই বলে এ-কথা ভাবলে ভুল হবে যে, এ যুগের যাবতীয় কাব্যই রীতিকাব্যের শ্রেণীভুক্ত। বীররসাত্মক এবং ভক্তিমূলক সাহিত্যও কিছু কিছু সৃজিত হয়েছে এ যুগে।

প্রত্যেক কাজেরই আরম্ভের আগেও একটি আরম্ভ বা অলক্ষিত প্রস্তুতি থাকে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য-অনুসারী হিন্দী সাহিত্যের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের কবিদের মনের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রানুসারী হিন্দী সাহিত্য-সৃজনের অভিপ্রায় অবচেতনভাবে থাকা অস্বাভাবিক নয়। মাঝে-মধ্যে তার আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবির রচনায়। হিন্দী সাহিত্যের রীতিকাব্যের যুগ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে শুরু হলেও তার প্রস্তুতি চলছিল পূর্ব থেকেই। এই প্রস্তুতির ফলস্বরূপ সুরদাসের 'সাহিত্য লহরী' (১৫৫০), নন্দদাসের

'রসমঞ্জরী' (১৫৮০), বলভদ্র মিশ্রের-'নখশিখ' (১৫৮৩) এবং কেশব দাসের 'রসিকপ্রিয়া' (১৫৯১) ও 'কবিপ্রিয়া' (১৬০১)—প্রভৃতি গ্রন্থে রীতিবিষয়ক প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে মোহনলাল মিশ্রের-'শৃঙ্গার সাগর' এবং কবি করনেস রচিত 'কর্ণাভরণ', 'শ্রুতিভূষণ' ও 'ভূপভূষণ' গ্রন্থ কয়টির কথাও স্মরণীয়। এগুলি সম্ভবত কৃপারামের সম-সাময়িক কালেই রচিত। কিন্তু বিষয় ও শৈলীর বিচারে কোনো ব্যবস্থিত রূপ গড়ে উঠতে দেখা যায় না। তবে কেশবদাসের গ্রন্থটিতে তা কতকটা ব্যবস্থিত এবং পরিণতি-অভিমুখী বলা চলে। সূরদাসের পূর্বেও কৃপারাম তাঁর 'হিততরঙ্গিনী' গ্রন্থে (১৫৪১) রীতি বিষয়ে প্রবণতা দেখিয়েছেন।[১] সুতরাং ১৫৪১ থেকে ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বৎসরের যে রীতি-প্রবণতা, তার ফলে কেশবদাসের রীতিকাব্য; তার আরও পঞ্চাশ বৎসরের এই প্রবণতা ও প্রয়াসের পর পুরোপুরি সার্থক এবং সুপরিণতরূপে 'কবিকুল কল্পতরু' (১৬৫০) রীতিকাব্য পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং ১৫৫০-১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ রীতিকালের প্রস্তুতির যুগ। সাধারণভাবে বলা চলে কেশবদাস অলংকারবাদী কবি। তিনি হিন্দী সাহিত্যের সে-যুগের অবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবি ভামহ, উদ্‌ভট প্রমুখের যুগের কাব্যধারার অনুকারী হলেন। রস, রীতি, অলংকার সব কিছুর জন্যই তিনি অলংকার শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এদের পার্থক্য তিনি স্বীকার করেন নি, বা করতে চান নি। তাঁর 'কবিপ্রিয়া' গ্রন্থটি কেশব আশ্রয়দাতা রাজা ইন্দ্রজিৎসিংহের পতিব্রতা গণিকা রায়প্রবীণকে কাব্যশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচনা করেন। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তিকে কাব্যমর্ম বোঝানোর উদ্দেশ্যই তাতে সাধিত হতে পারে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রসিকপ্রিয়াতে রসিকচিত্তের আমন্ত্রণ রয়েছে। 'রামচন্দ্রিকা' কাব্যেও কেশব শিক্ষক রূপে আবির্ভূত। তাঁর উদ্দেশ্য অল্পমতি বিদ্যার্থীর কাব্যাভ্যাস করানো। রসিকপ্রিয়াতে ভগবদ্ভক্তি প্রধানতা লাভ করেছে। প্রথমে বর্ণ্যবস্তু বা তার সংজ্ঞা ও পরে অলংকার স্থাপন করেই কেশবদাস কর্তব্য

শেষ করতে চেয়েছেন। তাই এইসব গ্রন্থে মৌলিকতার পরিচয় নেই। 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে তিনি কাব্যাঙ্গ-সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাই হিন্দী সাহিত্যের প্রথম অলংকারবাদী কবি রূপে কেশবদাস চিহ্নিত হতে পারেন।[২] এক্ষেত্রে এক বিষয়ে তিনি সংস্কৃত কবিদের অতিক্রম করে গেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে অন্ত্যানুপ্রাসের নিতান্তই অভাব। সুতরাং তার কোনো বিচার বিবেচনাও নেই। কিন্তু হিন্দীতে প্রথমাবধি তা পাওয়া যায়। কেশবদাস তাঁর গ্রন্থে অনুপ্রাসের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। কেশবদাসের এই কৃতিত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

সে যাই হোক, পরবর্তীকালে কেশবের 'অলংকার'-বিবেচন-রীতি অনুসৃত হয় নি। কেশবদাস প্রদর্শিত পথে গেলেও পরবর্তী যোগ্যতর কবিরা 'চন্দ্রালোক' (জয়দেব) 'কুবলয়ানন্দ' (অপ্পয়দীক্ষিত) এবং 'কাব্যপ্রকাশ' (মম্মটভট্ট) ও 'সাহিত্যদর্পণের' (বিশ্বনাথ) অনুসরণে হিন্দী কাব্যরীতিগ্রন্থ রচনা করেছেন। এইভাবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অনুসৃতিতে হিন্দীকাব্য শাস্ত্র-নির্মিতির রাজপথ পাওয়া গেল। চিন্তামণি ত্রিপাঠীর 'কাব্যবিবেক', 'কবিকুলকল্পতরু' এবং 'কাব্যপ্রকাশ' এই তিন গ্রন্থ দিয়ে হিন্দী কাব্যগ্রন্থ ও কাব্যসাহিত্যের নবীন শাখার জয়যাত্রা শুরু হয়। এ-সব গ্রন্থে কাব্যের প্রত্যেকটি অঙ্গের স্বরূপ নির্দেশিত হয়েছে। ছন্দশাস্ত্রবিষয়ক একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। চিন্তামণি ত্রিপাঠীর গ্রন্থ রচনার পর যেন লক্ষণ-গ্রন্থের বান ডেকে যায়। কবিরা যেন স্থির নিয়ম করে নিলেন—প্রথম দোহায় অলংকার বা রসের পরিচয় দান, পরে তার উদাহরণ রূপে কবিত্ত বা সবৈয়া রচনা করতে হবে। হিন্দী সাহিত্যে এই প্রথাটি অভিনব। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যশাস্ত্র রচয়িতা বা শিক্ষাদাতা এবং বিভিন্ন কাব্যরূপের প্রয়োগকর্তা কবি মূলে দুই পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু হিন্দীতে দুই ব্যক্তির কাজ সম্পন্ন করতে লাগলেন একজনই। তার ফল যে খুব ভালো হয়েছে তা বলা যায় না। আচার্যের প্রকৃত আচার্যত্ব আর বজায় থাকল না। ফলে হিন্দীতে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ ও বিবেচনাশক্তির চর্চার সম্যক স্ফুরণ হল

না। একটি কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, স্বরূপ-নির্ধারণ প্রভৃতি কিছুই হত না। সম্যকভাবে এসব করাও সহজ ছিল না। কারণ, তখন গদ্যের প্রচলন ছিল না, পদ্যে তর্ক-বিতর্ক, যুক্তিখণ্ডন, নতুন-সূত্র নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য ছিল না, সম্ভবও ছিল না। সুতরাং একটি দোহায় লক্ষণ বিবৃত করে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করাই স্বাভাবিক ছিল। এই দৃষ্টিতে বিচার করে বলা যায়—লক্ষণ গ্রন্থ-রচয়িতা কবিরা প্রকৃতপক্ষে আচার্য ছিলেন না, ছিলেন কবি। তাঁদের প্রদত্ত সাহিত্যের লক্ষণ, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির পরিচয় এবং দৃষ্টান্ত বহুস্থলেই অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এবং নিম্নমানের। কাজেই তাতে প্রকৃত সাহিত্য শাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। 'শব্দশক্তি' নিয়ে আলোচনা হয়নি বললেই হয়। কাব্যের 'শ্রব্য' ও 'দৃশ্য' বিভাগ দুটি স্বীকৃত থাকলেও তা নিয়ে গভীর মনন ও বিশদ বিবেচন তেমন হয় নি।

হিন্দী অলংকারশাস্ত্র রচয়িতাগণ আশ্রয়দাতা অথবা সেই বর্গের ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কাব্য রচনায় ব্রতী হতেন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা শৃঙ্গার রসের আশ্রয় নিয়েছেন, অবলম্বন করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। আবার ব্যক্তি-মনোরঞ্জনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকায়, অতি সাধারণ অগভীর চাহিদা পূরণের জন্য কলম ধারণ করায় রচনার মান কখনো উন্নত হয় নি। উদ্দেশ্য-আবদ্ধ সীমিত গণ্ডির মধ্যে রীতিযুগের কাব্য বিশেষ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হলেও সেই সীমানার বাইরে তার তেমন গুরুত্ব ও শক্তিশালিতা দৃষ্ট হয় না। এযুগের কাব্যে প্রতিফলিত নারী চরিত্রে কোনো স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই, তারা যেন পর-ইচ্ছায় পরসুখকারী বিলাস সামগ্রী মাত্র। চিত্রিত প্রেম আদ্যন্ত মহত্ত্বহীন, তেজোহীন এবং স্থূল ব্যঞ্জনাময়। বাস্তব জীবনের জটিলতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই চোখে পড়ে না। তাই ভক্তির মোড়কে শৃঙ্গার ভাবনা পরিবেশিত।[৩] বলা চলে এ যুগের রীতিকাব্যগ্রন্থগুলি প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত হতে পারে—

১ সম্পূর্ণ কাব্যাঙ্গ বিচার-গ্রন্থ ২. রসনিরূপণ-গ্রন্থ ৩. নায়ক-নায়িকা-ভেদ বিষয়ক-গ্রন্থ ও ৪. অলংকার-গ্রন্থ।

প্রথম বর্গের গ্রন্থে কাব্য-লক্ষণ, শব্দ ও অর্থের শক্তি, কাব্যের দোষ-গুণ, রস, ভাব, অনুভাব প্রভৃতি সব অঙ্গেরই আলোচনার প্রয়াস লক্ষিত হয়। ভিখারীদাসের 'কাব্যনির্ণয়', এই জাতীয় গ্রন্থ। মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণ'— প্রভৃতির আদর্শে 'কাব্যনির্ণয়' রচিত।

রস বিচার-জাতীয় গ্রন্থে শৃঙ্গার রসের চর্চা প্রধান হলেও অন্য রস-প্রসঙ্গও এসে গেছে স্বাভাবিকভাবে। রসের আলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব-অনুভাব, স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব প্রভৃতির লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে এই শ্রেণীর গ্রন্থে। কেশবদাসের 'রসিকপ্রিয়া', তোষের 'সুধানিধি' কুলপতি রচিত 'রসরহস্য', সুখদেব মিশ্রের 'রসার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থে রসের বিচার বিধৃত। এই শ্রেণীর গ্রন্থের আকর ও উৎস ছিল ভানুদত্তের 'রস তরঙ্গিণী'। এসব গ্রন্থে যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য ছিল সে-কথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় বিভাগের গ্রন্থে শৃঙ্গার রসের আলম্বনের সূক্ষ্মভেদ-বৈষম্য দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হত। নায়িকা ও শৃঙ্গার রস বিষয়ক এই জাতীয় গ্রন্থ লোকপ্রিয়তায় অন্য তিন বিভাগের রচনাকে অতিক্রম করে যায়। চিন্তামণির 'শৃঙ্গার মঞ্জরী', দেবের 'সুখসাগর তরঙ্গ' এবং 'জাতিবিলাস' প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। এই সব গ্রন্থের লেখক প্রেরণা ও আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন— ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরীতে'ই।

চতুর্থ ও শেষ বর্গে রাখা যায়— সে যুগের হিন্দী অলংকার গ্রন্থগুলি। জয়দেবের 'চন্দ্রালোক' এবং অপ্পয় দীক্ষিত রচিত 'কুবলয়ানন্দ' এই শ্রেণীর জনপ্রিয় সংস্কৃত গ্রন্থ। মাঝে মধ্যে এই দুই গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কবি কর্নেসের 'শ্রুতি-ভূষণ' ও 'কর্ণাভরণ', মতিরামের 'ললিতললাম' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত অলংকার গ্রন্থ।

নায়ক-নায়িকাভেদ ছাড়াও সেযুগের কবিরা 'নখ-শিখ', (পায়ের নখ থেকে মাথার শিখা বা কেশ পর্যন্ত সর্বাঙ্গের বর্ণনা), ষড়ঋতুবর্ণন, এবং অষ্টযাম (রাধা বা কৃষ্ণের অষ্টপ্রহর যাপনের বিবরণ) নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এ-সব বিষয় নিয়ে তার পূর্বে আর কাব্য রচনা হয় নি। কবিরা নায়িকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন। ষড়ঋতুর বর্ণনার প্রথা প্রাচীন হলেও এ যুগের কবিরা শৃঙ্গার রসের উদ্দীপনের জন্য প্রকৃতির রূপকে কাজে লাগিয়েছেন। 'অষ্টযামে' রাধা ও কৃষ্ণের অষ্টপ্রহরের লীলার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মানবীয় প্রেমের আশ্রয়ে কবির ভক্তিভাবও বিধৃত।

রীতিযুগের কাব্যে প্রধানত ব্রজভাষারই প্রয়োগ হয়েছে। তবে অঞ্চলের বিস্তৃতি এবং কবিকুলের বহুসংখ্যকতার জন্য তাতে প্রতিবেশী অবধী প্রভৃতি একাধিক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, 'যাবনিমিশাল' ভাষারও প্রয়োগ করেছেন কবিরা। সব মিলিয়ে এই সময় নানাপ্রকার প্রয়োগ-পরীক্ষার দ্বারা ভাষা-অনুশীলনের সুন্দর সুযোগ ছিল। কিন্তু তার কোনো সুফল প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভাষার স্থৈর্য ও দৃঢ়তার জন্য অপরিহার্য ব্যাকরণ। কিন্তু সেই ব্যাকরণের ছিল নিতান্তই অভাব। সে অভাব পূরণের তেমন প্রয়াসও হয় নি। তবে কোনো কোনো কবির রচনায় ব্রজভাষার সুন্দর সার্থক নির্দোষ রূপও পাওয়া যায়। ভক্তিকালের প্রথম থেকেই হিন্দী সাহিত্যে আরবি-পারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। নামদেব, কবীর, তুলসী ও সূরের রচনায় তার প্রমাণ মেলে। রীতিকালেও এই ধারাটি অব্যাহত থাকে, এমন কি কিছুটা জোরও পায়। কবিত্ত, সবৈয়া ও দোহা এযুগের কবিদের প্রিয় ছন্দোবন্ধ।

আদিযুগ এবং মধ্যযুগের হিন্দীকাব্যে যে সব ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়— রীতিভেদে তাদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়— অক্ষরবৃত্ত বা ঘনাক্ষরী এবং মাত্রাবৃত্ত। তবে কোনো কোনো কবির রচনায় সবৈয়া এবং বর্ণবৃত্তের প্রয়োগও মেলে। বলাই বাহুল্য সবৈয়া বর্ণবৃত্ত রীতিরই একটি হিন্দী সংস্করণ।

রীতিযুগের প্রমুখ কবি

রীতিকালের প্রারম্ভিক আলোচনা থেকে রীতিকালের প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা সম্ভব আশা করি। এবার সেযুগের প্রধান প্রধান কবিদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

চিন্তামণি ত্রিপাঠী (১৬০৯)—কানপুরের তিকবাঁপুরের রত্নাকর ত্রিপাঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিন্তামণি। তাঁরা চার ভাই, চারজনই কবি। চিন্তামণি, ভূষণ, মতিরাম এবং জটাশংকর। তাঁদের প্রথম তিনজন হিন্দী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। চিন্তামণি সপ্তদশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশক থেকে লিখতে শুরু করেন। তাঁর 'কবিকুলকল্পতরু' (১৬৫০) গ্রন্থের জন্য তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই গ্রন্থ থেকেই পরবর্তীকালে 'রীতিকাব্য' রচনার ধারা বলিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্নভাবে লক্ষিত হয়। তাছাড়া চিন্তামণি 'কাব্যবিবেক', 'কাব্যবিচার', 'ছন্দবিচার' এবং 'রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'কবিকুলকল্পতরু' কাব্যপ্রকাশের আদর্শে রচিত। রুদ্রশাহ সোলাংকী, শাহজাহান এবং জৈনন্দী আমেদের কাছে চিন্তামণি সাদরে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে নিজেকে 'মণিমাল' বলেও উল্লেখ করেছেন। 'কবিত্ত' শব্দটিকে তিনি কাব্যের পর্যায়বাচী রূপে ব্যবহার করেছেন।[৪]

চিন্তামণি যে সব উদাহরণ দিয়েছেন তাতে তাঁর সত্যিকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তাঁর রচনা এমন সুন্দর, মধুর ও ভাষার অকৃত্রিম প্রবাহ এবং ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তা পড়ে অভিভূত হতে হয়। কিন্তু তা সর্বত্র সব রচনাতে অক্ষুণ্ণ থাকে নি। এখানে তাঁর সার্থক কবিত্বের পরিচায়ক দুটি অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

১. ওঢ়ে নীলসারী ঘনঘটাকারী 'চিন্তামণি'
কঞ্চুকী কিনারী চারু চপলা সুহাঙ্গী হৈ।

ইন্দ্রবধূ জুগনূ জওয়াহির কী জগী জ্যোতি
বগ মুকুতান মাল কৈসী ছবি ছাঈ হৈ ॥
লাল পীত, সেত বর বাদর বসন তন
বোলত সু ভৃঙ্গী ধুনি নূপুর বজাঈ হৈ।
দেখিবে কো মোহন নওয়ল নট-নাগর কো
বরসা নওয়েলী অলবেলী বনি আঈ হৈ ॥

—নট-নাগর মোহনের দর্শনের জন্য বর্ষা ঋতু যেন নব বধূ বেশে উপস্থিত হয়েছে। তার বিজলি-পেড়ে নীলাম্বরীতে ইন্দ্রধনু ও নক্ষত্রের জড়ি, বিচিত্র বর্ণের মেঘের বসন তার গায়ে, কখনও বা ভৃঙ্গীরব কখনও বা নূপুর-নিক্কণের আকর্ষণে তার আবাহন ভরপূর।

২. কোকিল কূক সুনৈ উমগৈ মন,
ঔর সু ভাউ ভয়ো অবহী কো।
ফূলী লতা দ্রুম-কুঞ্জ সুহাত,
লগে অলি গুঞ্জন ভাবত জীকো।
কারন কৌন ভয়ো সজনী,
য়হ খেল লগৈ গুড়িয়ান কো ফীকো।
কাহে তে সাঁওয়রো অঙ্গ ছবীলো,
লগৈ দিন দ্বৈক তেঁ নৈননি নীকো ॥

—কোকিলের কুহু রব শুনে মন উদ্‌বেল হয়ে পড়েছে। মনোভাব বদলে গেল। প্রফুল্লিত লতাকুঞ্জ মধুর লাগছে, অলি-গুঞ্জন আনন্দময় মনে হচ্ছে। প্রিয়ে এ কি হলো? পুতুল খেলা আর ভালো লাগছে না। প্রিয়তমের সুন্দর ছবি দুদিনের জন্য এমন ভালোই বা লাগছে কেন?

দেখা যাচ্ছে চিন্তামণি কবিত্ব ও আচার্যত্ব দুই ক্ষেত্রেই মহত্ত্বের অধিকারী। রীতিকাব্যধারার প্রথম বলিষ্ঠ কবি হওয়ায় আচার্য রাম-চন্দ্র শুক্ল তাঁকে এই ধারার প্রবর্তকের সম্মান দিতে চেয়েছেন। তাঁর

কাব্যে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের আলোচনা স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল। আবার তাঁর হৃদয়ানুভূতির কাব্যময় প্রকাশও বহুলাংশে মধুর ও সুন্দর।

মহারাজ জসবন্ত সিংহ (১৬২৬-১৬৮১)—মেওয়ারের মহারাজ গজ-সিংহের দ্বিতীয় পুত্র জসবন্ত সিংহ শাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি যেমন সাহসী ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞ কবিও ছিলেন। তাঁর সময়ে রাজ্যে বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রাজসভায় ভালো কবিদের সমাদর ছিল। তিনি নিজে লিখতেন এবং অপরকেও লিখতে প্রণোদিত করতেন। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে জসবন্ত সিংহ কিছুদিন গুজরাটের সুবাদার ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। কাবুলে যুদ্ধের সময় তিনি মারা যান।

হিন্দী সাহিত্যের রীতিযুগের প্রধান আচার্যদের অন্যতম জসবন্ত-সিংহ যত বড়ো আচার্য ততবড়ো কবি ছিলেন না। তাঁর 'ভাষাভূষণ' গ্রন্থ ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সাহিত্যানুরাগী পাঠক ও বিদ্যার্থীদের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এগ্রন্থে লেখকের আচার্য-রূপটি সুপরিস্ফুট। গ্রন্থটি জয়দেবের 'চন্দ্রালোক'-এর অনুসরণে রচিত। মূল গ্রন্থের মতোই একই দোহায় লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত বর্ণিত। তাঁর তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হল— 'অপরোক্ষসিদ্ধান্ত', 'অনুভবপ্রকাশ', 'আনন্দবিলাস' 'সিদ্ধান্ত-বোধ', 'সিদ্ধান্তসার' এবং 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'। সব গ্রন্থই কাব্যে রচিত। তাতে ভাষায় দখল ও পদ্য রচনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় মেলে। তবু বলতে পারা যায়— রীতিযুগের গ্রন্থকারগণ মূলত কবি এবং গৌণত আচার্য— একমাত্র জসবন্ত সিংহ তার ব্যতিক্রম। তিনিই একমাত্র আচার্য। হিন্দী সাহিত্যরসিক ও হিন্দী সাহিত্যের ছাত্রের কাছে আচার্যরূপেই তিনি পরিচিত এবং সম্মানিত।

বিহারীলাল চতুর্বেদী (১৬০৩-১৬৬৪)—গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী বসবা গোবিন্দপুর গ্রামে মাথুর চৌবে বংশে বিহারীলাল জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর শৈশব বুন্দেলখণ্ডে এবং তারুণ্য মথুরায় কাটে। জয়-পুরের রাজা জয়সিংহের সভায় বিহারীলালের বিশেষ সম্মান ছিল। প্রবাদ আছে— রাজা জয়সিংহ তরুণী রানীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে পড়ে থাকতেন। রাজকার্য দেখতেন না। তাতে সবাই খুবই উদ্‌বিগ্নবোধ করতেন, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চিন্তায় ও নিরাশায় সকলের দিন কাটছিল। সেই সময় বিহারীলাল একটি দোহা লিখে কোনোক্রমে মহারাজের কাছে পাঠাতে সক্ষম হন। দু-পংক্তির সেই দোহাটি এই—

নহিঁ পরাগ নহিঁ মধুর মধু, নহিঁ বিকাস য়হিকাল।
অলী কলীহী সোঁ বঁধ্যো, আগে কৌন হওয়াল।

অর্থাৎ—নেই পরাগ নেই মধুর মধু, বিকাসই ঘটেনি আজো যার—
অলি কলিতেই পড়ল বাঁধা, পরের কথা কি আর।

রাজা দোহাটি পড়লেন। তাতেই কাজ হল। অসম্ভব সম্ভব হল। রাজার চোখ খুলল। তিনি রাজকার্যে মন দিলেন। কবির এই কান্তাসম্মিত উপদেশে রাজ্য রক্ষা পেল। রাজা কবিকে একটি মোহর উপহার দিলেন এবং প্রতিদিন এইরূপ একটি দোহার জন্য একটি করে মোহর দিতে অঙ্গীকার করলেন। এইভাবে বিহারী সাতশ দোহা লিখলেন—যা 'বিহারী সতসঈ' নামে পরিচিত। 'সতসঈ' শব্দটি সপ্তশতী থেকে এসেছে। 'অমরু শতক', 'গাথা সপ্তশতী' ও 'আর্যাসপ্তশতী' প্রভৃতির নাম ও আদর্শ অল্পবিস্তর 'বিহারীসতসঈ'র সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তবে বিষয়বস্তু ও প্রকাশ ভঙ্গির পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট।

বিহারী কোনো লক্ষণ গ্রন্থ না লিখলেও শৃঙ্গার বিষয়ক সকল-প্রকার বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দৃষ্টান্ত আছে 'সতসঈ'তে। লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দশক্তিরও উদাহরণ মেলে। দোহার ক্ষুদ্র আকৃতিতেই কবির সূক্ষ্ম নিরীক্ষণশক্তি এবং অনন্য প্রতিভার পরিচয় বিধৃত। ক্ষুদ্র অথচ মনোহর ছবি-চিত্রণ, ভাষার লালিত্য এবং অলংকার নিঃসৃত মধুর ধ্বনির ঝংকার ও সূক্ষ্ম-ভাবব্যঞ্জনা বিহারীর

দোহাকে হীরকখণ্ডের স্থায় মূল্যবান করে তুলেছে। বিহারী সে যুগের একজন সুশিক্ষিত, বিচক্ষণ ও বহুজ্ঞ স্রষ্টা-ব্যক্তি। তাঁর রচনায়, কাব্যরূপ ব্যাখ্যাত, দোহার সঙ্গে প্রেম, শৃঙ্গার, জ্যোতিষ, রাজনীতি, আয়ুর্বেদ দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের বিস্ময়কর উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্যোতিষ ও রাজনীতি বিষয়ক দুটি পংক্তি—

> দু সহ দুরাজ প্রজানু কৌ ক্যোঁ ন বঢ়ে দুখ-দন্দু।
> অধিক অঁধেরৌ জগ করত, মিলি মাওস রবি-চন্দ॥

—দুই কর্তার অধীনতা সর্বদা দুঃখকর হয়। একটি কাজের জন্য এক ব্যক্তির উত্তর-দায়িত্বই কাম্য। অমাবস্যার দিনে সূর্য ও চন্দ্র এক রাশিতে এলে অন্ধকার বেড়ে যায়। আর এই অংশটির শৃঙ্গারিক অর্থ হল— বয়ঃসন্ধিকালে শৈশব ও যৌবনের প্রভাব পীড়াদায়ক মনে হয়।

জ্বরে সুদর্শন চূর্ণ দেওয়া হয়। বিরহ-তাপে উৎপীড়িতা নায়িকাকে কবি অতি সুন্দরভাবে শ্লেষের সাহায্যে সুদর্শন দেওয়ার বিনীত প্রার্থনা করেছেন।—

> য়হ বিন সতু নগু রাখিকৈ, জগৎ বড়ৌ জসু লেহু।
> জরী বিষম জ্বর জাই য়েঁ আই সুদর্শন দেহু॥

জলের উপরিতলের সমতা ও নিম্নগামিতা এবং বলের উপর শক্তি প্রয়োগে তার লাফানোর প্রসঙ্গও বিহারীলাল বর্ণনা করেছেন।—

> কোটি জতন কোউ করৈ, পরৈ ন প্রকৃতি হিঁ বীচ।
> নল বল জল উঁচৌ চঢ়ে, অন্ত-নীচ কৌ নীচ॥···
> নীচ হিয়ে হুলসে রহৈঁ, গহেঁ গেঁদ কে পোত।
> জ্যেঁা জ্যেঁা মাথে মারিয়ত, ত্যৌ-ত্যোঁ উঁচে হোত॥

বিহারী মূলত শৃঙ্গার রসের কবি। শৃঙ্গারের মিলন ও বিরহ দুই অবস্থাই তিনি চিত্রিত করেছেন। বিরহ অপেক্ষা মিলনের অনুভূতি চিত্রণেই বিহারীর স্বকীয়তা সমধিক ফুটে উঠেছে। বিরহের মাঝে মাঝে

অত্যুক্তি দোষ ঘটেছে। তবে মিলন বা সংযোগ চিত্রণে তিনি যে সজীবতা ও জীবনের ক্রীড়াময়তা এনেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। নায়ক-নায়িকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য চিত্রণে, সৌন্দর্য-দর্শন ও প্রদর্শনের জন্য চোখের নিরুপায় অবস্থা বর্ণনা করে তিনি সৌন্দর্যের আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে ঔচিত্যের সীমা তিনি অতিক্রম করেছেন। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কবিতায় কিছুটা অভিনব স্বাদ দিতে চেয়েছেন।

তাই শৃঙ্গাররসের কবিরূপে যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বিহারীলাল লাভ করেছেন তা অন্য কোনো হিন্দী কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিহারী-'সতসঈ'র প্রায় ৫৮টি টীকাকাব্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ক্ষুদ্রাবয়ব দোহার ভাবের বিস্তারকল্পে অনেক কবি ছপ্পয়, কুণ্ডলিয়া, সবৈয়া প্রভৃতি বৃহত্তর বন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন। কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫), তাঁদের অন্যতম। কবি অম্বিকাদত্ত ব্যাস রোলাছন্দে 'বিহারী-বিহার' রচনা করেছেন। পণ্ডিত পরমানন্দ 'শৃঙ্গার সপ্তশতী' নামে দোহাগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করেছেন। উর্দুর 'শেরে' (শায়রে) ও দোহাগুলি রূপান্তরিত 'গুলদস্তয়ে বিহারী' নামে। অনুবাদক মুন্সী দেবীপ্রসাদ প্রীতম। এইভাবে বিহারী যেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। এ থেকেই বিহারীর জনপ্রিয়তার অনুমান করা চলে।

বিহারীর রচনার মধ্যে কবিত্বশক্তি, কল্পনার সংহতি, সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি, পরিমিত অভিব্যক্তি-কৌশল এবং ভাষা ও ছন্দের প্রশংসনীয় 'সম্‌তোলন' বা সন্তুলন লক্ষিত হয়। এই সূক্ষ্মভাব এবং সূক্ষ্মতর শিল্পবোধই বিহারীকে অমরত্ব দান করেছে। এই অসাধারণ শক্তির জোরেই তিনি বিন্দুতে সিন্ধু প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই কোনো কবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন—

সতসৈয়া কে দোহরে, জ্যোঁ নাবক কে তীর।
দেখত মেঁ ছোটে লগেঁ, ঘাব করেঁ গম্ভীর॥

অর্থাৎ 'সতসঈ'র দোহা যেন হূলে গড়া তীর।
দেখতে খুবই ছোটো কিন্তু বেঁধে সুগভীর॥

বিহারীর রচনা থেকে রসব্যঞ্জনার নৈপুণ্য, উক্তি কৌশল, কল্পনার মাধুর্য এবং অনুভাব-বিভাবের সুন্দর সমন্বয়জাত চিত্রধর্মী কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করছি। যা অন্য কোনো কবির শৃঙ্গার রসের কবিতায় দুর্লভ—

বতরস লালচ লালকী, মুরলী ধরী লুকাই।
সৌঁহ করৈ, ভৌঁহনি হঁসৈ, দেন কহৈ, নটি জাই॥
নাসা মোরি, নচাই দৃগ, করী ককা কী সৌঁহ।
কাঁটে সী কসকৈ হিয়ে, গড়ী কঁটীলী ভৌঁহ॥
ললন চলন সুনি পলন মেঁ অসুঁআ ঝলকে আই।
ভঈ লখাই ন সখিহ্ন হূ, ঝূঠৈ হী জমুহাই॥

—রাধা কৃষ্ণকে যে কতরকমে জ্বালিয়ে আনন্দ পেতে চান তার ঠিক নেই। বাঁশিটি লুকিয়ে নিলেন, না নেবার শপথ করছেন, ভ্রূ-কুটি করে হাসছেন, দেবেন বলে, দিচ্ছেন না। নাক সিঁটকে, চোখ নাচিয়ে কাকার দিব্যি করলেন। তীক্ষ্ণ ভ্রূ হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধে যন্ত্রণা দিতে লাগল। আবার কৃষ্ণের যাবার শব্দ শুনে চোখে জল এসে গেল, কিন্তু সখীদের বুঝতে দিলেন না— মিছিমিছি হাই তুলতে লাগলেন।

শৃঙ্গারের সঞ্চারী ভাবের ব্যঞ্জনা কেমন মর্মস্পর্শী হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত—

সঘন কুঞ্জ, ছায়া সুখদ, সীতল মন্দসমীর।
মন হ্বৈ জাত অজৌ ওয়হৈঁ, ওয়া জমুনা কে তীর॥
—সঘন কুঞ্জে সুখদ ছায়ায় শীতল মন্দ সমীরে—
মন হয়ে যায় আজো রঙিন, যেন যমুনার সুতীরে।

বিহারী নীতি-শিক্ষাপ্রদ দোহাও অনেক লিখেছেন। তার মাত্র কয়েকটিই কাব্য শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। যেমন—

কনক কনক তে সৌগুনী, মাদকতা অধিকায়।
উহি খায়ে বৌরায় জগ, ইহি পায়ে বৌরায়॥
—কনকে কনকের চেয়ে শতগুণ মাদকতাই মেলে।
জগৎ পাগল একটি খেলে, অন্যটিকে পেলে।

বিহারীর কাব্যের বাহন চলিত ব্রজভাষা। তবে তা সুন্দর সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে। বাক্য গঠন সুব্যবস্থিত শব্দের রূপ ও নির্দিষ্ট হয়েছে নিয়মানুযায়ী। মুখ্যত শৃঙ্গার রসের কবি হলেও, 'বিহারী-সতসঈ' লক্ষণ বা রীতিগ্রন্থ না হলেও তাতে 'নখশিখ' 'নায়িকাভেদ', ষড়ঋতুর বর্ণনা প্রভৃতির পর্যায়ে বিহারীর দোহাগুলিকে সাজানো যায়। কয়েকজন ভাষ্যকার তা করেছেনও। এইসব দোহা রচনাকালে বিহারীলালের লক্ষ্য যে সাহিত্যিক লক্ষণের দিকে ছিল— তা অনুমান করা যায়। তাই স্বতন্ত্রভাবে কোনো রীতিগ্রন্থ রচনা না করলেও বিহারী-লালকে রীতিকালের প্রমুখ কবিদের মধ্যে গণ্য করা যায়। সূক্ষ্ম-শিল্পগত কারণে বিহারীর রচনা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সৌন্দর্য কাব্যশিল্পের বহিরঙ্গ বস্তু। যে সূক্ষ্ম-শিল্পবোধ হৃদয়ের গভীর অনুভূতির স্বচ্ছ-নির্মল প্রবাহ মানুষের মনকে রসস্নান বা অবগাহন করায় বিহারীর রচনায় গভীরভাবে দেখলে তার অভাব অনুভূত হয়। তাই বিহারীলালের রচনা পাঠক মনে সাময়িক আনন্দদানে যতটা সক্ষম, স্থায়ী আনন্দদানে সেরূপ নয়। তাছাড়া বিহারীর শৃঙ্গার রস প্রেমের উচ্চ আদর্শভূমিতে প্রতিস্থাপিত নয়, তাই প্রেমের সুগভীর, সূক্ষ্ম-মহৎ অনুভূতি জাগাতে অক্ষম। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের হিন্দী সাহিত্যে বিহারীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয়।

মতিরাম ত্রিপাঠী (১৬০৩-১৬৯৩?)—রীতিকালের প্রধান কবিদের অন্যতম মতিরাম চিন্তামণি ও ভূষণের ভ্রাতা ছিলেন। কান-পুরের তিকবাঁপুরে তাঁর জন্ম হয়। মতিরাম দীর্ঘদিন বুঁদির অধিপতি মহারাজ ভাবসিংহের দরবারে ছিলেন। তাঁর আশ্রয়ে তিনি 'ললিত-ললাম' নামক অলংকার গ্রন্থটি রচনা করেন। তাছাড়াও তিনি

'রসরাজ', 'ছন্দসাগর', 'সাহিত্য-সার' এবং 'লক্ষণশৃঙ্গার' গ্রন্থ এবং 'বিহারী সতসঈ'র মতো 'মতিরাম সতসঈ' রচনা করেন।

ভাষার সরলতা এবং ভাবের সুগমতাই মতিরামের রচনার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাবে-ভাষায় কোথাও কৃত্রিমতা নেই, শব্দাড়ম্বর নেই, সবই যেন সুপ্রযুক্ত। সে যুগে এমন স্বচ্ছ-সাবলীল এবং প্রাঞ্জল ভাষা দুর্লভ ছিল। যথার্থ কবিহৃদয়ের অধিকারী মতিরাম ধরাবাঁধা নিয়মে চলার ফলে তাঁর স্বাভাবিক কবিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব হতে পারে নি। তা সত্ত্বেও জীবনের যে সকল মর্মস্পর্শী চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন, তাতেই তিনি সুকবির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

'রসরাজ' এবং 'ললিত-ললাম' গ্রন্থ দুটিতে মতিরামের আচার্যত্ব বেশ সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। হিন্দী সাহিত্যের রস ও অলংকার শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থ দুটি এক সময় অপরিহার্য ছিল। সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা এমন রমণীয়, উপাদেয়, সরস ও প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে যে, তা সকল শ্রেণীর পাঠকের মন ও রুচি সহজে আকৃষ্ট করে। ভাবের সুমধুর প্রকাশেও মতিরাম অদ্বিতীয়।—

কুন্দন কৌ রঙ্গ ফীকৌ লগৈ ঝলকৈ অতি অঙ্গন চারু গোরাঈ।
আঁখিন মেঁ অলসানি চিতৌনি মেঁ মঞ্জু বিলাসন কী সরসাঈ॥
কো বিন মোল বিকাত নহীঁ মতিরাম লহৈ মুসুকানি মিঠাঈ।
জ্যোঁ-জ্যোঁ নিহারিয়ে নেরে হৈব নৈননি,
তৌঁ্য-তৌঁ্য খরী নিকরৈ-সী নিকাঈ॥

—কুন্দ ফুলের রং সুন্দরীর গৌরবর্ণের কাছে ফিকে মনে হচ্ছে। তার চোখের অলস চাহনিতে সুন্দর বিলোল সরসতা। তার এমন মধুর স্মিতহাস্যে কে আ-কেনা থাকতে পারে? যত কাছ থেকে চোখ মেলে দেখছি— ততই তার সৌন্দর্য উথলে পড়ছে।

দেখা যাচ্ছে— রীতিগ্রন্থ লিখেও মতিরাম উপভোগ্য কাব্যরস সৃজন করেছেন।

কবি কুলভূষণ (১৬১৩-১৭১৫)—চিন্তামণি ও মতিরামের ভ্রাতা 'ভূষণ' রীতিযুগের কবি হয়েও বীর রসের কাব্য লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল জানা যায় না। চিত্রকূটের সোলাঙ্কী রাজা রুদ্রদেব তাঁকে 'কবি-কুলভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর তিনি 'ভূষণ' নামেই খ্যাত হন। পান্নার শাসনকর্তা মহারাজ ছত্রসালের রাজসভাতেও ভূষণ বেশ কিছুদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু স্থৈর্য লাভ করতে পারেন নি। ভাগ্যান্বেষণে বহুস্থানে পরিভ্রমণ করে শেষে মহারাজ শিবাজীর দরবারে উপস্থিত হন। শিবাজীর আশ্রয়ে তিনি সুস্থিতি লাভ করেন।

কবির রচনায় আশ্রয়দাতার প্রশস্তি থাকা খুবই সাধারণ এবং স্বাভাবিক কথা। কিন্তু শিবাজী ও ছত্রসালের মতো অন্যায়দমনকারী এবং হিন্দু ধর্ম ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-রক্ষকের সম্পর্কে যত কিছুই বলা হোক সামান্যই মনে হবে। অন্তত সে যুগের বিচারে। তাঁদের বীরোচিত প্রয়াস ও সফলতার পরিবেশে থেকে ভূষণ তাঁর রচনায় বীর রসের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন ; সাধারণ মানুষের মনে দেশপ্রেমের জোয়ার এনে দিতে পেরেছিলেন। তাই সাধারণ পাঠকের মনে ভূষণের আসন স্থায়ী হয়ে উঠেছিল। ভারত ইতিহাসের দুই বীর নেতার আশ্রয় এবং উৎসাহ পেয়ে ভূষণের কবিত্বের বিকাশ, প্রচার এবং স্থায়িত্ব সহজ হয়েছিল। অপর দিকে ওই দুই দেশপ্রেমিকের কার্য-কলাপ, চরিত্র এবং মহত্ত্ব ভূষণের কবিত্বের স্পর্শলাভে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

ভূষণের 'শিবরাজভূষণ', 'শিবাবাওয়নী', 'ছত্রসালদশক'-গ্রন্থ তিনটি বীর-রসাত্মক কাব্যরূপে প্রসিদ্ধ। তা ছাড়াও তিনি 'ভূষণউল্লাস' 'ভূষণ-হজারা', 'দূষণ-উল্লাস' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর প্রধান দুটি কৃতি অলংকার গ্রন্থ রূপে পরিকল্পিত হলেও সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ভাষা ও উদাহরণ দুই অস্পষ্ট। বীরত্বের ব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কবি ভাষা ও শব্দের প্রতি সুবিচাব করতে পারেন নি। কিন্তু যেখানে তিনি এই দোষ থেকে মুক্ত হতে

পেয়েছেন, সেখানে তাঁর ব্রজভাষা ভাবে ও শিল্পে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। যেমন—

১ ছূটত কমান ঔর তীর গোলী বানন কে
মুসকিল হোত সুরচানহূ কী ওটমেঁ।
তাহী সমৈ সিবরাজ হাঁকি মারি হল্লা কিয়ো,
দাওয়া বাঁধি পরা হল্লা বীরভট জোট মেঁ॥
ভূষণ ভনত তেরী হিম্মত কহাঁ লৌ কহেঁ।,
কিম্মত যহাঁ লগি হৈ জাকী ঝট ঝোট মেঁ।
তাওয় দৈ দৈ মূঁছন কঁগূরন পৈ পাঁও দৈ দৈ,
অরি মুখ ঘাব দৈ দৈ, কূদি পরে কোট মেঁ॥

—কামান, গুলি ও তীরের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সুরচানের (সুলতানের) পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা কঠিন হল। সময় বুঝে শিবরাজ চিৎকারে চারিদিক কাঁপিয়ে দারুণ দাপটে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুই বীরে যুদ্ধ শুরু হল। সাহসের কথা কি আর বলে শেষ করা যায়! সুলতানের ভাগ্যই এখানে জড়িয়ে পড়েছে। গোঁফে তা এবং দুর্গের পাঁচিলে পা দিয়ে দিয়ে শিবরাজ-সৈন্য শত্রুর মুখে আঘাত হেনে দুর্গে লাফিয়ে পড়ল।

২. চকিত চকত্তা চৌঁকি উঠৈ বার বার,
দিল্লী দহসতি চিতৈ চাহি করষতি হৈ।
বিলখি বদন বিলখত বিজৈপুর পতি,
ফিরত ফিরঙ্গিন কী নারী ফরকতি হৈ॥
থর থর কাঁপত কুতুব সাহি গোলকুণ্ডা,
হহরি হবস ভূপ ভীর ভরকতি হৈ।
রাজা সিবরাজ কে নগারন কী ধাক সুনি,
কেতে বাদসাহন কী ছাতী ধরকতি হৈ॥

—রাজা শিবরাজের নাকাড়ার ধ্বনি শুনেই কত বাদশাহের বুক ধড়্ফড়্ করে ওঠে; দিল্লীর সিংহাসন বার বার কেঁপে ওঠে, বিজাপুরের

অধিপতি কান্নায় ভেঙে পড়েন, ফিরিঙ্গিদের নাড়ি ধুক্ ধুক্ করতে থাকে, গোলকুণ্ডার কুতুবুদ্দীনশাহ থরথর করে কাঁপতে থাকেন—ত্রাসে আর ভয়ে অন্যান্য রাজাদের তো ঠিক ঠিকানাই থাকে না।

দেখা যাচ্ছে ভূষণের রচনা বীর রসের চমৎকার প্রবাহ, দর্প, আতঙ্ক এবং ওজস্বী চিত্রে পূর্ণ। ভূষণ হিন্দী সাহিত্যের আদিকাল ও মধ্য-কালের বীর রসের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও গৌরবের অধিকারী। বীর রসের কবিদের 'ভূষণ' রূপে তাঁকে গণ্য করা চলে।

কুলপতি মিশ্র (কবিতা রচনাকাল ১৬৭০-১৬৮৬)—আগ্রার পরশুরাম মিশ্রের পুত্র ও প্রখ্যাত কবি বিহারীলালের ভাগ্নেয় কুলপতি মিশ্র জয়পুরের রাজা রামসিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি 'রসরহস্য' (১৬৭০), 'দ্রোণপর্ব' (১৬৮০), 'মুক্তিতরঙ্গিনী' (১৬৮৬), 'নখশিখ' ও 'সংগ্রামসার' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'রসরহস্য'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। সংস্কৃতজ্ঞ মিশ্রজী মম্মটের কাব্য-প্রকাশের অনুসরণে 'রসরহস্য' রচনা করেন। এ গ্রন্থে তাঁর সাহিত্য—শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

যুক্তি-তর্কের অবতারণায় কুলপতি মিশ্র মাঝে মাঝে গদ্যের ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তখনকার অপরিণত গদ্যের ব্যবহারে ক্লিষ্ট ও দুরূহ ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে বইটি প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। শব্দ-শক্তি এবং ভাব নিরূপণে কাব্য-প্রকাশের সাহায্য নিলেও রাজা রামসিংহের প্রশংসায় স্বরচিত দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানে স্থানে তাঁর রচনা বেশ স্বাভাবিক এবং সুন্দর হয়েছে।

হিন্দী সাহিত্যে কুলপতি মিশ্রের পরিচয় কবিরূপে নয়, সাহিত্য-শাস্ত্রী রূপেই সমধিক।

দেবদত্ত (১৬৭৩-১৭৬৭)—উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ কুলের সন্তান দেবদত্ত 'দেব' উপনামে কাব্যরচনা করতেন। 'দেব' নামেই তিনি

পরিচিত। দেবদত্ত সারা জীবন মনোমত আশ্রয়দাতার খোঁজে বিভিন্ন স্থানে নানা জনের কাছে গেছেন কিন্তু স্থিতিলাভ করতে পারেন নি। তাই সাময়িক হলেও আশ্রয়দাত্রাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁকে বহু গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে। গ্রন্থগুলি সবই যে উচ্চমানের বা তাঁর কল্পনা ও ভাবের উপযোগী হয়েছে তা বলা যায় না। অনেক সময় তিনি পূর্বরচিত গ্রন্থেরই কিছু ফের-বদল করে নতুন নাম দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। এইভাবে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা বাহাত্তর থেকে আশিতে গিয়ে পৌঁছেছে। এই প্রতিভাশালী রসিক ও ভাবুক কবির কয়েকটি গ্রন্থের নাম— 'ভাববিলাস', 'অষ্টযাম', 'ভবানীবিলাস' 'সুজান-বিনোদ', 'প্রেমতরঙ্গ', 'রাগরত্নাকর', 'কুশলবিলাস', 'দেবচরিত্র', 'প্রেমচন্দ্রিকা', 'জাতিবিলাস', 'রসবিলাস', 'কাব্যরসায়ন' (শব্দ রসায়ন), 'সুখসাগর তরঙ্গ', 'বৃক্ষবিলাস', 'পাবসবিলাস', 'ব্রহ্মদর্শন পচীসী', 'তত্ত্বদর্শনপচীসী', 'আত্মদর্শনপচীসী', 'জগদ্দর্শনপচীসী', 'রসানন্দলহরী', 'প্রেমদীপিকা', 'সুমিলবিনোদ', 'রাধিকাবিলাস', 'নীতিশতক' এবং 'নখশিখ প্রেমদর্শন'। এই পঁচিশটি গ্রন্থের মধ্যে দেবের রীতিকবি-চিত্ততার প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'ভোগীলাল' নামক জনৈক আশ্রয়দাতার বিনোদনের উদ্দেশ্যে রচনা করেন নায়ক-নায়িকা-ভেদ বিষয়ক গ্রন্থ 'রসবিলাস' (১৭২৬)। ভবানী দত্ত নামে পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় রসগ্রন্থ 'ভবানী-বিলাস' (১৬৯৩), দেবের মতে শৃঙ্গারই একমাত্র 'রস', নব-রসের প্রসঙ্গ ভ্রান্তিজনিত।[৫] কুশলসিংহের উদ্দেশ্যে রচিত হয় 'কুশলবিলাস' (১৭০৩)। ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের আশ্রয়ে তিনি 'অষ্টযাম' (১৬৮৯) এবং ভাববিলাস (১৬৮৯) রচনা করেন। আজমশাহ হিন্দীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। অষ্টযামে নায়ক-নায়িকার অষ্টপ্রহরের বিলাসসূচীর পরিচয় রয়েছে। এটি পুরোপুরি লৌকিক শৃঙ্গার কাব্য-রূপে মান্য হতে পারে। ভাববিলাসে শৃঙ্গার রসের অঙ্গ-উপাঙ্গের বর্ণনা রয়েছে। জাতিবিলাসে (১৭২৩) কবি তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার

পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কাব্যরসায়ন (১৭৮৬) অলংকার গ্রন্থরূপে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। সাধারণভাবে ভবানীবিলাস, কুশলবিলাস, প্রেমতরঙ্গ, রসবিলাস, সুজনবিনোদ ও সুখসাগর— নায়ক-নায়িকাভেদ বিষয়ক গ্রন্থ। কাব্যের বিভিন্ন রূপ, নবরস, রীতি, গুণ, বৃত্তি, অলংকার এবং ছন্দ বিষয়ক বিচার-বিবেচনার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শব্দরসায়ন। জগদ্দর্শনপচীসী, আত্মদর্শনপচীসী এবং তত্ত্বদর্শনপচীসীতে বৈরাগ্য-ভাবনার পরিচয় সুস্পষ্ট।

গ্রন্থের বিষয় ও আলোচনার ভঙ্গিতে 'দেব' সাহিত্য-শাস্ত্রের আচার্যরূপেই প্রতিভাত হন, কিন্তু এক্ষেত্রেও পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভায় কবিত্ব শক্তি বা স্বকীয়তার আভাস ছিল। কিন্তু তারও সম্যক বিকাশ ঘটতে পারে নি। কারণ পরের মনোরঞ্জনের জন্য কবিকে অগভীর ভাব এবং ধ্বনিমোহ বা শব্দালংকারের আকর্ষণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে তাঁর প্রযুক্ত শব্দাড়ম্বর অর্থহীন প্রলাপের মতো মনে হয়। কিন্তু যেখানে তাঁর রুচি ভাবে ও ভাষায় সমন্বয় আনতে পেরেছে— সেখানে রচনা সরস স্নিগ্ধ প্রবাহে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

দেব কবির কাব্যের প্রধান বিষয় শৃঙ্গার। তত্ত্বাদিবিষয়ক গ্রন্থাদিতেও প্রেম বা শৃঙ্গারই মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রেমের আবেগে কবির রসচেতনা সুপরিস্ফুট। এই রসচেতনা কল্পনার বৈভবমণ্ডিত হয়ে, ক্ষেত্র বিশেষে এত সূক্ষ্ম, সুন্দর এবং সার্থক হয়ে উঠেছে যে, কাব্যচিত্র অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। সজীব চিত্রণ এবং ভাবাভি-ব্যক্তিতে দেবকবি বেশ সতর্ক ছিলেন। বিষয়ের অনুরূপ শব্দচয়ন, শব্দনির্মাণ এমন কি বিপর্যয়সাধন প্রভৃতি কাজে দেব অদ্বিতীয় ছিলেন। ভাবাত্মক শব্দ-ব্যবহারেও তিনি নিপুণ ছিলেন। ব্রজভাষায় কবিতা লিখে তিনি তার বিচিত্র শক্তি ও রূপকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধি ও হৃদয়ের সুন্দর সমন্বয় মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যে। দেবের রচনা থেকে দুইটি দৃষ্টান্ত—

১. ঝহরি ঝহরি ঝীনী বূঁদ হৈঁ পরতি মানোঁ,
ঘহরি ঘহরি ঘটা ঘেরী হৈ গগন মেঁ।
আনি কহ্যো স্যাম মো সৌ 'চলৌ ঝূলিবে কোঁ আজ'
ফূলী ন সমাতী ভঈ ঐসী হৌঁ মগন মৈঁ॥
চাহত উঠ্যোঈ উঠি গঈ সো নিগোড়ী নীদঁ,
সোয় গয়ে ভাগ মেরে জানি ওয় জগন মেঁ।
আঁখ খোলি দেখৌঁ তৌঁন ঘন হৈঁ, ন ঘনশ্যাম
বেঈ ছাঈ বূঁদৈঁ মেরে আঁসূ হ্বৈ দৃগন মেঁ॥

—আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ঝরছে। শ্যাম এসে বললেন— চলো আজ ঝুলতে (দোল খেতে) যাই। আমার আনন্দ আর ধরে না। উঠতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। আর ভাগ্যের দোষে সে শুভ মুহূর্তটি কোথায় উবে গেল। চোখ খুলে দেখি 'ঘনও নেই, ঘনশ্যাম'ও নেই। শুধু আমার চোখে অশ্রুধারা ঝরছে।

২. পীত রঙ্গ সারী গোরে অঙ্গ মিলি গঈ 'দেব',
শ্রীফল-উরোজ-আভা আভা সৈ অধিক সী।
ছুটী অলকনি ছলকনি জলবূঁদন কী
বিনা বেঁদী বন্দন বদন সোভা বিকসী॥
তজি তজি কুঞ্জ পুঞ্জ উপর মধুপগুঞ্জ
গুঞ্জরত মঞ্জুরব বোলে বাল পিক-সী।
নীবী উকসাই নেকু, নয়ন হঁসায় হঁসি,
সসিমুখী সকুচি সরোবর তৈঁ নিকসী॥

—এখানে কবি সরোবরে স্নানান্তে এক রূপসীর অপরূপ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। পীতবর্ণের শাড়ি যেন তার গৌরবর্ণের সঙ্গে মিশে গেছে, আলোর চেয়েও ভাস্বর 'শ্রীফল-উরোজ', এলোচুল থেকে জলবিন্দু ছিটকে-ছিটকে পড়ছে, কেয়ুর-কুমকুম ছাড়াই সুন্দর বদন-শোভা বিকশিত হয়ে উঠল, দলে দলে ভ্রমর কুঞ্জবন ছেড়ে সেই সুষমায় আকৃষ্ট হয়ে এসে পাক খেতে লাগল, কোকিল-শাবকের গুঞ্জরন শোনা

যেতে লাগল ; খোলা-নীবী, নয়নে সুন্দর হাসি নিয়ে শশিমুখী স্মিত হাস্যে সসংকোচে সরোবর থেকে বেরিয়ে এলো।

ভিখারীদাস (কবিতা রচনাকাল ১৭২৮-১৭৫০)—উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ের নিকট 'টেঁ্যাগা' গ্রামে শ্রীবাস্তব কায়স্থ পরিবারে ভিখারীদাসের জন্ম হয়। পিতা কৃপাল দাস। ভিখারীদাস কাব্য-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'নামপ্রকাশ-কোষ' (১৭৩৮), 'রসসারাংশ' (১৭৪২), 'ছন্দোর্ণবপিঙ্গল' (১৭৪২), 'কাব্যনির্ণয়' (১৭৪৬), শৃঙ্গারনির্ণয় (১৭৫০) এবং 'বিষ্ণুপুরাণ ভাষা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন—'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থের জন্যই। 'ছন্দপ্রকাশ', 'শতরঞ্জশতিকা', 'অমর প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁরই রচনা বলে স্বীকৃত।

প্রতাপগড়ের সোম বংশীয় রাজা পৃথ্বীপতি সিংহের ভাই হিন্দুপতি সিংহের আশ্রয়ে কাব্যনির্ণয় কাব্যটি রচিত। কাব্যাঙ্গবিচারে ভিখারী-দাস রীতিযুগের প্রধান কবিদের অন্যতম। কারো কারো মতে তিনি রীতিযুগের সর্বপ্রধান কবি। তাঁর রচনায় তিনি ধ্বনি, রস, রীতি, গুণ, দোষ, শব্দশক্তি, ছন্দ, অলংকার এবং ভাষার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় হিন্দীকাব্যে পরকীয়া প্রেমের অতিরেক দোষের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তখন কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ মাত্রেই দেবত্ব আরোপ এবং স্ব-দোষ পরিহার সহজ হয়ে উঠেছিল। তাই ভিখারী-দাস স্বকীয়া প্রেমের লক্ষণ এবং পরিধিকে ব্যাপকতা প্রদান করতে চেয়েছেন। আর কাব্যশাস্ত্রে তিনি এমন কয়েকটি প্রয়োগ করেছেন যা সংস্কৃত সাহিত্যে থাকলেও হিন্দীতে ছিল না। তাঁর এই প্রয়াস বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিক এবং পরিমার্জিত ভাষা ব্যবহারে তাঁর প্রধান উপজীব্য শৃঙ্গার-রস অপরূপ আস্বাদ্যতা লাভ করেছে। 'শৃঙ্গারনির্ণয়' কাব্যে তিনি মনোহর ও সরস দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্য-বিষয়কে অতি উপাদেয় করে তুলেছেন। প্রয়োজনানুরূপ ভাষা সাধারণ কিন্তু গভীর-গম্ভীর ভাবের যোগ্য বাহন। সংযম ও মনোরঞ্জন

তাঁর ভাষার প্রধান গুণ। তিনি নীতিমূলক সূক্তিও রচনা করেছেন। কল্পনায় সূক্ষ্মতা ও গভীরতা কম থাকলেও সব মিলিয়ে তাঁর সাফল্য যেন সে যুগের অন্য কবিদের অতিক্রম করে গেছে। তিনি যে কথাটি যেমনভাবে বলতে চাইতেন অবলীলাক্রমে তা পারতেন। তিনি দরকার মতো সংস্কৃত, তদ্ভব ও গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরবি-পারসি শব্দও সহজেই ব্যবহার করতেন। শব্দ ব্যবহারের এই উদারতা তাঁর সফলতাকে সহজ করেছে। ব্রজভাষা কেমন হওয়া দরকার তা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

ব্রজভাষা, ভাষা রুচির, কহৈ সুমতি সব কোয়।
মিলৈ সংস্কৃতি পারস্যৌ, পৈঅতি প্রগট জু হোয়॥
ব্রজ মাগধী মিলৈ ভ্রমর, নাগ যমন ভাখানি।
সহজ পারসী হু মিলৈ, ষট্‌বিধি কবিত বখানি॥

সুমতি সুধীদের সমর্থনে সংস্কৃত, দেশী ও বিদেশী— বিভিন্ন জাতের শব্দে সমৃদ্ধ ব্রজভাষাকে ভিখারীদাস 'রুচির ভাষা' বলে অভিহিত করেছেন।[৬] ভাব ও ভাষার বিচারে অপেক্ষাকৃত সফল রীতিকবি ভিখারীদাস আচার্যত্ব ও কবিত্ব— দুই দিকেই সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কবিত্বসূচক দুইটি অংশ—

১. জেহি মোহিবে কাজসিঙ্গারসজ্যো তেহি দেখত মোহমেঁ আই গঈ।
ন চিতৌনি চলাই সকী উনহীঁ কী চিতৌনি কে ভায় অঘায় গঈ॥
বৃষভান ললী কী দসা য়হ 'দাস' জূ দেত ঠগৌরী ঠগায় গঈ।
বরসানে গঈ দধি বেচন কো তহঁ আপুহি আপু বিকায় গঈ॥

—রাধা যাঁকে মুগ্ধ করার জন্য এত সাজ-গোজ করলেন— তাঁকে দেখে নিজেই মোহিত হয়ে পড়লেন। কটাক্ষে যাঁকে মাত করতে চেয়েছিলেন তাঁর কটাক্ষে নিজেই কাত হয়ে পড়লেন, গিয়েছিলেন দই বিক্রি করতে কিন্তু নিজেই বিকিয়ে গেলেন।

২. নৈননকো তরসৈএ কহ্ঁালৌ, কহাঁলৌ হিয়ো বিরহাগি মৈঁ তৈএ।
এক ঘরী ন কহুঁ কল পৈএ, কহঁা লগি প্রানন কো কলপৈএ ?
আওয়ৈ য়হী অব জীমেঁ বিচার, সখী চলি সৌতিহুঁকৈ ঘর জৈএ।
মান ঘটে তেঁ কহা ঘটিহৈ জু পৈ প্রানপিয়ারে কো দেখন পৈএ।

—কৃষ্ণের বিরহ রাধার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। দেহ-মন-প্রাণ অতিমাত্রায় কাতর-জর্জর হয়ে পড়েছে। তাই রাধা স্থির করেছেন—এবার সতিনের ঘরেই যাবেন। তাতে মান যাবে যাক, প্রিয়তমের দেখা তো পাবেন।

সুখদেব মিশ্র (১৬৩৩-১৭০৩)—'বৃত্তবিচার' গ্রন্থের প্রণেতা সুখদেব মিশ্রের অন্যান্য গ্রন্থ— 'ছন্দবিচার', 'ফাজিলঅলীপ্রকাশ', 'রসার্ণব', 'শৃঙ্গারলতা' ও 'অধ্যাত্মপ্রকাশ' (১৬৯৮)।

উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির দৌলতপুরের মিশ্র পরিবারের সন্তান সুখদেব কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ফতেপুরে কয়েকজন গুণগ্রাহীর নিকট অবস্থানের পর ঔরঙ্গজেবের মন্ত্রী ফাজিলঅলী শাহের আশ্রয়ে বাস করেন। পরে আবার রাজা দেবী সিংহের ইচ্ছায় দৌলতপুরে বাস করতে যান। দেবী সিংহ তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুখদেব মিশ্রের রচনায় কবিত্ব ও আচার্যত্ব দুই-ই সাধারণ স্তরের।

সুরতিমিশ্র (১৬৮৩)—'সূরতি মিশ্র কনৌজিয়া নগর আগরে বাস' অর্থাৎ সুরতিমিশ্র কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, আগ্রায় বাস করতেন। ১৭০৯-১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী ছিলেন। সরদার নসরুল্লা এবং দিল্লীর বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের দরবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। মিশ্রজীর গ্রন্থকার, অনুবাদক এবং ভাষ্যকার— এই তিনটি রূপ আমরা দেখতে পাই। তিনি 'অলংকার মালা', 'রসরত্নাকর', 'সরসরস', 'রসগ্রাহক চন্দ্রিকা', 'নখসিখ' ও 'কাব্যসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি রীতিগ্রন্থ রচনা করে কাব্যশাস্ত্রের সমৃদ্ধিসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু

গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না। 'বিহারী সতসঈ', 'কবিপ্রিয়া' এবং 'রসিক-প্রিয়া'র সুদীর্ঘ টীকা রচনা করে সূরতিমিশ্র তাঁর পাণ্ডিত্য, সাহিত্য-মার্মিকতা এবং রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত বিহারী সতসঈ'র টীকার নাম—'অমরচন্দ্রিকা'। তিনি সংস্কৃত 'বৈতাল-পঞ্চবিংশতি'র ব্রজভাষা গদ্যে অনুবাদ করেছেন। এইভাবে তিনি হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছেন।

শ্রীপতি মিশ্র—কালপীর ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান শ্রীপতি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সে যুগের একজন নিপুণ কাব্য-বিবেচক এবং উদার সাহিত্যবোদ্ধা ছিলেন। তিনি 'কাব্যসরোজ' (১৭২০), 'কবিকল্পদ্রুম', 'রসসাগর', 'অনুপ্রাসবিনোদ', 'বিক্রম-বিলাস', 'সরোজকলিকা' এবং 'অলংকারগংগা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কাব্যের দশটি অঙ্গেরই সম্যক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সমধিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার ও নির্দেশ করেছেন কাব্যদোষের। প্রয়োজনমতো তিনি কেশব দাসের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন। আবার কবি ভিখারীদাসের রচনায় শ্রীপতির রচনাংশের নিরুল্লেখ উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে।[৭] কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় শ্রীপতির পরিণত বোধ ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রশংসনীয়। তিনি উচ্চস্তরের কবিও ছিলেন। ভাষা সহজ-সরস ও স্বাভাবিক। অলংকার প্রয়োগ তাঁর ভাবকে রসানুকূল ও সুস্পষ্ট করেছে। সুতরাং আচার্য ও কবি রূপে শ্রীপতি মিশ্র হিন্দী সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম।

আলিমুহিব খাঁ 'প্রীতম' (অষ্টাদশ শতকের পূর্বার্ধ)—আগ্রার অধিবাসী আলিমুহিব খাঁ 'প্রীতম' নামে কবিতা লিখতেন। রীতিযুগে যদিও শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য; তবু কোনো কোনো কবি বীররস অবলম্বন করেও কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এই দুই রস ছাড়া তৃতীয় রস হিসাবে 'হাস্য-রসের' হিন্দীকাব্যে শিষ্ট প্রয়োগ করলেন হজরত আলি মুহিব খাঁ। তাই এ-ক্ষেত্রে তিনি পথ-প্রদর্শকের মর্যাদার অধিকারী। নির্মল-শুভ্র হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি চয়ন করলেন— 'ছারপোকা'

বা 'খটমল'। খটমল সম্পর্কে তাঁর একটি কৌতুককর সংস্কৃত শ্লোক উদ্‌ধার যোগ্য—

কমলা কমলে শেতে হরশ্‌শেতে হিমালয়ে।
ক্ষীরাব্ধৌ চ হরিশ্‌শেতে মন্যে মৎকুণ শংকয়া ॥

বলাইবাহুল্য এ শ্লোকে ক্ষুদ্র ও মহতের অভেদত্ব উঁকি মারছে। কবি প্রীতম ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে 'খটমল বাইসী' হাস্যরসাত্মক কাব্যটি রচনা করেন। নানা দিক থেকেই কাব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। হাস্য অবলম্বন প্রধান রস। কেবল অবলম্বনই এই রসের আধার হতে পারে, একপ্রকার রূঢ়ি হয়ে পড়েছিল এই ধারণা ও প্রয়োগ। সংস্কৃত নাটকে আহারাদি কে আশ্রয় করেই একপ্রকার স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। ভাষা-সাহিত্যে হাস্যরসের উপজীব্য কৃপণ ব্যক্তি ও সম্প্রদায়। কিন্তু আলিমুহিব খাঁ একটি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করলেন হাস্যরস সৃষ্টির। তাই হিন্দী সাহিত্যের হাস্যরসাত্মক শাখায় তিনি একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনের অধিকারী। তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও 'খটমল বাইসী'ই তাঁকে অমর করে রাখবে। এখানে 'খটমল বাইসী' থেকে দুইটি কবিত্ত উদ্‌ধার করছি—

১. জগৎ কে কারন করন চারো বেদন কে,
কমল মেঁ বসে ওয়ে সুজান জ্ঞান ধরি কৈ।
পোষন অবনি, দুখ সোষন তিলোকন কে,
সাগর মৈঁ জায় সোয়ে সেস সেজ করি কৈ ॥
মদন জরায়ো জো; সংহারৈ দৃষ্টি হী মেঁ সৃষ্টি,
বসে হৈঁ পহার বেউ ভাজি হরবরি কৈ।
বিধি হরি হর, ঔর ইনতেঁ ন কোউ, তেউ,
খাট পৈ ন সোঁওয়েঁ খটমলন কো ডরি কৈ ॥

—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পরম শক্তিধর এবং অসাধ্য সাধনে সক্ষম হলেও ছারপোকার ভয়ে খাটে শোন না।

২. বাঘন পৈ গয়ো, দেখি বনন মেঁ রহে ছপি,
সাঁপন পৈ গয়ো, তে পতাল ঠৌর পাঈ হৈ।
গজন পৈ গয়ো, ধূল ডারত হৈঁ সীস পর,
বৈদন পৈ গয়ো কাহু দারু না বতাঈ হৈ॥
জব হহরায় হম হরি কে নিকট গয়ে,
হরি মোসোঁ কহী তেরী মতি ভূল ছাঈ হৈ।
কোউ না উপায়, ভটকত জনি ডোলৈ, সুন,
খাটকে নগর খটমল কী তুহাঈ হৈ॥

—ছারপোকার ভয়ে বাঘ বনে আশ্রয় নিয়েছে, আর সাপ নিয়েছে পাতালে। হাতি আক্রান্ত হয়ে মাথায় সর্বদা ধুলো ছড়ায় আর বৈদ্য আক্রান্ত হয়ে কাউকে আর ঔষধই বলে দিতে পারে না। যখন ছারপোকা হরির কাছে সদলবলে উপস্থিত হল, হরি তাদের বললেন—হে খটমলকুল! তোমাদের মতিবিভ্রম ঘটেছে। অন্য কোনো উপায় দেখছি না, লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে না বেড়িয়ে তোমরা 'খাট-নগরে' গিয়ে বাস কর।

রসলীন (১৬৯০-১৭৫০)—উত্তর প্রদেশের হরদোঈ জেলার বিল-গ্রামের অধিবাসী সৈয়দ মোহাম্মদ বাকরের পুত্র সৈয়দ গোলাম নবী রসলীন— ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে 'অঙ্গদর্পন' রচনা করেন। গ্রন্থটিতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের রুচিসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন কবি; প্রবাদ-বচন, নীতি-সূক্তি প্রভৃতিরও অভাব নেই। কাব্যরসিকদের কাছে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রসপ্রবোধ' (১৭৪১) রস, ভাব, নায়িকাভেদ, ষড়-ঋতু, বারোমাস্যা প্রভৃতির বর্ণনায় পূর্ণ। আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও গ্রন্থটি প্রকৃতির বিচারে মহৎ। রসলীনের দোহা চমৎকারিতা এবং উক্তি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। রসলীন একজন যোদ্ধা এবং সংগীতজ্ঞও ছিলেন। রসলীনের নেত্রবিষয়ক একটি দোহা লোকের মুখে মুখে ফেরে—

অমিয় হলাহল মদভরে, সেত স্যাম রতনার।
জিয়ত মরত— ঝুকি-ঝুকি পরত জেহি চিতওয়ত ইকবার।
—বিষামৃতের মদে ভরা চোখ, ধবল-শ্যামল-রাতুল!
বাঁচুক-মরুক, নুয়ে নুয়ে পড়ে— চাহনিতে হয়ে বাতুল!

তাঁর বয়সন্ধির একটি দোহা—

তিয়-সৈসব-জোবন মিলৈ ভেদ ন জান্যো জাত।
প্রাত সময় নিসি দ্যৌস কে দুবৌ ভাব দরসাত॥
—বামা-শৈশব যৌবনে মেশে, ভেদ বোঝা নাহি যায়,
ভোরের বেলাটি নিশি-দিবসের দুই ভাব দরশায়!

রঘুনাথ (কবিতা রচনাকাল ১৭৩৩-১৭৫৩ পর্যন্ত)— কাশীরাজ বরিবণ্ড সিংহের সভাকবি রঘুনাথ বন্দীজন চারটি গ্রন্থ রচনা করেন— 'কাব্যকলাধর', 'রসিকমোহন', 'জগৎমোহন' এবং 'ইশ্‌ক-মহোৎসব'।[৮] মহাভারতের ভাবানুবাদকারী প্রসিদ্ধ গোকুলনাথ তাঁর পুত্র এবং গোপীনাথ পৌত্র ছিলেন। রঘুনাথ 'বিহারী সতসঈ'র একটি টীকাও রচনা করেন। রসিকমোহন (১৭৩৯) অলংকার গ্রন্থ, তাতে আশ্রয় দাতার বিশদ গুণ-গান রয়েছে। কাব্যকলাধর (১৭৪৫) রস-ভেদ ও নায়িকা ভেদের গ্রন্থ। জগৎমোহন (১৭৫০) অষ্টযাম শ্রেণীর রচনা। তাতে কৃষ্ণকে আদর্শ নৃপতি হিসাবে চিত্রিত করে তাঁর বারো ঘণ্টার দিনচর্চা (ডায়েরী) বর্ণিত। ইশ্‌ক-মহোৎসব সে যুগের একটি প্রগতিশীল রচনা। খড়ীবোলী এবং পারসি শব্দের সাহায্যে ইশ্‌ক অর্থাৎ প্রেমের উল্লাস বর্ণিত।

কবি রঘুনাথের রচনা তার কাব্যময়তা ও প্রাঞ্জলতার জন্য সহজেই পাঠক বা শ্রোতার মন আকৃষ্ট করে। কবিতা যেমন সরস সুললিত, ভাষাও তেমনি সহজ এবং গতিবেগ সম্পন্ন। কাব্যকলাধর রঘুনাথ মতিরাম প্রমুখদের শ্রেণীর কবি। খড়ীবোলীতে তাঁর কাব্যরচনার প্রয়াস দেখে মুগ্ধ হতে হয়।—

আপ দরিয়াও, পাস নদিয়োঁ কে জানা নহীঁ
দরিয়াও, পাস নদী হোয়গী সো ধাওয়ৈগী।
দরখত বেলি আসরে কো কভী রাখতা ন
দরখত হী কে আসরে কো বেলি পাওয়ৈগী॥
লায়ক হমারে জো থা কহনা সো কহা মৈনেঁ
রঘুনাথ মেরী মতি ন্যাওয় হী কো গাওয়ৈগী।
ওয়হ মুহতাজ আপকী হৈ, আপ উসকে নহীঁ
আপ ক্যোঁ চলোগে, ওয়হ আপ পাস আওয়ৈগী॥
—(ইশ্‌ক-মহোৎসব)

—সমুদ্র নদীর কাছে যাবে না, নদী আপনিই সমুদ্রের কাছে ছুটে আসবে। গাছ লতাকে নয়, লতাই গাছকে আশ্রয় করে। কবি রঘুনাথের বিচারে প্রেমিকাই প্রেমিকের কাছে ছুটে আসবে, প্রেমিকের তার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ আসক্তি প্রেমিকারই তীব্র।

কবি দূলহ (রচনাকাল ১৭৯২-১৮২৩)—প্রখ্যাত কবি কালিদাস ত্রিবেদীর পৌত্র এবং 'কবীন্দ্র' উদয়নাথের পুত্র কবি দূলহ সম্পর্কে বলা হয়— 'ঔর বরাতী সকল কবি, দূলহ, দূলহ রায়' অর্থাৎ অন্য কবিরা বরযাত্র মাত্র এবং 'দূলহ' বা বর হলেন একমাত্র দূলহ-ই। এই মন্তব্যে আতিশয্য থাকা বিচিত্র নয়। তিনি 'কবিকুল-কণ্ঠাভরণ' নামক একটি অলংকার গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই যুগের অন্য কবিদের মতো তিনি খুচরো কবিতাও রচনা করেছেন। অলংকার গ্রন্থে কবি দূলহ অলংকারের পরিচয়মাত্র দিয়েছেন, বিচার-বিবেচনা করেন নি। তা সত্ত্বেও এই একটি গ্রন্থের সুবাদেই দূলহ আচার্য-কবিদের দলভুক্ত হতে পেরেছেন। বক্তব্যের শৃঙ্খলা ও যুক্তিনিষ্ঠা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতার সঙ্গে কবিতার সরস-মধুর ভাবের সমন্বয় তাঁর প্রতিভাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।—

ধরী জব বাঁহী, তব করী তুম নাহীঁ,
পাঁই দিয়ো পলিকাহী নাহীঁ নাহীঁ কৈ সুহাঈ হৌ।
বোলত মৈঁ নাহীঁ পট খোলত মৈঁ নাহীঁ,
কবি দূলহ উছাহী, লাখ ভাঁতিন লহাঈ হৌ॥
চুম্বন মেঁ নাহীঁ, পরিরম্ভন মেঁ নাহীঁ,
সব আসন বিলাসন মেঁ নাহীঁ ঠীক ঠাঈ হৌ।
মেলি গলবাহীঁ, কেলি কীহ্নী চিতচাহী
য়হ হাঁ তে ভলী নাহীঁ, সো কহাঁ তে সীখ আঈ হৌ॥

নায়িকা প্রতিপদে 'না, না' করা সত্ত্বেও নায়কের পক্ষে স্বীয় ইচ্ছাপূরণে কোনো বিঘ্ন হয় নি। তাই নায়কের মতে— নায়িকার 'হ্যাঁ' অপেক্ষা এই 'না'-ই শ্রেয়। নায়িকার এই কলাটি অপূর্ব।

বেনী বন্দীজন (রচনাকাল ১৭৯২-১৮২৩)—রায়বরেলীর অধিবাসী বেনী বন্দীজন অওধপতি টীকৈত রায়ের আশ্রয়ে ছিলেন। আশ্রয়-দাতার নামে কবি 'টিকৈতরায়প্রকাশ' অলংকারগ্রন্থ (১৭৯২) রচনা করেন। 'রসবিলাস' নামে আরও একটি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। এই রীতিগ্রন্থদ্বয়ের প্রথমটিতে অলংকার-নিরূপণ এবং দ্বিতীয়টিতে রস-নিরূপণ করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে তাঁর খ্যাতির কারণ তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা। তাঁর বিভিন্ন রকমের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা 'ভঁড়োওয়া সংগ্রহ' নামে প্রচলিত। যা অন্যের হাসির কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিন্দার সামগ্রী— এমন উপহাসপূর্ণ নিন্দা-আশ্রিত রচনাই ভঁড়োওয়া (satire) রূপে পরিচিত। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই এই ধরণের রচনা থাকে। তারও গুরুত্ব কোনো ক্রমে কম নয়। উর্দুতে 'শের' বা শায়রের ক্ষেত্রে 'হজ' এই জাতীয় রচনা। এই জাতীয় কবিরা সমাজে যেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি পান, প্রচণ্ড ব্যঙ্গের কষাঘাতে তাকে আক্রমণ করেন। শোধনের প্রত্যাশাও পোষণ করেন। কবিরা এমন প্রাণ মন খুলে কথা বলেন যে, পাঠকচিত্ত মশগুল হয়ে ওঠে। বেনী বন্দীজন, সে যুগের ব্যক্তি, গোষ্ঠী সমাজ

এমন কি লাখনাউ-এর কর্দমাক্ত পথকেও কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ব্যঙ্গ ছাড়া অন্য রসের রচনাতেও বেনী বন্দীজন দক্ষতা দেখিয়েছেন। বলাই বাহুল্য এই ধরণের হাস্যরস সৃষ্টি সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। ছিল না হিন্দী সাহিত্যেও। সুতরাং বলা যায় বেনীকবি হিন্দী সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে নব-পথ প্রদর্শন করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত—

> কারীগর কোউ করামাত কৈ বনায় লায়ো
> লীনো দাম থোরী জান নঈ সুধরঈ হৈ।
> রায়জ কো রায়জ রজাঈ দীনী রাজী হ্বৈ কে
> সহরমেঁ ঠৌর-ঠৌর সোহরত ভঈ হৈ॥
> বেনী কবি পায় কে আঘায় রহে ঘরী দ্বৈক
> কহত ন বনে কছু-ঐসী মতি ঠঈ হৈ।
> সাঁস লেত উড়ি গৌ উপল্লা ঔর ভিতল্লা সহৈঁ
> দিন দ্বৈ কে বাতী হেত রূঈ রহ গঈ হৈ॥

এখানে কবি ধুনুরীকে এক হাত নিয়েছেন। সে এমন লেপ তৈরি করেছে যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের জোরে লেপের উপরের ও ভিতরের খোল ও তুলো উড়ে গেল এবং দু দিনের সলতে পাকাবার মতো তুলো মাত্র থেকে গেল। কৃপণদেরও কবি ছেড়ে কথা বলেন নি—

> আধ পাওয় তেল মেঁ তৈয়ারী ভঈ রোশনী কী,
> আধ পাওয় রূঈ মেঁ পোশাক ভঈ বর কী,
> আধ পাওয় ছালে কে গিনৌরা দিয়ৌ ভাইন কো,
> মাঁগে-মাঁগি লায়ৌ হৈ পরাঈ চীজ ঘরকী॥
> আধি-আধি জোরি বেনী কবি কী বিদাঈ কীনী,
> ব্যাহি লায়ৌ জব তৈঁ ন বোলে বাত থির কী।
> দেখি-দেখি কাগদ তবিয়ত সুমাদী ভঈ,
> শাদী কাহ ভঈ বরবাদী ভঈ ঘর কী॥

অবিশ্বাস্য রকম কম খরচে বিবাহ হলেও কৃপণের বিচারে তাতে সংসার বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ নানাপ্রকার খরচ তাতে বেড়ে যায়। বেনী বন্দীজনই লাখনাউ-এর 'বেনী'কে 'বেনীপ্রবীণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বেনী প্রবীণ (১৮১৬)—লাখনাউ-এর অধিবাসী শীতল বাজপেয়ীর সন্তান বেনীদীন বাজপেয়ী অযোধ্যার শাহীদরবারে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। 'শৃঙ্গারভূষণ', 'নবরসতরঙ্গ' এবং 'নানারাওপ্রকাশ' নামে তিনটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। লাখনাউ-এর দেওয়ান-তনয় আশ্রয়দাতা নবলকৃষ্ণ 'ললনজী'র ইচ্ছানুসারে বেনীপ্রবীণ 'নবরসতরঙ্গ' রচনা করেন। বিঠুরের নানা রাওয়ের উদ্দেশ্যে তিনি 'নানারাও-প্রকাশ' লেখেন। প্রথমটিতে রস-বিচার ও নায়িকা-ভেদ এবং দ্বিতীয়টিতে অলংকার নিরূপণ রয়েছে। কাব্যশাস্ত্র রূপে তাঁর রচনা বিশেষ খ্যাতিলাভ করতে পারে নি। তবে গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সব কবিতা তিনি রচনা করেছেন ভাবে ভাষায় এবং লালিত্যে তা বড়োই উপভোগ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'নবরসতরঙ্গে'র কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনাও উল্লেখ করার মতো। ভাবসমৃদ্ধ, সজীব ও মর্মস্পর্শী কবিতার জন্য বেনী প্রবীণ উৎকৃষ্ট কবিরূপে মান্য।

পদ্মাকর ভট্ট (১৭৫৩-১৮৩৩)—জনপ্রিয়তার বিচারে রীতিকালের কবিদের মধ্যে বিহারীর পরেই সম্ভবতঃ পদ্মাকর ভট্টের স্থান। পদ্মাকর সুপণ্ডিত এবং গভীর লোক-জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বাঁদার তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগের কোনো কোনো রাজা-রাজড়ার তিনি কুলগুরুও ছিলেন। পিতা মোহনলাল ভট্টের মতো তিনিও বহু রাজা ও গুণগ্রাহীর কাছে সম্মানলাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি ভক্তিবিষয়ক পদ রচনায় মগ্ন হন। এই পদগুলি সহজেই মনকে স্পর্শ করে। গোঁসাঈ অনুপ গিরির সঙ্গে তিনি কিছুকাল ছিলেন। এই যোদ্ধার উদ্দেশ্যে তিনি 'হিম্মৎবহাদুর বিরুদাবলী' রচনা করেন। এটি বীর রসাত্মক গ্রন্থ। জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহের নামে তিনি 'জগদ্বিনোদ'

রচনা করেন। তাছাড়া 'পদ্মাভরণ', 'প্রবোধপচাসা', 'রাম-রসায়ন', 'গঙ্গালহরী', 'হিতোপদেশ', 'আলিজাহপ্রকাশ', 'প্রতাপসিংহ বিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেন। 'জগদ্বিনোদ' গ্রন্থটি উনিশ শতক পর্যন্ত কাব্য-রসিকদের আনন্দ দান করে এসেছে। শৃঙ্গার রসের সার গ্রন্থরূপে এটি গ্রাহ্য। ভাষার ওপর কবির অধিকার ছিল অদ্ভুত রকমের। মধুর কল্পনা এবং লাক্ষণিক শব্দব্যবহারনৈপুণ্যে স্বাভাবিক-মূর্তিলাভ করে তাঁর বক্তব্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে পাঠকের মম যেন প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে ভরে ওঠে। সহজ-মধুর ও স্নিগ্ধ ভাষায় প্রেমের সজীব মূর্তি, ভাবরসের অনুকূল প্রবাহ, অনুপ্রাসাদির ধ্বনি ঝংকার, চিত্তের বিক্ষোভ, হৃদয়ের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য পদ্মাকরের কাব্যের উৎকর্ষের দ্যোতক।

পদ্মাকর সেতারা, জয়পুর, গোয়ালিয়র, বূঁদী প্রভৃতি রাজ্যের রাজসভায় অবস্থান করেন এবং সম্মানে ভূষিত হন। তিনি সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' হিন্দীতে অনুবাদ করেন। বাঁদাতে এসে তিনি 'প্রবোধ পচ্চাসা' নামে বৈরাগ্য ও ভক্তিপূর্ণ কাব্য রচনা করেন। শেষ জীবনে কানপুরে গঙ্গাতীরে বাস করেন এবং 'গঙ্গালহরী' কাব্য লেখেন। বাল্মীকির অনুসরণে তিনি 'রামরসায়ন' রচনা করেন। পদ্মাকর বীররসের কবিতা রচনা করলেও সমধিক সফলতা লাভ করেছেন শৃঙ্গার রসের রচনাতেই। মাঝে মাঝে অনুপ্রাসের ঘন-ঘটায় তাঁর রচনার মাধুরী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পদ্মাকরের রচনা থেকে দুইটি অংশ উদ্‌ধৃত করা যাক।—

১. বা অনুরাগ কী ফাগ লখী জহঁ রাগতি রাগ কিসোর-কিসোরী।
তোঁ্যা পদ্মাকর ঘালী ঘলী ফির লালহী লাল গুলাল কী ঝোরী
ওয়ৈসী কী ওয়ৈসী রহী পিচকী কর কাহূ ন কেসর রঙ্গ মেঁ বোরী।
গোরিনকে রঙ্গ ভীজিগো সাঁবরো, সাঁবরেকে রঙ্গ ভীজিগৈ গোরী।

—অনুরাগের আবীরে কিশোর-কিশোরীর হৃদয়-মন রাঙা হয়ে উঠেছে। তা দেখে কবি পদ্মাকর তাঁর কল্পনার থলিটিও লাল আবীরে ভরে

নিলেন। কিশোর-কিশোরী যে যার স্থানে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের পিচকারীর রঙ কেউ ব্যবহার করছে না। এদিকে রাধার রঙে শ্যাম এবং শ্যামের রঙে রাধা রাঙা হয়ে উঠলেন।

২. আঈ সঙ্গ আলিন কে ননদ পঠাঈ নীঠি
সোহত সোহাঈ সীস ঈড়রী সুপট কী।
কহৈ পদ্মাকর গম্ভীর জমুনা কে তীর
লাগী ঘট ভরন নবেলী নেহ অটকী॥
তাহী সময় মোহন জো বাঁসুরী বজাঈ তামেঁ,
মধুর মলার গাঈ, ওর বংসী বটকী।
তান লাগে লটকী, রহী ন সুধি ঘূঁঘটকী,
ঘরকী ন, ঘাটকী, ন বাট কী, ন ঘটকী॥

—সখীদের সঙ্গে রাধা যমুনায় জল নিতে এসেছেন। কলসী ভরছেন আর আনমনা হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ঠিক সেই সময় কদম্ব বৃক্ষের দিকে বাঁশিও মধুর মল্লার গেয়ে উঠল। ব্যাস! রাধা বেহুঁস হয়ে পড়লেন। ঘর-দোর, লোক-জন, ঘোমটা, ঘট ও ঘাট কোনো কিছুরই আর হুঁস রইল না।

রীতিযুগের শেষ সার্থক কবি পদ্মাকর।

গ্বাল কবি (১৭৯১-১৮৬৮)—পদ্মাকরের পর উল্লেখযোগ্য কবিরূপে গ্বাল কবির প্রসিদ্ধি আছে। তিনি সেবারাম বন্দীজনের সন্তান। তাঁর শৈশব বৃন্দাবনে এবং উত্তরকাল মথুরায় কাটে। বাল্যে তাঁর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে একজন শিক্ষক তাঁকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেন। পরে স্ব-প্রয়াসে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁর জীবন প্রধানত রাজাদের আশ্রয়েই কাটে। মহারাজ নাভা এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। রামপুরের রাজদরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রসিকানন্দ', 'হম্মীর হঠ' (১৮২৪), 'কৃষ্ণজ কো নখশিখ' (১৮২৭), 'দূষণ-

দর্পণ' (১৮৩৪), 'রসরঙ্গ' (১৮৪৭), 'গোপী-পচ্চীসী', 'রাধামাধব মিলন', 'রাধা অষ্টক' এবং 'অলংকার ভ্রমভঞ্জন' প্রভৃতি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আচার্য-ভাবটি ফুটে উঠেছে 'রসরঙ্গ' ও 'অলংকার ভ্রম-ভঞ্জন' গ্রন্থদ্বয়ে, অলংকারের বিবেচনায়— সংজ্ঞা, বিচার-বিশ্লেষণ, এবং দোষগুণ নিরূপণের প্রয়াসে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেরও তিনি সমালোচনা করেছেন এবং যুক্তির সাহায্যে স্ব-মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস সে যুগের বিচারে স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্বব্যঞ্জক।

ভাষার বিচারে দেখা যায় গ্বাল কবি ওজঃ ও চমৎকারিতা সৃষ্টিতে নিপুণ এবং শব্দ-চয়নে উদার ছিলেন। সংস্কৃত, আরবি, পারসি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা তিনি জানতেন। ওই সব ভাষার শব্দ বেশ সহজভাবে কবিতায় ব্যবহার করতেন এবং ওই সব ভাষাতেও তিনি কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর কবিকল্পনা ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তাই আপাত উপভোগ্য লঘুভাবের কবিতার কবি গ্বালকে প্রথম সারির কবিরূপে মান্য করা যায় না। তবে ষড়্‌ঋতুর বর্ণনায় তিনি সুনিপুণ। তাঁর নীতিমূলক কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

দিয়া হৈ খুদা নে খূব খুসী করো গ্বাল কবি,
খাও-পিয়ো, দেও-লেও য়হী রহ জানা হৈ।
রাজা রাও উমরাও কেতে বাদসাহ ভয়ে
কহাঁ তে কহাঁ কো গয়ে, লগ্যো ন ঠিকানা হৈ॥
বৈসী জিন্দগানী কে ভরোসে পৈ গুমান এতে!
দেস-দেস ঘূমি-ঘূমি মন বহলানা হৈ।
আয়ে পরওয়ানা পর চলৈ না বহানা য়হাঁ,
নেকী কর জানা, ফের আনা হৈ ন জানা হৈ॥

—ঈশ্বর প্রচুর দিয়েছেন, সুতরাং হে গ্বাল কবি, আনন্দ করো, খাও-দাও, অন্যকে দাও! এইটুকুই থাকবে। কত রাজা-বাদশা এলেন আর গেলেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই নশ্বর জীবনের জন্য এমন

অহংকার বৃথা। দেশে-দেশে ভ্রমণ করে আনন্দ পাও। পরপারের ডাক এলে এড়াবার উপায় নেই। সুতরাং এই সুবাদে পরোপকার করে যাও। কারণ আসা-যাওয়ার সুযোগ আর ঘটবে না।

প্রতাপসাহী (রচনাকাল ১৮০০-১৮৪৯)—বন্দীজন রতন সেনের পুত্র বুন্দেলখণ্ডের চরখারীর রাজা বিক্রমসাহীর আশ্রয়পুষ্ট ছিলেন। ছত্রসাল পরনাপুরন্দরের আশ্রয়েও তিনি কিছুকাল ছিলেন। তাঁর রচিত— 'ব্যঙ্গ্যার্থ-কৌমুদী' (১৮২৫) এবং 'কাব্যবিলাস' (১৮২৯) দুইটি প্রসিদ্ধ রীতিগ্রন্থ। তা ছাড়াও 'জয়সিংহ প্রকাশ', 'শৃঙ্গার-মঞ্জরী' (১৮৩২), 'শৃঙ্গার শিরোমণি' (১৮৩৭), 'অলংকার চিন্তামণি' (১৮৩৭), 'কাব্যবিনোদ' (১৮৩৯), 'রসরাজ কী টীকা' (১৮৩৯), 'রত্নচন্দ্রিকা' ('সতসঈ টীকা' ১৮৩৯), 'জুগলনখশিখ' এবং 'বলভদ্রনখশিখ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। অনুভূতির সূক্ষ্মতা না থাকলেও কল্পনাশক্তি, সহজ ভাষা এবং বলিষ্ঠতা প্রভৃতির কারণে তিনি রীতিকালকে ধরে রাখতে সমর্থ হলেও তাঁর জীবনকালের পরেই রীতিযুগের অবসান সূচিত হয়। আধুনিক যুগ নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে উঁকি দিতে থাকে। এইভাবে সাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বীরগাথা কাব্য, ভক্তিকাব্য ও রীতিকাব্য রচিত হলেও তা পরিমাণে যৎসামান্য, কারণ কোনো প্রতিভাধর কবি আর সে পথে অগ্রসর হন নি। সুতরাং কেবল রীতিযুগেরই নয় হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগেরই অবসানের সূচনা ঘটে কবি প্রতাপসাহীর পর থেকে।

রীতিযুগে অন্তত আরও একশো জন কবি রীতিকাব্য রচনার প্রয়াস পান। তাঁদের মধ্যে থেকে জন পঁয়ত্রিশ কবি ও তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম কেবল উল্লেখ করা যাচ্ছে। তাঁদের কারো কারো প্রয়াস অল্পাধিক মাত্রায় নূতনত্বের আভাসও বহন করে।

কালিদাস ত্রিবেদী—(১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন)। তাঁর পুত্র কবীন্দ্র ও পৌত্র দূলহ কবিখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—

'বারবধূ-বিনোদ' 'জঞ্জীরাবন্দ', 'রাধামাধব-বুধ-মিলনবিনোদ' ও 'কালিদাস হজারা'।

কবীন্দ্র উদয়নাথ (১৬৭৯)—কালিদাস ত্রিবেদীর পুত্র। রচিত গ্রন্থ 'বিনোদ চন্দ্রিকা' (১৭২০), 'রসচন্দ্রোদয়' (১৭৪৭) ও 'জোগলীলা'।

সোমনাথ—অষ্টাদশ শতকের কবি। তিনি 'সসিনাথ' নামেও কবিতা লিখতেন।— 'রস-পীযূষনিধি' (১৭৩৮), 'সিংহাসনবত্তিসীর হিন্দী অনুবাদ ও 'মাধব বিনোদ নাটক'।

চন্দন—অষ্টাদশ শতকের এই কবি ১৭৬৩-১৭৯৩ পর্যন্ত কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে রীতিবিষয়ক 'শৃঙ্গার সাগর', 'কাব্যাভরণ' ও 'কল্লোল তরঙ্গিণী' বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এ-ছাড়া আরও দশটি গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত— 'কেশরী প্রকাশ', 'চন্দন সতসঈ', 'পথিকবোধ', 'নখশিখ', 'নামমালা' (অভিধান ?), 'পত্রিকাবোধ', 'তত্ত্বসংগ্রহ', 'সীতবসন্ত' (আখ্যান সংগ্রহ), 'কৃষ্ণকাব্য' ও 'পাণ্ডববিলাস'।

রসিকগোবিন্দ—১৭৯৩-১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কবিতা রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা নয়— 'রামায়ণ সূচনিকা' (১৮০০), 'রসিক গোবিন্দানন্দঘন' (১৮০১), 'লছিমন চন্দ্রিকা' (১৮২৯) 'অষ্টদেশ-ভাষা', 'পিঙ্গল', 'সময়প্রবন্ধ', 'কলিযুগরাসো', 'রসিকগোবিন্দ' (১৮৩৩) ও 'জুগল রসমাধুরী'।

মণ্ডন—বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসী, ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। —'রস-রত্নাবলী', 'রসবিলাস', 'জনক পচ্চীসী', 'জানকী জূ কো ব্যাহ' ও 'নৈন পচাসা'।

রামকবি (জন্ম ১৬৪৬ : রচনাকাল ১৬৭৩)—'শৃঙ্গার সৌরভ' ও 'হনুমান নাটক'।

নেওয়াজ (১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন)— 'শকুন্তলা নাটক'-আশ্রিত কাব্য (১৬৮০)।

শ্রীধর বা মুরলীধর (১৬৮০ ?)—'জঙ্গনামা' (ঐতিহাসিক কাব্য), 'নায়িকাভেদ' ও 'চিত্রকাব্য' ।

বীরকবি—দিল্লীর অধিবাসী ।— 'কৃষ্ণচন্দ্রিকা' (১৭২২) ।

কৃষ্ণকবি—কবি বিহারীলালের পুত্র ।— 'বিহারী সতসঈ টীকা' (১৬২৮-১৬৩৫) ।

রসিক সুমতি (১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন)—'অলংকার চন্দ্রোদয়' ।

গঞ্জন—কাশীবাসী গুজরাটী ব্রাহ্মণ ।—'কমরুদ্দীন খাঁ হুলাস' (১৭২৯) ।

ভূপতি—অমেঠীর রাজা গুরুদত্ত সিংহ । ভূপতি নামে লিখতেন । —'সতসঈ' (১৭৩৪), 'কণ্ঠাভূষণ' ও 'রস-রত্নাকর' ।

তোষনিধি—এলাহাবাদের চতুর্ভুজ শুক্লের পুত্র ।—'সুধানিধি' (১৭৩৪), 'বিনয়-শতক' ও 'নখসিখ' ।

দলপতি রায় ও বংসীধর—'অলংকার রত্নাকর'। গ্রন্থটিতে অলংকারের ব্যাখ্যায় গদ্যের ব্যবহার লক্ষিত হয় ।

কুমারমণি ভট্ট—'রসিক রসাল' (১৭৪৬) ।

শম্ভুনাথ মিশ্র—১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন ।— 'রসকল্লোল', 'রসতরঙ্গিণী' ও 'অলংকারদীপক' ।

শিবসহায় দাস—বিজয়পুরের অধিবাসী ছিলেন ।— 'শিব চৌপাঈ' (১৭৫২) ও 'লোকোক্তি রসকৌমুদী' (১৭৫২) ।

রূপসাহী—'রূপবিলাস' (১৭৫৬) ।

ঋষিনাথ (১৭৩৩-১৮০৯)—'অলংকারমণিমঞ্জরী' (১৭৭৪) ।

বৈরীসাল—'ভাষাভরণ' (১৭৬৮) ।

দত্তকবি– খুরমান সিংহের দরবারী কবি ।— 'লালিত্যলতা' (১৭৭৩) ।

রতনকবি (১৭৪১)— ফতেহভূষণ' ও অলংকারদর্পণ' (১৭৭০) ।

নাথকবি (হরিনাথ)—কাশীবাসী গুজরাটী ব্রাহ্মণ।— 'অলংকার দর্পণ' (১৭৬৯)।

মণিরাম মিশ্র—'ছন্দ ছপ্পনী' (১৭৭২) ও 'আনন্দ মঙ্গল' (১৭৭২)।

দেবকীনন্দন—'শৃঙ্গার চরিত্র' (১৭৮৪), 'অবধূত ভূষণ' (১৭৯৪) ও 'সরফরাজ চন্দ্রিকা' (১৭৯৪)।

মহারাজ রামসিংহ—'অলংকার-দর্পণ', 'রসনিবাস' (১৭৮২) ও 'রসবিনোদ' (১৮০৩)।

ভানকবি—'নরেন্দ্রভূষণ' (১৭৮৮)।

থানকবি বা থানরায়—'দলেল প্রকাশ' (১৭৯১)।

জসবন্ত সিংহ (দ্বিতীয়)—অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন।— 'সালিহোত্র' ও 'শৃঙ্গার শিরোমণি'।

জসোদানন্দ (১৭৭১)—'বরওয়ৈ নায়িকাভেদ'।

করণকবি— উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন।—'সাহিত্যরস' ও 'রসকল্লোল'।

গুরদীন পাণ্ডে—'বাগমনোহর' (১৮০৩)।

ব্রহ্মদত্ত—'বিদ্বদ্বিলাস' (১৮০৩) ও 'দীপপ্রকাশ' (১৮০৮)।

এইসব কবিদের আবির্ভাবকাল, সময় ও রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে সুস্থির ও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। যে-সব তথ্য উল্লিখিত হয়েছে তার অনেকটাই অনুমানভিত্তিক। দুই বা ততোধিক কবির রচিত গ্রন্থের একই নাম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুও একই হওয়ায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংখ্যা সম্পর্কে উদাসীন থাকা যায় না। মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন জাগে।

যে-সব গ্রন্থের ভিত্তিতে এই সব তথ্য সংগৃহীত, সেগুলির রচয়িতা বা সংকলন কর্তাগণ যা পেয়েছেন গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব রক্ষা বা নির্ণয় করা সব সময় তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এইরূপ উৎসমূলক কয়েকটি গ্রন্থ—

১. চৌরাসী ঔর দো সৌ বাওয়ন বৈষ্ণবন কী বার্তা (১৫৬৮ ?)
২. ভক্তমাল (১৫৮৫)
৩. গুরুগ্রন্থ সাহেব (১৬০৪)
৪. গোঁসাঈ চরিত (১৬৩০)
৫. ভক্তমাল নামাবলী (১৬৪১)
৬. কবিমালা (১৬৫৫)
৭. কালিদাস হজারা (১৭১৮)
৮. কাব্যনির্ণয় (১৭২৫)
৯ কবিনামাবলী (১৭৫৭)
১০. রাগ সাগরোদ্ভব ঔর রাগ কল্পদ্রুম (১৮৪৭)
১১. শিব সিংহ সরোজ (১৮৮৭)—সাহিত্যেতিহাস রচনার সূত্রপাত
১২. কবি রত্নমালা (১৯১১)
১৩. সন্তবাণী সংগ্রহ তথা অন্য সন্তোঁ কী বাণী (১৯১৫)

রীতিকালের অন্যান্য কবি ও রীতিমুক্ত কাব্য

দেখা গেল— কবিতার একটি সংস্কারবদ্ধ সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ রীতিকাব্য নামে পরিচিত। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রিগণ কাব্যশিল্প এবং কাব্যসৌষ্ঠব বিবেচনার জন্য যে সিদ্ধান্ত এবং লক্ষণ নির্দেশ করেছেন— তারই ভিত্তিতে লক্ষণ-সাহিত্য অথবা লক্ষণ-রহিত যে কাব্য রচিত হত তাকেই রীতিকাব্য এবং ওই ধারাকে রীতিকাব্যের ধারা বলা হয়েছে। রীতিবদ্ধ কাব্য আসলে শাস্ত্র-কাব্য এবং তার রচয়িতা 'আচার্য' রূপে মান্য ছিলেন। তবে যে সব রচনায় লক্ষণের নির্দেশ ছাড়াই প্রধানত অলংকার, রস, ধ্বনি, নায়িকাভেদ, রীতি, বক্রোক্তি এবং নখশিখ, ষড়ঋতু, বারোমাস্যা প্রভৃতি আশ্রিত বা আধৃত, তাকেও আমরা রীতি-পরম্পরার কাব্য বলতে পারি।

কিন্তু এ-ছাড়াও এ যুগে অন্যবিধ অর্থাৎ রীতিমুক্ত কাব্যও কম রচিত হয়নি। এই রচনার পিছনে ছিল কিছু কবির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ধরাবাঁধা নিয়মের প্রতি অনাগ্রহ। তাঁরা স্বচ্ছন্দ গতিতে এবং অনির্দিষ্ট রীতিতে প্রধানত প্রেম ও শৃঙ্গার বিষয়ক কবিতা লিখেছেন। তাতে কাব্যের বন্ধন, সামাজিক মূল্যবোধ, রূঢ়িবাদিতা প্রভৃতির প্রতিও বিদ্রোহ-ভাবনার সুর ছিল। এমন কি ধর্ম সংস্কারের প্রতিও অনেকে আস্থাহীন ছিলেন। তাই প্রেম ও শৃঙ্গারই অতি সুন্দর সার্থক ও মর্মস্পর্শী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁদের রচনায়। এই সব কারণেই রীতিকালের ফসল হলেও এই কাব্যধারাটি রীতিমুক্ত কাব্যধারা রূপে বিশেষিত হয়েছে। আর সাহিত্যকৃতির নাম হয়েছে 'রীতিমুক্ত কাব্য'।

রীতিমুক্ত কাব্যশাখার কবিদের কেউ প্রবন্ধকাব্য (আখ্যানকাব্য), কেউ নীতিকাব্য বা ভক্তিকাব্য এবং অন্যেরা লিখেছেন— শৃঙ্গার রসের নানা প্রকার কবিতা। এই কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন— কবি ঘনানন্দ। এই সম্প্রদায়ের কবিদের রচনায় মার্মিক এবং মনোহারী উচ্চ-কোটির সাহিত্যের পরিমাণ নেহাত কম নয়। রীতিবদ্ধতার বিধান রক্ষায় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যখন যে ভাবটি কবিদের মনে এসেছে— তখন সেটি নিয়েই তাঁরা কবিতা লিখেছেন। যাঁরা নিজ অভিরুচি, মনোভাব এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন —তাঁদের মধ্যে মহামতি প্রাণনাথ, রসখান, ঘনানন্দ, আলম ও ঠাকুর প্রমুখ কবির নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁরা কেউই লক্ষণবদ্ধ কবিতা রচনা করেন নি।

এ-যুগের কারো-কারো রচনায় অল্প-স্বল্প গদ্য রচনার প্রয়াসও চোখে পড়ে। তবে তা অল্প এবং অপরিণত। এ-গদ্য ব্রজভাষার গদ্য। খড়ীবোলী প্রথমে দিল্লী অঞ্চলের মুসলমানদের ব্যবহারের ভাষারূপে গণ্য হত। তাই রচনায় কেবল মুসলমানদের প্রসঙ্গেই তার ব্যবহার সীমিত রাখা হত। কিন্তু রীতিকালে ক্রমে ক্রমে তা শিষ্ট সমাজের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভালো ভালো গদ্য-গ্রন্থ রচনার

প্রয়াসও দেখা যায় তাতে। রামপ্রসাদ নিরঞ্জন অতিমার্জিত ও বলিষ্ঠ গদ্যে 'যোগ বাশিষ্ঠ্য ভাষা' (১৭৪১) গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়েই রীওয়াঁ রাজ্যের অধিপতি বিশ্বনাথ সিংহ (১৭৮৬-১৮৫৪) হিন্দীর প্রথম নাটক 'আনন্দ রঘুনন্দন' ব্রজভাষার গদ্যে রচনা করেন। কবি গণেশ পদ্যে 'প্রদ্যুম্নবিজয়' নাটক লেখেন। তবে এ-নাটকে নাট্যধার্মিতা তেমন নেই। শৃঙ্গার ধর্মিতাই এ-যুগের রীতিমুক্ত কবিদের কাব্যেরও প্রধান পরিচয়। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ বয়সে ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য রচনায় ব্রতী হন। সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

আলোচ্য যুগের রীতিমুক্ত কবিদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

নির্গুণপন্থী শাখার জ্ঞানমার্গী ও প্রেমমার্গী এবং সগুণপন্থী শাখার রামভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি ধারার অভূতপূর্ব এবং অনুপম সমন্বয় লক্ষিত হয় 'প্রণামী' সম্প্রদায়ের অকুতোভয় প্রচারক ও ভাষ্যকার স্বামী প্রাণনাথের মধ্যে (১৬১৮-১৬৯৪)। তিনি সৌরাষ্ট্রের জামনগরে জন্মগ্রহন করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-প্রদেশ ও ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী এমন কি বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনার সাধনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন প্রণামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিজানন্দস্বামীর (১৫৮১-১৬৫৫) প্রধান শিষ্য। তিনি আরব এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং স্ব-প্রয়াসে গুজরাটি, সংস্কৃত, আরবি-পারসি, সিন্ধী ও খড়ীহিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে বিভিন্ন ভাষার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। আর বিভিন্ন ভাষায় কাব্যরচনা করেন যা একাধারে ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থ দুই। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সতের, যা 'কুলজমস্বরূপ' নামে সংকলিত। এই বিশাল গ্রন্থে ৫২৭টি প্রকরণ বা সর্গ এবং ১৮৭৫৮টি শ্লোক সংকলিত। তাতে বিশ্বের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মূল সিদ্ধান্ত এবং আশয় সম্যকভাবে সুগ্রথিত। ধর্মের মূল সিদ্ধান্ত, কর্মকাণ্ড এবং 'শরাত' আদির বিধান ও তাতে নিহিত 'মিথকে'র সুস্পষ্ট সমন্বয় ঘটেছে। ধর্মের একটি পবিত্র এবং সর্বব্যাপী স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত

হয়েছে— যা যে-কোনো ধর্মের লোকের পক্ষে তাঁর নিজের ধর্মেরই সুসংস্কৃত যথার্থ রূপ বলে মনে হবে।

কুলজম-স্বরূপের অপর নামে 'শ্রীমৎ তারতম্য সাগর'। তাতে সংকলিত সতেরটি গ্রন্থ হল— শ্রীরাস-অঞ্জীল, শ্রীপ্রকাশ, জম্বুর, শ্রীষড়্‌ঋতু, শ্রীকলশ-তৌয়েত— এগুলি গুজরাতী ভাষায় রচিত; শ্রীপ্রকাশ, শ্রীকলশ, শ্রীসনন্ধ— হিন্দুস্তানী ভাষায় লেখা; শ্রীকীরন্তন-হিন্দী, গুজরাতী ও জাটী ভাষায় লেখা; শ্রীখুলাসা, শ্রীখিলওয়ত, শ্রীপরিক্রমা, শ্রীসাগর, শ্রীশৃঙ্গার— এই পাঁচটি খড়ী হিন্দীতে লেখা; শ্রীসিন্ধী জাটীতে এবং শ্রীমারফত-সাগর, শ্রীক্যামতনামা (ছোটা) এবং শ্রীক্যামতনামা (বড়া)— হিন্দুস্তানীতে রচিত।

বিষয়ের বিচারে মহামতির রচনা চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।— ১. আত্মবোধক, ২. ব্রহ্ম-ব্রহ্মৈশ্বর্য ও ব্রহ্মধাম-বোধক, ৩. সে যুগের ধর্মসমন্বয়াত্মক এবং ৪. শাস্ত্রীয়, পৌরাণিক ও বেদান্ত-তত্ত্ব সমীক্ষাত্মক। ভারতের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যগত সংহতির সাধক প্রাণনাথের কয়েকটি পঙক্তি—

১. সবকো প্যারী অপনী, জো হৈ কুল কী ভাখ।
তব মৈঁ কহুঁ ভাষা কিনকী, য়া মেঁ তো ভাষা কঈলাখ॥
বোলী জুদী সবন কী, ঔর সবকো জুদা চলন।
সব উরঝে নাম জুদে ঘর পর মেরে তো কহনা সবন॥

—সনন্ধ : ১।১৩-১৪

—নিজের নিজের ভাষা সকলের কাছে প্রিয়। কারণ তা কুল বা পরিবারের ভাষা। আর ভাষাও তো অসংখ্য। আমি কোন্ ভাষায় আমার কথা বলব, যাতে জনগণের কাছে পৌঁছয়? সকলের ভাষা ও চাল-চলন আলাদা আলাদা। তবে সবই মূলে এক, নামের পার্থক্য নিয়েই সকলে মারামারি করে। আর আমি তো বলব সকলের কাছে, সকলের জন্য।

২. হিন্দু কহেঁ 'হম উত্তম' মুসলমান কহেঁ 'হম পাক'।
যে দোনোঁ মুট্‌ঠী এক ঠৌর কী, এক রাখ দূজী খাক ॥

—খুলাসা : ৩।৩

—হিন্দু বলে 'আমি শ্রেষ্ঠ', আর মুসলমান বলে— 'আমি পবিত্র।' তাতেই তাদের গর্ব ও পার্থক্যবোধের ভ্রম সুস্পষ্ট। আসলে এ যেন একই ব্যক্তির দুইটি হাত! তার একটিতে 'ছাই' ও অপরটিতে ভস্ম।

এই সব কারণে ভাষার কচ-কচিতে না গিয়ে ইন্দ্রাবতী-রূপী প্রাণনাথ মধ্য যুগের হিন্দবী বা হিন্দুস্তানীকেই পুরোপুরি স্বীকার করেছেন। বলেছেন—

বিনা হিসাবে বোলিয়াঁ মিলেঁ সকল জহান।
সব কো সুগম জানকে, কহূঁগী হিন্দুস্তান ॥
বড়ী ভাষা য়েহী ভলী, জো সব মেঁ জাহের।
করণ পাক সবন কো, অন্তর মাহে বাহের ॥

—সনন্ধ ১।১৫-১৬

—পৃথিবীতে ভাষা অসংখ্য। সকলের পক্ষে সুগম বা সহজবোধ্য মনে করে হিন্দুস্তানীতেই বলছি। এই ভাষাটি বহুজন ব্যবহৃত, উত্তম এবং সকলের পক্ষে বোধগম্য। তার মাধ্যমে 'ভগবৎ-কথা' বলা হলে তা অন্তর ও বাহির সমানভাবে বিশুদ্ধ বা উজ্জ্বল করবে।

প্রাণনাথের ভাষাশৈলী সরল হলেও প্রতীকাত্মক। তাই তাঁর রচনা বুঝতে হলে প্রতীকের দিকে নজর রাখতে হয়। তাঁর চিন্তা-ভাবনা— একদিকে কবীর অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ। আধুনিক যুগের মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও প্রাণনাথের বাণী রূপলাভ করেছে দেখা যায়। গান্ধীজী 'প্রণামী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন— সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর মায়ের জন্ম প্রণামী পরিবারে হয়েছিল।[৯]

সবল সিংহ চৌহান (১৬৪৫-১৭৩২)—ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িককালে ইটাওয়ার নিকটবর্তী গ্রামের জমিদার সবলসিংহ চৌহান সমগ্র মহাভারতের কাহিনী দোহা ও চৌপাঈতে অনুবাদ করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থটি তিনি দীর্ঘ সময়ে সম্পূর্ণ করেন। কালিদাসের ঋতুসংহারেরও ভাষানুবাদ করেন। 'রূপবিলাস' এবং একটি ছন্দোগ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তবে তাঁর খ্যাতির মূলে রয়েছে 'ভাষা মহাভারতই'। ভাষায় লালিত্য ও কাব্য-লাবণ্য না থাকলেও তাঁর সহজ-সরল এবং সুবোধ মহাভারত কাহিনী সাধারণ পাঠককে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম।

বৃন্দ কবি (১৬৪৩-১৭২৩)—যোধপুরের মেড়তা নামক স্থানের অধিবাসী বৃন্দ কবি কৃষ্ণগড়ের রাজা রাজসিংহের গুরু ছিলেন। সম্ভবত ঔরঙ্গজেবের সৈন্যদলে রাজসিংহের সঙ্গে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঢাকা পর্যন্ত এসেছিলেন। ঢাকাতেই ঔরঙ্গজেব তনয় আজীমুশ্‌শানের শিক্ষার জন্য তিনি 'বৃন্দসতসঈ' (১৭০৪), 'শৃঙ্গারশিক্ষা' এবং 'ভাবপঞ্চাশিকা' রচনা করেন। শেষের গ্রন্থটি রসবিষয়ক। 'বৃন্দ সতসঈ'তে নীতি বিষয়ক সাতশো দোহা রয়েছে। এই নীতিসূক্তির জন্যই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাঁর কোনো কোনো দোহা বা তার অংশ বিশেষ লোকোক্তিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— 'ওয়া সোনা কো জারিয়ে জাসোঁ টূটে কান'। অর্থাৎ 'যে সোনায় কান ছেঁড়ে— পোড়াও ত্বরায় তারে'। বৃন্দ কবির দুইটি দোহা এখানে উদ্‌ধৃতি করছি।—

> হিতহু কৌ কহিয়ে ন তেহি, জো নর হোয় অবোধ।
> জ্যোঁ নকটে কো আরসী, হোত দিখায়ে ক্রোধ।
> সবৈ সহায়ক সবল কে, কোউ ন নিবল সহায়।
> পবন জগাওয়ত আগকো দীপহিঁ দেত বুঝায়॥
> —হিত-কথাও বলবে না, অবোধ জনেরে।
> নাক কাটারে আরশদান! রাগেই সে মরে॥

সবাই সহায় সবলের, দুর্বল-নিঃসহায়,
আগুনে জাগায় পবন প্রদীপে নিভায়।

সফল সূক্তিকারের মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাচন-তির্যকতা এবং সার্থক দৃষ্টান্ত সংযোজন-দক্ষতা একান্তভাবে প্রয়োজন। বৃন্দ কবির মধ্যে এই তিনটি গুণই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় তিনি নীতি-উপদেশক-কাব্যশাখায় সফল কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত।

বৈতাল (১৬৭৭)—জাতিতে 'বন্দীজন' (ভাট বা চারণ) বৈতাল রাজা বিক্রম সাহীর সভায় থাকতেন। বৃন্দের সম-সাময়িক এই নীতিমূলক কাব্য রচয়িতা কবি অন্য বিষয় নিয়েও সাদাসিদেভাবের ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন। তিনি কুণ্ডলিয়া (দোহা + রোলা) রচনাতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রত্যেক স্তবকের শেষে তিনি পৃষ্ঠপোষক বিক্রমের নামোল্লেখ করেছেন। সাধারণ জীবনের নানা বিষয়ই তিনি গ্রহণ করেছেন। 'বৈতাল কহে বিক্রম শোনো'— ভণিতার নীতি-কবিতা মধ্যযুগে বেশ জনপ্রিয় ছিল মনে হয়। কবি বৈতালের একটি কুণ্ডলিয়া—

মরৈ বৈল গরিয়ার, মরৈ ওয়হ অড়িয়ল টট্টূ।
মরৈ কর্কশা নারি, মরৈ ওয়হ খসম নিখট্টূ॥
ব্রাহ্মন সো মরি জায়, হাথ লৈ মদিরা প্যাওয়ৈ।
পূত ওয়হী মরি জায়, জো কুল মেঁ দাগ লগাওয়ৈ॥
অরু বেনিয়াও রাজা মরৈ, তবৈ নীদঁভর সোইয়ে।
বৈতাল কহৈ বিক্রম সুনৌ, এতে মরে ন রোইয়ে॥

—শ্রম-কাতুরে বলদ, অকর্মণ্য টাট্টু, মুখরা পত্নী, নিষ্কর্মা প্রেমিক, মদ্যপ ব্রাহ্মণ, কুল-কলংকী পুত্র এবং অন্যায়ী রাজার মৃত্যু হলে নির্বিঘ্নে সুখনিদ্রা যাওয়া দরকার। এদের মৃত্যুতে শোক পাওয়া উচিত নয়।

আলম (কবিতা রচনাকাল ১৬৮৩-১৭০৩)—জাতিতে ব্রাহ্মণ কবি, শেখ নামের একজন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়ে আলম নাম গ্রহণ

করেন। তাই 'শেখ-আলম' নামে রচিত তাঁর কবিতায় প্রেমের স্বচ্ছন্দ ধারার প্রবাহ পাওয়া যায়। 'আলম' নামে একজন কবি আকবরের সময়েও ছিলেন। কিন্তু এই আলম ছিলেন ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র মোআজ্জম শাহের কৃপাপুষ্ট। সুতরাং তিনি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। এই মোআজ্জমই পরে বাহাদুর শা নামে সিংহাসনে বসেন। আলম কবির রচনার একটি সংকলন— 'আলমকেলি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমানুরাগী কবির রচনায় হৃদয়-তত্ত্ব প্রধান হয়ে উঠেছে। শব্দ বৈচিত্র্য ও অনুপ্রাসের দিকে কবির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তবে তাঁর প্রেম বিষয়ক পদগুলির আবেদন পাঠকচিত্তে বিস্ময়কর তন্ময়তা এনে দেয়। প্রেমোন্মত্ত কবিরূপে আলমের স্থান উচ্চে। আলমের মুসলমান-হওয়া নিয়ে একটি বিচিত্র গল্প সুপ্রচলিত। একজন রঙরেজিনীর কাছে নিজের পাগড়ী রঙ করতে দিয়ে আলম ভুলে যান যে, পাগড়ির এক কোনায় বাঁধা একটি ছোটো কাগজে লেখা আছে—

'কনক ছরী-সী কামিনী কাহে কো কটি ছীন।'

রঙরেজিনী কাগজটি পড়ে দ্বিতীয় পংক্তিটি জুড়ে দেন—

—'কটি কো কঁঞ্চন কাটি বিধি, কুচন মধ্য ভরি দীন॥'

দুইজনের পংক্তি একত্র করলে— প্রশ্নোত্তরের বাংলা রূপটি দাঁড়ায়—

'কামিনী কনক-ছড়ি কটি কেন ক্ষীণ?'
'কটি-স্বর্ণ কাটি বিধি, কুচে করে লীন।'

শেখের ওই একটি পংক্তিই ব্রাহ্মণ কবির মনে প্রেম এবং অবশেষে তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ হল। তাঁর প্রেমে নবীন উল্লাসের স্বর ধ্বনিত। শেখও যে একজন কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহিলা ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আলমের রচনায় প্রেমোল্লাসের ব্যঞ্জনা নিঃসন্দেহে উচ্চকোটির—

প্রেম রঙ্গ পগে জগমগে জগে জামিনী কে,
জোবন কী জোতি জগি জোর উমগত হৈঁ।

মদন কে মাতে মতওয়ারে য়ৈসে ঘূমত হৈঁ,
ঝূমত হৈ ঝুকি ঝুকি ঝঁপি উঘরত হৈঁ ॥
আলম সো নবল নিকাঈ ইন নৈনন কী,
পাঁখুরী পতুম পৈ ভঁবর থিরকত হৈঁ।
চাহত হৈঁ উড়িবে কো, দেখত ময়ঙ্ক মুখ,
জানত হৈঁ রৈনি তাতেঁ তাহি মেঁ রহত হৈঁ ॥

—যৌবনের প্রেমে রঙীন আনন্দরাত্রি যাপনের পর চোখের অলস পাতা দুটি খুলছে আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপরূপ শোভা ধারণ করেছে চোখ দুটি। যেন পদ্মের পাপড়িতে ভ্রমর নৃত্য করছে। ভ্রমর উড়ে যেতে চায়, কিন্তু চাঁদ-মুখ দেখে ভাবছে এখনো রাত আছে, তাই আর উড়ে যেতে পারছে না।

গুরুগোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৮)—শিখ সম্প্রদায়ের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ একজন পরাক্রমী যোদ্ধা, সংগঠক এবং উচ্চস্তরের সাহিত্যিক ও বিদ্যাপ্রেমী ছিলেন। কাব্যরসিক ও কবিত্বশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতে বহু শিখ বারাণসীতে গিয়ে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। গোবিন্দ সিংহ উদারমনা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। হিন্দুত্ব ও আর্যত্ব সুরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন তিনি। নির্গুণোপাসক শিখ-সম্প্রদায়ের সঞ্চালক হয়েও তিনি সগুণোপাসক ধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল ছিলেন। হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিও তাঁর উদার শ্রদ্ধার তুলনা হয় না। পাঞ্জাবী-ভাষী হয়েও তিনি ব্রজভাষাতে সুন্দর ও সার্থক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সুনীতিপ্রকাশ', 'সর্বলোহপ্রকাশ', 'প্রেম-সুমার্গ', 'বুদ্ধি-সাগর' এবং 'চণ্ডীচরিত্র' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কৃষ্ণ-উপাসনা নিয়েও তিনি কিছু পদ রচনা করেছেন। চণ্ডী চরিত্রের চিত্রণ বেশ ওজস্বিতাপূর্ণ। চণ্ডী চরিত্রের অন্তর্গত 'দুর্গা সপ্তশতী'—কাহিনীটিও বেশ মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য। তাঁর ওজঃপূর্ণ যুদ্ধ বর্ণনার দুটি চরণ—

তাগিড় তীরং ছাগিড় বং ছুট্টে
বাগিড়দং বীরং লাগিড়দং লুট্টে।

প্রেমের পূজারী গুরুগোবিন্দ সিংহের একটি সবৈয়া—

ধ্যান লগায় ঠগ্যো সব লোগন সীস জটা নখ হাথ বঢ়ায়ে।
লায় ভভূত মল্যো মুখ উপর দেব-অদেব সবৈ ডহকায়ে॥
লোভ কে লাগে ফির্যো ঘর হী ঘর জোগ কে ন্যাস সবৈ বিসরায়ে।
লাজ গঈ কছু কাজ কর্যো নহিঁ, প্রেম বিনা প্রভু ধ্যান ন আয়ে॥

—মাথার জটা ও হাতের নখ লম্বা করে ধ্যানে বসে সবাইকে ঠকালে। নিজের গায়ে ও মুখে যজ্ঞের ছাই মেখে স্বর্গ-মর্ত্য সবই খোয়ালে। লোভে পড়ে বাড়ি-বাড়ি ফিরছ আর যোগের মূল কথাটিই ভুলে বসে আছো। এইভাবে লাজ-সম্ভ্রম সব খোয়ালে কিন্তু কোন কাজ তো হল না। আসলে আন্তরিক প্রেম না হলে প্রভুর ধ্যানও আসে না।

গুরুগোবিন্দ সিংহ সহজ সুরে সহজ কথা বলবার ক্ষমতা রাখতেন।

লালকবি—বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসী গোরেলাল পুরোহিতের (‘লালকবি’) পূর্ব-পুরুষগণ অন্ধ্রপ্রদেশের ভট্ট উপাধিধারী তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। লালকবি বুন্দেলখণ্ড-কেসরী মহারাজ ছত্রসালের গুণাবলী বর্ণনা করে ‘ছত্রসাল প্রকাশ’ রচনা করেন। ‘ছত্র-প্রকাশ’ ছাড়াও ‘ছত্র-প্রশস্তি’, ‘ছত্র-ছায়া’, ‘ছত্র-কীর্তি’, ‘ছত্র-ছন্দ’, ‘ছত্র-হজারা’, ‘ছত্রদণ্ড’, ‘ছত্রসাল শতক’ এবং ‘রাজবিনোদ বরওয়ৈ’ প্রভৃতি গ্রন্থেও তিনি আশ্রয়দাতার গুণগান করেছেন।

লালকবির খ্যাতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাব্য ‘ছত্র-প্রকাশের’ জন্যই। মহারাজ ছত্রসালের এই জীবন-চরিতটিতে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য দোহা ও চৌপাঈতে বিবৃত। কাব্যটিতে ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়ের প্রতি কবি সুবিচার করেছেন। ওজস্বিতা ও প্রবন্ধকাব্যাত্মকতা থাকলেও বাক্‌বৈচিত্র্য এবং কলাতুচারি

নেই। ভাষার স্বাভাবিক ওজোগুণেই পাঠক হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ে। যুদ্ধবর্ণনাও বেশ সজীব, জীবনের ব্যাপক সিদ্ধান্তও সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট। এই ধরণের সার্থক ঐতিহাসিক কাব্য হিন্দী সাহিত্যে বেশী নেই। 'বিষ্ণুবিলাস' গ্রন্থটিও লালকবি বিরচিত বলে মনে করা হয়। তাতে বরওয়ৈছন্দে নায়িকাভেদ বর্ণিত। 'ছত্রপ্রকাশ' থেকে যুদ্ধ বর্ণনা বিষয়ক কয়েকটি পংক্তি (চৌপাঈ ও শেষে দোহা)—

ছত্রসাল হাড়া তহঁ আয়ো। অরুন রঙ্গ আনন ছবি ছায়ো॥
ভয়ো হরৌল বজায় নগারো। সার ধার কো পহিরনহারো॥
দৌরি দেস মুগলন কে মারৌ। দপটি দিলী কে দল সংহারৌ॥
এক আন শিবরাজ নিবাহী। করৈ আপনে চিত কি চাহী॥
আঠ পাতসাহী ঝক ঝোরে। সূবনি পকরি দণ্ড লৈ ছোরে॥
কাটি কটক কিরবান বল, বাঁটি জম্বুকনি দেহু।
ঠাটি যুদ্ধ য়হি রীতি সোঁ, বাঁটি ধরনি ধরি লেহু॥

—ছত্রসাল উপস্থিত হওয়াতে প্রত্যেকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নাকাড়া বেজে উঠল— হৈ-হৈ পড়ে গেল। আর সবুর সয়না কারো, মোগলদের ওপর সব ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাপটে দিল্লীর সৈন্য বিনষ্ট করল। তারপর ছত্রসাল স্বাধীনভাবে আচরণ করতে লাগলেন। তাঁর মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাটি পূর্ণ হল। আটজন বাদশাহকে নাড়া দিয়ে নিরস্ত্র ও পদানত করলেন। এইভাবে খড়্গাঘাতে শত্রুসৈন্য বধ ও শৃগালের ভক্ষ্য করে শত্রুরাজ্য অধিকার করলেন।

ঘনানন্দ (১৬৮৯-১৭৩৯)—ঘনানন্দ বুলন্দ শহরে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরে দিল্লীতে চলে আসেন। কলম ও কবিত্বগুণে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের মীরমুন্সীর পদ লাভ করেন। ঘনানন্দ একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিল্পী ছিলেন। রাজদরবারের নর্তকী 'সুজান', তাঁর বীণাবাদন এবং নৃত্যের মাধুর্যে কবিকে মুগ্ধ করে নিয়েছিলেন। এই আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত প্রগাঢ় প্রীতিতে রূপান্তরিত

হয়। অবশেষে একদিন কবির আচরণে বাদশাহ অপমানিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেন। নির্বাসিত কবি সঙ্গে 'সুজান'কেও নিয়ে যেতে চান। কিন্তু 'সুজান' অসম্মতি জানায়। ফলে কবি বৃন্দাবনে গিয়ে বিরক্ত জীবন যাপনে প্রয়াসী হন। পরে সেখানেই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা ঈশ্বরোন্মুখী করে তোলেন। সুজানও বাহ্যিক অস্তিত্বের অতীত হয়ে তাঁর অন্তরের প্রেম-ভাবনাতে লীন হয়ে গেল। তাই ঘনানন্দের প্রত্যেকটি পদেই অন্তর্যামিনী সুজানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবি ঘনানন্দ লৌকিক প্রেম থেকে আধ্যাত্মিক প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই ঘনানন্দের কাব্যকে 'প্রেম-কাব্য'-আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এতে আছে দুর্লভ তন্ময়তা, ব্যক্তিগত অনুভূতির সত্যতা ও তীব্রতা। যার পরিচয় রয়েছে ঘনানন্দের এই পংক্তিতে—

লোগ হৈঁ লাগি কবিত্ত বনাওয়ত,
মোহিঁ তো মেরে কবিত্ত বনাওয়ত।
—লোকে করে কবিতা সৃজন,
কবিতায় আমার সৃজন।

ঘনানন্দ 'সুজানসাগর', 'বিরহলীলা', 'কোকসাগর', 'রস-কেলিবল্লী' এবং 'কৃপাকন্দ' রচনা করেন। তাছাড়া কবিত্ত-সবৈয়া প্রভৃতির একটি সংকলনে তাঁর চারশোটি পদ সংকলিত। কৃষ্ণভক্তিমূলক একটি বৃহৎ গ্রন্থে তিনি প্রিয়াপ্রসাদ, ব্রজব্যবহার, বিয়োগবেলী, কৃপাকন্দ নিবন্ধ, গিরিগাথা, ভাবনাপ্রকাশ, গোকুল বিনোদ, ধাম-চমৎকার, কৃষ্ণ-কৌমুদী, নামমাধুরী, বৃন্দাবনমুদ্রা, প্রেমপত্রিকা, রসবসন্ত প্রভৃতি বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর বিরহলীলা গ্রন্থটির ভাষা ব্রজের কিন্তু ছন্দ পারসি।

বিশুদ্ধ সরস ও শক্তিশালী ব্রজভাষায় তাঁর সমকক্ষ কবি খুব কমই আছেন। তাঁর হাতে ব্রজভাষা যেন পরিণতি ও মাধুর্য লাভের প্রতীক্ষায় ছিল। বিরহের ভাব বর্ণনায় কবির সূক্ষ্মবোধ এবং তার শিল্প-

সুন্দর অভিব্যক্তি অতুলনীয় বলা যায়। শৃঙ্গার রসের কবি তাঁর প্রেমিক মনের যে ভাবটি যখন ব্যক্ত করতে চেয়েছেন— সেই ভাবের অনুকূল ভাষা যেন আপনা-আপনি এসে গেছে। এমনই ছিল ভাষার উপর ঘনানন্দের অধিকার। তিনি ভাষাকে নূতন অভিব্যঞ্জনা দান করেছেন। আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের মতে— 'ঘনানন্দজী' সেই সব দুর্লভ কবিদের একজন, যাঁরা ভাষার ব্যঞ্জকতা বৃদ্ধি করেছেন। আপন-ভাবনার বিরল রূপ-রঙের ব্যঞ্জনার জন্য ভাষার এমন দ্বিধাহীন প্রয়োগ হিন্দীর মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে আর কেউ করেন নি। ভাষা বা শব্দের লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা-শক্তির প্রয়োগসীমা কোথায় তাও তিনি পরখ করেছেন।[১০]

প্রেমের ব্যঞ্জনায় ঘনানন্দ অদ্বিতীয়। প্রেমের ঐকান্তিক সাধনাই তাঁর জীবনের সাধ্য ও লক্ষ্য। সহজভাবে প্রিয়ের কাছে আত্মসমর্পণের মতো সুখ নেই। তাই তাঁর প্রেম ছল-চাতুরী হীন, সরল-শুভ্র। তিনি ভগবানকে উদ্দেশ করে বলেছেন।—

তুম কৌন ধোঁ পাটী পঢ়ে হো ললা,
মন লেহু পৈ দেহু ছটাক নহী।
—নন্দলাল কেমন ধারা শিখিয়াছ আঁক,
মন-প্রমাণ নাও, তবু দাওনা ছটাক।

ঘনানন্দের কাব্য অস্বীকৃত ও ব্যথিত প্রেমিকের বেদনার করুণ কাহিনী। এই কাহিনী অশ্রুতে লেখা এবং আর্তির সুরে গাওয়া। স্বচ্ছন্দ কাব্যধারায় ঘনানন্দের সৌন্দর্যচিত্র সর্বাধিক তরঙ্গায়িত, বর্ণময়ও রসার্দ্র সৃষ্টি। মিলন ও বিরহ দুই-ই সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর কাব্যে চিত্রিত। কিন্তু মিলন মৌন এবং বিরহ মুখর। বিরহী আত্মা প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হতে চায় কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে তা জানে না।—

পাউঁ কহাঁ হরি হায় তুম্হেঁ
ধরনী মেঁ ধসৌ কৈ অকাসহিঁ চীরৌ।

—হায়! কোথায় তোমায় পাই, ওগো হরি!
ধরণী-প্রবেশ করি, অথবা গগন ফেলি চিরি।

সে যাই হোক স্বচ্ছন্দ কবি ঘনানন্দ শৃঙ্গারের উদাত্ত দিকটিই গ্রহণ করেছেন। সে যুগের কবিদের মধ্যে ভক্তির বিভোরতা ছিল না। কিন্তু ঘনানন্দ তার ব্যতিক্রম। শৃঙ্গার-রস সৃষ্টিতে অন্য শৃঙ্গারী কবিদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের লক্ষ্য ও উপলক্ষ্যে পার্থক্য ছিল। ঘনানন্দের কয়েকটি পংক্তি—

কারী কূর কোকিল কহাঁ কো বৈর কাঢ়তি রী,
কূকি কূকি অবহী করেজো কিন কোরিলৈ।
পৈড় পরৈ পাপোঁ য়ে কলাপী নিসি দ্যৌস জ্যোঁ হো,
চাতক রে ঘাতক হ্বৈ তুহূ কান ফোরি লৈ॥
আনন্দ কে ঘন-প্রান জীবন সুজান বিনা,
জানি কৈ অকেলী সব ঘরোদল জোরি লৈ।
জৌ লোঁ করেঁ আওয়ন বিনোদ বরসাওয়ন ওয়ে,
তৌ লোঁ রে ডরারে বজমারে ঘন-ঘোরি লৈ॥

—ক্রূর কালো কোকিল না জানি কবেকার শত্রুতা-শোধ করছে, কুহু তানে হৃদয় জর্জরিত করে তুলেছে। কলাপ সহ রজনী অতিক্রান্ত হলে বাঁচা যায়। চাতক ঘাতক হয়ে কান কালা করে তুলছে। ঘনানন্দের প্রাণ-মন সব যে এক সুজানই, তাই তার অভাব মোচনের জন্য সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে মন চায়। যতক্ষণ সে না এসে কৌতুকের কথা বলবে ততক্ষণ ঘন-ঘোর মেঘের দল ভয়াতুর করতেই থাকবে। ঘনানন্দের আরও কয়েকটি পংক্তি—

নিসি দ্যৌস খরী উর মাঁঝ অরী ছবি রঙ্গভরী মুরি চাহনি কী।
তকি মোরনি ত্যোঁ চখ ঢোরি রহৈঁ ঢরিগো হিয় ঢোরনি বাহনি কী॥
চট দৈ কটি পৈ বট প্রান গয়ে, গতি সোঁ মতি মেঁ অবগাহনি কী।
ঘন আনন্দঁ জান লখ্যো জব তে জক লাগিয়ৈ মোহি করাহনি কী॥

—একবার নায়ক, নায়িকার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে আবার মুখ ফেরাল এবং নিজের পথে পা বাড়াল। নায়কের মুখ ফেরানোর সময় নায়িকার মন তার দিকে এমন ভাবে ঢলে পড়ল যেমন নালায় জল এসে গড়িয়ে পড়ে। কোমরে বাঁক দিয়ে নায়িকার হৃদয় সমুদ্রে ডুব দেবার কৌশলে নায়ক তা পার হয়ে গেল। আর নায়িকার 'দুখের নাহি ওর'। এখানে অতি সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির সুকৌশল প্রকাশ ঘটেছে।

গিরিধর কবিরাজ (১৭১৩)—পেশায় ভাট (চারণ কবি) ছিলেন বলে মনে করা হয়। সহজ-সরল-আটপৌরে জীবনের নানা-সমস্যা ও বিষয় নিয়ে তিনি কুণ্ডলিয়া লিখেছেন। নীতিকথা রচনায় তাঁর খ্যাতি বৃন্দ ও বৈতাল কবির খ্যাতিকে অতিক্রম করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। অসাধারণ জনপ্রিয় কবি ছিলেন গিরিধর কবিরাজ। তাঁর পদে 'সাঁই' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সাঁই' কবিপত্নীর নাম। কবিরাজ বা 'কবিরায়' তাঁর উপাধি। মধ্যযুগের গৃহস্থদের সদুপদেশ দাতা কবিরূপে গিরিধরের স্বীকৃতি আজও অম্লান বলা যায়। তাঁর রচনায় কাব্যময়তার অভাব থাকলেও দৈনন্দিন জীবনের তথ্যে তা সমৃদ্ধ। তিনি লোকহিতৈষী কবি। তাই কবিতাকার নয় পদ্যকার-রূপেই তিনি স্বীকৃত। তাঁর ভাষা সহজ-সরল ও স্পষ্ট। এই স্পষ্টতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধিই তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। গিরিধর কবিরাজের কবিতায় ব্রজভাষার সঙ্গেই মাঝে মাঝে খড়ীবোলীও প্রযুক্ত।—

> রহিয়ে লটপট কাটি দিন বরু ঘামহি মেঁ সোয়।
> ছাঁহ ন ওয়াকী বৈঠিয়ে জো তরু পতরো হোয়॥
> জো তরু পতরো হোয় একদিন ধোখা দৈহেঁ।
> জা দিন বহৈ বয়ারি টূটি তব জর সে জৈহেঁ॥
> কহ গিরিধর কবিরায় ছাঁহ মোটে কো গহিয়ে।
> পাতা সব ঝরি জাঁয় তঊ ছায়া মেঁ রহিয়ে॥

—ঘামে ভিজে দিন কাটুক, বরং রোদে ঘুম দাও, কিন্তু কদাচ সরু গাছের ছায়ায় বসবে না। সরুগাছ একদিন না একদিন বিপদে ফেলবেই। জোরে বাতাস দিলে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে পড়ে যাবে। তাই মোটা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়। তার সব পাতা ঝরে গেলেও সে ছায়া দান করে।

সূদন চতুর্বেদী—মথুরার অধিবাসী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান সূদনের পিতার নাম বসন্ত চতুর্বেদী। সূদন ভরতপুরের রাজা সূরজমল সুজান সিংহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। আশ্রয়দাতার চরিত্র অবলম্বনে তিনি 'সুজানচরিত' কাব্য রচনা করেন। যোদ্ধা সুজান সিংহ কবিও ছিলেন। সূদন যোগ্যতার সঙ্গে সুজান সিংহের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। কাব্যটি সুবৃহৎ। তাতে ১৭৪৫-১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী বর্ণিত। কাব্যটি রচিত হয় ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে। ইতিহাসের বর্ণনা সুবিস্তৃত। গ্রন্থটির লঘু-ভাবাত্মক এবং কিছু অরুচিকর অংশ পীড়াদায়ক। অতি কথন ও অতি-রঞ্জনের ফলে কাব্যটির সাহিত্যমূল্য হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্নপ্রকার বস্তুর নাম পরিচয় এবং বেশ কয়েকটি ভাষা নিয়ে যেন খেলা করেছেন কবি। ব্রজভাষা, খড়ীবোলী ও পাঞ্জাবির মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর ভাষায়। শব্দ ব্যবহারেও কবি অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। শব্দ ভেঙে, দ্বিত্ব ঘটিয়ে এবং শুধু ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে তিনি যুদ্ধোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির হাস্যকর প্রয়াস করেছেন। অবশ্য তাতে কবির ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধবর্ণনাই প্রধান হওয়ায় কাব্যটি সাতটি জঙ্গ বা যুদ্ধে বিভক্ত। কবি নানাপ্রকার ছন্দের ব্যবহারেও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।—

> তুহুঁ ওর বন্দূক জহঁ চলত বেচূক,
> রব হোত ধুক ধুক, কিলকার কহুঁ কূক।
> কহুঁ ধনুষ-টঙ্কার জিহি বান ঝংকার
> ভট দেত হুঙ্কার সংকার মুঁহ সূক॥

কহুঁ দেখি দপটন্তু, গজ বাজি ঝপটন্তু,
অরি ব্যূহ লপটন্তু, রপটন্তু কহুঁ চুক।
সমসের সটকন্তু, সর সেল ফটকন্তু
কহুঁ জাত হুটকন্তু, লটকন্তু লগি ঝ্ুক॥

—বন্দুক ও তীরধনু নিয়ে যুদ্ধের বর্ণনায় কবি-উপযোগী ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিন্যাসে অপূর্ব কোলাহল সৃজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সূদন কবির রচনা-প্রবণতা, ভাষার কারসাজি, শব্দাড়ম্বর বা ধ্বনিঝংকার প্রিয়তা অষ্টাদশ শতকের রাজাশ্রিত বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অনুরূপ প্রবণতার সঙ্গে তুলনীয়।

কবিবোধা (১৭৪৭-১৮০৩)—বাঁদা জেলার রাজাপুরের সরযূপারী ব্রাহ্মণ। প্রকৃত নাম বুদ্ধসেন। কিন্তু 'বোধা' নামেই পরিচিত। ব্রজভাষা, সংস্কৃত এবং পারসি ভাষার তিনি অধিকারী ছিলেন। কবি ঘনানন্দের মতোই তাঁর সম্পর্কেও প্রেমানুরাগের কাহিনী প্রচলিত। পান্নার রাজদরবারের সুভান বা সুব্হান নামের এক রূপোপজীবিনীর প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি ছিল। এক সময় তিনি রাজার সামনেই অভিনয়ের ভঙ্গিতে আচরণ করে বসেন। তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজা ছ-মাসের জন্য তাঁকে নির্বাসনে পাঠান। সেই সময় তিনি 'বিরহবারীশ' কাব্যটি রচনা করেন। ছয় মাস পরে রাজ্যে ফিরে এসে তিনি কবিতা শুনিয়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করলে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, 'কি চাও?' কবির উত্তর— 'সুভান আল্লাহ'। প্রসন্ন হয়ে রাজা কবির প্রত্যাশা পূর্ণ করেন। 'ইশ্কনামা', 'বারহমাসী', 'ফ্ূলমালা' ও 'পক্ষীমঞ্জরী' নামে আরও কয়েকটি কাব্য তিনি রচনা করেন। বোধার রচনায় প্রেমানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ লক্ষিত হয়। প্রেমের স্বরূপ ও পথ নিরূপণে তিনি রীতিমুক্ত কৌশল গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রেমার্তির চিত্রণ বেশ মর্মস্পর্শী। ব্যাকরণগত দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও তাঁর ভাষা বেশ গতিশীল এবং প্রবাদ বচন ও বাগ্ধারায় পুষ্ট। বাউণ্ডুলেপনা থাকলেও

কবি বোধার ভাবুকতা ও রসজ্ঞতা অবশ্যই স্বীকার্য। বোধার রচনা থেকে দুইটি অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

১. অতি খীন মৃনাল কে তারহুঁ তেঁ
তেহি উপর পাঁওয় দে আবনো হৈ,
সুঈ-বেহ হূঁ বেধি সকী ন তহাঁ
পরতীত কো টাঁড়ো লদাবনো হৈ ॥
কবি বোধা অনী ঘনী নেজহুঁ তেঁ
চঢ়ি তাপৈ ন চিত্ত ডরাবনো হৈ,
য়হ প্রেম কো পন্থ করাল মহা,
তরবারি কী ধার পৈ ধাবনো হৈ ॥

—অতি ক্ষীণ মৃণালের তারের উপর হাঁটা, যেখানে ছুঁচ ফোটানো কঠিন সেখানে প্রত্যয়ের অনুপ্রবেশ, নির্ভীকচিত্তে বল্লমের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে অবস্থান— প্রভৃতির মতোই প্রেমের পথ ভয়ংকর। এ যেন তরবারির ধারের উপর ছোটা।

এই অংশে কবি প্রেমের পথের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। এবার তাঁর রাধার পায়ে প্রেমনিবেদনের একটি পদ দেখা যাক—

অনতৈঁ নিত কাহুকে হোন ন পাওয় সমান কে লোগ অজোগিয়া রে।
দুখ তেরো কহা সুনি হৈঁ দুখিয়া হৈব রহে সব আপহী সোগিয়া রে ॥
করৌ বার নৈঁ তো পৈ বুধা বরহী পুরহুত কে পূরন ভোগিয়া রে।
বসু রে বসু রাধে কে পাঁয়ন মেঁ মন জোগিয়া প্রেম বিয়োগিয়া রে ॥

—এ সংসারে অধিকাংশ লোকই অ-যোগী এবং ভোগী। সুতরাং দুঃখী ছাড়া দুঃখ-কাতর মনের কথা কে আর শুনবে। তাই কবি যোগী ও প্রেম-বিয়োগী মনকে শ্রীরাধার চরণে আত্মোৎসর্গ করতে বলেছেন।

এই কবিতায় বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের ভক্তি-প্রেমোল্লাসের অনুভূতির সাম্য মেলে।

দ্বিজদেব (১৮২৩-১৮৭২)—রীতিমুক্ত কাব্যধারার একজন প্রসিদ্ধ

কবি হলেন দ্বিজদেব। তিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মানসিংহ। তাঁর দুইটি গ্রন্থ— 'শৃঙ্গারবত্তীসী' ও 'শৃঙ্গার লতিকা', পাওয়া যায়। ভাষার সরলতা এবং ভাবের আকর্ষণই তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা লাভের প্রধান কারণ। তাঁর ঋতুবর্ণনায় উদ্দীপ্তভাবের ব্যঞ্জনাই অধিক।—

> ন ভয়ো কছু রোগ কো যোগ দিখাত
> ন ভূত লগৌ ন বলায় লগী।
> ন কহুঁ কোউ টোনো ডিঠৌনো কিয়ৌ
> নহিঁ কাহূ কী কীনী উপায় লগী॥
> দ্বিজদেব জূ নাহক হী সবকে
> হিয়ে ঔষধি মূল কী চায় লগী।
> সখি বীস্ব বিসে নিসি য়াহী কহুঁ
> বন বৌরে বসন্ত কী বায় লগী॥

—আধি-ব্যাধি, ভূত-প্রেত, মন্ত্র-টন্ত্র কোনো কিছুরই ক্রিয়া বা প্রভাব নেই, তবু অকারণে লোকে ঔষধের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আসলে স্নিগ্ধ-মধুর রাত যে এমন মত্ততা এনে দিয়েছে তার কারণ মঞ্জরিত অরণ্যে সৌরভপুষ্ট বসন্তের বাতাস লেগেছে।

কবি মুবারক (১৫৮৩)—সৈয়দ মুবারক আলি 'বিলগ্রাম' নিবাসী ছিলেন। ভালো পারসি এবং সংস্কৃত জানতেন। সপ্তদশ শতকে তিনি কাব্য-চর্চা শুরু করেন। 'অলকশতক' ও 'তিলশতক' গ্রন্থ দুইটিতে তিনি সুন্দরী রমণীর 'অলক' ও 'তিলে'র সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন অনন্য ভঙ্গিতে। তাঁর কোনো কোনো রচনায় স্বচ্ছন্দ প্রেমধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'অলক-শতক' ও 'রোমাবলী শতক' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের আদর্শ মুবারক অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁর খুচরো রচনায় উদারচিত্ততা ও নবীন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।—

> হমকো তুম এক, অনেক তুম্হেঁ ; উনহীঁ কে বিবেক বনায়ে রহো।
> ইত আস তিহারী, বিহারী উতৈঁ ; সরসায় কৈ নেহ সদা নিবহো।

করনী হৈ 'মুবারক', সোই করো ; অনুরাগ লতা জিন বোয়ে দহো।
ঘনশ্যাম ! সুখী রহো আনন্দ সোঁ, তুম নীকে রহো উনহী কে রহো।

—হে ঘনশ্যাম ! আমার তুমি একা, কিন্তু তোমার তো অনেকে আছে, তুমি তাদের মন জুগিয়েই চল। আমার মনে তোমার প্রত্যাশা অক্ষুণ্ণ থাক, তুমি সরস স্নেহে তাদের আনন্দ দান কর। হে মন! আমার যা করণীয় তা যেন করতে পারি, যে অনুরাগ-লতা রোপণ করেছি তাকে যেন বিনষ্ট না করি। হে ঘনশ্যাম, তুমি সুখে থাকো আনন্দে থাকো, ভালো থাকো, তাদেরই থাকো।

কবি ঠাকুর—হিন্দী সাহিত্যে ঠাকুর নামে পরিচিত তিন জন কবির কথা জানা যায়। তাঁদের একজন বুন্দেলখণ্ডের কায়স্থ এবং অপর দুই-জন অসনীর ব্রহ্মভট্ট পরিবারের সন্তান। এই তিন কবির রচনা এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে, পার্থক্য করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তবে বুন্দেলখণ্ডীয় ঠাকুরের রচনায় স্থানীয় প্রবাদবচন, বাগ্‌ধারা এবং ভাষার বৈশিষ্ট্য কতকটা লক্ষিত হয়।

বুন্দেলখণ্ডের লালা ঠাকুর দাসের (১৭৬৬-১৮২৩) পূর্বপুরুষগণ লাখনাউয়ের অধিবাসী ছিলেন। কবিজীবনের প্রারম্ভেই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জৈতপুরের রাজা পারীছতের সভাকবির সম্মান লাভ করেন। মাঝে মাঝে কবি পদ্মাকরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও কবিত্ব শক্তির পরীক্ষা হত। ঠাকুরদাস স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বদেশ প্রেমিক কবি ছিলেন। তিনি কেবল কবিই ছিলেন না, উদার হৃদয়, পরোপকারী, বিচক্ষণ ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। কবিতার সংকেতের সাহায্যে তিনি আশ্রয়দাতা রাজাকে একবার শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেন। তাঁর কবিতার একটি সংকলন 'ঠাকুরঠসক' (ঠাকুরবিচিত্রা) নামে প্রকাশিত। তবে তাতে যে অন্য ঠাকুর কবিদের রচনাও সংকলিত হয়েছে— তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভাব, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির বিচারে ঠাকুরদাসের কবিতা সহজ, সরস ও স্বাভাবিক। অযথা শব্দাড়ম্বর নেই, ব্যর্থ কল্পনার আতিশয্যও নেই। স্ত্রী-পাত্রের মুখে প্রবাদবাক্য ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার লক্ষ করার মতো। লোকোক্তির যেমন সুন্দর ও সার্থক প্রয়োগ তাঁর রচনায় মেলে তেমনটি অন্যত্র দুর্লভ। বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর কবিতার অপর এক বিশিষ্টতা। স্বচ্ছন্দতাপ্রিয়, মরমী ও সহানুভূতিশীল কবি ঠাকুরদাসের পছন্দ ছিল না কবিতা রচনার গতানুগতিক ধারা। তাই তাঁর রচনায় কোথাও উৎসব-অনুষ্ঠানের আন্তরিক চিত্রণ মেলে তো কোথাও প্রেমোন্মত্ততা, আবার কোথাও বা মানুষের ক্ষুদ্রতা, কুটিলতা এবং দুঃশীলতার জন্য ক্ষোভ ও তিরস্কার। এখানে তাঁর রচনার নমুনা হিসাবে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যাক্।

১. অবকা সমুঝাবতী কো সমুঝৈ
বদনামী কো বীজ তো বো চুকী রী।
তবতো ইতনো ন বিচার কর্যো
য়হি জালপরে কহো কো চুকী রী॥
কবি ঠাকুর জো রস রীতি রঙ্গী
সব ভাঁতি পাতিব্রত খো চুকী রী।
অরী নেকীবদী জো লিখী হতী ভালমেঁ
হোনী হতী সো তো হো চুকী রী॥

—আর ভালো মন্দ বিচারে কী ফল। নিন্দার বীজ তো উপ্ত হয়েই গেছে। তখন কিছুই বিচার না করে ধরা পড়েছি, পুরোপুরি সতীত্ব হারিয়েছি। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কপালের লিখন কে আর খণ্ডাবে!

২. অপনে অপনে সুঠি গেহন মেঁ চঢ়ে
দোউ সনেহ কী নাওয় পৈ রী!
অঙ্গনান মেঁ ভীঁজত প্রেম ভরে,
সময়ৌ লখি মৈঁ বলি জাঁওয় পৈ রী॥

কহৈ ঠাকুর দোউন কী রুচি সোঁ
রঙ্গ হৈবে উমড়ে দোউ ঠাঁওয় পৈ রী।
সখী ! কারী ঘটা বরসৈ বরসানে পৈ,
গোরী ঘটা নন্দ গাঁওয় পৈ রী॥

—সুন্দর সুরুচিপূর্ণ আপন-আপন গৃহে উভয়েই প্রেমের নায়ে উঠেছে। একই সময় দুই জনকে দুই স্থানে দুই প্রাঙ্গণে ভিজতে দেখে কবির বিস্ময় ও আনন্দের সীমা নেই। রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের রুচি, মনোভাব ও অনুভূতির উল্লাসে দুই স্থানই যেন উপচে পড়ছে। রাধার গৃহে হচ্ছে ঘনশ্যাম মেঘের বর্ষণ আর নন্দ-গৃহে গৌর মেঘের।

এখানে সাবলীল প্রবাহপূর্ণ ভাষায় প্রেমানুভূতির সূক্ষ্ম ও সুন্দর প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অন্য দুই-জন ঠাকুর কবির একজন (১৬৪৩) সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর রচনাও বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ছিল মনে হয়। কবিতা রচনায় তিনিও স্বচ্ছন্দতাবাদী ছিলেন। দ্বিতীয় জন (কবিতা রচনাকাল ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ) 'সতসঈ বরনার্থ' নামে বিহারী সতসঈ'র একটি টীকা রচনা করেছেন। তিনিও সরস কবিতায় ভাব ও দৃশ্যকে স্বাভাবিক করে তুলতেন। এই দুই-জন কবির রচনা যে 'ঠাকুর ঠসক' গ্রন্থে কিছু পরিমাণে সংকলিত হয়েছে—সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রসনিধি (মৃত্যু ১৬৬০)—দতিয়া রাজ্যের অধিপতি পৃথ্বীসিংহ 'রসনিধি' নামে কবিতা লিখতেন। তিনি ভালো পারসি জানতেন। তাঁর প্রেম ব্যঞ্জনায় উর্দুর 'তর্জেবেয়াঁ'র বাকচাতুর্যের প্রভাবও লক্ষিত হয়। মুক্তক-শৃঙ্গার শ্রেণীর তাঁর 'রতন হজারা' কাব্যগ্রন্থটি 'বিহারী সতসঈ'র অনুসরণে রচিত। বাক্‌চাতুরী ও ভাবৈশ্বর্যে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। রসনিধির রচনায় মাঝে মাঝে বিহারীর দোহার কোনো কোনো ভাবের হুবহু উদ্‌ধৃতিও চোখে পড়ে।—

কুহূ নিসা তিথি পত্র মেঁ বাচন কো রহিজায়॥
তুব মুখ সসি কী চাঁদনী উদয় করত হৈ আই ॥
—কুহকিনী নিশির তিথির পত্র পড়ে ওঠা বড়ো দায়।
তব মুখ-চন্দ্রের কৌমুদী শুধু আলোকিত করে তায়॥

এই ভাবটিই বিহারীর একটি দোহায় পাওয়া যায়—

পত্রা হী তিথি পাইয়ত, বা ঘর কে চহুঁ পাস।
নিসি দিন পূনো হী রহত, আনন তমো উজাস ॥
—পাঁজির তিথির মূল্য কি, সে ঘরের চারিধার ;
অষ্টপ্রহর পূর্ণিমা যেথা, উজ্জ্বল আননে তাঁর।

দীনদয়াল গিরি (১৮০২-১৮৫৮)—বারাণসীর গোস্বামী বংশের সন্তান। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের পিতা গোপালচন্দ্রজীর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল, তিনি ভালো সংস্কৃত জানতেন। তাঁর 'অন্যোক্তি কল্পদ্রুম' (১৮৫৫) হিন্দীসাহিত্যের একটি দুর্লভ কৃতি। এটি ছাড়াও তিনি 'অনুরাগ বাগ' (১৮৩১), 'বৈরাগ্য দিনেশ' (১৯০৬), 'বিশ্বনাথ নবরত্ন' এবং 'দৃষ্টান্ত তরঙ্গিনী' (১৮২২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ভাষা বেশ সহজ ও মার্জিত। ভাবুকতার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের একটি প্রবণতাও তাঁর ছিল। 'অন্যোক্তি' বা রূপকার্থ প্রয়োগে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। যেমন—

চল চকঈ তেহি সর বিষৈ জহঁ নহিঁ রৈন বিছোহ।
রহত এক রস দিবস হী, সুহৃদ হংস সংদোহ ॥
সুহৃদ হংস সন্দোহ কোহ, অরু দ্রোহ ন জাকো।
ভোগত সুখ-অম্বোহ মোহ দুখ হোয় ন তাকো ॥
বরনৈ দীনদয়াল ভাগ বিন জায় ন সকঈ।
পিয় মিলাপ নিত রহৈ, তাহি সর চল তূ চকঈ ॥

—হে চক্রবাক্ সেই সরোবরে নিয়ে চল, যেখানে সুহৃদ হংসের দল দিবসে এক হয়ে থাকে। রাত্রেও বিচ্ছেদ-ব্যথা ভোগ করে না।

তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষভাব নেই, সবাই মোহ-দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখ ভোগ করে। সৌভাগ্য ছাড়া যেখানে যাওয়া অসম্ভব, হে চক্রবাক্! আমাকে সেই সরোবরে নিয়ে চল।

নাগরীদাস (১৬৯৯)—কৃষ্ণগাড়ার রাজা সাবন্ত সিংহ হিন্দীসাহিত্য জগতে 'নাগরীদাস' নামে পরিচিত। গৃহ-কলহ ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে বিরক্ত হয়ে তিনি বৃন্দাবনে এসে বসবাস শুরু করেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তিতে লীন ছিলেন। তিনি প্রায় পঁচাত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'সিঙ্গার সাগর', 'গোপীপ্রেম প্রকাশ', 'ভোরলীলা', 'ভোজনানন্দাষ্টক', 'জুগল রসমাধুরী', 'ফ়ুলবিলাস', 'গোধন আগমন', 'দোহন-আনন্দ', 'ইশ্‌ক-চমন', 'রাস কে কবিত্ত', 'চাঁদনী কে কবিত্ত', 'দিবারী কে কবিত্ত', 'হোরী কে কবিত্ত', 'হিঁডোরা কে কবিত্ত', 'বৈরাগ্য বল্লী', 'শিখনখ', 'নখশিখ', 'রামচরিত্রমালা', 'বর্ষাঋতু কী মাঁঝ', 'শরদ কী মাঁঝ', ও 'বসন্ত বনর্ন' উল্লেখযোগ্য। বিষয়-কৃতির বৈচিত্র্য কবির ভক্তি ও লোক-প্রীতির পরিচায়ক। তাঁর রচনায় ব্রজভাষার মাঝে মাঝে খড়ীবোলীর রূপও উঁকি দেয়।—

ইস্ক উসী কী ঝলক হৈ জ্যোঁ সূরজ কী ধূপ।
জহাঁ ইস্ক তহঁ আপু হৈঁ কাদির নাদির রূপ।
—তাঁরই প্রকাশ প্রেম, সূর্যরশ্মি সম।
যথা প্রেম তথা তিনি— আর্ত অনুপম॥

গিরিধর দাস (১৮৩৩-১৮৬০)—ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের পিতা গোপালচন্দ্র ব্রজভাষার প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। 'গিরিধরদাস' তাঁর উপনাম। তিনি চল্লিশটি গ্রন্থ লিখেছেন। তার মধ্যে 'জরাসন্ধবধ মহাকাব্য', 'ভারতী ভূষণ', 'ভাষা ব্যাকরণ' ও 'নহুষ নাটক' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি নানাভাবে হিন্দীসাহিত্যে সমৃদ্ধি আনতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। তিনি প্রচুর গ্রন্থ সংগ্রহ করে একটি বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'সরস্বতী ভবন'।

সম্ভবত এটিই হিন্দী সাহিত্যে প্রথম গ্রন্থাগার, যা একক চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। সেখানে বরাবর বিদ্বজ্জন সমাগম হত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই গ্রন্থাগারের আর্থিক মূল্য স্থির করেছিলেন একলক্ষ টাকা—এমন শোনা যায়।[১১]

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে কাশীরাজ উদিত নারায়ণ সিংহের ইচ্ছাক্রমে গোকুলনাথ, গোপীনাথ ও মণিদেব সমগ্র মহাভারতের (হরিবংশ সহ) অতি সুললিত ও সুগম ভাষায় রূপান্তর করেন। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৫০ বৎসর লেগেছিল। অনুবাদটির সাহিত্যমূল্যও অবশ্য স্বীকার্য। তার আগে সবল সিংহ চৌহান (১৭৪০) এইরূপ অনুবাদকাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। তবে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষার গুণে তা অচিরে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।

সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে প্রতাপ পুরের কবি পুহকর 'রসরতন' (১৬১৬) নামক প্রেমাখ্যান কাব্য রচনা করেন। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে রম্ভাবতী ও সূরসেনের প্রেম অবলম্বনে। এই সময় মেবারের কবি লালচাঁদ বা 'লক্ষোদয়' 'পদ্মিনী-চরিত্র' কাব্য রচনা করেন।

আলোচ্য যুগের রীতিমুক্ত কবিদের সংখ্যা কম নয়। উপরে যাঁদের কথা আলোচিত হল তাঁদের ছাড়াও প্রায় অর্ধ-শত কবির কথা জানা যায়। এবার অতি সংক্ষেপে তাঁদের ভিতর থেকে জন কুড়ি কবির পরিচয় (নাম ও গ্রন্থনাম) দেওয়া যাচ্ছে।—

ছত্রসিংহ কায়স্থ (১৬৫০)—'বিজয় মুক্তাবলী'। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বিত কাব্য।

জোধরাজ—'হাম্মীর রাসো' (১৮১৮) প্রবন্ধকাব্য।

বখ্‌শী হংসরাজ (১৭৪২) সখীভাবোপাসক।— 'সনেহসাগর', 'বিরহ বিলাস', 'রামচন্দ্রিকা' ও 'বারহমাসা'।

অলবেলী অলি (১৭৫০)—'শ্রীস্তোত্র' ও 'সময় প্রবন্ধাবলী'।

শ্রীহঠীজী—সাহিত্য মর্মজ্ঞ ভক্ত। —'রাধাসুধাশতক' (১৭৮০)।

গুমান মিশ্র—গোপাল মণির পুত্র, মহোবা নিবাসী। শ্রীহর্ষের নৈষদ্ চরিতের হিন্দী অনুবাদ (১৭৪৩), 'কৃষ্ণচন্দ্রিকা' (১৭৮১) ও 'ছন্দাটবী' (পিঙ্গল গ্রন্থ)।

সরজূদাস পণ্ডিত—'জৈমিনীপুরাণ ভাষা' (১৭৪৮)।

ভগবন্ত রায় খীচী—'হনুমৎ পচীসী' (১৭৬০)।

হরনারায়ণ—'মাধবানল কামকন্দলা' (১৭৫৫) ও 'বৈতাল পচীসী'।

ব্রজবাসী দাস—'ব্রজবিলাস' (১৭৭০)। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (অনুবাদ)।

রামচন্দ্র (১৭৮৩)—'চরণচন্দ্রিকা'।

মঞ্চিত (১৭৭৯)—'সুরভী দানলীলা' ও 'কৃষ্ণায়ণ'।

মধুসূদন দাস—'রামাশ্বমেধ' (১৭৮২)।

মনিয়ার সিংহ—'মহিম্নভাষা' (১৭৮৪), 'সৌন্দর্য লহরী', 'হনুমৎ ছবীসী' ও 'সুন্দর কাণ্ড'।

কৃষ্ণদাস—'মাধুর্য লহরী' (১৭৯৬)।

গণেশ (১৭৯৩-১৮৫৩)—'বাল্মীকি রামায়ণ' (অনুবাদ), 'শ্লোকার্থ প্রকাশ', 'প্রদ্যুম্নবিজয় নাটক' ও 'হনুমৎ পচীসী'।

লালক দাস (১৮০৩-১৮২৩ বর্তমান ছিলেন)—'সত্যোপাখ্যান'।

খুমান—'অমর প্রকাশ' (১৭৭৯), 'অষ্টযাম' (১৭৯৫), লক্ষ্মণ শতক (১৭৯৮)।

নবলদাস কায়স্থ—ভক্তকবি ও চিত্রশিল্পী। —'সংকট মোচন' (১৮১৬) 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী' ও 'রামচন্দ্র বিলাস'।

রামসহায় দাস—'রাম সতসঈ', 'বাণীভূষণ', 'বৃত্ততরঙ্গিণী' (১৮১৬) ও 'ককহরা'।

চন্দ্রশেখর (১৭৯৮-১৮৭৫)—'হাম্মীর হঠ', 'বিবেকবিলাস', 'রসিক বিনোদ' ও 'হরিভক্তি বিলাস'।

পজ্জনেশ (কবিতাকাল ১৮৪৩)—'মধুর প্রিয়া', 'নখশিখ' ও 'পজ্জনেশ প্রকাশ'।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দী কবিতার সেই তেজ এবং শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে, যা পঞ্চদশ শতকের ভক্ত কবিদের রচনায় দেখা গিয়েছিল। জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এখন আর জনজীবনের সামনে কোনো নতুন আদর্শ ছিল না। কবিতা প্রায় ধরা-বাঁধা পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। চারদিক থেকে নিজেকে সংকুচিত করে বাঁধা পথে চলার ফলে নির্ধারিত কর্মের নির্দিষ্ট ফল-প্রাপ্তিতে ব্রজভাষার কবিতায় এক প্রকার মাধুর্য ও সৌকুমার্য এল ঠিকই কিন্তু তার তারুণ্য ও স্বাভাবিক তেজ আর রইল না। আর অষ্টাদশ শতকের পরের হিন্দী কবিতায় এই সৌকুমার্য ও মাধুর্যও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে ঘটেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন সূচিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এই ভাবে হিন্দীসাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা হিন্দীসাহিত্যের সেই আধুনিক যুগের সন্দর্ভে আলোচনার চেষ্টা করতে পারি।

উল্লেখপঞ্জী

১. সিধি-নিধি-শিরমুখ-চন্দ্রলখি মাঘ সুদ্ধ তৃতিয়াসু।
হিত-তরঙ্গিনী হৌঁ রচী কবিহিত পরম প্রকাশু ॥

—অর্থাৎ ১৫৯৮ সংবৎ বা ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দ।

২. জদপি সুজাতি সুলচ্ছনী সুবরন সরস সুবৃত্ত।
ভূষণ বিনু ন বিরাজঈ কবিতা বনিতা মিত্ত ॥
—কেশবদাস

—যদিও সরস সুচ্ছন্দ সুবর্ণ সুজাতি সুলক্ষণে ধন্য,
ভূষণ ছাড়া শোভে না কবিতা-বণিতা-সখা-পণ্য।

৩. আগে কে সুকবি রীঝিহেঁ তো কবিতাঈ—
ন রাধিকা গোবিন্দ সুমিরণ কো বহানো হৈ।

৪. 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'-এর অনুসরণে তিনি লিখেছেন—
'বত কহাউ রস মৈঁ জু হৈ, কবিত্ত কহাওয়ে সোয়।'

৫. 'ভূলি কহত নবরসসুকবি, সকল মূল শৃঙ্গার।'

৬. এই প্রসঙ্গে ভিখারীদাসের সমসাময়িক বাঙালি কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) ভাষা সম্পর্কে একটি অনুরূপ উক্তি স্মরণীয়—

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী ॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ, না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে-হোক সে-হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে ॥

—অন্নদামঙ্গল : 'মানসিংহ'

৭. দ্রষ্টব্য—আচার্য রামচন্দ্রশুক্ল : 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (২০২৯ বি.) পৃ. ১৮৮।

৮. আরবি ও তৎসম শব্দের সমাসবদ্ধ 'ইশ্‌ক-মহোৎসব'-এর মতো বাংলা একটি গ্রন্থের নাম 'আল্লোপনিষদ' সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। গ্রন্থখানিতে আল্লা ও ঈশ্বরের অভেদত্ব প্রতিপাদিত। এটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।

৯. দ্রষ্টব্য—স্বামী লালদাস বিরচিত : 'বীতক গ্রন্থ' (প্রকাশিত ১৯৮৩) 'বীতক কা ঐতিহাসিক মহত্ত্ব' পৃ. 'দো'।

১০. আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল : হিন্দীসাহিত্য কা ইতিহাস (২০২৯ বি.) পৃ. ২৩৩।

১১. দ্রষ্টব্য—আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস, (২০২৯ বি.) পৃ. ২৭১

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক কাল

(১৮৫০-১৯৮০)

অবতারণা

রীতিযুগের শেষ দিকে হিন্দী কবিতার ধারা ধরা-বাঁধা পথে প্রবাহিত হতে হতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তারই পাশা-পাশি স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় কবিদের রচনাধারায় এমন একটি আভাস ফুটে উঠছিল যেন, প্রাচীন নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ কবিতার যুগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই বলে হিন্দী কবিতার মহত্ত্ব বা গুরুত্ব তেমন ক্ষুণ্ণ হয়নি। এরই মধ্যে কবিতা রাজদরবার ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের পরিধি অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। শৃঙ্গার রসের কবিতা অনেকের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরছে, কবিতার সমস্যাপূর্তি বা পংক্তি-পূরণ প্রথা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে কবিতার বিষয়বস্তুতে তেমন বৈচিত্র্য আসতে পারে নি। কবিরা অলংকার-সৃষ্টি, নায়ক-নায়িকাভেদের উদাহরণ রচনা অথবা শৃঙ্গার রসের বা অন্য প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গেই আশ্রয়দাতার প্রশংসা ও নীতি-উপদেশমূলক পদ্য-রচনাও চলত। মাঝে-মধ্যে বীররসের কবিতাও যে রচিত না-হত এমন নয়। সুতরাং গতানুগতিক বৈচিত্র্য নিয়ে কবিতার প্রাচুর্য দেখা দিলেও তার সহজ-স্বাভাবিক, রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ প্রভৃতির ছিল একান্ত অভাব। তার কারণ সম্ভবত দীর্ঘ-দিনের অনুসৃত পথের মোহ-ত্যাগে কবি ও পাঠককুলের সংস্কারগত প্রতিবন্ধকতা ও অক্ষমতা। তখনও কবিতার একমাত্র বাহন ছিল—ব্রজভাষা। ব্যবহার-বাহুল্য এবং অলংকরণের ভারে তা হয়ে পড়েছিল শিথিল ও ভারী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নগদ-বিদায় বা বিলাস-প্রবণতার

নিয়ন্ত্রণই ছিল মুখ্য। এই নিয়ন্ত্রণে সুপ্তি ভাঙার অবকাশ ছিল না। কিন্তু জাগরণের জন্য মানুষের মন ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল ভিতরে ভিতরে। হয়তো, মনে মনে তার প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। তাই পাশ্চাত্য-আগত শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এদেশবাসীর এক অংশের আত্ম-বিস্মরণের ঘোর কাটল। তারা হয়ে উঠল নবীনতার প্রত্যাশী। জীবনের কঠোর-কঠিন বাস্তব রূপটির প্রতি সজাগ হবার ইঙ্গিত দিল ইংরেজ প্রশাসন। জীবন অমসৃণ, বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হল। ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয় জীবনে জাগরণের ছোঁয়া লাগল। তা সঞ্চারিত হল হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলেও। এটাই ছিল স্বাভাবিক।

হিন্দী ভাষাপ্রযুক্ত অঞ্চলে জাতীয় চেতনার বীজ বপনে প্রয়াসী হন, কবি 'ভূষণ' ও 'লালকবি' প্রভৃতি, কিন্তু তা সম্যকভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে নি। বীরগাথা কাব্যে দেখা যায় এক-একটি রাজ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বার্থের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যের শত্রু। কিন্তু ইংরেজের আগমনে, ভারতে শক্তি বা সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এদেশের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। স্বদেশকে চেনা ও বোঝার মাধ্যম— এদেশের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি লোকের মনে আকর্ষণ জাগে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে মানুষের মন জেগে উঠল। খাওয়া-পরা ও বাঁচার তথা শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মাচরণের নানাপ্রকার অভাব-অভিযোগ এবং অত্যাচার-অবিচার মানুষকে রাজনীতির দিকেও সজাগ করে তুলল। তাই সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ও বাদ পড়ল না—স্বাভাবিক কারণেই। তাঁদের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তন-মনন, নব-নব ভাব ও অনুভূতির বিকাশ এবং তদনুরূপ সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদও দেখা গেল। এক্ষেত্রে মানুষের ধর্মবোধ বা ধর্মচিন্তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মুসলমানদের ধর্ম প্রচারিত হত শক্তির সাহায্যে। ইংরেজ মিশনারীরা তা শুরু করলেন বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে, নানা সুখ-সুবিধার বদলে।

ভারতীয় বা হিন্দুধর্ম কোণঠাসা হবার উপক্রম হল। সুতরাং বিদেশী ধর্মের তুলনায় ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও প্রচারের আবশ্যকতা দেখা দিল। তাই যুগধর্মানুরূপ প্রতিযোগিতার অস্ত্র বা কৌশল হিসাবে যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদের আশ্রয় নিতে হল এদেশের মানুষকেও। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ ও মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ স্মরণ করতে হয়।

বুদ্ধিবাদ নির্ভর প্রতিযোগিতার যুগে জনগণের ভাব প্রকাশের জন্য দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত পদ্যের সাহায্যে কাজ চলা আর সম্ভব নয়। যেমন ভাব তার তেমনি বাহন দরকার, যুগোপযোগী প্রকাশ-মাধ্যম প্রয়োজন, কারণ বোধ-অনুরূপ অভিব্যক্তি হওয়া চাই। মানুষের মনে যুগোচিত বিবিধ-বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হতে লাগল। তার প্রকাশ মাধ্যমরূপে আর কবিতা এবং ললিত লবঙ্গলতায়িত ব্রজভাষার তেমন উপযোগিতা আর রইল না। মানুষের মন চায় বন্ধন থেকে মুক্তি। সাহিত্য মনই বা তা না-চাইবে কেন? সেও চায় স্বেচ্ছা-বিহার এবং এই বিহার সম্ভব গদ্যের সাহায্যেই। বলাই বাহুল্য, পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আদর্শ তার প্রেরণাদাতা। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত সাহিত্যের সূক্ষ্ম-বিবেচনাত্মক ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি গদ্যেই হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের অধিকাংশ টীকাভাষ্য ও বৃত্তির প্রসঙ্গ স্মরণীয়।[১]

গভীর অনুভূতি এবং মনের আবেগ প্রকাশের যোগ্যতম বাহন বা মাধ্যম কবিতা। আধুনিক যুগও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু জীবনের যুগানুসারী সাধারণ প্রয়োজন যে— উগ্রতা, কঠোরতা ও জটিলতা নিয়ে আসে, তার জন্য গদ্যের আশ্রয় নেওয়াই স্বাভাবিক।

যতদিন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ততদিন পদ্যের সাহায্যেই বিবেচনাত্মক বা সমালোচনাত্মক বিষয়ও লেখা হত— শ্রবণ ও স্মরণের সুবিধার জন্য। ইংরেজদের সহৃদয়তায় এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দেশের মানুষের প্রয়োজনে যত্র-তত্র যৎকিঞ্চিৎ

ব্যবহৃত গদ্যের বহুল ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিল। এই গদ্য যে তখন হিন্দীভাষী অঞ্চলে অজানা ছিল তা নয়, গদ্য ছিল, তবে ব্রজ-ভাষার। খড়ী-হিন্দী বা আধুনিক হিন্দী গদ্য, তার তুলনায় খুবই কম লেখা হত। পদ্যের ব্যবহারও যথাবিধি চলতে থাকে। পদ্যের ক্ষেত্রেও নানাভাবে নূতনত্ব এলো। এই নূতনত্ব লক্ষিত হল— ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে।

আধুনিক যুগে মানব-মনের সার্থক এবং সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির মাধ্যম গদ্য। আপাতভাবে মনে হয় হিন্দী গদ্য আধুনিক কালের সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আধুনিক-পূর্ব যুগেও হিন্দী গদ্য ছিল। তবে তার ব্যবহার বা প্রচার তেমন ছিল না। বলাই বাহুল্য সে গদ্য ব্রজভাষার গদ্য। হিন্দী গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে গোর্খপন্থী সাধন-গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি। তা খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের রচনা বলে অনুমিত হয়। তবে তাতে 'পুচ্ছিবা', 'কহিবা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায়, কেউ কেউ লেখককে রাজস্থানের অধিবাসী বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার সে ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব আছে বলে মনে করছেন। তবে আমাদের অবশ্যই মানতে হবে যে, নাথপন্থী সাধকদের ভাষায় বহু স্থানের বিভিন্ন ভাষার প্রভাব পড়েছে। কারণ তাঁরা যথেচ্ছভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং মুখে মুখে সাধন-রীতি প্রচার করতেন। তাই স্থানীয় ভাষার শব্দ এবং বাচনভঙ্গিও তাঁদের রচনায় সহজেই গৃহীত হত।

অতঃপর ভক্তিযুগে কৃষ্ণভক্তি শাখাতেও আমরা কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ পাই। বল্লভাচার্যের পুত্র গোস্বামী বিট্‌ঠলনাথ রচিত ব্রজভাষা গদ্যে 'শৃঙ্গার রসমণ্ডন' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যদিও তার গদ্য অপরিণত। এই সম্প্রদায়েরই অপর কয়েকজন ভক্ত রচিত গদ্যের ভাষা বেশ ব্যবস্থিত এবং মার্জিত। 'চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা' এবং 'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবন কী বার্তা'— মূল্যবান গ্রন্থ দুইটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ দুইটি বল্লভাচার্যের পৌত্র গোকুল দাস এবং তাঁর শিষ্য বা

শিষ্যদের রচনা বলে অনুমিত। প্রথমটির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়টি আরও পরবর্তীকালের। গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা সে যুগের চলিত গদ্য, মাঝে-মাঝে সুপ্রচলিত আরবি-পারসি শব্দও এসে গেছে। ছোটো ছোটো বাক্য ও পদের বিন্যাসে লেখকের নৈপুণ্য সুস্পষ্ট। তবে সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এতে নেই।

পরবর্তীকালে ব্রজভাষা গদ্যে দুই-জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়। সাহিত্য-গ্রন্থের টীকা এবং মৌলিক গ্রন্থ। টীকাজাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে (পৃ. ১৩১ ও ১৩৮), এখানে মৌলিক গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে।

১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নাভাজী বা নাভাদাস— 'অষ্টযাম' নামক ব্রজভাষা গদ্য-গ্রন্থে ভগবান রামচন্দ্রের দিনচর্যার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৬২৩ সালের নিকটবর্তী সময়ে বৈকুণ্ঠমণি শুক্ল ব্রজভাষা-গদ্যেই 'অগহন মাহাত্ম্য' এবং 'বৈশাখ মাহাত্ম্য'— নামে দুইটি পুস্তিকা লেখেন। এই প্রসঙ্গে প্রাঞ্জল, প্রৌঢ় ও পাণ্ডিত্যধর্মী ভাষায় অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রচিত 'নাসিকেতোপাখ্যান'— গদ্যগ্রন্থের কথাও স্মরণীয়।

১৭১০ খ্রীস্টাব্দে সূরতি মিশ্র সংস্কৃত থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে ব্রজভাষা গদ্যে 'বৈতালপচীসী' লেখেন। গ্রন্থটি পরে খড়ীবোলী ও হিন্দুস্তানীতেও লেখা হয়। এই কাজটি করেন লল্লুলাল। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে লালা হীরালাল 'আইন-ই-আকবরী' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন— 'আইন-ই-আকবরী কী ভাষা বচনিকা'। তবে এই সব টীকা-ভাষ্য গ্রন্থে প্রযুক্ত ব্রজভাষা-গদ্য যেমন দুষ্পাঠ্য তেমনি দুর্বোধ্য। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে জানকীপ্রসাদ রচিত 'রামচন্দ্রিকা'র টীকা থেকে কয়েকটি পংক্তি—

> 'সবল কহেঁ অনেক রঙ্গ মিশ্রি হৈঁ, অংসু কহেঁ কিরণ জাকে ঐসে জে সূর্য হৈঁ তিন সহিত মানো কলিন্দগিরি শৃঙ্গ তেঁ হংস কহেঁ হংস সমূহ উড়ি গয়ো হৈ।'

এর তুলনায় 'বৈষ্ণবন কী বার্তা'র গদ্য সুন্দর ও সুবোধ্য—

> 'বৈষ্ণবন নে কহী জো তেরো শাস্ত্রার্থ করনো হোবৈ তো পণ্ডিত কে পাস জা, হমারী মণ্ডলী মেঁ তেরে আয়বে কো কাম নহীঁ। ইহাঁ খণ্ডন মণ্ডন নহীঁ হৈ। ভগবদ্বার্তা কো কাম হৈ ভগবদ্যশ সুননো হোবৈ তো ইহাঁ আও।'

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি সুবোধ্য হলেও তার সুগঠিত সাহিত্যিক রূপ ফুটে উঠতে পারেনি। সোজা কথায় ব্রজভাষা গদ্যে সাময়িক প্রয়োজন মিটেছে মাত্র। এ হল কেজো গদ্য। পরবর্তীকালে এই গদ্যের বিকাশ ও পরিণতির তেমন সুযোগ ঘটেনি। কারণ ইতঃমধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অঞ্চলবিশেষে পৃথকভাবে, আবার কখনও বা ব্রজভাষার সঙ্গেই উঁকি-ঝুকি দিচ্ছিল খড়ীবোলী। ক্রমে ক্রমে তা নিজগুণে ব্যবহারে শিষ্ট-ভাষার মর্যাদা লাভ করল এবং সুযোগ বুঝে হিন্দী গদ্যমঞ্চে অবতীর্ণ হল।

আধুনিক যুগে স্বাভাবিক কারণেই গদ্যের প্রচার-প্রসার দ্রুত-গতিতে ঘটেছে। আজকাল হিন্দী সাহিত্যের লেখক ও কবিগণ যে ভাষায় লেখেন ও কথা বলেন তাকে বলা হয় খড়ীবোলী। হিন্দী সাহিত্যের ও ভাষার ইতিহাসবেত্তা কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিতের বিশ্বাস— ইংরেজের সহৃদয়তা ও অনুকম্পায় খড়ীবোলীর উদ্ভব, ক্রম-বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে সাহিত্যের ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই ধারণাটি যথার্থ নয়। প্রাচীনকাল থেকেই খড়ীবোলী দিল্লী অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল। ক্রমে ক্রমে তা সেখানকার শিষ্টসম্প্রদায়ের কথ্যভাষার রূপ নেয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ব্রজভাষার সঙ্গেই খড়ীবোলীতেও কবি আমির খসরু 'পহেলী' বা ধাঁধা-জাতীয় পদ্য রচনা করেন (দ্রষ্টব্য আদিকাল, পৃ. ১২)। ঔরঙ্গজেবের সময়ে খড়ীবোলীতে 'শায়রী' বা 'শের'— রচনা শুরু হয়েছিল। এইভাবে খড়ীবোলীতে উর্দু সাহিত্য গড়ে উঠতে শুরু করে ধীরে ধীরে। দিল্লী থেকে এই কথ্যভাষা নানা কারণে দিল্লীর আসে-পাশে, উত্তর-ভারত, পশ্চিম-

ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণগুলির মধ্যে রাজ্য-শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দিল্লী থেকে অন্যত্র এবং অন্যত্র থেকে দিল্লীতে মানুষের আসা-যাওয়া, বস-বাস এবং পরে প্রয়োজনে পুনরায় প্রত্যাবর্তনই প্রমুখ মনে হয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতার কথ্যভাষা কিভাবে সমগ্র বঙ্গভূমির কথ্যভাষা এবং পরিশেষে বাংলা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে—তা স্মরণ করা চলে। দিল্লী থেকে অন্যত্র খড়ীবোলী ছড়িয়ে পড়ার পর মানুষ ব্যাবহারিক জীবনে খড়ীবোলীর ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে থাকে, ক্রমে লোকের ঘরে ঘরেও তার ব্যবহার শুরু হয়। এইভাবে খড়ীবোলী বিস্তৃততর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল কথ্যভাষা রূপেই। মাঝে-মধ্যে তাতে রহস্যভরা দোহা, হেঁয়ালী প্রভৃতি রচিত হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি ঘটেনি। তাই তার লিখিত রূপ মেলে যৎসামান্য। সুতরাং উর্দুর সংস্পর্শে আসার আগেও খড়ী-হিন্দীর অস্তিত্ব ছিল। তার সেই দেশীয় রূপ মাঝে-মাঝে সাহিত্যের আনাচে-কানাচে চোখে পড়ে। প্রাচীন কালের একটি প্রবাদ বচনে খড়ী-হিন্দীর আভাস লক্ষণীয়—

'সোউ জুহিট্ঠির সংকট পাআ। দেবক লেখিঅ কোন মিটাআ?
—সেই যুধিষ্ঠিরও সংকটে পড়ে। দৈবের লেখন কভু কি নড়ে?

নির্গুণধারার কবিদের রচনাতেও খড়ীবোলীর সাক্ষাৎ মেলে। কবীরের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত—

আউঁগা ন জাউঁগা, মঁরূগা ন জীউঁগা
গুরুকে সবদ রম রম রহূঁ গা ॥
—আসবো না, যাবো না, মরবো না, না-বাঁচবো,
গুরুর মন্ত্রে মগ্ন হ'য়ে, পরম সুখে থাকবো।

আকবরের শাসনকালে 'গঙ্গকবি' 'চন্দছন্দবরনন কী মহিমা'—নামক গদ্যগ্রন্থটি খড়ীবোলীতে লিখেছিলেন। তার থেকে কিছু অংশ—

'সিদ্ধি শ্রী ১০৮ শ্রীশ্রী পাতসাহিজী শ্রীদলপতিজী অকবর সাহজী আমখাস মেঁ তখত উপর বিরাজমান হো রহে। ঔর আমখাস ভরনে লগা হৈ জিসমেঁ তমাম উমরাওয় আয় আয় কুর্নিশ বজায় জুহার করকে অপনী অপনী বৈঠক পর বৈঠ জায়া করেঁ অপনী অপনী মিসল সে। জিনকী বৈঠক নহীঁ সো রেসম কে রস্‌সে কী লূ মেঁ পকড়-পকড় কে খড়ে তাজীম মেঁ রহেঁ।'

এই উদ্ধৃতিতে খড়ী-হিন্দীর সুন্দর সুললিত রূপ দেখে অনুমান করা চলে — আকবর-জাহাঙ্গীরের সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে খড়ীবোলীর শিষ্টভাষা রূপে ব্যবহার ছিল। আরবি-পারসি শব্দের প্রয়োগ থাকলেও একে উর্দু বলা সমীচীন নয়, এটি হিন্দীর খড়ীবোলীই। এ-ভাষায় অল্পস্বল্প সাহিত্যসৃষ্টিও হয়েছে।

১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে 'রামপ্রসাদ' 'নিরঞ্জনী' 'ভাষাযোগবাশিষ্ঠ' গ্রন্থটি সুন্দর সুব্যবস্থিত খড়ীবোলীগদ্যে রচনা করেন। এই ধরনের প্রাচীনতম গ্রন্থ এটি। খড়ীবোলী-গদ্যের সুস্থির, সুস্পষ্ট রূপটি গ্রন্থকার ও গ্রন্থটিকে খড়ী-হিন্দীর প্রথম লেখক ও প্রথম কৃতির মর্যাদার অধিকারী করেছে। খড়ী-হিন্দীর সেই প্রথম গ্রন্থটি থেকে গদ্যের নিদর্শন।—

'অগস্তজীকে শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে মন মেঁ এক সন্দেহ পৈদা হুআ তব ওয়হ উসকে দূর করনে কে কারণ অগস্ত মুনি কে আশ্রম কো জা বিধিসহিত প্রণাম করকে বৈঠে ঔর বিনতী কর প্রশ্ন কিয়া কি হে ভগবন্। আপ সব তত্ত্বোঁ ঔর সব শাস্ত্রোঁকে জাননহারে হো, মেরে এক সন্দেহ কো দূর করো। মোক্ষ কা কারণ কর্ম হৈ, কি জ্ঞান হৈ, অথবা দোনোঁ হৈঁ, সমঝায়কে কহো। ইতনা সুন অগস্তমুনি বোলে কি হে ব্রহ্মণ্য! কেবল কর্মসে মোক্ষ নহীঁ হোতা ঔর ন কেবল জ্ঞান সে মোক্ষ হোতা হৈ, মোক্ষ দোনোঁ সে প্রাপ্ত হোতা হৈ। কর্মসে অন্তঃকরণ শুদ্ধ

হোতা হৈ, মোক্ষ নহীঁ হোতা ঔর অন্তঃকরণ কী শুদ্ধি বিনা কেবল জ্ঞান সে মুক্তি নহীঁ হোতী।'

সুন্দর সুশৃঙ্খল শিষ্ট হিন্দী গদ্যের দৃষ্টান্ত এটি।

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত দৌলতরাম হরিষেণাচার্যের জৈন 'পদ্মপুরাণ' খড়ী-হিন্দীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ভাষা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও গ্রন্থ-রচনার উপযোগী খড়ীবোলীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিচয় রয়েছে তাতে। পরবর্তীকালে ১৭৭৩-১৭৮৩ সালের মধ্যে রচিত রাজস্থানী লেখকের 'মণ্ডোবর কা বর্ণন'ও সাধারণ কথ্য খড়ীবোলীর একটি গদ্য-গ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে খড়ীবোলীর গদ্যই ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের বাহনরূপে স্বীকৃতি পাবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। উর্দুর জ্ঞাতারা আরবি-পারসি শব্দবহুল গদ্য এবং সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ তদ্ভব-তৎসম শব্দবহুল গদ্য ব্যবহার করতেন। এই দুই ধারার মধ্যে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধারার অগ্রগতিই অব্যাহত থাকে এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সীমিত পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় প্রথম ধারাটির সম্যক্ স্ফুরণ ঘটতে পারে নি। এই অবসরে খড়ীবোলীর গদ্যে ইন্সাআল্লা কৃত জনপ্রিয় কাহিনী 'রানী কেতকী কী কহানী' রচিত হল। তার ফলে খড়ীবোলীকে সাহিত্যের বাহন রূপে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ আরও ত্বরান্বিত হল। খড়ী-হিন্দী স্ব-স্বরূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দী গদ্য সাহিত্যে তার স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত হল। অধ্যাপক স্যার জন গিলক্রিস্ট হিন্দী ও উর্দুর প্রতিষ্ঠা ও পঠনপাঠনের জন্য উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনার বিষয়ে উদ্‌যোগী হলেন।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দানের যে ব্যবস্থা হল তাতে হিন্দী (খড়ীবোলী) এবং উর্দু— দুই পৃথক ভাষারূপেই গৃহীত হল। হিন্দী বা খড়ীবোলীর পঠন-পাঠনের জন্য লল্লূলালজী 'গুজরাটী'

'প্রেমসাগর' এবং সদল মিশ্র 'নাসিকেতোপাখ্যান' লিখলেন। হিন্দী গদ্য নির্মাণে তাঁদের সহযোগী হিসাবে আমরা এই সময় সৈয়দ ইন্সাআল্লা খাঁ এবং মুন্সী সদাসুখলালকেও পাই। খড়ীবোলীর প্রারম্ভিক যুগের এই চারজন নির্মাতাই উনবিংশ শতকের প্রথমদিকের লোক।

মুন্সী সদাসুখ 'নিয়াজ' (১৭৪৬-১৮২৪) দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। চুনারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে উচ্চ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। উর্দু ও পারসি ভালো জানতেন। সুলেখক ও সুকবি ছিলেন। ভগবৎ-চিন্তায় অনুরাগবশত প্রৌঢ়ত্বে চাকরি ছেড়ে প্রয়াগে বস-বাস করতে শুরু করেন। তাঁর রচিত 'সুখসাগর'-এর ভাষা বেশ পরিণত ও প্রাঞ্জল। সংস্কৃতনিষ্ঠ হলেও তা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ তখন সে ভাষাই ছিল শিষ্টজনব্যবহৃত। তাঁর অপর একটি গ্রন্থের খণ্ডাংশ মাত্র পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র প্রয়াসের ফলে মুন্সীজীর খড়ীবোলীতে সহজ স্বাভাবিক প্রবাহ এবং স্পষ্টতা এসেছে। যেমন—

> 'জো ক্রিয়া উত্তম হুঈ তো সৌ বর্ষ মেঁ চাণ্ডাল সে ব্রাহ্মণ হুয়ে ঔর জো ক্রিয়া ভ্রষ্ট হুঈ তো ওয়হ তুরন্তহী ব্রাহ্মণ সে চাণ্ডাল হোতা হৈ। যদ্যপি য়ৈসে বিচার সে হমেঁ লোগ নাস্তিক কহেঁগে, হমেঁ ইস বাত কা ডর নহীঁ।'

মুন্সি ইন্সাআল্লা খাঁ (১৭৬৬-১৮১৮)—জন্ম বাংলার মুর্শিদাবাদে। পিতার নাম মীর মাশাআল্লা খাঁ। মুন্সী সদাসুখের মতো তিনিও উর্দুতে শায়রী বা 'শের' করতেন। তিনি সুশিক্ষিত পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তিনি শাহ আলমের সময় মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লী চলে যান। পরে আবার সেখান থেকে লাখনাউ যান। ১৭৯৮-১৮০০-এর মধ্যে তিনি 'উদয়ভান চরিত' বা 'রানী কেতকী কী কহানী' রচনা করে হিন্দী খড়ীবোলীগদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি হিন্দী-কথ্যভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কৃতবহুল হিন্দী বা আরবি-পারসি শব্দ-ভারাক্রান্ত হিন্দী ব্যবহারের

সমর্থক ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন— 'জৈসে ভলে লোগ অচ্ছোঁ সে অচ্ছে— আপস মেঁ বোলতে-চালতে হৈঁ, জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ ওয়হী সব ডৌল রহে, ঔর ছাঁও কিসী কী ন হো।' অর্থাৎ— ভাষায় ভদ্রলোকেরা যেমন অতি সুন্দরভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন, ঠিক তারই আদল থাকবে, অন্য কোনোপ্রকার ছায়া বা প্রভাব থাকবে না।— এর থেকে বোঝা যায় তাঁর এই প্রয়াস আয়াসনির্ভর। মাঝে মাঝে উর্দু-পারসির বাক্যগঠন এসে গেছে— বাক্যের প্রথমেই ক্রিয়ার প্রয়োগে। অনুপ্রাসযুক্ত হবার ফলে ভাষার গতি কিছুটা আড়ষ্ট হয়েছে। তাঁর চটকদার কথ্যভাষায় ইডিয়ম, আটপৌরে শব্দ প্রভৃতির ব্যবহার— বাংলা গদ্যে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালী' ভাষার এবং হুতোম প্যাঁচার 'হুতোমী ভাষা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সময়গত দূরত্ব থাকলেও প্রয়াস ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বিশেষ নেই— এই দুই ভাষার এই জাতীয় রচনায়। ইন্সাআল্লার প্রয়াস অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং টেকচাঁদী ও হুতোমী প্রয়াস —উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। ইন্সাআল্লার স্বতন্ত্র প্রয়াস নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তী হিন্দী গদ্যে তাঁর গদ্য কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি। তবে মুন্সী সদাসুখলালের ভাষার শৈলী মান্য ও স্বীকৃত হয়েছিল। ইন্সাআল্লার ভাষার উদাহরণ—

> 'নিবাড়ে, মৌলিয়ে, বচরে, লচকে, মোর পংখী, শ্যামসুন্দর, রামসুন্দর ঔর জিতনী ঢব কী নাবেঁ থীঁ, সুনহরী, সজী-সজাঈ ঔর সৌ-সৌ লচকেঁ খাতিয়াঁ আতিয়াঁ জাতিয়াঁ ঠহরাতিয়াঁ ফিরাতিয়াঁ থীঁ। উন সভী পর খচাখচ কঞ্চনিয়াঁ রামজনিয়াঁ ডোমিনিয়াঁভরী হুঈ অপনে-অপনে কসবোঁ মেঁ নাচতী-গাতী বজাতী কূদতী ফাঁদতী ধূমেঁ মচাতিয়াঁ অঁগড়াতিয়াঁ জম্হাতিয়াঁ উঙ্গলিয়া নচাতিয়াঁ ঔর ঢুলী পড়াতিয়াঁ থীঁ।'

—এই বর্ণনা বাংলা আলালের ঘরের দুলালের কোনো কোনো অংশের ভাষার কথা মনে করিয়ে দেয়।

লল্লূলালজী (১৭৬৩-১৮২৫)—আগ্রার অধিবাসী গুজরাটী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি তার হিন্দী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জন গিলক্রিস্টের নির্দেশে তিনি খড়ী-হিন্দীতে 'প্রেমসাগর' (১৮০৩) রচনা করেন। তাতে ভাগবতের দশম স্কন্ধের কথা বর্ণিত। তাঁর খড়ী-হিন্দীর গদ্য ব্রজভাষার মাধুরী-মণ্ডিত। বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করার দিকেই লেখকের প্রবণতা ছিল। তবে কবিতার অনুপ্রাস-প্রেম তাঁর গদ্যেও প্রতিফলিত। মাঝে মাঝে দীর্ঘ বাক্যও ব্যবহার করেছেন। ফলে ভাষায় তেমন সাবলীলতা আসে নি। যেমন—

> 'আগে পান কী মিঠাঈ, মোতীমাল কী শীতলতাঈ ঔর দীপ জ্যোতি কী মন্দতাঈ দেখ একবার তো সব দ্বার মূঁদ ঊষা বহুত ঘবরায় ঘর মেঁ আয় অতি প্যার কর প্রিয় কো কণ্ঠ লগায় লেটী।'

—মিঠাঈ, শীতলাঈ ও মন্দতাঈ-তে অনুপ্রাস এবং 'ঘবরায়, আয় ও লগায়-এ ব্রজভাষার কমনীয়তা লক্ষণীয়।

সদল মিশ্র (আঃ ১৭৬৭-১৮৪৮)—বিহারের আরা জেলার অধিবাসী সদল মিশ্র হিন্দী-পণ্ডিতরূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি 'নাসিকেতোপাখ্যান' লেখেন—হিন্দী পাঠ্যগ্রন্থ রূপে। এই গ্রন্থের খড়ী-হিন্দী বেশ স্পষ্ট ও ব্যাবহারিক। অযথা অনুপ্রাস ও পাণ্ডিত্য না থাকায়, আবশ্যকমতো তদ্ভব, তৎসম, আরবি-পারসি, বিহারী এমন-কি বাংলা শব্দের ব্যবহার থাকায়— ভাষায় শিষ্ট, সংযত ও সজীব হবার প্রবণতা লক্ষিত হয়। গ্রন্থটি কলকাতায় রচিত সুতরাং বাংলা শব্দ এসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ব্রজভাষা সহ অন্যান্য লোকমুখের ভাষার প্রয়োগও মাঝে মাঝে মেলে।—

> '...কহাঁ ইহাঁ নানা ভাঁতি মেঁ ও ফূলহু কে বিছোনে পর সুখ সে দিন-রাত জিসকে বীততে থে, সো অব জঙ্গল মেঁ কন্দমূল

খা কাঁটে-কুশা পর সোকর স্যারোঁ কে চহুঁ-দিশি ডরাবনে শব্দ সুনি কৈসে বিপত্তি কাটতী হোগী।'

সদল মিশ্রের এই ভাষা পরবর্তীকালের হিন্দী গদ্যসাহিত্যের ভাষার পথ-প্রদর্শক বলা চলে।

সাধারণভাবে লল্লুলালের 'প্রেমসাগরী' ভাষাই—ফোর্ট-উইলিয়মে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দী সাহিত্যে যে গদ্য রীতি গৃহীত হয়— তার আদল অনেকটা সদল মিশ্রের ভাষারই। মুন্সী সদাসুখলাল ও সদল মিশ্রের ভাষার রূপই আবশ্যকমতো পরিবর্জন ও পরিমার্জন লাভ করে হিন্দী সাহিত্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে হিন্দী-গদ্যপ্রতিষ্ঠার সুযোগ নেয় খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক মিশনারীরা। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড মিলে 'ড্যানিশ মিশনের' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে খ্রীস্টীয় ধর্মপুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীরামপুর মিশনারীদের বিবিধ ও বিচিত্র কর্মের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়। কেরী বাইবেলের হিন্দী অনুবাদ করেন। নিউ টেস্টামেন্ট হিন্দীতে অনূদিত হয় ১৮০৯ সালে। এই অনুবাদের ভাষায় উর্দু ছিল না। বিশুদ্ধ হিন্দীতেই অনুবাদ করা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারীদের প্রয়াসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও হিন্দী পাঠ্য-পুস্তক প্রণীত বা অনূদিত হয়। এই কাজে তাঁরা সে যুগের বিভিন্ন হিন্দী পণ্ডিত ও লেখকদের সাহায্য নিতেন। এ ছাড়াও তাঁরা নানা রকমের ধর্মবিষয়ক ও উপদেশমূলক পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রভৃতিও লিখতেন এবং প্রচার করতেন। বলাই বাহুল্য এই সব কাজে তাঁরা হিন্দী গদ্য ব্যবহারের দিকেই সচেষ্ট থাকতেন। এইভাবে হিন্দী গদ্যের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে মিশনারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিরোধীরূপেও

আবির্ভূত হলেন। ভারতীয় ধর্মচেতনার তিরস্কার ও খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা প্রয়াস চালাচ্ছিলেন— তাই তাঁদের প্রতি, তাঁদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের প্রতি লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিল। এমন-কি, কোনো কোনো মনীষীর মনও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের কুফলের আশঙ্কায় রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতির সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার শুরু করেন। বিদেশীর ব্যাখ্যায় এদেশীয় অনেক কিছু গর্হিত এবং বর্জনীয়—এই মনোবিকারের সংশোধনের জন্য তিনি শুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা-বিধি প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত (১৮২৮) হল। হিন্দী-ভাষীর মধ্যেও তাঁর নব ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে বেদান্তসূত্রের ভাষ্যের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮১৬ সনে তিনি শাস্ত্রার্থ বা শাস্ত্র-বিচারার্থ একটি হিন্দী পুস্তিকা বের করলেন। ১৮২৯ সালে 'বঙ্গদূত' নামক হিন্দী সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন। এইভাবে এই উদারচেতা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বদেশ-পূজক মহাপুরুষ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দী গদ্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হিন্দী খড়ীবোলীতে বাংলার প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতদের প্রযুক্ত ভাষাই তিনিও ব্যবহার করেছেন।[২] যেমন—

> 'জো সব ব্রাহ্মণ সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন নহীঁ করতে সো সব ব্রাত্য হৈঁ, য়হ প্রমাণ করনে কী ইচ্ছা করকে ব্রাহ্মণ ধর্মপরায়ণ শ্রী সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী জী নে জো পত্র সাঙ্গবেদাধ্যয়নহীন অনেক ইস দেশ কে ব্রাহ্মণোঁ কে সমীপ পঠায়া হৈ, উসমেঁ দেখা জো উন্হোনেঁ লিখা হৈ— বেদাধ্যয়নহীন মনুষ্যোঁ কো স্বর্গ ঔর মোক্ষ হোনে শক্তা নহীঁ।'

উদ্দেশ্য স্বাতন্ত্র্যের বিচারে 'বঙ্গদূত' প্রথম হিন্দীপত্রের মর্যাদা পেলেও হিন্দীর প্রথম সমাচার পত্র 'উদন্ত মার্তণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে

কলকাতা থেকেই। সম্পাদক কানপুরের অধিবাসী পণ্ডিত যুগল-কিশোর শুক্ল। পত্রটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সম্পাদক লেখেন—

> 'য়হ উদন্ত মার্তণ্ড অব পহিলে পহল হিন্দুস্তানিয়োঁ কে হিত কে হেত জো আজ তক কিসী নে নহীঁ চলায়া, পর অংগ্রেজী ও পারসী ও বঁগলে মেঁ জো সমাচার কা কাগজ ছপতা হৈ উসকা সুখ উন বোলিয়োঁ কে জাননে ও পঢ়নেওয়ালোঁ কো হী হোতা হৈ। ইসসে সত্য সমাচার হিন্দুস্তানী লোগ দেখকর আপ পঢ় ও সমঝ লেয়ঁ ও পরাঈ অপেক্ষা ন করেঁ ও অপনে ভাষে কী উপজ ন ছোড়েঁ ইসলিয়ে···শ্রীমান গবরনর জেনেরল বহাদুর কী আয়স সে ঐসে সাহস মেঁ চিত্ত লগায়কে একপ্রকার সে য়হ নয়া ঠাট ঠাটা।'

৩৭ নং আমড়াতলা গলি, কলকাতা থেকে এই সাপ্তাহিক কাগজটি প্রকাশিত হত। এইভাবে ধীরে ধীরে হিন্দীর প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু শাসক ইংরেজ এবং রাজা রামমোহন রায়ের মতো কতিপয় প্রভাবশালী এদেশীয় মনীষীর প্রয়াসে ইংরেজী শিক্ষা-দানের জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় (১৮১৭)। ইংরেজী শেখার ফলে চাকুরি লাভের সুবিধা হওয়ায় সেদিকেই লোকের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠল। তাই দেশীয় ভাষার উন্নতির সুযোগ কমে গেল। সংস্কৃত ও আরবির চর্চা চললেও তাও ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হতে লাগল। অবশেষে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ সরকারীভাবে ইংরেজি শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তার পরেই ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে।

কোর্ট-কাছারির ভাষা হিসাবে আরবি বা উর্দুই স্বীকৃত ছিল দীর্ঘদিন ধরে। সেখানে হিন্দীকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হলেও তা ঠিক-মতো কার্যকরী হতে পারে নি। ফলে কোর্ট-কাছারি থেকে হিন্দী সরে আসতে বাধ্য হল। ক্রমে ক্রমে যেন চারিদিক থেকে খড়ী-হিন্দীর

চর্চা নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকে। তা সত্ত্বেও হিন্দী-প্রবাহের খাত বিশুষ্ক হয়নি কখনও। কলকাতা থেকেই হিন্দীর প্রথম তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়— 'উদন্ত-মার্তণ্ড' (১৮২৬), 'বঙ্গদূত' (১৮২৯) এবং 'প্রজা-মিত্র' (১৮৩৪)। হিন্দীভাষী অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম হিন্দী পত্র 'বনারস অখবার' (১৮৪৪, কাশী)। পত্রিকাটির অধিকর্তা রাজা শিবপ্রসাদ 'সিতারে হিন্দ' আর সম্পাদক একজন বাঙালিই তারামোহন মিত্র। তারপর কলকাতা থেকেই ১৮৪৬ সালে মৌলবী নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত 'মার্তণ্ড' প্রকাশিত হয়— হিন্দী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি ও পারসি— এই পাঁচ ভাষায় পৃষ্ঠাপূরণ নিয়ে। আবার কাশী থেকেই তারামোহন মিত্র প্রভৃতির প্রয়াসে ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয় 'সুধাকর' এবং মুন্সী সদাসুখলালের চেষ্টায় আগরা থেকে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় 'বুদ্ধিপ্রকাশ'। এই সব সাময়িকপত্রের সাহায্যে হিন্দীর প্রসার ঘটে, যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা এবং তদনুরূপ চিন্তা প্রকাশের শক্তিও অর্জিত হয় কিছু পরিমাণে। তবে পত্রিকার স্তরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি লক্ষিত হয় নি।

সরকারী প্রয়াস ও এদেশীয় কতিপয় মনীষীর সহযোগিতায় কিভাবে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করল এবং দেশীয় ভাষাগুলি হতোদ্যম হয়ে পড়ল— সে কথা আজ আর কারো অজানা নয়। ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশে ইংরেজির একাধিপত্য স্থাপিত হল। কিন্তু তাই বলে—দেশীয় ভাষার চর্চা ও উন্নতি যে স্তব্ধ হয়ে গেল, তা নয়। হিন্দীর প্রতি সাধারণ মানুষের অনুরাগ এবং স্বীয় প্রাণ-শক্তিতে হিন্দী যথাসম্ভব সজীব, সক্রিয় এবং উন্নতিশীল থেকেছে।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (আধুনিক কাল, প্রকরণ—১) গ্রন্থে নির্দেশ করেছেন যে, এদেশীয় কতিপয় মুসলমান, সরকার বাহাদুর এবং কোনো কোনো বিদেশী পণ্ডিতের সমন্বিত প্রয়াসে উর্দু ও হিন্দীর ঝগড়া দেখা দেয় এবং সে ঝগড়া প্রায় কুড়ি বৎসর চলে (১৮৩৭-

১৮৫৭)। এরই ফলে কয়েকজন হিন্দীর গুণগ্রাহী বিদ্বান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ ও রাজা শিবপ্রসাদ মিশ্র তাঁদের অন্যতম।

হিন্দী গদ্যসাহিত্যের সূচনা

হিন্দী বা খড়ীবোলীর লিপি দেবনাগরী বা নাগরী। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালে হিন্দীর প্রভাব খর্ব করার মানসে আইন-আদালতে হিন্দীর লিপিরূপে পারসি-লিপিকে গ্রহণ করা হল। ফলে নামে হিন্দী হলেও ভাষাটি কিন্তু আরবি-পারসি ও উর্দুর নামান্তর হয়ে উঠতে লাগল। হিন্দী ভাষা ও নাগরীলিপির পক্ষে চরম সংকট দেখা দিল। চাকুরির সুবিধার জন্য উর্দু ভাষা ও পারসি-লিপির জ্ঞান অনিবার্য হয়ে পড়ল—সকলের পক্ষে। উর্দুর প্রচার ও মাহাত্ম্য বাড়তে লাগল আর হিন্দীর অবস্থা হয়ে উঠতে লাগল শোচনীয়। অনাদর-উপেক্ষা ও বিরোধিতার মাঝখানে হিন্দী আপন প্রাণশক্তিতেই অগ্রসর হতে থাকল, যদিও তার গতি অতি ধীর, অতি মন্থর। এই সময় আবির্ভূত হলেন রাজা শিবপ্রসাদ মিশ্র 'সিতারে হিন্দ' (১৮২৩-১৮৯৫)। তিনি উত্তর প্রদেশের শিক্ষাবিভাগে নিরীক্ষকের পদে আসীন ছিলেন। তিনি হিন্দীভাষা ও নাগরী লিপির প্রতিষ্ঠার ব্রত নিলেন। তবে খোলাখুলি সরকারের পারসি-নীতির বিরোধিতা করতে পারতেন না। তিনি শুদ্ধ সংস্কৃত-মিশ্রিত হিন্দী লিখতে পারতেন। কয়েকজন হিন্দীপ্রেমিকের সহযোগে তিনি খড়ী-হিন্দীতে সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর হন। সহজবোধ্য পাঠোপযোগী হিন্দী গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রীলাল ও শ্রীবংশীধর ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। ১৮৫২ থেকে ১৮৬২ সনের মধ্যে অনেকগুলি হিন্দী গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথমটি পণ্ডিত বংশীধরের অনুবাদ— পুষ্পবাটিকা

(১৮৫২)। সাহিত্যিক গল্প-কাহিনী ছাড়াও ইতিহাস, অর্থনীতি, জগৎ-বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থও রচিত হল। এগুলির ভাষা সরল ও আকর্ষণীয় করার দিকেই লেখকের প্রবণতা লক্ষিত হয়। তাই এগুলিতে আরবি, পারসি শব্দেরও ব্যবহার করা হয়েছে। 'মানব ধর্মসার', 'যোগবাশিষ্ঠকে চুনে হুয়ে শ্লোক', 'উপনিষদ্‌সার', 'ভূগোল হস্তামলক', 'বামা মন রঞ্জন', 'আলসিয়োঁ কা কোড়া', 'বিদ্যাংকুর', 'রাজা ভোজ কা সপনা' এবং 'বর্ণমালা' প্রভৃতি গ্রন্থে শিবপ্রসাদ শুদ্ধ-সংস্কৃতনিষ্ঠ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এইভাবে খড়ী-হিন্দীগদ্য চলার পথ খুঁজে পেয়েছে তাঁর রচনায়।

রাজা লক্ষ্মণ সিংহ (১৮২৬-১৮৯৬)—উনবিংশ শতকেই হিন্দীর বিশুদ্ধ রূপ নির্মাণের ব্রত নিয়ে হিন্দী গদ্যসাহিত্যের সেবায় আবির্ভূত হলেন রাজা লক্ষ্মণ সিংহ। শিবপ্রসাদের অনুসারী হলেও তাঁর রচনায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেশি এবং আরবি-পারসির মিশ্রণ কম। তিনি হিন্দীকে উর্দু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আরবি-পারসি শব্দমুক্ত অথবা যৎ-সামান্য শব্দ-প্রযুক্ত ভাষা রূপে দেখতেন এবং তার সমৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তাঁর ভাষায় বক্তা ও শ্রোতার আনুকূল্য লাভের শক্তি ছিল— আর ছিল বিশাল হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি কালিদাসের মেঘদূত, শকুন্তলা (১৮৬২) ও রঘুবংশ (১৮৭৮) হিন্দী-গদ্যে অনুবাদ করেন। তাঁর মেঘদূত ও শকুন্তলার অনুবাদ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর ভাষায় ব্রজভাষার কাব্যময় প্রভাব লক্ষিত হয়, তা সত্ত্বেও তিনি সরকারী কাজ-কর্মের উপযোগী বিভিন্ন ভাষার শব্দের সমবায়ে হিন্দীকে গড়ে তোলারও চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'প্রজা-হিতৈষী' (১৮৬১) পত্র প্রকাশ করেন।

এই দুইজন রাজা ছাড়াও হিন্দী গদ্যসাহিত্যকে বিশেষ করে হিন্দী গদ্যকে গড়ে তুলতে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মথুরাপ্রসাদ মিশ্র, ব্রজবাসী দাস, বিহারীলাল চৌবে, শিব-শংকর, কাশীনাথ ক্ষত্রী, রামপ্রসাদ দুবে— প্রমুখের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এই সময় আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে হিন্দীর প্রচার-প্রসারে সহযোগ দেয়। এই প্রসঙ্গে খ্রীস্টান পাদরিদের প্রকাশিত আগ্রার 'লোকমিত্র' এবং লাখনাউ থেকে প্রকাশিত 'অবধ অখবার' প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। 'লোক-মিত্রে'র বাহন ছিল শুদ্ধ হিন্দী গদ্য এবং 'অবধ অখবার' উর্দু ভাষার কাগজ হলেও হিন্দীর জন্যও তাতে পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট ছিল।

নবীনচন্দ্র রায় (১৮৩৭-১৮৯০)—উত্তর প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজা শিবপ্রসাদ মিশ্র যেমন হিন্দীর প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির কাজে ব্রতী ছিলেন, তেমনি পাঞ্জাবের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত একজন হিন্দী-অনুরাগী বাঙালিও হিন্দীর প্রচার-প্রসারের জন্য যত্নবান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দী ভাষার সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দীর সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সাহায্যে হিন্দীর প্রচার সহজ হবে মনে করে তিনি উর্দুর বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন রায়ও এই কথাটি বুঝেছিলেন তাই বেদান্তের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন, হিন্দী পুস্তিকা ছাপেন ও বিনামূল্যে বিতরণ করেম সারা দেশ জুড়ে এবং সমাচারপত্র প্রকাশ করেন। সম্ভবত তাঁর আদর্শেই উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন নবীনচন্দ্র রায়। বাংলা 'তত্ত্ববোধিনী'র (১৮৪৩) আদর্শে তিনি হিন্দী 'জ্ঞানপ্রদায়িনী' (১৮৬৭) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ধর্ম, সমাজ সংস্কার শিক্ষাবিষয়ক ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাদিতে সমৃদ্ধ ছিল পত্রিকাটি। উর্দু ভাষা ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন নবীনচন্দ্র রায়। তিনি মনে করতেন উর্দু ভাষার ভাব-প্রকাশ শক্তি সীমিত এবং তা প্রেমরসেই আবদ্ধ। তাই তিনি বলতেন, 'হিন্দুওঁ কা য়হ কর্তব্য হৈ কি ওয়ে অপনী পরম্পরাগত ভাষা কী উন্নতি করতে চলেঁ।' বলাই বাহুল্য সে ভাষা হিন্দী। এই ভাবে তিনি ভিন্নতর ভাষী হয়েও ভিন্নতর প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচারের সফল প্রয়াস করেন। তাই হিন্দী ভাষা-অনুরাগীরা তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

আর্যসমাজ—শিক্ষা-ক্ষেত্রের মতোই ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয় এই সময়। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর নেতৃত্বে হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশের সামাজিক ও ধার্মিক-শক্তি— শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল। আর্যসমাজ সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিল পাঞ্জাবে। সে সময় পাঞ্জাবে উর্দুর প্রভাব বাড়ছিল এবং হিন্দীর প্রভাব কমে আসছিল। স্বামী দয়ানন্দ এবং তাঁর অনুগামীরা সেখানে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় নবজীবন সঞ্চার করেন। সভা-সমিতি আলাপ-আলোচনার সাহায্যেও তাঁরা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব লোকের কাছে তুলে ধরতে লাগলেন। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমপ্রান্তের জেলাগুলিতে এবং পাঞ্জাবে আর্যসমাজের প্রভাবে হিন্দীগদ্যের প্রচার বেশ দ্রুত তালে শুরু হয়। বর্তমানে পাঞ্জাবে ও হরিয়ানায় হিন্দী ভাষার যে প্রতিষ্ঠা, তা দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্যসমাজেরই প্রচেষ্টার ফল।

পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ফিল্লৌরী (১৮৩৭-১৮৮১)—ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে পাঞ্জাবের একজন যথার্থ হিন্দুসংস্কৃতির ভক্ত এবং হিন্দী ভাষার সাধক-লেখক তাঁর ভাষণ ও প্রচারের সাহায্যে হিন্দুসংস্কৃতিতে নব-জীবন সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর নাম পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ফিল্লৌরী। মিশনারীদের প্ররোচনায় এবং মনের ভ্রমে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিলেন। পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম বহুজনের ভ্রান্তি নিরসন করে পরধর্ম গ্রহণ থেকে তাঁদের নিরস্ত করেন। এমন-কি, কর্পূরথলার রাজা রণবীর সিংহকেও তিনি স্বধর্মচ্যুতি থেকে রক্ষা করেন (১৮৬৩)। শ্রদ্ধারাম উর্দু, হিন্দী ও পাঞ্জাবী—তিন ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তন-মনন ও ভাষণশক্তির সার্থক বিকাশ ঘটেছে হিন্দীতেই। তিনি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সমর্থনে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'সত্যামৃতপ্রবাহ', 'আত্মচিকিৎসা', 'তত্ত্বদীপক', 'ধর্মরক্ষা', 'উপদেশ-

সংগ্রহ', 'শতোপদেশ' এবং 'ভাগ্যবতী' (উপন্যাস, ১৮৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতজীর ভাষা সংস্কৃতনিষ্ঠ বিশুদ্ধ হিন্দী। ভাষা ও বিষয়ের আকর্ষণে 'ভাগ্যবতী' সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনাও তাঁর বেশ সরস ও প্রাঞ্জল। 'শতোপদেশ' গ্রন্থটি তাঁর দোহার সংকলন।

আর্য সমাজের সুকঠোর আঘাতে মানুষের মনে নবীন চেতনার সঞ্চার হয়। আবার প্রাচীনপন্থীরা স্ব-মত পোষণ এবং পর-মতখণ্ডন, এমন-কি, ভিন্নধর্মাবলম্বীরাও নিজেদের ধর্মের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় করে এদেশবাসীর মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দীগদ্যে নানাপ্রকার গ্রন্থ, পুস্তিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেন। এইভাবে হিন্দীগদ্য বহুমুখী পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, বিবিধ-বিচিত্র অভিনব ভাবপ্রকাশের শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে তার গতি অব্যাহত থাকে। ১৮৮৫ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। অতঃপর রাষ্ট্রীয় চেতনাই সাহিত্যসৃষ্টির মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দীগদ্য বা খড়ীবোলী নানাপ্রকার ভাব-প্রকাশের শক্তি অর্জন করে সাহিত্যের যথার্থ বাহন হবার যোগ্যতার পরিচয় দিতে লাগল। প্রয়োজন দেখা দিল প্রতিভাধর সাহিত্যিকের। আবির্ভূত হলেন হিন্দী সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত— ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। অবশ্য জনৈক সন্ত গঙ্গাদাস (১৮২৩-১৯১৩) সাহিত্যে খড়ী-হিন্দী প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন ভারতেন্দুর পূর্বেই।[৩]

ভারতেন্দুর আবির্ভাবে সমগ্র হিন্দী সাহিত্যেই নবীনতার স্রোত দেখা দিল। বিশেষ করে হিন্দী গদ্যশৈলী এবং হিন্দীগদ্য সাহিত্য যেন নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ভারতেন্দু তাঁর নাটক, প্রবন্ধ, কথা এবং কাব্যসাহিত্যের দ্বারা হিন্দী ভাষায় 'শিষ্টতা', সংযম এবং সুস্থিরতা আনলেন। হিন্দীর ব্যঞ্জনা ও গ্রহণশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ব্রজভাষা, পূর্বীভাষা, পাণ্ডিত্য এবং প্রাদেশিকতার

বন্ধন থেকে হিন্দীর মুক্তি ঘটতে শুরু করে। গুরু-গম্ভীর বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে তার সক্ষমতার চিহ্ন স্পষ্টতর হতে লাগল। এক্ষেত্রে ভারতেন্দুর অনুরাগী সাহিত্যিকমণ্ডলীও নানাভাবে ভারতেন্দুর পথ অনুসরণে হিন্দী-গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে যোগ দেয়। তাঁরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সে যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাহিদা পূরণ এবং পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার দ্বারা হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের রূপবিধানে যথেষ্ট সহায়তা করেন। আধুনিকতার স্পর্শ এনে ভারতেন্দু হিন্দী সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হলেন। নতুন শিক্ষার আলোকে মানুষের জীবনবোধ, সমাজবোধ, ধর্মবোধ— সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তদনুযায়ী নানামুখী সাহিত্য-শাখার প্রবর্তন করে তিনি হিন্দী সাহিত্যের লেখক ও পাঠক কুলকে সজাগ করে তুললেন। হিন্দী ভাষার শক্তি-সামর্থ্য ও রূপ তাঁর হাতে এমনভাবে সুস্থির ও সুদৃঢ় হয়ে উঠল যে উর্দু ও হিন্দীর প্রতিযোগিতা অলক্ষে উবে গেল। হিন্দীর পক্ষে সকলের সমাদর লাভের পথ উন্মুক্ত ও সুগম হল। এই সমাদর আরও বৃদ্ধি পেল— 'ভারতেন্দুমণ্ডলে'র কবি পণ্ডিত— প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, উপাধ্যায় বদরীনারায়ণ চৌধুরী, ঠাকুর জগমোহন সিংহ, পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট—প্রমুখের সশ্রদ্ধ প্রয়াসে ও সাহিত্যিক কর্মাবর্তে। তাঁদের ব্যক্তিত্বে হিন্দীগদ্যের বিভিন্ন শৈলী গড়ে উঠল। প্রাচীন-পরম্পরাও অভিনবের জন্য স্থান ছেড়ে দিল।

প্রতাপনারায়ণের ভাষা স্বচ্ছন্দগতি ও কথ্যভঙ্গি-নির্ভর ছিল। বদরীনারায়ণের ভাষা গদ্যকাব্যের, তাতে শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনির ছটা সুস্পষ্ট, গদ্য পংক্তি দূরান্বয়দোষমুক্ত নয়। বালকৃষ্ণ ভট্টের ভাষা স্পষ্ট, কর্কশ ও আক্রমণাত্মক। তীক্ষ্ণতা ও চমৎকারিতা তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য। জগমোহনের গদ্য শুদ্ধ ও অনুপ্রাস ছটামণ্ডিত। হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তিতে মধুর শব্দবিন্যাস তাঁর ললিত রচনাশক্তির পরিচায়ক। এই লেখকদের কেউ-ই ভারী শব্দের অকারণ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন

না। ভাষার প্রবাহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে তাঁদের সকলের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তবু সকলে সমমাত্রায় কৃতকার্য হতে পারেন নি— সে কথা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক হিন্দীগদ্য সাহিত্যের ধারার সূচনা ঘটে নাটকের সাহায্যে। ভারতেন্দুর পূর্বে একমাত্র উল্লেখযোগ্য হিন্দী নাটক ছিল রীঁওয়ার মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ (শাসনকাল—১৮৩৩-১৮৫৪) রচিত 'আনন্দরঘুনন্দন'। ভারতেন্দু বাংলা থেকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অনুবাদ করলেন (১৮৬৮)। তার পূর্বে প্রারব্ধ তাঁর 'প্রবাস' নাটক অসম্পূর্ণই থেকে যায়। হিন্দী সাহিত্যে ভারতেন্দু প্রধানতঃ কবি ও নাট্যকাররূপেই পরিচিত। এই নাট্যরচনা-ধারায় তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অন্য লেখকও যোগ দেন। নানা বিষয়ের নানা প্রবন্ধও লিখিত ও প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এই প্রবন্ধগুলি প্রধানত সমাজ, দেশদশা, ঋতুবর্ণনা, উৎসব-আনন্দ-পাল-পার্বণ, জীবন-চরিত, ইতিহাস, সাহিত্য, জগৎ ও জীবন প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে রচিত। এই প্রবন্ধগুলির ভাষা ও শৈলী ক্রমে-ক্রমে বিচিত্র ও পুষ্টতর হতে থাকে। অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল— এ যুগের সকল লেখকের মধ্যেই হাস্যরসাশ্রিত রচনার অল্পাধিক প্রবণতা। অনেকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনাও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অন্ধ প্রাচীন-মোহ এবং বিদেশিয়ানার অন্ধানুকরণ দুই-ই সমানভাবে নিন্দিত ও বিদ্রূপিত হয়েছে। এই সময় বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখা-দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্য-আধুনিক উপন্যাসের অনুসরণে হিন্দী উপন্যাস রচনার প্রয়াস দেখা দেয়। এই ধরনের মৌলিক হিন্দী উপন্যাস হল শ্রীনিবাস দাস (১৮৫১-১৮৮৭) রচিত 'পরীক্ষা গুরু' (১৮৮২)। অতঃপর রাধাকৃষ্ণ দাস, বালকৃষ্ণ ভট্ট প্রমুখও উপন্যাস রচনায় মনোযোগী হন। তা সত্ত্বেও হিন্দী উপন্যাসের অভাবপূর্তির জন্য বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ প্রয়াসও দেখা দেয়। ভারতেন্দুই সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাসের অনুবাদে হাত দেন। তবে

সেই অনুবাদ কর্মটি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, রাধাচরণ গোস্বামী প্রভৃতি এই অনুবাদ-কার্যে সফলতা প্রদর্শন করেন। অল্প দিনেই হিন্দীতে অনূদিত উপন্যাসের বাহুল্য দেখা দিল। অবশ্য মারাঠী প্রভৃতি ভাষা থেকেও অনুবাদ হচ্ছিল। মূল ভাষার শব্দ, ইডিয়ম প্রভৃতিও হুবহু অনুবাদে গৃহীত এবং ক্রমে তা প্রচারিত হতে লাগল। এইভাবেই অনুবাদ-কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এবং বিবিধ-বিচিত্র উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় সার্থক আধুনিক মৌলিক উপন্যাস রচনার প্রেরণা যোগায়।

হিন্দীগদ্যের উন্নতিকল্পে এই সময় সাতাশটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়— কলকাতা, দিল্লী, লাহোর, আজমির, জব্বলপুর, জয়পুর এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস গ্রন্থে (বি. সং ২০২৯, পৃ. ৩১১) লিখেছেন— 'এই পত্রগুলির অধিকাংশই অল্পদিনেই বন্ধ হয়ে যায়, তবে কয়েকটি একটানা অনেকদিন পর্যন্ত লোকহিতকর কর্ম এবং হিন্দীর সেবা করেছে— যেমন, বিহারবন্ধু, ভারতমিত্র, ভারতজীবন, উচিত বক্তা, দৈনিক হিন্দোস্তান, আর্য দর্পণ, ব্রাহ্মণ ও হিন্দী প্রদীপ প্রভৃতি।'— এই সব পত্র-পত্রিকার প্রকাশ সে যুগে যে কত কঠিন এবং সমস্যাময় ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং উল্লিখিত সমস্ত প্রয়াসের পিছনে যে দেশ ও জাতির সেবা এবং হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনের মহৎ অভিপ্রায় নিহিত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে আধুনিকতার বিশিষ্টতা আনতে যাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন— এবার তাঁদের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫)—বারাণসীর অধিবাসী কবি গিরিধর দাসের পুত্র হরিশ্চন্দ্র হিন্দী সাহিত্যে 'ভারতেন্দু' নামে পরিচিত। তাঁর মতো স্বল্পস্থায়ী জীবনে এত বিপুল সাহিত্যকর্ম দুর্লভ। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য বিশেষরূপে

প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তিনি বিমাতার সঙ্গে পুরী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে বাংলায় আসেন, কিছুকাল অবস্থান করেন। সেই সময় এই প্রতিভাধর বালকের আধুনিক বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ততদিনে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি নূতন জীবন ও জগতের ভাব-ধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে নব-আন্দোলন, সাহিত্যে ঘটেছে তার প্রতিফলন। শুরু হয়েছে সাহিত্যের নব নব শাখায় নতুন-নতুন সৃষ্টি। তা দেখে তীক্ষ্ণধী বালক হরিশ্চন্দ্রের বিস্মিত-বিমুগ্ধ চিত্তে ভেসে উঠল হিন্দী সাহিত্যের প্রাচীন পন্থানুবর্তী আধুনিকতার বাষ্পাচ্ছন্ন করুণ দশা। হিন্দী সাহিত্যের দৈন্যমোচনের শপথ নিল বালক মনে মনে। তাই কাশীতে ফিরে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্র প্রকাশ করলেন 'কবিবচনসুধা' (১৮৬৩) নামে একটি পত্রিকা। প্রাচীন কবিদেরও কবিতার সংকলন থাকত তাতে। কবিতার পত্রিকা হলেও এক সময় তাতে হিন্দীগদ্যও ছাপা হত। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি 'বালা-বোধিনী' (১৮৭৩) নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি 'হরিশ্চন্দ্র ম্যাগাজীন' প্রকাশ করেন। নবম সংখ্যা থেকে এটি 'হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা'—নামগ্রহণ করে। এই 'হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা'র পৃষ্ঠাতেই পরিমার্জিত ও সুষ্ঠু হিন্দীর প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। ভারতেন্দুর মতে 'হিন্দী নঈ চাল মেঁ ঢলী সন্ ১৮৭৩ ঈ.।' এইভাবে হরিশ্চন্দ্রের কলমে যে ভাষার সূচনা হল তা অকৃত্রিম ও বন্ধনমুক্ত। এই সহজ-স্বাভাবিক ভাষাই পরবর্তীকালে হিন্দী সাহিত্যের একমাত্র বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ভারতেন্দুকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী বা মণ্ডল গড়ে উঠেছিল— 'ভারতেন্দু মণ্ডল' নামে তা অভিহিত। এই মণ্ডলভুক্ত তাঁর সহযোগীরা নানা বিষয় নিয়ে মার্জিত ও সুললিত ভাষায় এমন সব প্রবন্ধ লিখলেন— যার গৌরব দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য— মুন্সী জ্বালাপ্রসাদের 'কবিরাজ কী সভা', তোতারামের 'অদ্ভুত-অপূর্ব স্বপ্ন', কাশীপ্রসাদের

'রেল কা বিকট খেল' এবং হরিশ্চন্দ্রের 'পাঁচওয়া পয়গম্বর'। এ-গুলি অতিমাত্রায় লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ তাদের ভাষা ও বিষয়ের নতুনত্বের স্বাদ ছিল খুবই আকর্ষণীয়।

হরিশ্চন্দ্রের প্রতিভার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নাটকে। নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে তিনি দেশভক্তি, ভাষা-প্রেম, ভগবদ্ভক্তি, পরোপকার বৃত্তি, সমাজ-সংস্কার, পরাধীনতার পাশমুক্তি-প্রয়াসের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগলেন।[৪] এ ক্ষেত্রে প্রধান সহায় ছিল— তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

নাটকের ক্ষেত্রে ভারতেন্দু যুগান্তর এনেছিলেন। তিনি সতেরোটি নাটক রচনা করেন। যদিও অধিকাংশ নাটক সংস্কৃত, প্রাকৃত বাংলা ও ইংরেজির অনুবাদ, তবু হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাতে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। তাঁর মৌলিক নাটক আটটি— বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি (১৮৭৩), প্রেমযোগিনী (১৮৭৪), চন্দ্রাবলী (১৮৭৬), বিষস্য বিষমৌষধম্ (১৮৭৬), ভারত দুর্দশা (১৮৭৬), নীলদেবী (১৮৮০), অঁধের নগরী (১৮৮১) ও সতীপ্রতাপ (অসম্পূর্ণ ১৮৮৪)। ভারতেন্দুর অনূদিত নাটক নয়টি— বিদ্যাসুন্দর (১৮৬৭, দ্বি. সং ১৮৮২), রত্নাবলী (১৮৬৮), পাখণ্ড বিড়ম্বন (১৮৭৩), ধনঞ্জয়বিজয় (১৮৭৩), সত্যহরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫), মুদ্রারাক্ষস (১৮৭৫-৭৭), কর্পূর মঞ্জরী (১৮৭৬), ভারতজননী (১৮৭৭) ও দুর্লভ বন্ধু (১৮৮০)। বিদ্যা-সুন্দর— বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অনুসরণে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত বিদ্যাসুন্দর নাটক (১৮৫৮) অবলম্বনে রচিত। তাতে বিদ্যা-সুন্দরের প্রেম গাথা বেশ উপভোগ্য রূপ লাভ করেছে। ভারতেন্দু নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম বাংলার মতোই রেখেছেন, কেবল প্রহরীর বদলে 'চৌকিদার' ব্যবহার করেছেন। যতদূর সম্ভব বাংলার নাট্য-শৈলীই অনুসরণ করেছেন। রত্নাবলী, ধনঞ্জয় বিজয় ও মুদ্রারাক্ষস সংস্কৃত, কর্পূরমঞ্জরী প্রাকৃত এবং দুর্লভবন্ধু ইংরেজি (শেকস্পীয়রের 'মার্চেন্টস্ অফ ভেনিস') থেকে অনূদিত। ক্ষেমেশ্বর কৃত বাংলা

'চণ্ডকৌশিক' (১৮৬৯) অথবা পার্বতীচরণ তর্করত্ন রচিত 'হরিশ্চন্দ্র চরিত' (১৮৭৩) অবলম্বনে 'সত্য-হরিশ্চন্দ্র' লিখিত মনে হয়। 'ভারত-জননী' কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা 'ভারতমাতা'র (১৮৭৩) অনুবাদ।

নাটকের ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে ভারতেন্দু বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' চার অঙ্কের প্রহসন। বেদ-পন্থীদের মদ-মাংস-আহার, পশুবলি এবং সামাজিক ভ্রষ্টাচারকে আক্রমণ করা হয়েছে।[৫] চন্দ্রাবলী নাটকে প্রেমের আদর্শ রূপায়িত। নীল দেবীতে পাঞ্জাবের জনৈক রাজার মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হবার ঐতিহাসিক কাহিনী বিধৃত। ভারত দুর্দশায় দেশের সমসাময়িক অবস্থার পরিচয় বেশ উপভোগ্য রূপে চিত্রিত। বিষস্যবিষমৌষধম্ প্রহসনে দেশীয় রাজাদের কুচক্রিতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এগুলি হয় প্রহসন, নয় প্রহসনধর্মী রচনা।

প্রেমযোগিনীতে সে যুগের ভণ্ড ধার্মিকদের মুখোস খুলে দেবার প্রয়াস দেখা যায়। নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতেন্দু প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা ও পাশ্চাত্য নাট্যকলা— উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করেন। 'কাশ্মীরকুসুম' এবং 'বাদশাহদর্পণ' রচনা করে তিনি ইতিহাস-রচনা ও কবি জয়দেবের জীবনবৃত্ত লিখে জীবনচরিত-রচনার দিকে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি উপন্যাস রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন কিন্তু অকাল মৃত্যুর ফলে সে কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে নি। সরসহৃদয় কবি ভারতেন্দুর রচনা তাঁর জীবিতকালেই লোকের মুখে মুখে ফিরত।

ভারতেন্দুর সৃজনশক্তি ও ব্যক্তিত্বের টানে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই গোষ্ঠী বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বদরীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীনিবাস দাস, বালকৃষ্ণ ভট্ট, কেশবরাম ভট্ট, অম্বিকাদত্ত ব্যাস, রাধাচরণ গোস্বামী প্রমুখ উচ্চস্তরের লেখক ও কবি ছিলেন। তাঁরা আপন-আপন সাহিত্যসাধনার সাহায্যে হিন্দী সাহিত্যকে তার বিকাশের

দিকে প্রাগ্রসর করেন। ভারতেন্দুর পরেও তাঁরা হিন্দী-ভারতীর সেবায় রত ছিলেন। ভারতেন্দুর খড়ী-হিন্দীর দুইটি শৈলী দৃষ্ট হয়—আবেগপ্রবাহী ও তথ্যনিরূপক। ভাবাবেগের ভাষায় তাঁর বাক্য ছোটো-ছোটো, সুললিত ও সুসমঞ্জস; তা আবার কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বহুল প্রচলিত আরবি-পারসি শব্দও তাতে এসে গেছে, তবে পরিমাণে কম। তাঁর আলোচনাত্মক শৈলী যুক্তি-অনুসারী, কতকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সহজ ও বলিষ্ঠ। সব মিলিয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হিন্দী সুসংবদ্ধ বাক্যগঠন, শব্দচয়ন ও বিন্যাসের ভিত্তিতে নির্মিত। ভারতেন্দুর ভাষা-প্রেম সকল যুগের সব ভাষাপ্রেমীর কাছেই আদর্শ-স্বরূপ। সংস্কৃতির প্রতীক ভাষা সম্পর্কে তিনি সহজ-ভাবে বলেছিলেন— ভাষার উন্নতিই সব উন্নতির মূল।—

নিজ ভাষা উন্নতি অহে, সব উন্নতি কো মূল।
বিনু নিজ ভাষা জ্ঞানকে, মিটে ন হিয় কী শূল॥

—নিজের ভাষার উন্নতিই সব উন্নতির মূল,
আপন ভাষার জ্ঞান ছাড়া কি মেটে হিয়ার শূল!

শেষ পংক্তিটির বক্তব্য রামনিধি গুপ্তের—'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' পংক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

সে যুগে ভারতেন্দুর এই বিরাট সাফল্যের মূলে— তাঁর গ্রহণ-ক্ষমতার বিচক্ষণতা, মানসিক উদারতা ও গুণগ্রাহিতা এবং সহজ-নির্মোহ ব্যক্তিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[৬] রামচন্দ্র শুক্লের মতে— 'স্বীয় সর্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি [ভারতেন্দু] একদিকে পদ্মাকর ও দ্বিজদেবের ধারার বাহক, অন্যদিকে বঙ্গদেশের মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের শ্রেণীভুক্ত। একদিকে তাঁকে রাধাকৃষ্ণের ভক্তিতে বিভোর নবভক্তমাল গাঁথতে দেখা যেত, অন্যদিকে মন্দিরের অধিকারী ও তিলকধারী ভক্তদের নিয়ে তামাসা করতে এবং মন্দির, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার আদি বিষয়ের ব্যাখ্যাদিতে দেখা যেত। প্রাচীন

এবং নবীনের এই সুন্দর সামঞ্জস্য ভারতেন্দুর শিল্পকলার এক দুর্লভ মধুর বৈশিষ্ট্য। হিন্দী সাহিত্যের নূতন যুগের ভোরের প্রবর্তকরূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি দেখালেন যে, 'বাইরের নব-নব ভাবকে আত্মস্থ ও সমন্বিত করে এমনভাবে প্রকাশ করা দরকার যাতে তা আপন সাহিত্যেরই বিকশিত অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়।'

—হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস (বি. সং ২০২৯), পৃ. ৩১৫

জীবন-চর্যা, জীবন-দর্শন, বিদ্যাশিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যানুরাগ, পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা, কবিতা ও নাটক রচনা, ভ্রমণ ও পরোপকার-বৃত্তি এবং স্বদেশ প্রেম— এক কথায় সামগ্রিক মানসিকতার বিচারে বাঙালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সঙ্গে ভারতেন্দুর বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতেন্দুকে কেন্দ্র করে তাঁর চার পাশে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তার প্রধান বিশিষ্টতা— সজীবতা বা প্রাণময়তা। সেই লেখকদের মধ্যে বিশেষ রকমের স্ফূর্তি ও চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। হাস্য ও ব্যঙ্গপূর্ণ শৈলীর মাধ্যমে তাঁরা সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চার এবং অভিনব ও বিচিত্র সাহিত্যের আস্বাদ-দানে সার্থক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এবার ভারতেন্দুকালের সেই সব লেখকদের কয়েকজনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

প্রতাপনারায়ণ মিশ্র (১৮৫৬-১৮৯৪)—কানপুরের অধিবাসী সংকটা-প্রসাদ মিশ্রের সন্তান প্রতাপনারায়ণ বাল্যকাল থেকেই স্বচ্ছন্দ বা বেপরোয়া প্রকৃতির ছিলেন। স্কুলের লেখা-পড়া তাঁর বেশি দূর হয় নি। পরে অবশ্য নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত, হিন্দী, আরবি-পারসি ও বাংলা শিখেছিলেন। বাংলার কবিয়ালদের মতো 'লাবনী'র দলের সঙ্গে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াতেন। লেখার জগতে ভারতেন্দু ছিলেন তাঁর গুরু-সখা ও আদর্শ। তবু স্বকীয়তার ছাপ রয়েছে তাঁর রচনায়। হাস্যপ্রিয়তা ও তির্যকতা তাঁর প্রবন্ধশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সহজ-

সরল-স্বাভাবিক ও উপযোগী শব্দের ব্যবহারে তিনি উদার ছিলেন। ১৮৮৩ সনে তিনি 'ব্রাহ্মণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সাহায্যেই তিনি হিন্দী ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পত্রিকায় তিনি নানা বিষয়ের লঘু ও গুরু ভাবের প্রবন্ধ লিখতেন। বিষয়োপযোগী ভাষার ব্যবহারে তিনি দক্ষ ছিলেন। একদিকে তা চটুল-চপল, অন্যদিকে ধীর ও সংযত। প্রবন্ধ-নাটক লিখে এবং বাংলা থেকে অনুবাদ করে তিনি হিন্দী সাহিত্যে সমৃদ্ধি আনতে চেয়েছিলেন। হিন্দী প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে প্রতাপনারায়ণের নাম অবিস্মরণীয়। তাঁর বর্ণনাত্মক, বিবেচনাত্মক, ভাবাত্মক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক এবং অন্য প্রকারের প্রবন্ধের সর্বসাকুল্যে সংখ্যা ১৯১। এগুলি 'নিবন্ধ-নবনীত' (১৯১৯), 'প্রতাপ পীযূষ' (১৯৩৩) এবং 'প্রতাপনারায়ণ গ্রন্থাবলী' (১৯৫৭) প্রভৃতি সংকলনে প্রকাশিত। 'কলি-কৌতুক' (১৮৮৬), 'জ্বারী খুআরী', 'ভারত দুর্দশা' (১৮৯০), 'হঠী হমীর', 'কলি-প্রভাব', 'জয়নারায়ণ সিংহ', 'সঙ্গীত শাকুন্তল' ও 'কলিপ্রবেশ' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক-প্রহসন ও গীতি-নাট্য।

প্রতাপনারায়ণ অনূদিত তেরোটি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়— বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ (১৮৯৪), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৯৫), রাধারাণী (১৮৯৭) এবং ইন্দিরা— এই চারটি উপন্যাস; চরিতাষ্টক (আটজন বাঙালী মহাপুরুষের জীবনচরিত), পঞ্চামৃত, নীতি-রত্নাবলী, কথামালা, বর্ণপরিচয়, সেনবংশ, ত্রিপুরা কা ইতিহাস, 'সুবে বঙ্গাল কা ইতিহাস' এবং 'সুবে বঙ্গাল কা ভূগোল' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি বাংলা থেকে অনুবাদ করেন। বলাই বাহুল্য শেষের কয়েকটি ছাত্রোপযোগী গ্রন্থ।

বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৪৪-১৯১৪)—প্রয়াগের পণ্ডিত বেণীপ্রসাদ ভট্টের পুত্র বালকৃষ্ণ সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন। তিনি হিন্দী গদ্যকে সুস্থির ও সুব্যবস্থিত রূপ দানের জন্য ১৮৭৭ সালে 'হিন্দী প্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। একটানা প্রায় বত্রিশ বৎসর ধরে তিনি এই পত্রে

সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। কয়েকটি মৌলিক এবং অনূদিত নাটক এবং উপন্যাসও 'হিন্দী-প্রদীপে' প্রকাশিত হয়। বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ বচন ব্যবহারে ভট্টজী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তদ্ভব, তৎসম শব্দের সঙ্গে আরবি-পারসি এমন-কি ইংরেজি শব্দও অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করতেন। ভাষা-শৈলীতে প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে সাম্য থাকলেও বিশিষ্টতাও সুস্পষ্ট। হাস্যরসাত্মক রচনায় তিনি গভীরতা, সংযম ও তির্যক-ভঙ্গির সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য ও সাহিত্যকারের পরিচয়ও ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হত 'হিন্দী-প্রদীপে'। হিন্দী সাহিত্যের গঠনে বালকৃষ্ণের এই জাতীয় প্রয়াস ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এডিসন-স্টীল (১৬৭২-১৭১৯ ; ১৬৭২-১৭২৯) এবং বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) অনুরূপ প্রয়াসের কথা স্মরণ করায়।

ভট্টজী রচিত নাটকের মধ্যে 'কলিরাজ কী সভা', 'রেল কা বিকট খেল', 'বাল্যবিবাহ নাটক', 'চন্দ্রসেন নাটক', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ভারতেন্দুর পন্থানুসরণে তিনি মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' ও 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দুইটিও হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

হিন্দী সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধকার ভট্টজী আলোচনা বা সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তকরূপেও মান্য। তিনি হিন্দী-প্রদীপে শ্রীনিবাস দাসের নাটক, 'সংযোগিতা-স্বয়ম্বরে'র 'সচ্চী সমালোচনা' বা যথার্থ সমালোচনা প্রকাশ করেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। সঠিক হিন্দী সমালোচনা পদ্ধতির সূত্রপাত এখান থেকেই।

উপাধ্যায় বদরীনারায়ণ চৌধুরী 'প্রেমঘন' (১৮৫৫-১৯১৩)—মির্জাপুরের প্রতিষ্ঠিত চৌধুরী বংশের সন্তান বদরী নারায়ণের পিতার নাম গুরুচরণ লাল। বাল্যকাল থেকেই তিনি হিন্দী, পারসি ও ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর আচার-আচরণ, কথাবার্তা এবং লেখাতে আভিজাত্যের ছাপ ছিল। স্বতন্ত্র বিচার, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং

বক্রোক্তিপূর্ণ ভাষা তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। তিনি ভারতেন্দুর ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। লেখায় 'প্রেমঘন' উপনাম ব্যবহার করতেন। তিনি তৎসম শব্দ-বহুল ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবণতা ছিল শিল্পিত গদ্য-ব্যবহারের দিকে। তাঁর ভাষায় অনুপ্রাস এবং মিলের ছটা সুলভ ছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ বাক্যেরও ব্যবহার করতেন। 'আনন্দ কাদম্বিনী' (১৮৮১) নামে একটি সাহিত্যিক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে প্রকাশ করেন 'নাগরী নীরদ' পত্রিকা (১৮৯৩)। এই পত্রিকা-দুইটির নামকরণ থেকেই তাঁর কবি-সুলভ-মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর গদ্য অনেকটা কাব্যধর্মী। তবে কাব্যধর্মী ও অলংকৃত হলেও তা পরিমার্জিত ও প্রাঞ্জল। সে যুগে এ-রূপ গদ্য-রচনার নিদর্শন দুর্লভ।

'প্রেমঘন' কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। তার মধ্যে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে রচিত 'ভারত সৌভাগ্য' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাতে ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের মানুষ (বাংলা সহ)— নিজ-নিজ ভাষায় কথা বলেছে। বিষয় ভারতবর্ষের দুর্দশা, পরাধীনতার গ্লানি ও তার জন্য ক্ষোভ। এ ছাড়াও তিনি 'প্রয়াগ রামাগমন', 'বারাঙ্গনারহস্য মহানাটক' প্রভৃতি নাটকও লেখেন। শেষেরটি প্রহসন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'আনন্দ-কাদম্বিনী'তে একুশ পৃষ্ঠা জুড়ে শ্রীনিবাস দাসের 'সংযোগিতা-স্বয়ংবর' নাটকের সমালোচনা প্রকাশ করেন। তাতে নানা-দৃষ্টিতে নাটকটির দোষ-গুণ নিরপেক্ষ অথচ সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসটির গদাধর মিশ্র কৃত হিন্দী-অনুবাদের (১৮৮৬) সমালোচনা করেন পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে। এইভাবে তিনি হিন্দী-সমালোচনা-শাখাকে অভিনবতা প্রদান করেন। হিন্দী সাহিত্যের এই নবীন শাখাটি উত্তরোত্তর স্বীকৃতি লাভ করে সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

লালা শ্রীনিবাস দাস (১৮৫১-১৮৮৭)—দিল্লীর অধিবাসী লালা মঙ্গলী-

লালের পুত্র শ্রীনিবাস দাস। ভারতেন্দুর সমসাময়িক হিন্দী সাহিত্যিক-দের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর রচিত চারটি গ্রন্থের মধ্যে— 'তপ্তাসংবরণ' (১৮৮৩), 'সংযোগিতা-স্বয়ংবর' (১৮৮৫) এবং 'রণধীর ও প্রেম-মোহিনী'— এই তিনটি নাটক এবং 'পরীক্ষা গুরু' উপন্যাস (১৮৮২)। নাটক তিনটির প্রথমটি পৌরাণিক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক এবং তৃতীয়টি কাল্পনিক। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'রণধীর ও প্রেমমোহিনী'— শেক্‌সপীয়রের ইংরেজি 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের আদর্শে রচিত। প্রস্তাবনাহীন বিয়োগান্ত নাটক এটি। এরূপ নাটক এদেশে তখন কমই লেখা হত।

শ্রীনিবাস দাসের খ্যাতির আধার হল তাঁর 'পরীক্ষাগুরু' উপন্যাসটি। হিন্দী উপন্যাসের বিকাশের ক্ষেত্রে পরীক্ষাগুরুর গুরুত্ব কম নয়। উপন্যাসের যে মানদণ্ড পরীক্ষাগুরুতে লেখক গ্রহণ করেছেন পরবর্তীকালের হিন্দী উপন্যাসে তারই অনুসরণ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁর গ্রন্থে সমকালীন অন্যান্য লেখকদের তুলনায় সংযত ও বলিষ্ঠ রূপ লাভ করেছে হিন্দী গদ্য।

অম্বিকাদত্ত ব্যাস (১৮৫৮-১৯০০)—পণ্ডিত দুর্গাদত্ত ব্যাসের পুত্র অম্বিকাদত্ত ব্যাসের জন্ম হয় কাশীতে। তিনি মূলত কবি, সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিষ্ঠাবান সমর্থক এবং উপদেশক ছিলেন। আর্য সমাজের সঙ্গে বিরোধ ও স্ব-মত প্রচারের জন্য তিনি হিন্দী ভাষাকেই যোগ্য মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষাতেও কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখতে পারতেন।

ব্যাসজী 'পীযূষপ্রবাহ' (১৮৮৪)— নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ এবং 'সংস্কৃত সঞ্জীবনী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ললিতা-নাটিকা' (১৮৮৩), 'গো-সংকট' (১৮৮৬), 'ভারত-সৌভাগ্য' (১৮৮৭), 'গদ্যকাব্য-মীমাংসা', 'অবতার মীমাংসা', 'মরহঠা নাটক' এবং 'বিহারী বিহার' প্রভৃতি হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন। 'আশ্চর্যবৃত্তান্ত' নামে একটি হিন্দী উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। নাম থেকেই বোঝা

যায় এর কাহিনী পুরোপুরি কাল্পনিক, অদ্ভুত এবং অলৌকিক। তাঁর গদ্য-শৈলী প্রাচীন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

রাধাচরণ গোস্বামী (১৮৫৮-১৯২৫)—গোস্বামীজী বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত লালূজী গোস্বামী। রাধাচরণ ভালো সংস্কৃত জানতেন। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের প্রভাবে দেশভক্তি ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। হিন্দীর প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি 'কবিকুল কৌমুদী'— নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। বৃন্দাবন থেকে 'হরিশ্চন্দ্র' পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তিনি ভালো বক্তা ও উপদেশ-দাতা ছিলেন। তাঁর ভাষা বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিণত ছিল। তিনি কিছুটা স্বতন্ত্র মতাবলম্বী ছিলেন। 'সুদামা নাটক', 'সতী চন্দ্রাবলী', 'অমরসিংহ রাঠোর', 'তন-মন-ধন শ্রীগোসাঈঁ জীকে অর্পণ' (১৮৯০)— প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক। 'বিধবা বিপত্তি', 'যমলোক কী যাত্রা', 'স্বর্গযাত্রা', 'কল্পলতা' ও 'বাল্যবিধবা' প্রভৃতি তাঁর বিভিন্ন বিষয়-আধৃত গ্রন্থ। তিনি 'বিরজা' (১৮৯১), 'সাবিত্রী' ও 'মৃন্ময়ী' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করেন। তিনি উচ্চস্তরের কবিও ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ দাস (১৮৬৫-১৯০৭)—ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের আত্মীয় ও তাঁর সাহিত্যানুরাগী লেখক ছিলেন রাধাকৃষ্ণ। তিনি ভারতেন্দুর অসমাপ্ত 'সতীপ্রতাপ' নাটকটি সম্পূর্ণ করেন। তাছাড়া প্রায় পঁচিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'দুঃখিনী বালা' (১৮৮০), 'মহারাণী পদ্মাবতী' (১৮৮২) ও 'মহারাণা প্রতাপ' (১৮৯৭) প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। শেষের নাটকটি বেশ বড়ো ও উচ্চ-স্তরের সামগ্রী। কয়েকবার অভিনীতও হয়। 'নিঃসহায় হিন্দু' (১৮৯০) নামে একটি রাজনৈতিক উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। 'মরতা ক্যা ন করতা' 'স্বর্ণলতা' (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) এবং বঙ্কিমের রাধারাণী (১৮৮৩)— উপন্যাস তিনটি বাংলা ভাষা থেকে অনূদিত। সে যাই হোক, নাটক রচয়িতারূপেই রাধাকৃষ্ণ দাস হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত।

বালমুকুন্দ গুপ্ত (১৮৬৫-১৯০৭)—পাঞ্জাবের রোহতক জেলায় বালমুকুন্দ গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সে যুগের প্রায় অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ ও কুশলী হিন্দী-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদন-কর্ম শুরু হয় উর্দু-পত্রিকা (১৮৮৭) দিয়ে। পরে কলকাতায় প্রখ্যাত হিন্দী-পত্র 'হিন্দী-বঙ্গবাসী'র (১৮৯০) সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন এবং 'ভারতমিত্রে'রও প্রধান সম্পাদক হন (১৮৯৮)। এই দুইটি পত্রিকার সাহায্যে তিনি হিন্দী ভাষায় প্রবাহ বা সহজ গতি আনতে সচেষ্ট হন। সুন্দর-সুগঠিত হিন্দীতে চিন্তামূলক-নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস-পূর্ণ আক্রমণাত্মক ভাষার ব্যবহারেও তিনি নিপুণ ছিলেন। শিষ্ট ও গভীর ভঙ্গিতে তিনি বিদ্রূপ করতেন। গ্রাম্যতা ও লঘুতাহীন তাঁর ব্যঙ্গ রচনায় রাজনীতির মাত্রা অধিক থাকত। তিনি লর্ড কার্জন এবং সে যুগের বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর ফুলর সাহেবকেও আক্রমণ করেন। এমন-কি হিন্দী সাহিত্যের অবিস্মরণীয় পুরুষ মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীও তাঁর ব্যঙ্গ-বাণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। এই নির্ভীক সম্পাদক ও ব্যঙ্গকারের 'শিব শম্ভু কা চিট্‌ঠা'— হিন্দী হাস্য ও ব্যঙ্গ সাহিত্যে সদা-সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার থেকে কিছু অংশ—

> 'ইতনে মেঁ দেখা কি বাদল উমড় রহে হৈঁ। চীলেঁ নীচে উতর রহী হৈঁ। তবীয়ত ভুরভুরা উঠি। ইধর ভঙ্গ, উধর ঘটা—বহার মেঁ বহার। ইতনে মেঁ বায়ু কা বেগ বঢ়া, চীলেঁ অদৃশ্য হুঈঁ। অঁধেরা ছায়া, বূঁদে গিরনে লগীঁ; সাথহী তড়তড় ধড় ধড় হোনে লগী। দেখা ওলে গির রহেঁ হৈঁ। ওলে থমে; কুছ বর্ষা হুঈ, বূটী তৈয়ার হুঈ; 'বম্‌ভোলা' কহকর শর্মাজী নে এক লোটা ভর চঢ়াঈ। ঠীক উসী সময় লাল ডিঙ্গী পর বড়ে লাট মিণ্টো নে বঙ্গদেশ কে ভূতপূর্ব ছোটে লাট লর্ড উডবর্ন কী মূর্তি খোলী। ঠীক এক হী সময় কলকত্তে মেঁ য়হ দো আবশ্যক কাম হুয়ে। ভেদ ইতনা হী থা, কি শিবশম্ভু শর্মা কে

বরামদে কী ছত পর বূঁদেঁ গিরতী থীঁ ঔর লর্ড মিণ্টো কে সির য়া ছাতে পর।

...গুলাবী নশে মেঁ বিচারোঁ কা তার বঁধা কি বড়ে লাট ফুরতি সে অপনী কোঠী মেঁ ঘুস গয়ে হোঁগে ঔর দূসরে অমীর ভী অপনে অপনে ঘরোঁ মেঁ চলে গয়ে হোঁগে, পর ওয়হ চীল কহাঁ গঈ হোগী ? ... হা! শিবশম্ভু কো ইন পক্ষিয়োঁ কী চিন্তা হৈ, পর ওয়হ য়হ নহীঁ জানতা কি ইন অভ্রম্পর্শী অট্টালিকাওঁ সে পরিপূরিত মহানগর মেঁ সহস্রোঁ অভাগে রাত-বিতানে কো ঝোঁপড়ী ভী নহীঁ রখতে।'

কি স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ এই ভাষা। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। লেখকের রুচি ও লক্ষ্য অনুযায়ী ভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। হিন্দীর খড়ীবোলী-গদ্য যে কতখানি বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে— তা বুঝতে আর বাকি থাকে না। অংশটি পড়তে পড়তে হুতোমী বা আলালী বাংলা গদ্যের কথা মনে পড়া বিচিত্র নয়।

আলোচ্য যুগের অন্য উল্লেখযোগ্য গদ্যকার হলেন— ঠাকুর জগমোহন সিংহ (১৮৫৭-১৮৯৯), বাবু তোতারাম (১৮৪৭-১৯০২), কেশবরাম ভট্ট (১৮৫৪-১৯০৪), কাশীনাথ খত্রী (১৮৪৯-১৮৯১), কার্তিকপ্রসাদ খত্রী (১৮৫১-১৯০৪), কলকাতায় থাকাকালীন বিংশবর্ষীয় যুবক কার্তিকপ্রসাদ হিন্দী পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করেন ও বাংলা থেকে 'ইলা', 'প্রমীলা', 'জয়া' ও 'মধুমালতী' প্রভৃতি উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করেন। ফ্রেডরিক পিন্‌কাট (১৮৩৩-১৮৯৬)। সুদূর ইংলণ্ডে বসে হিন্দী শিখে হিন্দীতে গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর দুইটি হিন্দী বই— 'বালদীপক' (চার খণ্ডে) ও 'ভিক্টোরিয়া-চরিত্র'।

এই সব গদ্যকার ও গদ্য-শিল্পীর প্রয়াসে খড়ীবোলী বেশ বলিষ্ঠ ও সক্ষম হয়ে ওঠে। তাঁদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে রামচন্দ্র শুক্ল লিখেছেন—

'হরিশ্চন্দ্র যুগের সব লেখকই নিজ-নিজ ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সজাগ ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃতের এমন শব্দ এবং রূপের-ই ব্যবহার করতেন যা শিষ্টসমাজে চলে আসছিল। যে-সব শব্দ অথবা রূপের সঙ্গে কেবলমাত্র সংস্কৃতানুরাগীরাই পরিচিত, অথবা যে-সব শব্দ ভাষাপ্রবাহের সঙ্গে চলতে পারে না, তার প্রয়োগ তাঁরা অনন্যোপায় হয়েই করতেন।'

—হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস (বি. সং ২০২৯), পৃ. ৩০৮

—এই সব সাহিত্যিকদের প্রয়াসে আড়ষ্টতা বা জড়তা থেকে খড়ী-হিন্দীর যেমন মুক্তি ঘটল তেমনি তার ভাবপ্রকাশ ক্ষমতাও অভূতপূর্ব রূপে দেখা দেয়। ভারতেন্দু ও তাঁর সহযোগীরা সাহিত্যে জীবনের রূপ-রেখা বিকাশের প্রতিফলনের নির্বাধ সুযোগ করে দেন। তারই ফলে উনবিংশ শতকের পর হিন্দী সাহিত্যের ধারা উন্মুক্ত গতিতে অগ্রসর হতে পেরেছে, আর হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধ আধুনিক রূপ সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছে।

কিন্তু খড়ীবোলীর শব্দ-প্রয়োগভিত্তিক রূপ কি হবে তা নিয়ে বিংশ শতকের প্রারম্ভেই আবার গোলযোগ উপস্থিত হল। আরবি-পারসি শব্দবহুল, না তৎসম শব্দবহুল, না তদ্ভব শব্দবহুল— কেমন হবে খড়ী-হিন্দী? আবার একদল উর্দু ও হিন্দীর মিশ্রণ ঘটিয়ে—খড়ীবোলীকে ব্যাবহারিক রূপ দিতে চাইতেন। তারই সঙ্গে হিন্দীর বাক্যরচনা ইংরেজির আদর্শে, না সংস্কৃতের আদর্শে না বাংলার আদর্শে হবে— এ নিয়েও মত-বিরোধ দেখা দিল। শব্দ-ভাণ্ডার ও বাক্য গঠনের এই মতভেদজনিত সমস্যা থেকে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করলেন আচার্য মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। তাঁর অনেক ঘষা-মাজা ও ব্যক্তিত্ব আরোপের ফলে হিন্দী গদ্যের স্বাভাবিকতা কিছুটা খর্ব হলেও, তাতে ভাষার স্বচ্ছতা ও ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

হিন্দী গদ্যসাহিত্যের প্রচার-প্রসার

ভারতেন্দুর সময়ে হিন্দী গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির কাজ বেশ আগ্রহ উদ্দীপনা এবং সফলতার সঙ্গে শুরু হলেও তার প্রচার-প্রসারের তেমন সুযোগ ঘটেনি। আদালতে উর্দুর ব্যবহার, বিদ্যালয়ে ইংরেজির সঙ্গে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রশাসক ও আমলাদের অধিকাংশেরই হিন্দীর প্রতি বিরূপতা— প্রভৃতিই ছিল তার প্রধান অন্তরায়। তাই হিন্দী ভাষা ও নাগরী লিপির উপযোগিতা-প্রমাণ এবং জনসাধারণের মনে তার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন দেখা দিল। সে কাজ শুরুও হয়। এ ব্যাপারে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রেরই আগ্রহ ও সক্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রতাপনারায়ণ মিশ্র। তিনি হিন্দী, হিন্দু ও হিন্দুস্তানীর প্রসঙ্গ ও উৎকর্ষের বিষয় রাগ-রাগিণী সহযোগে গেয়ে শুনিয়ে বেড়াতেন। এই সময় তোতারামের উদ্‌যোগে আলিগড়ে 'ভাষাসম্বর্ধিনী' সভা স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সনে প্রয়াগে স্থাপিত হয়— 'হিন্দী উদ্ধারিণী প্রতিনিধি মধ্যসভা'। সরকারী দপ্তরে যাতে নাগরী লিপি ও হিন্দী ভাষার ব্যবহার শুরু হয়, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বার বার তার প্রয়াস করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। তবু প্রয়াস অব্যাহত ছিল।

সুতরাং উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে হিন্দী প্রচারের আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে ওঠে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্যামসুন্দর দাস, পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র, ঠাকুর শিবকুমার সিংহ প্রমুখ কাশীতে 'নাগরী প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সভা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিকে হিন্দী ভাষা ও নাগরী লিপির সমৃদ্ধি সাধন ও প্রচারই ছিল সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানও সংযুক্ত হয়ে

পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। নাগরী লিপি ও হিন্দীর সমর্থনে সভা, সমিতি, ভাষণ, পুস্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতি কাজ সভা শুরু করে। প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাছে বার বার স্মারকলিপি দিয়ে, দেখা-সাক্ষাৎ-আলাপ-আলোচনা করে অবশেষে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দীকে আদালতের স্বীকৃত-ভাষার মর্যাদা-প্রদান সম্ভব হয়। নাগরী প্রচারিণী সভার প্রয়াসে হিন্দী আদালতের ভাষারূপে স্বীকৃত হওয়ায় সমাজের নানা স্তরের মানুষ হিন্দী শিখতে ও লিখতে শুরু করেন। ফলে সংস্কৃতবহুল, উর্দুবহুল, ইংরেজি-শব্দে ভরা এবং বাংলা ও অন্য কয়েকটি ভাষার প্রকৃতি নিয়ে হিন্দীর বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ গড়ে উঠতে শুরু করে। সুতরাং অনিবার্যভাবে তাতে শৈথিল্য দেখা দিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই হিন্দী, উর্দুর স্থান কেড়ে নেবে—এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে উর্দুভাষী এবং উর্দুপ্রেমিগণ হিন্দীর আবার বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁদের প্রয়াস এবং শাসক ইংরেজের অনুকম্পায় নাগরী লিপি পরিত্যক্ত হয়। পরে বিংশ শতকের প্রারম্ভে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ফলে নাগরী লিপি আবার স্বীকৃতি পায়। স্বীকৃতি লাভের জন্য যে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে বহু ব্যক্তি এবং বহু প্রতিষ্ঠানের দান থাকলেও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় (১৮৬১-১৯৪৬) এবং নাগরী প্রচারিণী সভার ভূমিকাই প্রধানভাবে স্মরণীয়। পরে আবার ভাষা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। হিন্দীতে আরবি-পারসি শব্দপ্রযুক্ত হবে কি হবে না, তাই নিয়ে তিনটি মত গড়ে উঠল। কিছু লোক— আরবি-পারসি শব্দ ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, সমর্থক ছিলেন সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারের। অন্য একটি দল আবার হিন্দীকে তৎসম শব্দে ভারাক্রান্ত করার বিরোধী ছিলেন, সহজ-সরল তদ্ভব শব্দের সমর্থক ছিলেন তাঁরা। আর তৃতীয় পক্ষ— হিন্দী ও উর্দুর মিলন সাধনের প্রয়াসী ছিলেন। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে দুই ভাষার শব্দ খেয়াল-খুশি মতো ব্যবহার করাই তাঁদের কাছে শ্রেয় ছিল। বাক্যগঠন (বাক্যরূপ) সম্পর্কেও নানা মুনির

নানা মত দেখা দিল। তবে, ইংরেজি বাক্যের অনুরূপ সরল, ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্য নির্মাণ, সংস্কৃতাদর্শে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ অলংকারবহুল বাক্য গঠন অথবা বাংলার মতো সরস-কোমল-কান্ত পদাবলীর আদর্শ অনুসরণ— বাক্যনির্মিতির এই ত্রিবিধ প্রণালীর প্রয়াস লক্ষিত হয়। শেষ পর্যন্ত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীর মতো ভাষা-সাধক ব্যক্তিত্বের কল্যাণে হিন্দী গদ্যের একটি উপযোগী সুদৃঢ় রূপ ফুটে ওঠে। তাঁরই প্রয়াসে হিন্দী ভাষার স্বচ্ছতা, ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা এবং সৌন্দর্য সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নাগরী প্রচারিণী সভা হিন্দী ভাষা ও নাগরী লিপির স্বীকৃতি-আদায় ও তার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিক-প্রয়াসও শুরু করে। হিন্দীর প্রাচীন কবি ও সাহিত্যের পরিচয় সংগ্রহ এবং তার সুষ্ঠু প্রকাশের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সফলতা দেখা দেয় প্রথম বৎসরেই। এই ধরনের প্রাচীন হিন্দী কবিদের ইতিবৃত্ত সর্বপ্রথম ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে গার্স্যাদ্য তাসী কৃত 'হিন্দুস্তানী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত হয়। পরে ১৮৮৩ সনে ঠাকুর শিব সিংহ সেঙ্গর তাঁর 'শিবসিংহ সরোজ' গ্রন্থে অনুরূপ সংকলন প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে জর্জ গ্রিয়র্সন হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস রূপে 'মডার্ন ভার্নাকুলার লিটরেচার অব্ নর্দান হিন্দুস্তান' প্রকাশ করেন। নাগরী প্রচারিণী সভার স্বতন্ত্র প্রয়াসে এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে বিস্তৃত এবং বিপুলভাবে প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সুরক্ষা ও সম্পাদনার কাজ পরম উৎসাহে শুরু হয়। তারই ফলস্বরূপ প্রাচীন কবি ও কাব্য সম্পর্কে প্রভূত পরিমাণে তথ্য-সামগ্রী সংগ্রহ সম্ভব হয়। বহু অজ্ঞাত তথ্য নব আলোকে উদ্ভাসিত হয়, বিচিত্র বিষয়ের সীমিত জ্ঞানের বিস্তার ও তার চর্চার সুযোগ ঘটে। কাব্যের সংকলন প্রকাশ এবং হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস রচনাও সম্ভব হর। বিজ্ঞান-আলোচনা ও শিক্ষা দানের সুবিধার জন্য সভা ১৯০৬ সনে 'বৈজ্ঞানিক কোশ' প্রকাশ করে। প্রকাশ শুরু হয় 'নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা'র। পত্রিকায় সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক,

দার্শনিক প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা শুরু হয়। সভা থেকে নানা প্রকার গ্রন্থ, কাব্য ও গ্রন্থাবলীর প্রকাশনা শুরু হয়। এইভাবে হিন্দী সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যকর্ম বা সৃজনশীলতার বিচারে এই যুগটি তখনও অনেকটা তরলভাবাপন্ন। যে সব পথ ও তার শাখা-প্রশাখা হিন্দী সাহিত্যসেবীদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেগুলির গ্রহণ ও অনুসরণে প্রভূত বাধা ছিল। আর তার স্বরূপ স্পষ্ট ছিল না। এই অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন আচার্য মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী সে কথা আমরা জানি। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায় ছিল 'সরস্বতী' পত্রিকা (১৯০০-১৯২০)। মহাবীর প্রসাদ পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯০৩ সালে।

উল্লেখপঞ্জী

১. পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী', ব্রহ্মসূত্রের 'শংকর-ভাষ্য', মীমাংসা সূত্রের 'শাবরভাষ্য', মনুসংহিতার 'মেধাতিথিভাষ্য' —প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লেখকের 'রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দী চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-আষাঢ় ১৩৯২-৯৩। পৃ. ১২৭-১৩৬।

৩. দ্রষ্টব্য—'দিবঙ্গত হিন্দী সেবী' ২য় খণ্ড (১৯৮৩), 'লেখকীয় নিবেদন', পৃ. ১৪

৪. এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৮৬১-৬২ সনে ১৫ নয় (পৃ. ২০৬ দ্রষ্টব্য), ১১-১২ বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্র পুরী তীর্থে যাওয়ার সময় বর্ধমানে বিমাতার বিরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গ ছেড়ে রানীগঞ্জে চলে যান। সেখানে রাত্রিবাসের সময় আকস্মিকভাবে এক স্থলে বাংলা নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটে। অভিনয় দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে বালক হরিশ্চন্দ্র বাংলা শিখতে ও পড়তে যত্নবান হন। স্বল্পায়াসেই বাংলা শিখে নাটকটি সংগ্রহ করে পড়ে ফেলতে সমর্থ হন। এই ভাবে যুক্ত হন বাংলা ভাষা, বাংলা নাটক ও বাঙালীর সামাজিক চিন্তাধারার সঙ্গে। সেদিন সম্ভবত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৬) নাটকটির অভিনয় ভারতেন্দু দেখেছিলেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্য ও সমাজের প্রতি ভারতেন্দুকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এই নাটকটির ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়। স্মরণীয় ভারতেন্দুর একটি প্রাসঙ্গিক উক্তিও। 'আপবীতি'তে লিখেছেন—

> 'গ্যারহ বর্ষ কী অবস্থা মেঁ হম্ জগন্নাথ জী গয়ে, মার্গ মেঁ বিধবা বিবাহ নাটক বঙ্গভাষা মেঁ মোল লিয়া, সো অটকল হী সে উসকো পঢ় লিয়া।'

—ব্রজরত্ন দাস : 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' (১৯৪৮), পৃ. ৬৫

পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও সমসাময়িক বাঙালী সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভারতেন্দুর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতায় এলেই তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায়— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দী প্রবন্ধও প্রকাশিত হত। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লেখকের প্রবন্ধ— 'কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দুর বাংলা পদ' সমকালীন (পত্রিকা), ফাল্গুন, ১৩৭৫ এবং ব্রজরত্ন দাসের গ্রন্থ— 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' (হিন্দী, ১৯৪৮)।

৫. বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ সালের সপ্তম সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' প্রহসনটির বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। দ্রষ্টব্য— বঙ্গদর্শন, ১৩৮০ কার্তিক, পৃ. ৩৭৬।

৬. দ্রষ্টব্য—হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী : হিন্দী সাহিত্য (১৯৫২) পৃ. ৩৯৮-৯৯

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দী গদ্যসাহিত্য

(১৯০০-১৯৮০)

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, তাঁর সহযোগী এবং সমসাময়িক অন্যান্য হিন্দী অনুরাগীদের প্রয়াসে মনোরঞ্জক হিন্দী-গদ্য সাহিত্যের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। হিন্দীর প্রতি ইংরেজি শিক্ষিতদের অবজ্ঞার ভাব যেন কিছুটা মন্দীভূত হয়েছিল। বঙ্কিম সমকালীন বাংলার মতোই হিন্দী বা মাতৃভাষা না জানাটা এক সময় আভিজাত্যবোধক মনে হলেও তাতে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। কিন্তু ইংরেজি, সংস্কৃত ও আরবি-পারসির জ্ঞাতারা যে হিন্দী লিখতে শুরু করলেন তাতে ইংরেজিয়ানা, সংস্কৃতপনা ও আরবিয়ানা ফুটে উঠতে থাকে। বিভিন্ন বিদেশী ও ভারতীয় ভাষা থেকে সাহিত্যকৃতি বিশেষ করে নাটক, উপন্যাস ও ছোটো গল্প হিন্দীতে অনূদিত হতে লাগল। পাঠক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে বাংলা-উপন্যাসের অনুবাদ ও প্রেরণার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অনুবাদকেরা বাংলা উপন্যাসের কেবল কাহিনী, গঠন ও আস্বাদ দিয়েই যে ক্ষান্ত হলেন, তা নয়, বাংলা ভাষার শব্দ, ভঙ্গিমা এবং বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও তাঁরা হিন্দী পাঠকদের পরিচিত করতে প্রয়াসী হয়ে বাংলা বাগ্‌বিধি, বাক্য বা বাক্যাংশ এবং শব্দের ব্যবহারও করতে লাগলেন। ইংরেজি থেকে অনুরূপ বস্তু গ্রহণেও কোনো দ্বিধা ছিল না। তাই 'জীবনহোড়', 'কবিকা সন্দেশ', 'দৃষ্টিকোণ', 'বিহঙ্গাবলোকন', 'সিংহভাগ' প্রভৃতির সঙ্গেই বাংলাভাষা-আগত 'সিহরনা', 'কাঁদনা', 'বসন্তরোগ', 'শেষ করনা', 'জিজ্ঞাসা করনা', 'সর্বনাশ', 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' 'অসুবিধা' প্রভৃতির প্রয়োগও চোখে পড়ে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল।

বহু ব্যবহারের ফলে বেশ কয়েকটি বাংলা শব্দ হিন্দী হয়ে পড়েছে—যেমন অসুবিধা, অভাবিত, আব-হওয়া, অশুভ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি। এই সব প্রয়োগের ফলে হিন্দীতে সুন্দর মার্জিত সংস্কৃত ধ্বনিগরিমার সংস্পর্শ ঘটে। হিন্দী গদ্যের একটি বিশেষ প্রাঞ্জল রূপের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই সময় আবার ব্যাকরণগত শৈথিল্যও দেখা গেল। ভাষা দুষ্ট ও অশুদ্ধ হতে লাগল। এই ধরনের পতন রোধ করতে এগিয়ে এলেন মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী। 'সরস্বতী'র (১৯০৩) পৃষ্ঠায় সম্পাদক দ্বিবেদীজী ব্যাকরণগত অশুদ্ধি ও ভাষার মার্জিত রূপের আদর্শ, প্রয়োগ ও তার গুরুত্ব তুলে ধরলেন লোকের কাছে। তাঁর ভাষার সংস্কার-সাধন ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দান—সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার উদ্দেশ্য ও সফলতার সঙ্গে তুলনীয়। ক্রমে ক্রমে স্বীয়-স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ লেখকদের রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বাক্য-বিন্যাস, শব্দ-চয়ন ও সন্নিবেশ, বিরামচিহ্নের প্রয়োগ প্রভৃতিতে লেখার শৈলী বিশিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অনুবাদের কালে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার শক্তি অনুধাবন ও অনুসৃতির ফলে হিন্দীর শব্দভাণ্ডার এবং শব্দশক্তি বা ব্যঞ্জনাশক্তির সমৃদ্ধি ঘটে। যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক-ভাব-সম্পদের বাহন হয়ে উঠল হিন্দী। বাংলার বিভিন্ন প্রকার কথা-সাহিত্যের অনুবাদের ফলে— সামাজিক, পারিবারিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে হিন্দী পাঠক ও লেখকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ায়—পরবর্তীকালে মৌলিক উপন্যাস রচনার ইচ্ছা ও শক্তি দেখা দিল। প্রাচীন গালগল্প বা 'আষাঢ়ে রহস্যময়' আখ্যায়িকার দিন ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে এল। এই প্রসঙ্গে আচার্য হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর একটি অভিমত স্মরণীয়—

> 'বাংলা উপন্যাস একদিকে হিন্দীকে অতিপ্রাকৃত, অতিরঞ্জিত, ঘটনাবহুল, অবিশ্বাস্য ছলচাতুরীপূর্ণ উপন্যাসের মোহজাল থেকে মুক্তি দিয়েছে, অপরদিকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাকে উৎসুক করে তুলেছে। তার অনুবাদ হিন্দী ভাষাতে সংস্কৃত

পদাবলীর মাধুরী এবং গাম্ভীর্যের যুগপৎ যোগান দিয়েছে, কোমল ভাব ও সুকুমার কল্পনার রুচি তৈরি করে দিয়েছে।'

—হিন্দী সাহিত্য (১৯৫২), পৃ. ৪২০

হিন্দী ছোটো গল্পের ক্ষেত্রেও বাংলা তথা বিদেশী ভাষা থেকে ছোটো গল্পের অনুবাদই প্রথমে পূর্ববর্তী রহস্যাত্মক একঘেঁয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতর স্বাদ আনে এবং এই ভিন্নতর স্বাদ ও অনুবাদ প্রয়াসের ফলশ্রুতিরূপেই মৌলিক হিন্দী কহানী বা গল্প রচনার সূত্রপাত ঘটে।

হিন্দী নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ চোখে পড়ে না। রামকৃষ্ণ বর্মার পরেও কিছু বাংলা নাটকের অনুবাদ হয়, কিন্তু আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণার বিচারে তা উপন্যাসের সমকক্ষ নয়। কাশী ও প্রয়াগে স্থাপিত নাট্যমঞ্চের জন্য অভিনয়-উপযোগী নাটক লেখার প্রয়াস চলতে থাকলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো নাট্যকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়েই বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের বিজয় অভিযান দেখা দেয়। হিন্দীতে তার অনুবাদ প্রকাশে বিলম্ব হয় নি। রবীন্দ্রনাথেরও কিছু-কিছু নাটক অনূদিত হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হল কিন্তু তাতে স্তর ও বৈচিত্র্যগত কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। তা সত্ত্বেও নানাপ্রকার শৈলী বা লেখার স্টাইল গড়ে উঠেছে প্রবন্ধ রচনার—সেকথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। উচ্চ স্তরের প্রবন্ধের সংখ্যা কম হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে ভারতেন্দু যুগেই। কিন্তু তার স্তরোন্নতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে এ-যুগেই। মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীই বিস্তৃত এবং বিচিত্র সমালোচনার পথ প্রদর্শন করেন। মিশ্রবন্ধুগণ ও পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্মা তাঁদের স্ব-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কয়েকজন প্রধান কবির কাব্যের মূল্য-বিচার করেন। তবে এই আলোচনা বহিরঙ্গ বিষয়েই সীমিত থাকে। স্থায়ী সাহিত্যের পদ-বাচ্য সমালোচনা কৃতির সংখ্যা খুবই কম।

এই সময় জীবন-চরিত রচনার নব-প্রয়াস দেখা দেয়। পণ্ডিত মাধবপ্রসাদ মিশ্র কৃত 'স্বামী বিবেকানন্দ কা জীবন-চরিত' ও 'বিশুদ্ধ চরিতাবলী' এবং শিবনন্দন সহায় লিখিত 'বাবু হরিশ্চন্দ্র কা জীবন-চরিত' 'গোস্বামী তুলসীদাসজী কা জীবন-চরিত' ও 'চৈতন্য মহাপুরুষ কা জীবন-চরিত' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইভাবে হিন্দী গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। এবার সেই স্পষ্ট রূপ গ্রহণের ক্রিয়াটি বোঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমে উপন্যাসের কথা।—

উপন্যাস

ভারতেন্দুর সময় থেকেই বাংলা-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে উপন্যাসের অনুবাদ শুরু হয়। তার পূর্বে রহস্য-কাহিনী, ঐন্দ্রজালিক-কাহিনী, লঘুভাবের প্রেম-কাহিনী— প্রভৃতি লেখার একটি ধারা চলে আসছিল। এই ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল— আরবি-পারসি কাহিনীর অনুসৃতিতে। ভারতেন্দুর সময় থেকে যেমন প্রচুর সংখ্যায় বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ শুরু হল তেমনি কেউ কেউ মৌলিক উপন্যাস রচনারও চেষ্টা করেন। লক্ষণীয় হল— উপন্যাস-অনুবাদ ও রচনায় যেমন উৎসাহ দেখা দেয় তেমনটি সাহিত্যের অন্য কোনো বিভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি।

রামকৃষ্ণ বর্মা (১৮৫৯-১৯০৬) ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই উর্দু ও ইংরেজি থেকে কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে 'ঠগবৃত্তান্তমালা' (১৮৮৯), 'পুলিসবৃত্তান্তমালা' (১৮৯০), 'আকবর' (১৮৯০), 'অমলাবৃত্তান্তমালা' (১৮৯৪) এবং বাংলা থেকে 'চিত্তোর চাতকী' (১৮৯৫)— উল্লেখযোগ্য। কার্তিকপ্রসাদ খত্রী অনুবাদ

করেন— 'ইলা' (১৮৯৫) ও 'প্রমীলা' (১৮৯৬)। পরে 'জয়া ও মধুমালতী'র অনুবাদও প্রকাশিত হয়। গোপালরাম 'গহমরী' বাংলা থেকে 'চতুর চঞ্চলা' (১৮৯৩), 'ভানুমতী' (১৮৯৪), 'নয়েবাবু' (১৮৯৪), 'বড়াভাঈ' (১৯০০), 'দেবরানী জেঠানী' (১৯০১), 'দো বহিন' (১৯০২), 'তীনপতোহু' (১৯০৪) ও 'সাসপতোহু'— অনুবাদ করেন। উদিত-নারায়ণলাল স্বর্ণকুমারী ঘোষালের বাংলা 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, চণ্ডীচরণ সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র প্রমুখ বাংলার খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশ উপন্যাস-কৃতির অনুবাদে হিন্দী সাহিত্যে সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের অনুবাদও শুরু হয়। 'চোখের বালি' 'আঁখ কী কিরকিরী' নামে প্রকাশিত হয়। এই সব অনুবাদের ফলে হিন্দী মৌলিক উপন্যাসের কাঠামো ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হতে থাকে। তার স্তরও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। অনুবাদকদের মধ্যে ঈশ্বরীপ্রসাদ শর্মা এবং রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়ের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাপ্রসাদ শুক্লের উর্দু থেকে 'পূনা মেঁ হলচল' এবং রামচন্দ্র বর্মার মারাঠী থেকে 'ছত্রসাল' প্রভৃতির অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি থেকে বেশি অনুবাদ হয় নি। কিছু কিছু রচনা ইংরেজি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬) রেনাল্ডসের 'পিতলের মূর্তি', 'নর পিশাচ' ও 'লণ্ডন-রহস্য' (The mysteries of the Court of London) বাংলায় অনুবাদ করেন। এগুলি বাংলা থেকে হিন্দীতে অনূদিত হয়।[১] আমেরিকার মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীমতী হ্যারিয়েট ভিচার স্টো-এর প্রখ্যাত রচনা Uncle Tom's Cabin (1852)-এর চণ্ডীচরণ সেনের (১৮৪৫-১৯০৬) বঙ্গানুবাদ— 'টম কাকার কুটির' থেকে 'টম কাকা কী কুটিয়া'— নামে অনূদিত হয়। এই বিংশ শতকের প্রারম্ভে এডগার এলেন পো, কোনান ডয়েল এবং রেনাল্ডস্ প্রমুখের প্রভাব পড়ে হিন্দী উপন্যাস

সাহিত্যে। তবে সংখ্যা এবং অন্যান্য গুরুত্বের বিচারে হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদক ও পাঠকদের সমধিক দৃষ্টি ও অনুরাগ যে বাংলা-উপন্যাসের প্রতিই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার হিন্দীর মৌলিক উপন্যাস প্রসঙ্গে আসা যাক।

হিন্দীর মৌলিক উপন্যাস—মিরাটের অধিবাসী পণ্ডিত গৌরী দত্তের 'দেবরানী জেঠানী কী কহানী' (১৮৭০) হিন্দীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস। তারপর প্রকাশিত হয় পাঞ্জাবের শ্রদ্ধারাম 'ফিল্লৌরী'র (১৮৩৭-১৮৮১), 'ভাগ্যবতী' (১৮৭৭)। এ দুইটি উপন্যাস জাতীয় রচনা মাত্র। তাই হিন্দীর প্রথম মৌলিক উপন্যাসরূপে শ্রীনিবাস দাসের 'পরীক্ষা-গুরু'র (১৮৮২) কথাই উল্লেখ করা হয়; এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দাসের 'নিঃসহায় হিন্দু' (১৮৮৬), বালকৃষ্ণ ভট্টের 'নূতন ব্রহ্মচারী' (১৮৮৬) ও 'সৌ অজান এক সুজান' (১৮৯২) প্রভৃতি উপন্যাসধর্মী গ্রন্থের নামও স্মরণীয়। কবি অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় ড. জনসনের (১৭০৯-১৭৮৪) রাসেল্যাস (১৭৫৯) ইংরেজি উপন্যাসটির অনুবাদ 'ভেনিস কা বাঁকা' (১৮৯২) সংস্কৃতনিষ্ঠ ভাষায় এবং কথ্য হিন্দীতে 'ঠেঠহিন্দী কা ঠাট' (১৮৯৯) ও 'অধখিলা-ফূল' (১৯০৭) রচনা ও প্রকাশ করে হিন্দী গদ্যের প্রচলিত দুই শৈলীর কথাসাহিত্যের বাহন-যোগ্যতা পরীক্ষা করেন। তাই সাহিত্য-শিল্পের বিচারে এই উপন্যাস তিনটির তেমন গুরুত্ব নেই। সাংবাদিকতা বৃত্তিধারী লজ্জারাম মেহতাও হিন্দুধর্ম ও হিন্দু পরিবারের শৃঙ্খলার উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। শিল্পগত নয়, উদ্দেশ্যগত কারণেই এগুলির সৃষ্টি। তাঁর 'ধূর্ত রসিকলাল' (১৮৯৯), 'হিন্দু গৃহস্থ', 'আদর্শ দম্পতি' (১৯০১), 'বিগড়ে কা সুধার' (১৯০৭) এবং 'আদর্শ হিন্দু' (১৯১৫) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি নামেই নিজ নিজ পরিচয় বহন করছে। ব্রজ-নন্দন সহায়ের 'রাধাকান্ত' (১৯১২) ও 'সৌন্দর্যোপাসক' (১৯১৯)—উপন্যাস দুইটি কাব্যভাবাপন্ন রচনা। এখানে চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনাবৈচিত্র্য গৌণ, মনোভাব বা মনোবিকৃতির প্রগল্‌ভ ও সবেগ ব্যঞ্জনাই মুখ্য।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯২২) বাংলা গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) পাঠ করেই তার দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে ব্রজনন্দন, এ দুইটি উপন্যাস লিখেছিলেন। এই জাতীয় উপন্যাস মৌলিক হলেও সার্থক উপন্যাসের মর্যাদার অধিকারী নয়। তবে অভিনব বিচিত্র-সাহিত্য-রস-আস্বাদ্য করার ক্ষেত্রে এগুলির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

দেবকীনন্দন খত্রী (১৮৬১-১৯১৩)—সাহিত্যের বিচারে উপন্যাস রূপে গণ্য না হলেও দেবকীনন্দন খত্রীর রচনা ঘটনার ঘনঘটা, রহস্যের মায়াজাল এবং সুখ-পাঠ্যতার গুণে পাঠক মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তিনি একদিকে যেমন হিন্দী পাঠকমন বিমুগ্ধ করেছেন তেমনি উর্দু ভাষার পাঠককুলকে হিন্দী শিখতে ও পড়তে প্রলুব্ধ করেছেন। আবার হিন্দী শিখে হিন্দী সাহিত্য-সৃজনেও উৎসাহিত করেছেন অনেককে। এর থেকেই তাঁর মৌলিক কাহিনীর গুরুত্ব ও সার্থকতা বোঝা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নরেন্দ্রমোহিনী' (১৮৯৩), 'কুসুমকুমারী', 'বীরেন্দ্র বীর', 'চন্দ্রকান্তা' (১৮৯২), চন্দ্রকান্তা-সন্ততি প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। তবে 'চন্দ্রকান্তা' ও 'চন্দ্রকান্তা-সন্ততি'— গ্রন্থ দুইটিই তাঁর সমস্ত যশ-প্রতিষ্ঠার মূলে। তাঁর প্রবর্তিত এই রহস্যাত্মক, ঐন্দ্র-জালিক-কাহিনী-রচনার ধারা আজও অব্যাহত। তাঁর অনুসারী লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম— হরিকৃষ্ণ জৌহর।

গোপালরাম গহমরী (১৮৬৬-১৯৪৬)—প্রধানত অন্য ভাষা থেকে উপন্যাস অনুবাদকরূপেই গোপালরাম গহমরী পরিচিত। কয়েকটি 'জাসুসী' বা গোয়েন্দা উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। তিনি 'জাসুস' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাতে গোয়েন্দা কাহিনী ও রহস্যধর্মী অন্যান্য রচনাও প্রকাশিত হত। এই সময় বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু স্থান ও কাল ছাড়া ইতিহাসের আর কোনো উপাদান তাতে গৃহীত হয়নি। স্থান ও

কালের উল্লেখমাত্র করে অলৌকিক-অবিশ্বাস্য-কপোল-কল্পিত কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই জাতীয় রচনাকে কোনোমতেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে 'লখনউ কী কব্র', 'শোণিত-তর্পণ', 'রাণী দুর্গাবতী', 'রাণী সংযোগিতা', 'চৌহানী তলবার', 'সোনে কী রাখ', অবধ কী বেগম'— প্রভৃতি ঐতিহাসিক নামধেয় লঘু-উপন্যাসের প্রসঙ্গ— স্মরণীয়। শোণিত তর্পণ— পাঁচকড়ি দে রচিত বাংলা উপন্যাসের চন্দ্রশেখর পাঠক কৃত হিন্দী অনুবাদ।

গোস্বামী কিশোরীলাল (১৮৬৫-১৯৩২)—গোস্বামীজীর উপন্যাস সাধারণভাবে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হলেও অল্পাধিক সাহিত্যধর্মিতাও তাতে মেলে। সমাজের রুগ্ন-ভগ্ন অংশের উজ্জ্বল ছবি, মানব-মনের বাসনার তীব্র-তীক্ষ্ণ রূপ, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রভৃতির সঙ্গে সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি লেখকের সজাগদৃষ্টি ও সহানুভূতি লক্ষণীয়। তিনি 'উপন্যাস' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (১৮৯৮) এবং ছোটোবড়ো মিলিয়ে ৬৫টি উপন্যাস রচনা করেন। তার মধ্যে— 'ত্রিবেণী' (১৮৮৯), 'হৃদয়-হারিণী' (১৮৯০), 'লবঙ্গ লতা' (১৮৯০) ও 'সুখশর্বরী' (১৮৯১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রোমান্স ও নৈতিক-শিক্ষার ভিত্তিতেই এগুলি রচিত। তবে সাময়িক-আনন্দ ও বিলাসের মোহ অতিক্রম করে জনরুচি-নির্মাণে লেখক সফল হতে পারেন নি।

আলোচ্য যুগেই রাধাচরণ গোস্বামীর 'বিধবা বিপত্তি' (১৮৮৮), হনুমন্ত সিংহের 'চন্দ্রকলা' (১৮৯৩) এবং গোকুলনাথ শর্মার 'পুষ্পবতী' প্রভৃতি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়।

অতঃপর হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দী উপন্যাস ও ছোটো গল্পের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটে তাঁর লেখনীস্পর্শে। শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের জীবনের করুণ দিক্‌টি মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন তিনি। তাই রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোর্কী (১৮৬৮-১৯৩৩) ও বাংলার শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া হয় ঔপন্যাসিক হিসাবে। প্রেমচাঁদের পন্থানুসারী

বিশ্বম্ভরনাথ কৌশিক, প্রতাপনারায়ণ শ্রীবাস্তব, জৈনেন্দ্রকুমার প্রমুখ সামাজিক উপন্যাসকার এবং বৃন্দাবনলাল বর্মার মতো ঐতিহাসিক উপন্যাসকার হিন্দী কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সামাজিক উপন্যাসে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থিক পালাবদলের ছবিও যথাসম্ভব অঙ্কিত। শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-চর্যা, জীবিকা ও আস্থা অর্থাৎ জীবনের মূল্যবোধ সব দিক দিয়েই পুরাতনের সংস্কার-সাধন এবং নূতনের গ্রহণ ও বর্জনের যে রূপবৈচিত্র্য তাও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতেও উপন্যাস রচিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ভগবতীচরণ বর্মার চিত্রলেখা (১৯৩৪) উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য, তার প্রেরণা এসেছে সম্ভবত বাংলা সামাজিক উপন্যাস থেকে।[২] অবশ্য ইংরেজি উপন্যাসের কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সামাজিক উপন্যাসে সাধারণ জন-জীবনের নানাদিক চিত্রিত। তাতে গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের মর্মস্পর্শী বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে তার ঘটনাকাল ঐতিহাসিক। প্রেমচাঁদের উপন্যাসে নিম্ন ও মধ্যবর্গীয় মানুষের গৃহ-জীবনের বাস্তব রূপটি উদ্ভাসিত। তবে সাধারণভাবে এ-যুগের অধিকাংশ উপন্যাসেই যে জীবন-চিত্র অঙ্কিত তা পুরোপুরি ভারতীয় নয়, বহুলাংশেই অভারতীয়। শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-পরা, প্রণয়-ভালোবাসা, আদব-কায়দা, সংলাপ-বিলাপ, সম্ভাষণ ও আশীর্বচন— সবই যেন বিজাতীয়, বিদেশীয়। হিন্দীতে ঐতিহাসিক উপন্যাস কমই রচিত হয়েছে। উদীয়মান হিন্দী ঔপন্যাসিকও পাঠকদের কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের— 'করুণা', 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল'-নামক উপন্যাস তিনটির অনুবাদ। তবে ঠিক এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস হিন্দীতে রচিত হয় নি। বৃন্দাবনলাল বর্মা ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগের কাহিনী নিয়ে 'গঢ়কুণ্ডা'র, 'বিরাটা কী পদ্মিনী' প্রভৃতি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেছেন। হিন্দী-ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নব পথ-প্রদর্শন করেছেন হাজারীপ্রসাদ

দ্বিবেদী— তাঁর 'বাণভট্ট কী আত্মকথা' শীর্ষক-আত্মকথনমূলক গ্রন্থে। এবার হিন্দী উপন্যাসের একটু বিস্তৃত পরিচয় প্রসঙ্গে আসা যাক।—

প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬)—বারাণসীর নিকটবর্তী এক গ্রামের নির্ধন পরিবারে প্রেমচাঁদের জন্ম হয়। তাঁর প্রকৃত নাম মুন্সী ধনপত রায়। কোনোক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমচাঁদ শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। স্ব-গুণে তিনি ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের উপ-পরিদর্শকের পদে উন্নীত হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করে দেশ-সেবার কাজে ব্রতী হন। তারপর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁকে জীবিকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। 'তিনি দারিদ্র্যেই জন্মগ্রহণ করেন; দারিদ্র্যের মধ্যেই বড়ো হন এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই নিঃশেষ হন।' স্থায়ী-অস্থায়ী বিভিন্ন রকমের চাকরী এবং পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা করে তিনি অবশেষে 'হংস'—নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ছোটো-গল্প ও উপন্যাস রচনার কাজও চলতে থাকে। এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রেমচাঁদ সে যুগের উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত।

প্রেমচাঁদ তাঁর কথাসাহিত্যে উত্তর ভারতের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, পীড়ন, অপমান, নারীজাতির নিরুপায় জীবন প্রভৃতির স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন এবং মানুষের মহত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাংলার দুঃস্থ-নরনারীর যে সহানুভূতিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, উত্তর ভারতের জনগণের অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় প্রেমচাঁদের রচনায়। তিনি বলতেন, 'আমি শ্রমিক, শ্রম না করে অন্নগ্রহণের অধিকার আমার নেই।' ধর্মের ভণ্ডামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না, আর মনুষ্যত্ব ছিল তাঁর কাছে মহা মূল্যবান। প্রেমচাঁদ অতীতের উপাসক বা ভবিষ্যতের রূপকার ছিলেন না, সততার সঙ্গে বর্তমানকেই বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন—তাই তার সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ-বিষয়ে

তাঁর অভিমত শোনা যায় তাঁর এক খেয়ালী পাত্রের (মেহতা) মুখে—'আমি অতীতের চিন্তা করি না, ভবিষ্যতের জন্যও ভাবি না। ভবিষ্যতের চিন্তা আমাদের কাপুরুষ করে তোলে, অতীতের বোঝা আমাদের কোমর ভেঙে দেয়। আমাদের জীবনীশক্তি এতই কম যে, অতীত ও ভবিষ্যতে ছড়িয়ে দিলে তা ক্ষীণ হয়ে যায়। আমরা অকারণ বোঝা বয়ে— নানা প্রকার রূঢ়ি (সংস্কার), বিশ্বাস ও ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছি। ওঠবার নাম নেই। সে সামর্থ্যই বা কই! যে শক্তির স্ফূর্তি মানবধর্মের পূর্তির জন্য প্রয়োগ করা দরকার ছিল— সহযোগিতা ও আত্মীয়স্বজনের কল্যাণে, তা প্রাচীন শত্রুতার প্রতিশোধ এবং বাপ-ঠাকুর্দার ঋণ-পরিশোধেই নিঃশেষ হয়ে যায়।'— এতেই মূর্ত হয়েছে প্রেমচাঁদের জীবন-দর্শন। তাঁর মতে— প্রেম অতি পবিত্র বস্তু। মানসিক ক্লেদ, মিথ্যাচার ও তামসিকতাকে ধ্বংস করে প্রেম নবীন-জ্যোতিতে ভরে দেয় মানবজীবন। এই প্রেমই মানুষকে মানবসেবা ও আত্মত্যাগে প্রণোদিত করে। প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটে ত্যাগ ও সেবাতেই। প্রেমচাঁদের পাত্র যখন প্রেমে দীক্ষা নেয়, তখনই সে উদ্দিষ্টের সেবায় অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে সর্বস্ব ত্যাগ করে কৃতার্থ বোধ করে।

হিন্দী সাহিত্যের নতুন চরিত্রপ্রধান উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে প্রেমচাঁদ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। প্রথম জীবনে তিনি উর্দুতে গল্প (১৯০৪) লিখতে শুরু করেন। পরে হিন্দীর প্রতি আকৃষ্ট হন। উপন্যাস ও ছোটো গল্প রচনা করে তিনি উর্দু ও হিন্দী কথাসাহিত্যকে অকল্পনীয়ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর পূর্বে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চিত্রায়ণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত না। প্রেমচাঁদ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও ব্যক্তিত্বে ভাস্বর করে তুলেছেন। তারা চলে বেড়ায়, গল্প করে, হাসে, কাজ করে, আবার দুঃখ করে, কাঁদেও। গ্রাম্য পরিবেশ, পুলিস কর্মচারীর অত্যাচারী-স্বরূপ প্রভৃতির রূপায়ণে তিনি অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর চিত্রিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ছবিও জীবন্ত

ও বাস্তবানুগ। তাঁর রচনায় যেন কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই, যা সহজ ও স্বাভাবিক তাই স্থান পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে উপদেশ-দান ও সংস্কার-ধর্মিতার দ্বারা উপন্যাসশিল্প ব্যাহত হলেও প্রচার বা অপপ্রচারমূলক সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেন নি। তাঁর এই প্রবণতা ও প্রয়াস ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ প্রবৃত্তির সঙ্গে তুলনীয়। তাই সার্থক উপন্যাস শিল্পী হিসাবে প্রেমচাঁদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রেমচাঁদের উপন্যাসগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও সাধারণ সমস্যামূলক প্রারম্ভিক রচনা—'প্রতিজ্ঞা' (১৯২৯) ও 'বরদান' (১৯৩৮)। এই ছোটো উপন্যাস দুইটি বিষয় ও শিল্পের বিচারে তেমন উল্লেখের দাবি রাখে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে। পণ-প্রথার স্বরূপ, বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ ও তার কুফল এবং পণ ও অলঙ্কারাদির দাবির দুষ্পরিণাম প্রভৃতি লক্ষিত হয়। 'সেবাসদন' (১৯১৯), 'নির্মলা' (১৯২৮) ও 'গবন' (১৯৩১) প্রভৃতি কথাগ্রন্থে লেখকের এই জাতীয় তীক্ষ্ণ-তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গবনে অসহায় মানুষের ভয়-কাতর মনোবৃত্তির পরিচয় রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর রচনায় প্রেমচাঁদের ভিন্নতর রূপ চোখে পড়ে। এখানে তিনি আংশিকভাবে নয়, সম্পূর্ণভাবেই জীবনকে দর্শন ও চিত্রণ করেছেন। নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়বিশেষ এবং তার নিজস্ব সমস্যাকে নয়, সমগ্র জীবন ও সমাজকেই স্বীয় প্রতিভাবলে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে তিনি উদ্ভাসিত করেছেন। এই পর্যায়ের প্রধান উপন্যাস— 'প্রেমাশ্রম' (১৯২২), 'রঙ্গভূমি' (১৯২৫), 'কায়াকল্প' (১৯২৬), 'কর্মভূমি' (১৯৩২) ও 'গোদান' (১৯৩৬)।

প্রেমচাঁদের প্রথম হিন্দী উপন্যাস 'সেবাসদন' রচিত হয় ১৯১৮ সনে এবং মুদ্রিত হয় ১৯১৯-এ। অবশ্য তার আগে নিজের একটি উর্দু উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করেন 'প্রেমা' নামে। তাতে বিধবা জীবনের সমস্যা চিত্রিত। সেবাসদনে—বেশ্যা-জীবনের সহানুভূতিপূর্ণ বর্ণনা এবং

নারীজীবনের গভীর প্রতারণা ও অবমাননার স্বরূপ ও কারণ তুলে ধরেছেন। নির্মলা-উপন্যাসে পণ-প্রথা এবং অসংগত বিবাহের সমস্যা ও তার কুফল দেখানো হয়েছে। মধ্যবর্গীয় জীবনের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যেমন গবন উপন্যাসে, তেমনি ফুটে উঠেছে অক্ষমতা, অসংগতি, উচ্চাশা এবং মনোবৈজ্ঞানিক সত্যের করুণ রূপ। প্রেমাশ্রমে কৃষক জীবনের সমস্যা রূপায়িত। সহজ নিরীহ কৃষক ধূর্ত স্বার্থপর জমিদার শ্রেণীর হাতের পুতুল। কিন্তু কতদিন চলবে এই শাসনের নামে শোষণ ও অত্যাচার? রঙ্গভূমি রাজনৈতিক উপন্যাস। বিরাট রাজনৈতিক মঞ্চে সে যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক সমস্যা অবিচ্ছিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। ধনতন্ত্রই সর্ব-শক্তিমান এবং সুফলভোগী— তার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেমচাঁদ। কায়াকল্প উপন্যাসে সমাজসেবা, শাসকের অত্যাচার, বিলাসিতা, যথার্থ প্রেম, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা এবং পুনর্জন্মের ধারণা বা বিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে। কর্মভূমি উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক চেতনার স্বর অনুরণিত। সামাজিক অসংগতি ও অশান্তির মূলে আর্থিক সমস্যা এবং তার প্রতিকারের প্রধান বাধা রাজনৈতিক স্বার্থ— এটাই ছিল প্রেমচাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। গোদান— হিন্দী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যথার্থবাদী উপন্যাস। তাতে ভারতীয় কৃষক তার আর্থিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা, শক্তি ও সম্ভাবনার সঙ্গে চিত্রিত। মানবীয়—সংবেদনশীল ও ক্ষমাশীল হৃদয় তার। অন্যদিকে শোষক-শক্তি বাইরে সভ্য, ভিতরে পাষাণ! তার কাছে পয়সাই সব। কিন্তু দয়া, ধর্ম, সত্য ও ক্ষমা হল—গৃহস্থের পরম ভূষণ। তবে নিজ অধিকার বিষয়েও সে সজাগ। কোনো কোনো উপন্যাসে— রাজনৈতিক আন্দোলনের বেশ জীবন্ত রূপ ফুটে উঠেছে। আবার সমসাময়িক ধর্ম-চেতনাও প্রভাব ফেলেছে। তবে প্রাচীন ধর্মবোধ বদলে গেছে। 'খাও-দাও-স্ফূর্তি কর'— এই পাশ্চাত্য মনোভাবটি ক্রমে ক্রমে ভারতীয় জীবন-বোধকে গ্রাস করে চলেছিল। তাই ঈশ্বর ও মোক্ষ

সম্পর্কে উদাসীন হয়ে মানুষ এই জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করে সুখী হতে চাইল। এটাই জীবনের যেন প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। প্রেমচাঁদের উপন্যাসের একটি পাত্রের মুখে আমরা শুনতে পাই— 'এই যে ঈশ্বর ও মোক্ষ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কার, এতে আমার হাসি পায়। এই মোক্ষ ও উপাসনা অহংকারের পরাকাষ্ঠারূপে আমাদের মানবতাকে নষ্ট করে ফেলছে। যেখানে জীবন আছে, ক্রীড়া আছে, আনন্দ আছে, প্রেম আছে— সেখানেই ঈশ্বর আছেন এবং সেখানে জীবন-যাপন মানেই মোক্ষ ও উপাসনা। জ্ঞানীরা বলেন, ঠোঁটে যেন হাসির রেখা না ফোটে, চোখে যেন জল-কণা না দেখা দেয়। আমি বলি, যদি তুমি হাসতেই না পারো, কাঁদতেই না পারো, তবে তুমি মানুষ নও, পাথরমাত্র। যে জ্ঞান মানবতাকে পিষে মারে তা জ্ঞান নয়, 'মানবতা-পেষাই-কল'। বলাই বাহুল্য এই উদ্‌ধৃতিতে প্রেমচাঁদের আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যা খুঁজছিল—তাই দিলেন প্রেমচাঁদ। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি বর্তমান কালের আধুনিক-শিক্ষিত-চিত্তের অনুকূল ধারায় চিন্তা করেছেন। তাই বিংশ শতকের অধিকাংশ হিন্দী লেখক তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। যদিও মাত্রা ও প্রকৃতির বিচারে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

প্রেমচাঁদের জনপ্রিয়তার অন্য একটি কারণ হল তাঁর প্রবাদ-বচন ও বাগ্‌ধারাপূর্ণ সহজ গতিসম্পন্ন বিষয়-উপযোগী ভাষা। হিন্দী ও উর্দু-মিশ্রিত তাঁর ভাষা 'হিন্দুস্তানী'-রূপে সহজেই চিহ্নিত হতে পারে। তবে প্রথমদিকে তা তেমন গতিশীল ছিল না, নির্দোষও ছিল না। ক্রমে ক্রমে সতেজ, সবেগ ও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। সাবলীল মাধুর্য তাঁর ভাষার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর রচনায় উপমা এবং তুলনাত্মক চিত্রগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি প্রাঞ্জল অথচ মর্মভেদী। প্রেমচাঁদের পাত্র-পাত্রীর ভাষা সামাজিক পরিস্থিতি এবং স্তরের

অনুকূলে বদলে বদলে যায়। বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরের মানুষ অল্পাধিক ভিন্ন একই ভাষা ব্যবহার করে। উর্দুর শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশ তিনি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। তাই এক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে সফলতাও লাভ করেছেন। কোনো কোনো স্থলে তাঁর মুসলমান পাত্রের মুখে উর্দু বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এই কঠিনতার মধ্যে সেই পাত্রের চিন্তার অস্পষ্টতা এবং মনের জটিলতা-আভাসিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর এই প্রয়োগও বিশিষ্টতাপূর্ণ।

জয়শংকর প্রসাদ (১৮৮৯-১৯৩৭)—হিন্দী সাহিত্যে জয়শংকর প্রসাদের প্রধান পরিচয়— নাট্যকার ও কবিরূপে। তবে উপন্যাস, ছোটো গল্প এবং আখ্যায়িকা রচনা করে তিনি কথাসাহিত্যেও স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। 'কঙ্কাল' (১৯২৯), 'তিতলী' (১৯৩৪) এবং 'ইরাবতী' (অসম্পূর্ণ)—জয়শংকর প্রসাদের উপন্যাসকৃতি। 'কঙ্কাল' উপন্যাসে যথার্থবাদ আদর্শবাদের উচ্চে স্থাপিত। সমাজের পতিত-নির্যাতিত বর্গ একত্রিত হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রসাদ সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নিম্নগামিতা নগ্ন করে দেখিয়ে সংস্কার ও নবনির্মাণের প্রবণতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'তিতলী' অপেক্ষাকৃত পরিণত কৃতি। তাতে গ্রামের দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত। খেয়ালবশে গ্রামের তথাকথিত হিতৈষীর দল উচ্চ স্তর থেকে নেমে এসে আবার পূর্বস্থানে ফিরে গেছে। সমাজ জীবনের কুশ্রী দিকৃটিই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে— 'তিতলী'তেও। ইতিহাসের আভাস থাকলেও তা পরিস্ফুট হতে পারে নি—আলোচ্য উপন্যাস দুইটির কোনোটিতেই। একমাত্র 'ইরাবতী'তে ইতিহাস কতকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছে। তিনটি উপন্যাসেই যেন বর্তমানের সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কল্পনা-বৈভব এবং গহন-বিষাদের একটি ছায়া অনুভূত হয়। উপন্যাসশিল্পের বিচারে জয়শংকর প্রসাদের কৃতিত্ব বিচিত্রমুখী প্রেমের গতিপ্রকৃতি চিত্রণে এবং রোমান্সধর্মী উপন্যাসের দিক্-নির্দেশের মধ্যে নিহিত— বলা চলে।

বিশ্বম্ভরনাথ শর্মা 'কৌশিক' (১৮৯১-১৯৪৫)—প্রেমচাঁদের ধারার উপন্যাসকার এবং কহানীকাররূপে কৌশিকজী হিন্দী সাহিত্যে পরিচিত। ছোটো গল্পই তাঁকে সমধিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। তিনি 'ভিখারিণী' (১৯২৯) ও 'মাঁ' (১৯২৯) নামে দুইটি উপন্যাস রচনা করেন। এ-দুইটির মধ্যে 'মাঁ' অপেক্ষাকৃত সার্থক সৃষ্টি। অভাব-অনটন ও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে আদর্শ মায়ের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায়। 'মণিমালা' ও 'চিত্রশালা'—তাঁর গল্প-সংগ্রহ। গল্পকার রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। সংলাপধর্মী-মনোবিজ্ঞান আশ্রিত গল্পে তিনি নগর-জীবনের সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বৃন্দাবনলাল বর্মা (১৮৮৯-১৯৬৯)—ঝান্সীর অন্তর্গত মউতে বৃন্দাবনলাল বর্মার জন্ম হয়। জয়শংকর প্রসাদের 'ইরাবতী'র পর হিন্দীতে আর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয় নি। এই অভাব পূরণ করেছেন বর্মাজী। 'গঢ়কুণ্ডা'র (১৯৩০), 'বিরাটা কী পদ্মিনী' (১৯৩৬), 'মুসাহিব জু' (১৯৪৬), 'ঝান্সী কী রাণী' (১৯৪৯), 'মৃগনয়নী' (১৯৫২), 'ভুবনবিক্রম', 'টুটে কাঁটে', 'অহিল্যাবাঈ', 'মাধবজী সিন্ধিয়া' এবং 'কচনার' (১৯৪৮)— বর্মাজীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'লগন' (১৯২৭), 'প্রত্যাগত' (১৯২৭), 'প্রেম কী ভেঁট' (১৯২৮), 'কুণ্ডলীচক্র' (১৯৩২) ও 'কভী ন কভী'—তাঁর সামাজিক উপন্যাস। তাঁর অন্য ধরনের নামকরা উপন্যাস হল— 'অমর বেল', 'অচল মেরা কোঈ', 'সঙ্গম' (১৯২৭), 'কোতওয়াল কী করামাত' (১৯৩১), 'সোনা' ও 'হৃদয় কী হিলোর'। এই সব উপন্যাস লিখে বৃন্দাবনলাল বর্মা বিশেষ খ্যাতি ও যশের অধিকারী হয়েছেন। ভাষার স্বাভাবিক সহজ রূপ, পাত্র-পাত্রীদের স্বয়ং বিকশিত হবার পরিবেশ রচনা, অস্বাভাবিক সংবেদনা না জাগিয়েই হৃদয়গ্রাহী রোমান্সের সংযোজন— প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে তাঁর উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তবে তাঁর উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সকল-প্রকার সংকীর্ণতা ও ইজ্‌ম্‌-এর উপরে তাঁর মানসিক-অবস্থান। লেখকের আন্তরিকতা ও রচনাগুণে সমসাময়িক প্রয়োজন অতীতের প্রেক্ষাপটে অপূর্ব ও সার্থক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গঢ়কুণ্ডার উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদান ও কল্পনার চমৎকার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। চতুর্দশ শতকে বুন্দেলখণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুপরিস্ফুট। বিরাটা কী পদ্মিনী ও অনুরূপ সৃষ্টি। উপন্যাস কয়টিতে প্রকৃতি-চিত্রণ, পরিবেশ-বর্ণনা ও নৈসর্গিক রূপ ও রঙের বাস্তবায়ন অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। 'কভী ন কভী'তে দুইজন শ্রমিকের কথোপকথনের মাধ্যমে শ্রমিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'ঝান্সী কী রাণী লক্ষ্মীবাঈতে' ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বাস্তবানুগ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন— ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা-লাভের ব্যর্থ প্রয়াস বা বিদ্রোহের মূলে ছিল উচ্চস্তরের ভাবনা-চিন্তা। কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতাই সমধিক গৃহীত হয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের গল্পময়তা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনলাল বর্মার অভিমত হল—

> 'গল্পে প্রথমে চরিত্র আসে। কিন্তু কাহিনী চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার পারম্পর্যও চায়। এই দুইয়ের সমন্বয় যখন আমাদের কোনো অনুপ্রেরকও, স্ফূর্তিদায়ক পরিণামের দিকে নিয়ে যায়, তখনই আমরা তাতে পুরোপুরি গল্পময়তা আস্বাদন করি।'[৩]

মুন্সী প্রতাপনারায়ণ শ্রীবাস্তব (১৯০৪-১৯৭৮)—প্রেমচাঁদ যেমন গ্রাম্য প্রকৃতির ও গ্রাম্য জীবনের সহানুভূতিপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন, শ্রীবাস্তবজী তেমনি উচ্চস্তরের শহুরে জীবনের ধারাকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি 'বিদা' (১৯৩৬), 'বিকাস' (১৯৩৭) ও 'বিজয়' (১৯৩৭) নামে তিনটি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসের খল-নায়ক বা খল-নায়িকা যখন উন্নতি বা প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে

পৌঁছে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় তিনি তার মুখোস খুলে দিয়েছেন। তিন উপন্যাসেই একটি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থিত হয়েছে। তিন উপন্যাসেই বিদেশী রমণীদের আনা হয়েছে—তাঁদের কেউ ভালো কেউ বা মন্দ। 'বিদা' উপন্যাসে এক নারী চরিত্র অপরজনকে বলছে—'সতী তো একটি আদর্শ পতিভক্তিমতী নারী চরিত্র। আর বোন, তুমিও একজন! এমন দেবতার মতো স্বামী পেয়েও সন্তুষ্ট নও। ···বোন, এতে তোমার কোনো দোষ নেই; দোষ সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের, যা তোমাকে গড়ে তুলেছে।' 'বিকাস' উপন্যাসে মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে পূর্বজন্মের স্মৃতির জাগরণ ঘটিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক-প্রয়োগের পরীক্ষা করেছেন লেখক। বিষয়ের অনুকূল ভাষার ব্যবহারেও তিনি কুশলতা দেখিয়েছেন। শ্রীবাস্তবজী কয়েকটি গল্পও লিখেছেন।

জৈনেন্দ্রকুমার (১৯০৫-)—আলিগড়ের কৌড়িয়া গঞ্জের সন্তান জৈনেন্দ্রকুমার জৈন গান্ধীজীর আহ্বানে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। জৈন-মতাবলম্বী পরিবারের সন্তানের হৃদয়ে গান্ধীজীর অহিংসার গভীর প্রভাব পড়ে। সেই প্রভাব প্রতিফলিত হয় তাঁর সাহিত্যে। অহিংসার আবহাওয়ায় দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ভূমিতেই জৈনেন্দ্রকুমারের সাহিত্য-শিল্প অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হয়। তাঁর উপন্যাস ও গল্প ঘটনা-প্রধান নয়, চরিত্র-প্রধান। মাত্র দু-একটি বাক্যে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও দর্শন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—এটি তাঁর শিল্প সংযমের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। জৈনেন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কল্যাণী' (১৯৪০), 'পরখ' (১৯৩০), 'সুনীতা' (১৯৩৬), 'ত্যাগ-পত্র' (১৯৩৭), 'ব্যতীত', 'বিবর্ত', 'সুখদা' (১৯৫২), 'মুক্তিবোধ' এবং 'অনন্তর' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তব বর্ণনায় সমৃদ্ধ উপাখ্যানে সমাজের প্রতি নবযুবক শ্রেণীর বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও অসন্তোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। সুনীতাতে পতির উদারতার পরাকাষ্ঠা চিত্রিত হয়েছে। স্ত্রীজাতির নৈতিক অধঃপতনের

সীমাও দেখিয়েছেন লেখক। তবে নারীজাতির নৈতিক-আদর্শকে প্রচলিত সংস্কারের মাপকাঠিতে মাপেন নি। বিবর্ত উপন্যাসে একজন বিপ্লবীর কাহিনী বর্ণিত। বাস্তবের পরিনিষ্ঠ অনুকরণ কোনোমতেই সাহিত্য নয়। তাঁর মতে উপন্যাসের আদর্শ নিম্নরূপ—

> 'সংসার যেমনটি আছে ঠিক তেমনি উপন্যাসে চিত্রিত হয় না, সংসারের ঊর্ধ্বায়িত, উন্নত, কল্পিত রূপ চিত্রিত হয়ে থাকে। সে উপন্যাস কোনো কাজেরই নয়, যা ইতিহাসের মতো ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দিয়ে যায়। কাজ নিয়ে কথা, জীবনের হুবহু চিত্রণ সংসারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না।'

তাই দার্শনিকতা, মনোবৈজ্ঞানিকতা ও কাল্পনিকতার সমন্বয়ের ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে এক প্রকারের বিশেষ গরিমা, ভব্যতা, গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্য এসেছে। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্র আত্মসংযমী, কর্মঠ ও বুদ্ধিবাদী। স্বীয় দার্শনিক মনোভাব প্রকাশের জন্য তারা লম্বা-চওড়া ভাষণের আশ্রয় নেয় না। ঘটনার ক্রমই তাদের কিছু-কিছু বলার অবসর করে দেয়— দুই-একটি বাক্যে মন্তব্য করে তারা থেমে যায়। এইভাবে দার্শনিকতার প্রকাশ সত্ত্বেও কাহিনীর আকর্ষণ হ্রাস পায় না।

ইলাচন্দ্র যোশী (১৯০২-)—আলমোড়ায় যোশীজীর জন্ম। তিনি সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী বলা চলে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ— সবই তিনি রচনা করেছেন। তবে কথাসাহিত্যিক রূপেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের অবচেতন মন ও বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সম্পর্কটি কেমন তার বিশদ ও বহুবিচিত্র সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাস প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক হলেও শিল্পধর্মভ্রষ্ট নয়। মানুষের সমস্ত প্রয়াস তার সংকল্পানুসারী হয় না। উত্তেজনা, কোনোপ্রকার অদম্য প্রেরণা,

আকস্মিক আত্মাভিব্যক্তি প্রভৃতি কারণে সে এমন অনেকগুলি কাজ করে বসে— যা দেখে তার নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়। বহু ধ্যান-ধারণা করেও সে তার সঠিক কারণ খুঁজে পায় না। শিল্পীর কাজ হল মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে শিল্পসম্মতভাবে সেই কারণটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা। এর মধ্যেই তার সফলতা নিহিত। ইলাচন্দ্র যোশী মনোবিশ্লেষণ করার সময়ও কাহিনীর শিল্পরূপটি ভোলেন না, তাই তাঁর উপন্যাসের আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে— 'ঘৃণামরী' (১৯২৯), 'সন্ন্যাসী' (১৯৪১), 'পর্দে কী রানী' (১৯৪১), 'প্রেত ঔর ছায়া' (১৯৪৪), 'নির্বাসিত' (১৯৪৬), 'লজ্জা' (১৯৪৭), 'মুক্তপথ' (১৯৫০), 'জিপ্সী' (১৯৫২), 'জহাজ কা পঞ্ছী' (১৯৫৫), 'সুবহ কে ভূলে' (১৯৫২) এবং 'ঋতুচক্র' (১৯৬৯) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোশীজীর গল্পসংগ্রহ— 'রোমান্টিক ছায়া', 'দিওয়ালী-হোলী', 'আহুতি' ও 'কঁটিলে ফুল লজীলে কাঁটে'।

চণ্ডীপ্রসাদ 'হৃদয়েশ' (১৮৯৮-১৯৩৬)—গল্প ও উপন্যাস লিখে হিন্দী সাহিত্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন 'চণ্ডীপ্রসাদ' তাঁদের একজন। 'মঙ্গলপ্রভাত' (১৯২৬) ও 'মনোরমা' (১৯২৭) নামে দুটি উপন্যাস এবং 'নন্দনিকুঞ্জ' ও 'বনমালা'— দুইটি গল্পসংকলন। মনোরমা আদর্শ-মূলক উপন্যাস। কেন্দ্রে আছে দুই পরস্পর বিরোধী প্রকৃতির— ত্যাগপরায়ণ ও ভোগপরায়ণ— নারীচরিত্র। তবে কাহিনীতে তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। তাঁর রচনায় কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও চমকপ্রদ শৈলীর পরিচয় সুস্পষ্ট। অবশ্য ভাষার অলঙ্কার-বাহুল্যে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ঢাকা পড়ে গেছে মাঝে মাঝে। গল্প তো নয় যেন গদ্যকাব্য। বাণভট্টের অনুকরণে অলঙ্কার ও সমাসবহুল ভাষার প্রয়োগে বক্তব্যও যেন গতিহীন ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে।

পাণ্ডেয় বেচন শর্মা 'উগ্র' (১৯০০-১৯৬৭)—রাজনৈতিক ও সামাজিক কথাসাহিত্যে সমাজের নগ্ন চিত্র এঁকেছেন উগ্রজী। তাই হিন্দী

সাহিত্যে তিনি 'ঘোর যথার্থবাদী' 'নগ্নতাবাদী' এবং 'উগ্রবাদী' লেখক রূপে পরিচিত। প্রেমচাঁদের বিপরীত কোটির উপন্যাসকার তিনি। মানবমনের দুর্বলতার পরিচয় সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। ভাষা বেশ বলিষ্ঠ ও উপভোগ্য। 'কলকত্তা রহস্য' (১৯২৫), 'চন্দ হসীনোঁ কে খতূত' (১৯২৭), 'দিল্লী কা দলাল' (১৯২৭), 'বুধুআ কী বেটী' (১৯২৮), 'চুম্বন' (১৯২৮), 'শরাবী' (১৯৩০), 'ঘণ্টা' (১৯৩৭), 'অন্নদাতা', 'জী জী জী' (১৯৫৫), 'সরকার তুম্হারী আঁখোঁ মেঁ' তাঁর উপন্যাস এবং 'দোখজ কী আগ' ও 'ইন্দ্রধনুষ'— গল্পসংগ্রহ। অন্য-প্রকারের রচনার মধ্যে যিশুখ্রীস্টের নামে একটি নাটকও আছে। 'চারবেচারে' তাঁর একাঙ্কী সংগ্রহ।

চতুর সেন শাস্ত্রী (১৮৮১-১৯৬০)—জন্মস্থান দিল্লী। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধারার উপন্যাস ও গল্প রচনা করেছেন শাস্ত্রীজী। রচনার প্রধান গুণ ভাষার ধারাবাহিকতা। প্রেমচাঁদের মতোই চলিত ভাষা ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ রচনাই শৃঙ্গার রসাশ্রিত। 'অমর অভিলাষ' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে নানা বাক্‌বিতণ্ডা দেখা দেয়। কারণ রচনাটি রুচিসম্মত নয়। তবে অন্য কৃতিগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও শোভন। তিনি ঐতিহাসিক গল্প লিখতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সহজ স্বাভাবিক ভাষায় চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় তদ্ভব শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেন। 'হৃদয় কী পরখ' (১৯১৮), 'হৃদয় কী প্যাস' (১৯২৭), 'অমর অভিলাষ' (১৯৩৩), 'আত্মদাহ', 'নরমেধ', 'বৈশালী কী নগরবধূ' (১৯৪৯), 'আলমগীর' (১৯৫৪), 'সোমনাথ' (১৯৫৪), 'বয়ংরক্ষামঃ', 'অপরাজিতা', 'ধর্মপুত্র', 'নীলমণি' ও 'গোলী'— শাস্ত্রীজীর প্রসিদ্ধ উপন্যাসকৃতি। 'অক্ষত', 'কৈদী', 'রাজপূত বচ্চে', 'লম্বগ্রীব', 'লালারুখ', 'পীর নাবালীগ' ও 'সপূত'— তাঁর গল্প সংগ্রহ। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মনোরঞ্জক ভঙ্গিতে বাস্তবের চিত্রণ— কথাকার শাস্ত্রীজীর একটি বিশেষ গুণ। পাণ্ডেয় বেচন শর্মা উগ্রের সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের বেশ মিল দেখা যায়। প্রকৃতিবাদী ধারার প্রভাবে তিনি

জীবনের নিকৃষ্টতা, কুৎসিত কার্যকলাপ এবং পাশবিক প্রবৃত্তির চিত্রণে সিদ্ধহস্ত।

ভগবতী চরণ বর্মা (১৯০৩-১৯৮১)—উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার শফীপুরে জন্ম। বৃত্তিতে আইনজীবী। তাঁর রচনায় যুগপ্রবৃত্তির সুন্দর প্রতিফলন মেলে। মূলত কবি হলেও কথাকাররূপেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। 'চিত্রলেখা' (১৯৩৪), 'তীনবর্ষ' (১৯৩৬), 'পতন' (১৯৩৬), 'টেঢ়ে-মেঢ়ে রাস্তে', 'আখিরী দাঁও', 'অপনে খিলৌনে' এবং 'ভূলে বিসরে চিত্র' (১৯৫৯)—তাঁর উপন্যাসকৃতি। চিত্রলেখা তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। তাতে অতীতের পটভূমিতে পাপ-পুণ্য, বেশ্যা-সন্ত, সংযম-ভোগ, প্রেম-বাসনা, ধর্ম-অধর্ম নাস্তিকতা-আস্তিকতা এবং ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যের সুপরিকল্পিত বিন্যাস ঘটেছে। এই সমস্যা নির্বাচন ও নির্ধারণই উপন্যাসের জনপ্রিয়তার মূল কারণ। তীনবর্ষ— গ্রন্থে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জীবনের পরিচয় বেশ হৃদয়গ্রাহিতার সঙ্গে চিত্রিত। অন্য উপন্যাসগুলি হয় সমাজ নয় রাজনীতি বিষয় নিয়ে লেখা। সুখপাঠ্য হলেও রচনার স্তর সাধারণ। 'ইন্সটালমেণ্ট' ও 'দোবাঁকে' তাঁর গল্পসংগ্রহ। লঘু অথবা হাস্যরসাত্মক বিষয় নিয়ে নাট্যধর্মী সংলাপের সাহায্যে তাঁর গল্পগুলির প্রারম্ভ হয়েছে বলা যায়। তিনি বেশ কয়েকটি 'একাঙ্কী'ও লিখেছেন।

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' (১৮৯৬-১৯৬১)—প্রকৃতপক্ষে কবি হলেও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন নিরালা। তাঁর জীবন, স্বভাব ও সাহিত্যসৃষ্টি সবই অদ্ভুত বা 'নিরালা'। সারল্য, সহিষ্ণুতা ও উদারতার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্য, আত্মগরিমা ও নির্ভীকতার অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। উত্তরপ্রদেশের এই কবির জন্ম বাংলার মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে। শিক্ষা-দীক্ষা ও মানসিক গঠনও বাংলাতেই। তিনি কবি, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকাররূপে পরিচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্মবোদ্ধা ছিলেন তিনি। তাই বেশ কিছু বাংলা গ্রন্থ ও কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। 'অপ্সরা' (১৯৩১),

'অলকা' (১৯৩৩), 'প্রভাবতী' (১৯৩৬), 'নিরুপমা' (১৯৩৬), 'চোটী কী পকড়', 'কালে কারনামে' (১৯৫০)— তাঁর উপন্যাসকৃতি। 'নিরুপমা' নিরালার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গ্রাম-জীবনের যেমন যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, প্রেমচাঁদ ছাড়া অন্য কারও রচনায় তেমনটি পাওয়া যায় না। 'লিলী', 'চতুরীচমার', 'সুকুল কী বীবী' ও 'সখী'— তাঁর গল্পসংগ্রহ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের— আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্ত কা ওিয়ল, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী, দেবী চৌধুরাণী, রাধারাণী, বিষবৃক্ষ ও রাজসিংহ— প্রভৃতি উপন্যাস ও আখ্যায়িকা হিন্দীতে অনুবাদ করেন। তাছাড়া বিবেকানন্দের পরিব্রাজক, বিবেকানন্দ জী কে ব্যাখ্যান, রাজযোগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (চার খণ্ড) হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন 'অজ্ঞেয়' (১৯১১-১৯৮৭)—দেওরিয়া জেলার কসিয়া গ্রামে বাৎস্যায়নজীর জন্ম। তিনি কবি, উপন্যাসকার, গল্পকার, আলোচক, প্রবন্ধকার, গদ্য-গীতরচয়িতা, সাংবাদিক-সাহিত্যকার ও মনোবৈজ্ঞানিক সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। গভীর অধ্যয়ন ও মনন, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণ, বুদ্ধিভিত্তিক শান্ত-গম্ভীর ভাবুকতার যুক্তিনিষ্ঠ অভিব্যক্তি— তাঁর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দী উপন্যাস এবং কবিতায় যুগান্তর আনার প্রবৃত্তিই তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছে। 'শেখর : এক জীবনী' (তিন খণ্ডে, ১৯৪০-৪৪), ও 'নদী কে দ্বীপ' (১৯৫১)— দুইটি উপন্যাসের প্রথমটি স্বদেশপ্রেমের জন্য উৎসর্গীকৃত এক মহৎ জীবনের সংঘর্ষময় আলেখ্য। অজ্ঞেয়ের সাহিত্যপ্রতিভার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'নদী কে দ্বীপ' চরিত্রপ্রধান উপন্যাস। তাছাড়া— 'আত্মনে পদ' ও 'অপনে অপনে অজনবী' নামে আরও দুইটি উপন্যাস তিনি রচনা করেন। তাঁর গল্পগুলিও প্রায় সমধর্মী।

এ যুগে উপন্যাস লিখে অন্য যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন— তাঁদের মধ্যে সিয়া রামশরণ গুপ্ত ('গোদ', 'নারী', 'অন্তিম আকাঙ্ক্ষা'); উদয়শঙ্কর ভট্ট (১৮৯৮- : 'ওয়হ্ জো মৈনে দেখা', দুই খণ্ড, 'সাগর লহরেঁ ঔর মনুষ্য', 'নয়ে মোড়'); উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক ('সিতারোঁ কা খেল'); শ্রীনাথ সিংহ ('জাগরণ'); উষাদেবী মিত্রা ('পিয়া', 'জীবন কী মুসকান', 'পথচারী'); ভগবতীচরণ বাজপেয়ী (১৮৯৯ —'পতীতা কী সাধনা', 'দো বহিনেঁ', 'নিমন্ত্রণ'),— প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য যুগের হিন্দী উপন্যাসকারগণ নানা প্রকারের বিভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসধারার গতি ধীর হলেও অব্যাহত। তাতে ভাবুকতার অভাব না থাকলেও বৌদ্ধিক-উপকরণের প্রাধান্য চোখে পড়ে। প্রেমচাঁদের উপন্যাসে গান্ধীবাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে, জৈনেন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসেও তাই। কিন্তু তারপর প্রগতিবাদের যুগ এসেছে। নরোত্তম দাস নাগর ও যশপাল— প্রমুখের উপন্যাস তার সাক্ষ্য দেয়। অজ্ঞেয়ের মতো বিপ্লব-পন্থী সাহিত্যকারও তার ব্যতিক্রম নন। যশপাল (১৯০৩-১৯৭৭) প্রতিভার বলে হিন্দী উপন্যাস ও ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁর 'দাদা-কামরেড' উপন্যাসে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যাত হলেও উপন্যাসের নায়ক আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই বেশি সজাগ। আদর্শ ও নীতিবাদের চেয়ে যথার্থবাদের সাহায্যেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। অজ্ঞেয়, জৈনেন্দ্র, ইলাচন্দ্র যোশী প্রমুখের উপন্যাসে মনোবৈজ্ঞানিক চিত্রণের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যেন মনের অবদমিত বাসনার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয়। মার্কস্-বাদী চিন্তাপ্রভাবিত উপন্যাস রচনার প্রয়াসও করেছেন কেউ-কেউ। রাহুল সাংকৃত্যায়নের (১৮৯৩-১৯৬৩) ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সিংহ সেনাপতি' মার্কস্‌বাদী চিন্তাপ্রভাবিত হওয়ায় ভিন্নতর স্বাদ দেয়।

প্রাচীন পরিবেশে গণতান্ত্রিক রাজ্যের প্রসঙ্গে মার্কস্‌বাদী সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করেছেন রাহুলজী। বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রাচীন নৈতিকতা খর্ব হয়েছে। লেখক অন্তঃ ও বহিঃ পরিস্থিতির অধ্যয়ন করে অন্তঃস্রোতের উপর আলোকপাত করে অপরাধীকে পরিস্থিতির ক্রীড়নকরূপে দাঁড় করিয়েছেন আবার সহানুভূতিও দেখিয়েছেন। ব্যক্তি নয়, সমাজই ব্যক্তি-অপরাধের জন্য দায়ী। তাই কোথাও কোথাও সাধারণ সংস্কারগত মর্যাদাবোধও ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। পাপ ও পুণ্যবোধের মধ্যকার রেখাটি মুছে ফেলার প্রয়াস লক্ষিত হয় এই শ্রেণীর রচনায়। ভগবতীচরণ বর্মার 'চিত্রলেখা' উপন্যাসেও এই বিষয়টিকে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। তাঁর 'টেঢ়ে-মেঢ়ে রাস্তে' উপন্যাসে একজন তালুকদারের তিন পুত্র যথাক্রমে গান্ধীবাদ, সমাজবাদ ও আতঙ্কবাদে বিশ্বাসী। জীবনে তারা তিন জনই ব্যর্থ হয়েছে। তবু স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা পরিস্থিতির আনুকূল্যের পূর্ণ ব্যবহার করেছে। এখানে লেখক যেন গান্ধীবাদ, সমাজবাদ ও আতঙ্কবাদের (সন্ত্রাসবাদ) তুলনামূলক প্রয়োগের পরীক্ষা করেছেন। সর্বানন্দ বর্মার 'নরমেধ' উপন্যাসের লক্ষ্য সমাজ-সংস্কার হলেও নায়ক চরিত্রটি সমাজ-বিধির বিরুদ্ধচারীরূপে চিত্রিত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সাহিত্যে সমাজদ্রোহ প্রশ্রয় পেয়েছে—কাহিনীতে চমৎকারিতা এসেছে। কিন্তু তার ফলে যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ ঘটেছে তা বলা যাবে না। তবু ধারাটি প্রবহমান থেকে হিন্দী উপন্যাসকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে।

এই সময় বঙ্কিম-রমেশ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসই হিন্দীতে অনূদিত হয়ে গেছে। সেই অনুবাদকর্ম ও তা পড়ার অভিজ্ঞতা হিন্দী সাহিত্যের উপন্যাসকে নতুন পথ ও প্রেরণা প্রদান করেছে। কোনো-কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় তার প্রতিফলনও ঘটেছে। মারাঠী ও গুজরাটী উপন্যাসেরও হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলা থেকে অনূদিত উপন্যাসের সংখ্যা একশো, মারাঠী থেকে এক ডজন ও গুজরাটি থেকে তারও

কম।[৪] বা. না. শাহের 'সম্রাট অশোক' ও 'ছত্রসাল', বামন মল্‌হার যোশীর 'রাগিনী' ও 'আশ্রম হরিণী' তথা নারায়ণ সীতারাম ফড়কের—'আল্লা হো আকবর'— প্রভৃতি মারাঠী; ইচ্ছারাম সূর্যরাম দেশাই কৃত 'গঙ্গা', ইন্দ্র বসওয়াড়ার 'শোভা', 'ঘর কি রাহ', রমণলাল বসন্ত-লাল দেশাই কৃত— 'কোকিলা', 'পূর্ণিমা', 'স্নেহ যজ্ঞ', 'অমর লালসা' এবং কে. এম. মুন্সীর 'পাটন কা প্রভুত্ব', 'জয় সোমনাথ', 'ভগবান পরশুরাম' প্রভৃতি গুজরাটী ভাষা থেকে অনূদিত উপন্যাস। উর্দু থেকেও কম উপন্যাসই অনূদিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রতননাথ সর-শারের 'ফিসানয়ে আজাদ'-এর প্রেমচাঁদ কৃত অনুবাদ 'আজাদকথা'—উল্লেখযোগ্য। নিজামী খাজার 'অশ্রুপাত' ও 'বাহাদুর শাহ কা মুক-দমা'র অনুবাদও উল্লেখযোগ্য।

প্রেমচাঁদ-উত্তর এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তি-উত্তর হিন্দী উপন্যাসে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যেমন— রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাস; ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

আলোচ্যযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক ও গান্ধীযুগের চিত্রণ প্রেমচাঁদের উপন্যাসেই প্রত্যক্ষ করা যায়। নবজাগরণ, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক আবরণে ভারতের বিশাল জন-মানসের অনুভূতি সামগ্রিকভাবে যে-সব উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে সেগুলিকে মহাকাব্য পর্যায়ভুক্ত মনে করা যায়। ব্যক্তিগত অনুভূতিই মনস্তাত্ত্বিক ও মার্কস্‌বাদ অনুপ্রাণিত সমাজবাদী উপন্যাসে গভীরভাবে প্রতিফলিত। সমাজবোধের কঠোর ভূমিতে গভীর খনন ও মননের ফলে সামাজিক উপন্যাস ভিন্নতর রূপ ও প্রকৃতি লাভ করল। যুগের রাজনৈতিক চেতনা সামাজিক যথার্থ-বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ভগবতীচরণ বর্মা, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক এবং অমৃতলাল নাগর প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ নতুন বৌদ্ধিক-সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হলেন। সে সাহিত্য হবে গভীরতা ও প্রভাবাত্মকতা-

সমৃদ্ধ, যুক্তি ও সমস্যা-আধৃত কিন্তু ব্যাপকতা ও বর্ণনাত্মকতা প্রধান হবে না।

আমরা পূর্বেই ভগবতীচরণ বর্মার উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির উদ্‌ঘাটন দেখেছি। বিদ্রোহী পাত্র-পাত্রী গভীর-সজীব দৃষ্টি নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণে তৎপর। এ-প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত হল—'যা কিছু আমি লিখি তা তর্কের জন্য নয়। আমি আমার সেই সিদ্ধান্তের কথা লিখি যা আমার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভ করেছি।' 'চিত্রলেখা' ছাড়া 'টেঢ়ে মেঢ়ে রাস্তে' 'আখিরী দাঁও', 'ভূলে বিসরে চিত্র' (১৯৫৯), 'ওয়হ ফির নহীঁ আঈ', 'অপনে অপনে খিলৌনে', 'সামর্থ্য ঔর সীমা' এবং 'রেখা' উপন্যাসে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ব্যাপকতা দেখিয়েছেন।

স্বীকৃত মূল্যবোধ, মর্যাদাবোধ ও নৈতিকতার প্রতি বিদ্রোহকে আশ্রয় করে আর্থিক, সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কারিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির নীতিবর্জন, মানসিক কুণ্ঠা ও বিকৃতির ছবি এঁকেছেন উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক। জীবনের যা যথার্থ তাই তাঁর উপন্যাসের আদর্শ। সমাজের যাথার্থ্যকে স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করে ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের সাহায্যে তার আলোচনা করেছেন লেখক। জীবনই তাঁর কাছে সব। তাঁর প্রধান উপন্যাস— 'সিতারোঁ কে খেল', 'গিরতী দীওয়ারেঁ', 'গর্মরাখ', 'বড়ী বড়ী আঁখেঁ', 'পথ্‌থর অল পথ্‌থর' এবং 'শহর মেঁ ঘূমতা আইনা'। অশ্‌কজীর উপন্যাস-সত্তা দেশি-বিদেশি বহু ঔপন্যাসিকের প্রভাবে পরিপুষ্ট।

অমৃতলাল নাগর (১৯১৬)—প্রেমচাঁদ থেকে কিছুটা দূরত্ব বাঁচিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন অমৃতলাল। তাঁর লেখা উচ্চ-স্তরের মানবিক সংবেদনায় সমৃদ্ধ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক হলেও সমাজের নিচুশ্রেণীর ব্যক্তিও তার সমাজ ও অধিকারবোধ নিয়ে তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে পৃথকভাবে

না দেখে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। মানবমনের আর্তি, করুণা ও সংবেদনশীলতা প্রভৃতিই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন শিল্পিতরূপে। তাঁর প্রধান উপন্যাস— 'কামরেড দেবদাস', 'সেঠ বাঁকেমল' ও 'মহাকাল' (১৯৪৭)। মহাকাল-এ বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের প্রামাণিক তথ্য উপকরণরূপে গৃহীত। উপন্যাসের কাহিনী অমানুষিক হলেও যথার্থ। 'বুঁদ ও সমুদ্র' (১৯৫৬), 'পাঁচওয়া দস্তা' (১৯৪৮), 'শতরঞ্জ কে মোহরেঁ', 'সুহাগকে নূপুর' (ঐতিহাসিক), 'অমৃত ঔর বিষ' (১৯৬৬), 'নাচ্যো বহুত গোপাল' (১৯৮৭), 'নৈমিষ্যারণ্যে' এবং 'মানস কা হংস' লিখে নাগরজী অভূতপূর্ব সৃজন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অমৃতলাল নাগর চোখ, কান ও মন খোলা রেখে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব দিকটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং আনুভূতিক ঐশ্বর্যে যা পান তাই দিয়ে শিল্প-রচনা করেন।

সমসাময়িক ঘটনা-আশ্রিত উপন্যাসরূপে চতুরসেন শাস্ত্রীর 'গোলী', বৃন্দাবনলাল বর্মার 'অমরবেল'-এর উল্লেখ করা যায়। প্রথম-টিতে ভারতের রাজ্য ও রাজপদ বিলোপের ব্যবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিণতি এবং দ্বিতীয়টিতে জমিদারী বিলোপের ফলে উৎপন্ন পরিস্থিতি ও তার ফল বিবৃত। অনুরূপ শ্রেণীর সমসাময়িক যুগের বিভিন্ন ঘটনা-আশ্রিত মন্মথনাথ গুপ্তের প্রগতিবাদী উপন্যাস হিসাবে 'চক্কী', 'গৃহযুদ্ধ', 'দো-দুনিয়া', 'বলি কা বকরা', 'দুশ্চরিত্র', 'অঁধের নগরী', 'জীত', 'রৈন অঁধেরী', 'অপরাজিতা', 'রঙ্গমঞ্চ' ও 'হোটেল দি তাজ'— প্রভৃতি নাম করা চলে।

বিষ্ণু প্রভাকরের (১৯১২-) 'নিশিকান্ত' (১৯৫০) উপন্যাসটি ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কালের পটভূমিতে রচিত। লেখক ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির ভূমিতে অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন। সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস 'তটকে বন্ধন'ও (১৯৫৫) একটি উল্লেখযোগ্য কৃতি। যদিও তাতে উপন্যাসের লক্ষ্য উপন্যাসের শিল্পকে কিছুটা খর্ব করেছে। এই প্রসঙ্গে উদয়শঙ্কর ভট্টজীর 'ওয়হ জো মৈঁনে

দেখা' (১৯৪০-১৯৪৩), 'ডাঃ শেফালী', 'লোক পরলোক', 'শেষ-অশেষ', 'দো অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য। মানবতাবাদী ভট্টজী ব্যক্তিগত অন্তর্মুখিতার অভিব্যক্তির জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন।

প্রেমচাঁদের উপন্যাসে গান্ধীবাদী চেতনা যে স্থান অধিকার করেছিল, পরবর্তীকালের উপন্যাসে সেই স্থান অধিকার করেছে মার্কস্‌বাদী চেতনা। এই চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে যশপালের (১৯০৩-১৯৭৬) উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে। তিনি এই অভিনব দৃষ্টিতে সমাজের যথার্থবাদের ভূমিতে ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন করে পরখ করেছেন। তাঁর রচনায় ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করে। শ্রেণীসংগ্রামে উন্মুখ চেতনা সমাজের অন্তঃসার-শূন্যতা, নীতিহীনতা ও বৈষম্যের নগ্নতাকে চিত্রিত ও ধিকৃত করেছেন। 'দাদা কামরেড' (১৯৪১), 'পার্টি কামরেড' (১৯৪৬), 'মনুষ্য কে রূপ', 'ঝূঠা সচ' (প্রথম ভাগ ১৯৫৮ দ্বিতীয় ভাগ ১৯৬০), 'ঝূটা মঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে শেষেরটিকে যশপালের শ্রেষ্ঠ কৃতি রূপে সম্মান দেওয়া চলে। তাতে দেশ-বিভাগের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ও প্রজাতন্ত্রের ব্যাপক ভ্রষ্টাচার ও শরণার্থীদের শোচনীয় পরিস্থিতির কাহিনী সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণিত। এই শ্রেণীর আর একজন উপন্যাসকার হলেন— রাঁগেয় রাঘব। মধ্য-বিত্তের জীবন-স্তরে সমাজবাদের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন তিনি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে আশ্রয় করেও তিনি সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস— 'বিষাদ মঠ' (১৯৪৬), 'উবাল', 'পরায়া' ও 'হুজুর' (১৯৫২), 'সবতক পুকারূঁ' (১৯৫৭)। বিষাদমঠে বাংলার দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ার পিছনে রাজনীতির আক্রোশ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নগ্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়। উপন্যাসের নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠে'র ছায়াও অনুভূত হয়। লেখকের মনঃপীড়াবোধ ও সহানুভূতি উপন্যাসের প্রথম থেকে

শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ। অপরগুলিতে আর্থিক বৈষম্য, নারী জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যক্তির স্বার্থ ও যৌনতা বর্ণিত। 'হুজুর' উপন্যাসে বর্তমান সমাজ ও জীবনের কুৎসিত নগ্ন কাহিনী ব্যঙ্গপূর্ণ শৈলীতে কুকুরের মুখে বর্ণিত।

সাম্যবাদের ভাষ্যকার অমৃত রায়ের উপন্যাসে গান্ধীনীতির নিন্দা ধ্বনিত হতে দেখা যায়। পাত্র-পাত্রীরা ব্যক্তিত্বহীন, যেন কাঠের পুতুল। 'বীজ' (১৯৫৩), 'হাথী কে দাঁত', 'নাগফণী কা দেশ' প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের মতবাদ— কচকচিতে কণ্টকিত। ভৈরবপ্রসাদ গুপ্তের 'মশাল', 'গঙ্গা মৈয়া', 'জঞ্জীরেঁ', 'নয়া আদমী' ও 'সতী মৈয়া কা চৌরা' প্রভৃতি উপন্যাসে মার্কস্‌বাদের ভ্রান্তি থাকলেও সামাজিক ও ব্যক্তিগত চেতনার বিশ্লেষণ এবং আঞ্চলিকতার আপাত বিশিষ্টতা লক্ষণীয়।

'সামাজিক উপন্যাস জনগণকে এবং সামাজিক উপন্যাসকে জনগণ'— উপহার দেবার কাজটি করলেন এ যুগে নাগার্জুন (১৯১১)। তাঁর রচনা প্রধানত ভৌগোলিক সীমায় সীমিত অঞ্চলকেন্দ্রিক। তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রী বন্ধনহীন বিচার-বিবেচনা ও স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপের অধিকারী। প্রাচীন সংস্কার ও শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিও তিনি সজাগ। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধিকার অর্জনের প্রয়াস দেখা যায় তাঁর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে। 'বলচনমা' (১৯৫২), 'রতীনাথ কী চাচী' (১৯৫৩), 'নঈ পৌধ' (১৯৫৩) ও 'বাবা বটেশ্বরনাথ' (১৯৫৪) প্রভৃতি নাগার্জুনের প্রমুখ উপন্যাস। কোনো কোনো উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সুর কিছুটা প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন— 'বাবা বটেশ্বরনাথ' ও 'বলচনমা'।

যুগবিশেষের গভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কাহিনী সহজভাবে, সাবলীল গতিতে মানবিক স্তরে প্রবাহিত। সমাজবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব— কোনো পদ্ধতিকেই সামনে রাখা বা মেনে চলা হয় নি। তাই বিধি বিধানহীন বিপুলকায় কৃতিরও সৃজন হয়েছে। মানুষের পীড়াময়

ইতিহাস তার চেতনাকে নিরন্তর অন্ধকারের সঙ্গে সংঘর্ষরত অবস্থায় দেখে আসছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যক্তি, পরিবার, ভালো-মন্দ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ— সব নিয়ে মানুষ চলেছে— লড়ছে, হারছে, জিতছে— তাতে সমাজ ও ব্যক্তির সমতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা সুস্পষ্ট। তাই গভীরতা ও বিস্তৃতি, বাইরের যাথার্থ্য ও প্রামাণিক অনুভূতিই এই সব উপন্যাসের প্রাণ।

চিরাচরিত নৈতিকতা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি আক্রোশ এবং বিরক্তির প্রকাশ ঘটেছে এক শ্রেণীর উপন্যাসে। এই বিদ্রোহ-ভাবনা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উত্তর কালে নানাপ্রকারের অভাব ও শূন্যতাবোধের ফসল। এই প্রসঙ্গে ধর্মবীর ভারতীর (১৯১২) 'সূরজকা সাতবাঁ ঘোড়া' (১৯৫২) ও 'গুনাহোঁ কা দেবতা' (১৯৫৪) উল্লেখযোগ্য। স্বল্প পরিসরে কাহিনী দীর্ঘ হওয়ার ফলে বাস্তবতার রূপ-বিধানের এবং পাঠকের মন ও বুদ্ধির ধৈর্যের কঠোর পরীক্ষার প্রয়াস লক্ষিত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ লালের (১৯১৩-১৯৮৮) 'বয়াকা ঘোঁসলা ঔর সাঁপ' (১৯৫৬), 'কালে ফূলকা পৌধা' (১৯৫৫), 'রূপাজীবা' (১৯৬৯), 'ছোটী চম্পা বড়ী চম্পা', 'হরা সমন্দর গোপীচন্দর' (১৯৭৪) ও 'মন বৃন্দাবন' প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম ও নগরের মধ্যবিত্ত বর্গের জীবনের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণিত।

রাজেন্দ্র যাদবের (১৯২৯) উপন্যাসে সামাজিক যথার্থবাদ, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি এবং প্রামাণিক অনুভূতির সমন্বয় দেখা যায়। ঘন কালো মেঘের গায়ে শুভ্র রজত রেখাও দেখাতে চান তিনি। 'প্রেত বোলতে হৈঁ' (১৯৫১), 'উখড়তে হুয়ে লোগ' (১৯৫৪-৫৫), 'সারা আকাশ' (১৯৬০), 'কুলটা', 'এক ইঞ্চ মুস্কান' (মন্নূ ভাণ্ডারী সহযোগে) প্রভৃতি রাজেন্দ্র যাদবের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'উখড়তে হুয়ে লোগ' বা 'উৎখাত হচ্ছে যারা' উপন্যাসে প্রগতিশীল সমাজের ছলনা, কপটতা, অত্যাচার ও শোষণের শিকার নব যুবকগোষ্ঠীর করুণ

নিরুপায় কাহিনী বর্ণিত। সাতদিনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা বাঁচতে চায়, তাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় উপন্যাসের নায়ক শরদের (শরৎ) মুখে লেখক বসিয়েছেন— 'আজও আমাদের সমাজের বা আমাদের সবার উপরে সামন্তবাদের ধ্বংসাবশেষের ছাই জমে আছে, আর অন্যদিকে মহাজনী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ছায়া ক্রমে গভীর হয়ে উঠেছে। এইরূপ বিচিত্র সংক্রান্তি কালের মধ্যে বেঁচে থাকাই আমাদের সমাজের এক ট্রাজেডি। এই দুই বিষম পরিস্থিতির সঙ্গে চলছে আমাদের স্বপ্নের সংগ্রাম। এ-দুইয়ের ভারে চাপা পড়ে আমাদের আত্মা আর্তনাদ করছে।'

গিরিধর গোপালের— 'চাঁদনী কা খণ্ডহর' ও 'কন্দীলে ঔর কুহাসে' (১৯৬৯) গ্রন্থে মধ্যবিত্ত বর্গের বিশৃঙ্খল অবস্থা বর্ণিত। কমলেশ্বরের (১৯৩২) 'এক সড়ক-সত্তাওয়ন গলিয়াঁ' এবং 'কালী আঁধী' (১৯৭৪)— উপন্যাসে সহানুভূতির সঙ্গে ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী চিত্রিত। 'ওয়হ পথ বন্ধু থা' (১৯৬২)— নরেশ মেহতার খ্যাতিপ্রাপ্ত উপন্যাস। তাতে সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস দেশপ্রেমের বিস্ফোরণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অমানবীয় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। নরেশ মেহতার 'ডূবতে মাস্তুল' (১৯৫৪) ও 'দো একান্ত'ও এই শ্রেণীর উপন্যাস। মোহন রাকেশের 'অঁধেরে বন্দ কমরে' (২য় সং ১৯৬৬) একটি জনপ্রিয় সাহিত্যকৃতি। তারই সঙ্গে 'ন আনেওয়ালা কল' এবং 'অন্তরাল'ও উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে দাম্পত্যজীবনের মনোবৈজ্ঞানিক, আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের সমস্যা রূপায়িত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাসের কাহিনীও মূলত দাম্পত্যজীবন-নির্ভর।

বর্তমান জীবনের মূল্যহীনতা, ক্ষয়িষ্ণুতা এবং দুর্গতি ও অসহায়তা চিত্রণে খ্যাত উপন্যাসকার নাগার্জুনের 'হীরকজয়ন্তী' (১৯৬২), কেশবচন্দ্র বর্মার 'আঁসূঁ কী মশীন' এবং রঘুবংশের 'অর্থহীন' প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য। এই সব উপন্যাসকৃতি পাঠককে ভাবায় যত, তত সাহিত্যরস দিতে পারে না। তবু এ-ধরনের উপন্যাসের রচনা বেড়েই চলেছে। এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, 'সমাজ' বলে কোনো কিছুকে মানতেই চান না। লক্ষণীয় হল— তাঁরা সমাজকে পুরোপুরি স্বীকার করেন না, আবার অস্বীকারও করতে পারেন না। কারণ কোনো সামাজিক জীবের পক্ষে সমাজকে অস্বীকার করা অসম্ভব, তা যত দোষই সে সমাজের থাকুক না কেন।

স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দী উপন্যাসসাহিত্যে, সর্বাপেক্ষা নবীন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন— আঞ্চলিক উপন্যাস। বিশিষ্ট যুগ ও পরিস্থিতির দান এই আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিখণ্ড, গ্রাম নগর বা জনপদের সামগ্রিক জীবন, তার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধার, 'ফুল ও শূল' নিয়ে উপস্থিত থাকে। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার, এবং ভাষা— মানুষের সহজ-সরল বিশ্বাস ও পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহ অনাগ্রহের টানা-পোড়েন সেই পরিবেশটিকে জীবন্ত করে তোলে। মনে রাখা দরকার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরই ভারতবিদ্যার মূল কথা। সেই সুরের মাধুরী সিক্ত হয়ে কোনো আঞ্চলিক উপন্যাস কৃতি শিল্প-পদবাচ্য হলে 'যথার্থ ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাস' রূপে বিবেচ্য। 'আঞ্চলিক' শব্দটি ভৌগোলিক অবস্থান, জাতি-ধর্ম-ভাষা ও জীবন-যাত্রার সাধারণ রূপান্তর থেকে ভিন্নতা ও বিশিষ্টতার দ্যোতক। তার থেকেই পরিশ্রুত হয়ে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে 'আঞ্চলিক রস'। এই বিশিষ্টতা যতক্ষণ অঞ্চল বিশেষের, ততক্ষণই আঞ্চলিক, রসে পর্যবসিত হলেই তা হয়ে যায় সমগ্র দেশের, সব দেশের। এই সাধারণী-ভবনের মধ্যেই আছে ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ পরিচয়। তাই বলা চলে— অঞ্চল বিশেষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক ও দৈনন্দিন জীবনের বিশিষ্টতার সহজ, স্বাভাবিক ও অবিকৃত আন্তরিক চিত্রণে যদি সেখানকার সামগ্রিক জন-

জীবন তার অসামান্যতা নিয়ে উপন্যাস-তত্ত্বের সহযোগে ফুটে ওঠে এবং আঞ্চলিক রসের আস্বাদন দেয়, তবেই সে শিল্পকৃতি 'ভারতীয় আঞ্চলিক উপন্যাস' রূপে স্বীকার্য। আনন্দের কথা ভারতীয় কথা-সাহিত্যে এরূপ কৃতির অভাব নেই।

হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের পিছনে টমাস হার্ডি, মার্কটোয়েন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রেরণা কাজ করেছে। আঞ্চলিক উপন্যাসকাররূপে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী ফণীশ্বর-নাথ রেণুর (১৯২১-১৯৭৭) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মৈলা আঁচল' (১৯৫৪) হিন্দী সাহিত্যজগতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পরতী পরিকথা' (১৯৫৭)—অপেক্ষাকৃত পরিণত কৃতি। দুই উপন্যাসেই রেণুজী পূর্ণিয়া অঞ্চলের অতি নিম্নস্তরের গ্রামীণ জীবন এবং লোকভাষাকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন। জীবন-গাথার প্রতীক যেন ব্যঙ্গ্যাত্মক হয়ে উঠেছে। মৈলা আঁচলের পৃষ্ঠায় পূর্ণিয়া গ্রামের শূল ও ফুল, কাদা ও চন্দন, ধুলো ও আবির—সব কিছুই নিজ-নিজ রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ প্রভৃতির গুরুত্ব ও স্বীকৃতি নিয়ে উপস্থিত। এই অভিনব উপন্যাসে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক, বৈশিষ্ট্যের পট-ভূমিতে জনদরদী দৃষ্টি নিয়ে অতি-সূক্ষ্ম ও বিচিত্র জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। জনজীবনের প্রগতির আভাসকে তিনি কুশলতার সঙ্গে সংগত ও সংহত শিল্পরূপ দিয়েছেন। পরতী-পরিকথা অর্থাৎ ঊষর জমির কাহিনীতে পরাণপুর গাঁয়েব বন্ধ্যা ভূমির কথা বর্ণিত। লঘুকথা বা উপকথা সংশ্লিষ্ট জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতির সাহায্যে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। খণ্ড চিত্রের যথার্থ বিন্যাসে কাহিনী সমৃদ্ধ। রেণু দু'টি উপন্যাস ও বহু ছোটো গল্প লিখেছেন। তাঁর সব রচনাই আঞ্চলিক রসে স্নিগ্ধ। হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু ফণীশ্বর রেণুর ময়লা আঁচল থেকেই। এই প্রসঙ্গে নাগার্জুন (১৯২৯) রচিত 'বলচনমা' (১৯৫২) ও 'বাবা বটেশ্বরনাথ' (১৯৫৪) গ্রন্থ দুইটিও স্মরণীয়। মিথিলার গ্রাম্য জীবনের রূপ ও ভাষার প্রয়োগ এই উপন্যাসদ্বয়ের অভিনবত্বার

পরিচায়ক। উদয়শঙ্কর ভট্টের (১৮৯৮-১৯৬৬) 'সাগর লহরেঁ ঔর মনুষ্য' (১৯৬১), দেবেন্দ্র সত্যার্থীর 'রথকে পহিয়ে' (১৯৫৩), শিবপ্রসাদ রুদ্রের (১৯১১) 'বহতী গঙ্গা', রামদরশ মিশ্রের 'পানী কে প্রাচীর' (১৯৬১), শৈলেশ মাটিয়ানীর (১৯৩১) 'বোরীবলী সে বোরী বন্দরতক', 'কবুতর খানা', 'কিস্‌সা নর্মদা বেন গঙ্গুবাঈ', 'চিট্‌ঠী-রসৈন' (১৯৬১), 'হৌলদার', 'সুখ সরোবরকে হংস'— প্রভৃতিও আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে বিবেচ্য। উদয়শঙ্কর ভট্টের রচনায় বোম্বের পশ্চিমতটবর্তী বারসোবার ধীবরদের জীবনকাহিনী উপস্থাপিত। তবে লেখকের মানবীয়তা ও মঙ্গলভাবনা প্রবল হয়ে আঞ্চলিকতার সুরকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনুরূপ-ভাবে দেবেন্দ্র সত্যার্থীর (১৯০৮) উপন্যাসেও আদিবাসীদের জীবনে রাষ্ট্রীয় ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শবাদিতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শিবপ্রসাদ রুদ্রের 'বহতী গঙ্গা'-তে বারাণসীর যৌবন-মদেমত্ত জীবনের চিত্র ঐতিহাসিক পটভূমিতে অঙ্কিত। যৌবন-তরঙ্গের দোলায় ভাষাও যেন দোল খাচ্ছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে। প্রত্যেক ঢেউই কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতীক। সুন্দর-সুমধুর ভাষার দোলায় লেখক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছেন। রামদরশ মিশ্রের (১৯২৪) উপন্যাসে উত্তরপ্রদেশের গোরা ও রাপ্তী সর্বনাশা নদী দুইটির আওতায় অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের নিরুপায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সহানুভূতি ও শিল্পরুচির সঙ্গে চিত্রিত। শৈলেশ মাটিয়ানীর কাহিনীতে নগ্ন যথার্থ মাঝে মাঝে কুরূপ এবং বীভৎস হয়ে সামনে এসেছে। পুরোপুরি শিল্পসম্মত না হলেও লেখকের যথার্থ-প্রিয়তা প্রশংসনীয়।

হিন্দীতে আঞ্চলিক উপন্যাস আজও লেখা হচ্ছে। কিন্তু ফণীশ্বর রেণু ও নাগার্জুনের মতো অভিনবত্ব ও শক্তির দ্যুতির দিন বুঝি শেষ হয়ে গেছে। সম্প্রতিকালের লেখকদের মধ্যে তেমন শক্তি আর নেই কিম্বা যে যুগ ও পরিস্থিতিতে আঞ্চলিকতার অমোঘ আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল— কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি হ্রাস পেয়েছে

মনে হয়। তার আর প্রয়োজনই বোধ হয় না। ফলে আঞ্চলিক উপন্যাসের মাধ্যমে জনজাগরণ সংঘটিত করা, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত-প্রদেশ ও সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে সমগ্র দেশকে সজাগ ও পরিচিত করবার যে আয়োজন ও উদ্দেশ্য ছিল তাও মাঝপথে ব্যাহত হল। অন্যদিকে প্রত্যাশিত স্বীকৃতির অভাবে লেখক ও পাঠকদের উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে গেল। প্রাণশক্তিই যেন হারিয়ে গেল। তাই কোনোক্রমে আঞ্চলিক রসের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে ব্রতী আছে সাম্প্রতিক কালের আঞ্চলিক উপন্যাস।

রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন প্রেমচাঁদের স্থান সুনির্দিষ্ট, হিন্দী ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বৃন্দাবনলাল বর্মার স্থানও তেমনি স্বীকৃত। সে কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এখন রাহুল সাংকৃত্যায়ন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, অমৃতলাল নাগর, যশপাল ও রাঁগেয় রাঘবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হতে পারে।

বৃন্দাবনলাল বর্মার (১৮৮৯-১৯৬৯) ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির প্রারম্ভিক এবং পরিণত স্তরের উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি বললেই হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাই তাঁর উপন্যাসে কাজ করেছে। অপর উপন্যাসকারদের রচনায় নতুনত্ব এসেছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, যশপাল ও রাঁগেয় রাঘবের ঐতিহাসিক উপন্যাস মার্কস্-বাদ প্রভাবিত। সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদের উপন্যাসে ইতিহাসের ক্ষীণ আলোকরশ্মিটুকু কোনোক্রমে অনির্বাপিত। তারই আলোকে আজকের জীবন-সমস্যার স্থিতি, বিকৃতি, এবং পাত্র-পাত্রীর মনোভূমি সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত। অমৃতলাল নাগরের (১৯১৬) 'সুহাগকে নূপুর' (১৯৬০) ও 'সতরঞ্জ কে মোহরে'— উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় উপন্যাসটি ১৮৫৭ সালের রাজনৈতিক পটভূমিতে লাখনাউর ইতিহাস আশ্রিত প্রামাণিক তথ্যের উপর লিখিত। নাগরজী এ উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাসের সার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন।

চতুরসেন শাস্ত্রীর 'বয়ং রক্ষামঃ' (১৯৫৫), 'বৈশালী কী নগরবধূ' (১৯৬৩), 'সোনা ঔর খুন' এবং 'সোমনাথ' প্রভৃতির প্রথমটিতে পঞ্চম শতকের সমাজ ও রাজনীতি আশ্রিত কাহিনী গৃহীত। 'সোনা ঔর খুন'-এ মোঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ইংরেজ শাসনের পূর্বাভাস সূচিত।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩) ঐতিহাসিক যথার্থবাদের ব্যাখ্যা মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে করতে চেয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে প্রাচীন ইতিহাসের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক বৈষম্যের গঠন ও বিগঠনাত্মক রূপ চিত্রিত। 'রাজস্থানী রনিবাস'-এ অন্তঃপুরের নারীদের নিরুপায়তা, দুঃখ-দুর্দশা ও পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণিত। আত্মকথামূলক শৈলীর উপন্যাসের রূপ কতকটা প্রবন্ধধর্মী হয়ে পড়েছে। 'সিংহ সেনাপতি' (১৯৪২)-তে বৈশালী ও লিচ্ছবি রাজাদের যুদ্ধ-বর্ণনা ও জীবনাদর্শের রূপায়ণ প্রাধান্য পেয়েছে। 'জয় যোধেয়' (১৯৪৪)-তে গুপ্ত যুগের রাজনীতি-সমাজনীতি ও নৈতিক স্থিতির পরিচয় বিধৃত। যশপালের (১৯০৩) 'দিব্যা'তেও (১৯৪৫) বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব ও মহত্ব-হ্রাসকালীন পর্বে নারীর আর্থিক পরতন্ত্রতার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। এই শ্রেণীর আশ্রিত বিষয়কে ইতিহাস না বলে ইতিহাসের কল্পনা বা কাল্পনিক ইতিহাস বলাই ভালো। 'অমিতা' গ্রন্থে যশপাল অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের ঘটনার নবতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর (১৯০৭-১৯৭৯) নতুন ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বাণভট্ট কী আত্মকথা' (১৯৪৬) স্ব-শ্রেণীর একক গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্য ও কল্পনাকে দ্বিবেদীজী এমন অপূর্বভাবে সমন্বিত করেছেন যে, একে অপরের পরিপূরক হয়ে সম্পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করেছে। যুগজীবন ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আত্মকথন-মূলক শৈলীতে রসের ঘনত্ব, আলঙ্কারিতা এবং ইতিহাস ও সমাজ সমৃদ্ধ করে তুলেছে কাহিনী ও

চরিত্রকে। এই উপন্যাসে দ্বিবেদীজীর সাফল্য কেবল বিস্ময়করই নয় 'বে-নজীর'ও। 'চারুচন্দ্র লেখ' (১৯৬৩) দ্বিবেদীজীর সমধর্মী দ্বিতীয় উপন্যাস। তাতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আর্যাবর্তের কাহিনী বর্ণিত। তন্ত্রশাসিত পরিমণ্ডলে বিচিত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অভিশপ্ত জীবনের ব্যর্থতা চিত্রিত। তাঁর পুনর্নবা (১৯৭৩) উপন্যাসে তিনি কালিদাসের যুগকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তবে কাহিনী ঘটনার-ঘনঘটায় আবদ্ধ থেকে গেছে। মধ্যযুগে প্রচলিত ধর্মের মূলকে উপনিষদের মধ্যে অন্বেষণ করতে গিয়ে দ্বিবেদীজী— মানব জীবনের সঙ্গে সেই ধর্মের সম্পর্ক কত দূর সহজ-স্বাভাবিক এবং গ্রাহ্য, তা দেখাতে চেষ্টিত হয়েছেন তাঁর— 'অনাম দাস কা পোথা' (১৯৭৬) উপন্যাসে। এক অবধূত-চরিত্রের আশ্রয়ে লেখক উপন্যাসটিকে গড়ে তুলেছেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক 'রস' সৃষ্টির বিচারে উপন্যাস চারটি সার্থক বলা যায়। হিন্দী সাহিত্যে 'কাল-প্রধান' বা কালকে নায়কের মর্যাদা দিয়ে উপন্যাস রচনার প্রথম সূচনা করেন হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীই। 'রাহ ন রুকী' (১৯৫৮), 'মুর্দোঁ কা টীলা' (তৃ. সং ১৯৬৩), 'চীওয়র' (১৯৫৮), 'প্রতিদান', 'পক্ষী ঔর আকাশ' (১৯৬৮), 'দেবকী কা বেটা', 'রত্না কী বাত', 'লৌঈ কা তানা', 'যশোধরা জীত গঈ', 'লখিমা কী আঁখেঁ'— প্রভৃতি উপন্যাসে রাঁগেয় রাঘবের (১৯২৩-১৯৬২) কল্পনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। তাঁর মতে— 'প্রকৃত ভারত গ্রামে বাস করে। সেখানে মধ্যযুগীয় বিশ্বাসেরই শাসন চলে। আর সে বিশ্বাস মধ্যযুগের আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।' অর্থ ও কাম বিষয়ক তত্ত্ব ও মূল্যের ব্যাখ্যা তিনি মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে করেছেন। সাহিত্যশিল্পের বিচারেও উপন্যাসগুলি সার্থক বলা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক ও মনোবিশ্লেষণাত্মক হিন্দী উপন্যাসের সূচনায় য়ুরোপীয় মনস্তাত্ত্বিক শাস্ত্রনীতি প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন ফ্রয়েড। ফ্রয়েডের নির্দেশিত প্রথায় সম্পূর্ণ চরিত্র অধ্যয়ন এবং যথার্থবাদী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সংকেত গৃহীত হয়েছে।

উপন্যাসকার মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে, তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অন্তঃ ও বহির্জগতের বিভিন্ন সংঘর্ষকে দেখেছেন মনস্তাত্ত্বিক ভূমিতে রেখে। এইভাবে এই নবীন ঔপন্যাসিকের দল নব মূল্যমান ও নৈতিকতার নতুন মানদণ্ড নিয়ে হিন্দীর সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে— হিন্দী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা হয়েছে— বলা যায়।

হিন্দীর প্রথম মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকুমার (১৯০৫)। তাঁর 'পরখ' (১৯২৯), 'ব্যতীত' (১৯৫৩), 'কল্যাণী' (১৯৫৬), 'ত্যাগপত্র' (১৯৫৬), 'সুখদা', 'বিবর্ত', 'জয়বর্ধন' (১৯৫৬) ও 'মুক্তিবোধ' (১৯৬৫)— এই জাতীয় উপন্যাস। সে কথা আমরা আগেই বলেছি। তবে তাঁর লক্ষ্য বিচারবিন্দু ও চিন্তন-মননশূন্য নয়। তাঁর নিষ্ঠায় অবচেতন ও চেতনস্তরের সঙ্গে দর্শনচিন্তাও যুক্ত। আদর্শবাদী লেখক জৈনেন্দ্রকুমার স্বপ্ন-সম্ভাবনা, কল্পনা ও সূক্ষ্ম যথার্থবাদের সমন্বয়ে বিশ্বাসী। তাঁর বিচারে যথার্থ একমাত্র সত্য নয়, কারণ আদর্শ যথার্থের বাইরের বস্তু। আত্ম-কথন-মূলক কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা অহংভাবের আকর্ষণশূন্য। বাইরের সত্যকে এড়িয়ে লেখক অন্তরের বা হৃদয়ের সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মসংঘর্ষ এবং ব্যথা-বেদনার প্রাধান্য ঘটেছে তাঁর কাহিনীতে। মনের গভীরতা ও দ্বন্দ্বভাবের পরিমাপের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। মনস্তত্ত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের জন্য স্বপ্ন ও প্রতীক প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। মনস্তত্ত্বে ধ্যান কেন্দ্রিত থাকায় কখনো কখনো বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গেছেন। এই প্রসঙ্গে ইলাচন্দ্র যোশীর বিদেশী-মনস্তাত্ত্বিক ধারানুসারী উপন্যাসগুলিও স্মরণীয়। মনের গভীরের অজ্ঞাত স্তরের চেতনালোকে দমিত, লুক্কায়িত কামনা-বাসনা ও কুণ্ঠিত প্রবৃত্তিকে তিনি অভিব্যক্তি দান করেছেন। 'ঘৃণাময়ী' (১৯৪৭), 'প্রেত ঔর ছায়া' (১৯৪৭), 'পর্দে কী রানী' (১৯৬৮), 'লজ্জা' এবং 'জিপ্সী' প্রভৃতি

উপন্যাসে লেখক অবচেতনের গিঁট খুলতে চেয়েছেন। পাত্র-পাত্রীও মানসিক রোগগ্রস্ত। পরবর্তী হিন্দী উপন্যাসে অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য নেই।

হিন্দী সাহিত্যে 'অজ্ঞেয়' (১৯১১-১৯৮৭) নতুন ধরাতল ও নব-দিগন্ত নিয়ে আবির্ভূত। তাঁর 'শেখর : এক জীবনী' (১৯৪০-১৯৪৪)। উপন্যাসটি বহু পঠিত ও বহুল চর্চিত। ঘনীভূত বেদনায় মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। সমন্বয় ঘটেছে— ভাব, বিচার ও মনোস্থিতির। 'নদী কে দ্বীপ' (১৯৫১) তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। কাহিনী ও শিল্পের বিচারে অজ্ঞেয় স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। অদ্বিতীয় তাঁর শিল্প সৃষ্টি। 'অপনে অপনে অজনবী' (১৯৬৩) উপন্যাসটি সাধারণ স্তরের হলেও পারম্পর্যের বিচারে বিশিষ্টতাপূর্ণ। মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎই উপন্যাসটির প্রমুখ বিষয়। যা মানবমনে জীবনের প্রতি আস্থা জাগায়। উপন্যাসের সব চরিত্রই যেন কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর সঙ্গে যোগযুক্ত। মৃত্যুকে সামনে পেয়ে মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, তার সূক্ষ্ম-মনোবৈজ্ঞানিক-যথার্থবাদী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ড. দেবরাজ (১৯০৮-১৯৮১) পাঁচটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লিখেছেন— 'পথ কী খোজ' (১৯৫১), 'বাহর ভিতর' (১৯৫৪), 'রোড়ে ঔর পত্থর', 'অজয় কী ডায়েরী' (১৯৬০) ও 'মঁ্যায় ওয়ে ঔর আপ'। পথ কী খোজ ও অজয় কী ডায়েরী উল্লেখযোগ্য কৃতি। প্রথমটিতে আদর্শ ও যথার্থ, ঐতিহ্য এবং নব-চেতনার সংঘর্ষ একই সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবাবর্গের বিভিন্ন সমস্যার মনোবৈজ্ঞানিক চিত্রণ, সামাজিক মূল্যবোধের হ্রাস এবং ব্যক্তিবাদী আদর্শের প্রতিষ্ঠাই উপন্যাসকারের লক্ষ্য। তাতে পাঠক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়টির কেন্দ্র ব্যক্তিমন। তাতে স্ত্রী ও পুরুষের সহজ আকর্ষণ ও প্রেম পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্মতায় চিত্রিত।

লক্ষণীয় দেশকালের বন্ধন ও কঠোরতা থেকে মুক্ত এযুগের উপন্যাসে বিবরণ, আত্মকথা, আত্মবিশ্লেষণ, দিবাস্বপ্ন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তরঙ্গ আলাপ প্রভৃতি শৈলীতে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে পাত্র-পাত্রীর মানসিক অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়া নিরূপণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা এই শ্রেণীর উপন্যাসে লেখকের নিরলস সচেতনতা সমধিক প্রয়োজন হয়। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা ও সমৃদ্ধির দ্বারাও হিন্দী কথাসাহিত্যের উৎকর্ষই সূচিত হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর সাতের-আটের দশকে সমকালীন জীবনের নানা দিক নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সমস্যা নিয়ে রচিত ভীষ্ম সাহানীর (১৯১৫) 'তমস' (১৯৭৬) উপন্যাসটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভাগের পীড়ার প্রত্যক্ষ-সাক্ষী সাহানীজী প্রগতিশীল সাহিত্যিক আন্দোলনের সুদৃঢ় স্তম্ভ। তাঁর মতে— 'তমস' রচনার উদ্দেশ্য অতীতের শব-ব্যবচ্ছেদ নয়, বরং সেই সন্ত্রাসের পিছনে সক্রিয় শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং সাধারণ মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও সংবেদনার মূল্যায়ন করা। 'তমস' সে যুগের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি সাধন করে। সাম্প্রদায়িক শক্তির কুৎসিত রূপ ও কুচক্রীর ক্রিয়াকলাপ নগ্ন হয়ে ফুটে উঠেছে। দক্ষবাজীকরের মতো পুতুল নাচিয়ে তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়, কিন্তু নিজেরা থাকে অন্তরালে। তমসের বক্তব্য হল— যা ঘটেছে তা মনে রাখো, গোঁড়া ও স্বার্থান্বদের হাতের পুতুল হতে যেও না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তির সাহায্যে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হও। গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আভাসিত পরিবর্তনের চিত্র এঁকেছেন শিবপ্রসাদ সিংহ (১৯২৮), শ্রীলাল শুক্ল, বিবেকী রায় (১৯২৭) প্রমুখ উপন্যাসকার। গিরীশ অস্থানা (১৯২০) হিন্দীতে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের প্রামাণিক রূপকে সংবেদনাত্মক গভীরতা দিয়ে বৃহৎ পটভূমিতে চিত্রিত করেছেন 'ধূপছাঁহী

রং'-এ। পুঁজিপতিদের মধ্যে সংস্কার-পালিত ষড়যন্ত্র, ধাপ্পাবাজী, ভ্রষ্টাচার এবং সংঘর্ষও তাতে চিত্রিত। জগদম্বাপ্রসাদ দীক্ষিত (১৯৩৫) 'কটা হুয়া আসমান' ও 'মুরদা ঘর'-এ মহানগরের জীবনের ছবি এঁকেছেন, যেখানে অভিশপ্ত জীবনের নিম্ন মধ্যবিত্তের বেদনা ও মর্মযন্ত্রণা ধরা পড়েছে সুন্দরভাবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসেও এই সমাজের অন্তর্বিরোধ ও ভেঙে পড়া জীবনের মূল্যায়ন প্রয়াস লক্ষিত হয়। মন্নূ ভাণ্ডারী, গিরিরাজ কিশোর (১৯৩৭), শ্রীকান্ত বর্মা (১৯৩১), এবং গজানন মুক্তিবোধ (১৯১৭-১৯৬৪) প্রভৃতি কথাসাহিত্যিক আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর জটিল জীবনের সম্পর্ক-রূপান্তরের ছবি আঁকতে চেয়েছেন। মন্নূ ভাণ্ডারীর 'আপ কী বান্টি'তে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ির পর নব-বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর আন্তরিক পীড়া ও দ্বন্দ্ব মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে গিরিরাজ কিশোরের 'চিড়িয়াঘর' (১৯৬৮), ও 'যাত্রায়েঁ', শ্রীকান্ত বর্মার 'দূসরী বার', মুক্তিবোধের 'রিপাত্র', নরেন্দ্র কোহলীর রূপকথা আশ্রিত 'দীক্ষা', 'অবসর' ও 'সংঘর্ষ কী ওর'— উল্লেখযোগ্য। প্রভাকর মাচওয়ের (১৯১৭) উপন্যাসে ('পরন্তু', 'সাঁচা' ও 'দ্বাভা') শিল্পগত প্রয়োগ যেন বিচার প্রবাহে ঢাকা পড়ে গেছে। লেখকের চেতনা-প্রবাহ প্রাচীন মূল্যবোধে প্রহার হেনে নব মূল্যবোধের সন্ধানে ব্যস্ত দেখা যায়। সাঁচাতে মানুষকে যন্ত্র বানানোর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন উপন্যাসকার। তাছাড়া কমলেশ্বর, ধর্মবীর ভারতী (১৯২৬), মুদ্রারাক্ষস (১৯৩৩), গঙ্গাপ্রসাদ বিমল (১৯৩৯), গিরিধর গোপাল, অমৃত রায় (১৯২১), হৃদয়েশ, মহেন্দ্র ভল্লা, বদী উজ্জমা ও রমেশ বক্সী প্রভৃতিও উপন্যাসে যুগচেতনা ও যুগসমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রয়াস আজও অব্যাহত।

এই যুগে মহিলা ঔপন্যাসিকদের কথাসাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ-বিধান চোখে পড়ে না। তবু শ্রীমতী উষা মিত্রার (১৮৯৭-১৯৬৬)

'পিয়া বচন কা মোল', 'আওয়াজ' ও 'জীবন কী মুস্কান' প্রশংসার দাবি রাখে। রজনী পানিক্কর (১৯২৪-১৯৭৪)—'মোম কে মোতী', 'পানী কী দিওয়ার' ও 'কালী লড়কী'—লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। চন্দ্রকিরণ সৌনরিক্সার 'চন্দন-চান্দনী'ও উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া শিবানী (১৯২৩), উষা প্রিয়ংবদা, অমৃতাপ্রিতম (১৯১৯), কৃষ্ণা সেবতী, মমতা কালিয়া (১৯৪০) প্রমুখও উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে তাঁদের রচনার স্তর সাধারণ। মন্নু ভাণ্ডারীর প্রসঙ্গ তো পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শশিপ্রভা শাস্ত্রী মেহেরুনিসা পরওয়েজ, বিজয়া চৌহান (১৯৩০), নিরুপমা সেবতী (১৯৪৩), মৃদুলা গর্গ (১৯৩৮), সূর্যবালা (১৯৪৪), সিম্মী হর্ষিতা (১৯৪০) এবং রাজী শেঠ (১৯৩৫) প্রমুখ মহিলা ঔপন্যাসিকের কথাও উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে হিন্দী উপন্যাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাকাব্যের স্থান গ্রহণ করেছে। তাতে জীবনের শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, প্রাচীন-নবীন তথা বিবিধ-বৈচিত্র্য যেন যুগচারী হয়ে সমাহৃত ও বাণীভূত। মনস্তত্ত্ব ও বৌদ্ধিক গভীরতাও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত। মানুষের প্রতিটি রোম ও তার নাড়ির প্রতিটি ধ্বনিকে অতি সূক্ষ্মভাবে বোঝাবার প্রয়াস রয়েছে এ-যুগের হিন্দী উপন্যাসে। মানবজীবনের এতদিনকার অবহেলিত, অলক্ষিত ও অস্পৃষ্ট দিকগুলি আহৃত হয়ে হিন্দী কথাসাহিত্যকে অভিনব এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তাই সবদিকের বিবেচনায় হিন্দী উপন্যাসের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল এবং প্রত্যাশাময় বললে অত্যুক্তি হবে না।

লক্ষণীয় হল— ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং বহির্ভারতীয় সমৃদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত নিত্য নূতন উপন্যাসকৃতির পাঠ ও অনুবাদের সাহায্যে হিন্দী উপন্যাসের ক্ষেত্র উত্তরোত্তর উর্বর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক কালের হিন্দী উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধির মূলে সাহিত্য-পাঠক ও স্রষ্টাদের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-পাঠের এই উদার মানসিকতার গুরুত্বকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দী কহানী বা ছোটো গল্প

হিন্দী উপন্যাসের মতোই হিন্দী কহানী বা গল্পও বাংলা ছোটো গল্পের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। প্রেস তথা আনুষঙ্গিক অন্যান্য আধুনিক উপায় ও উপকরণের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দীভাষী অঞ্চলে 'লৈলা-মজনু', 'শীরীফরহাদ', 'কিস্‌সয়ে গুলেবকাওয়লী' প্রভৃতি আরবি-পারসি কাহিনীরই প্রাধান্য ছিল। তবে, সুখপাঠ্য হলেও আধুনিক সাহিত্যিক ছোটো গল্পের সঙ্গে সেগুলির তুলনাই চলতে পারে না। পরবর্তীকালে যে-সব কাহিনী নতুন করে রূপ নিল— সেগুলিরও মান ছিল নিম্ন। সাহিত্যের ধারে কাছেও তা আসতে পারে না। 'কিস্‌সা তোতা-মৈনা', 'ছবীলী ভটিয়ারিন', 'কিস্‌সা সাঢ়েতীন য়ার', 'এক রাত মেঁ চালীস খুন', 'রানী সারঙ্গা ও সদাবৃক্ষ'—প্রভৃতিও এই স্তরের কাহিনী। কোনো কোনোটি আবার পাঁচালীর মতো সুর করে গাওয়া হত। দূর-দূরান্তরের পল্লী-মানুষের মধ্যে এই ধারাটি আজও অব্যাহত।

ইংরেজি Short Story-র সমগোত্রীয় বাংলা ছোটো গল্পের প্রারম্ভ, ঘটনাবিন্যাস ও পরিসমাপ্তি এবং ওই স্বল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের হৃদয়গ্রাহী ও ভাবব্যঞ্জক খণ্ড চিত্রের সার্থক সমাবেশ— হিন্দী কথাকার ও পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। মুন্সী ইন্‌সা আল্লার 'রানী কেতকী কী কহানী' (১৮০৩-০৮), উনিশ শতকের শেষার্ধের রাজা শিবপ্রসাদের 'রাজা ভোজ কা সপনা' এবং ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের 'অদ্ভুত অপূর্ব স্বপ্ন'— রচনা তিনটি ভাষা, গঠনসৌষ্ঠব এবং কাহিনীরসের বিচারে আধুনিক ও উল্লেখযোগ্য হলেও শিল্প হিসাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। যথাসম্ভব কম পাত্র-পাত্রী, স্বল্প পরিসর, সপ্রাণ চরিত্র, উপযুক্ত পরিবেশ ও সার্থক কাহিনী সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াসের নিতান্তই অভাব অনুভূত হয় এগুলিতে।

অতঃপর বাংলা ও ইংরেজি ছোটো গল্পের পাঠ ও অনুবাদের সহায়তায় রসোত্তীর্ণ ছোটো গল্পের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে ও আয়ত্ত করে নিয়ে মৌলিক হিন্দী ছোটো গল্পে সেগুলির প্রয়োগ-প্রয়াস দেখা দেয় কারো কারো রচনায়। হিন্দী ছোটো গল্পের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সরস্বতী পত্রিকার (১৯০০) ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে প্রথম বর্ষেই কিশোরীলাল গোস্বামীর (১৮৬৬-১৯৩২) 'ইন্দুমতী' গল্প প্রকাশিত হয়। প্রথম আধুনিক হিন্দী গল্প হিসাবে গল্পটির গুরুত্ব কম নয়। তবে শেক্‌সপীয়রের 'টেম্পেস্টে'র কাহিনী আশ্রিত হওয়ায় মৌলিক সৃষ্টিরূপে তা গণ্য করা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন—১৯০১ সালে মাধবরাও সপ্রে-রচিত ও মধ্যপ্রদেশের 'ছত্তীসগঢ় মিত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত—'এক টোকরী ভর মিট্টী' রচনাটি হিন্দীর প্রথম মৌলিক গল্প-রূপে স্বীকার্য। রচনাটির উৎস লোককথা হলেও তাতে সাহিত্যধর্মিতাও লক্ষণীয়। তার বিষয় সামাজিক, গঠন সরল হলেও অসাধারণ, মানবিক দিক বেশ সূক্ষ্ম ও সাবলীল।[৫] বলাই বাহুল্য, বাংলা ও অন্যান্য ভাষা থেকে গল্পের অনুবাদও চলতে থাকে। হিন্দীতে অনূদিত ও সরস্বতী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'মুক্তির উপায়'। অনুবাদক গিরিজাকুমার ঘোষ (১৮৭৮-১৯২০)। তিনি 'পার্বতীনন্দন' ছদ্মনামে অনুবাদ করেন— 'মুক্তি কা উপায়' (১৯০২)। রামচন্দ্র শুক্লের 'গ্যারহ বর্ষ' (১৯০৩) গল্পটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাতে ছোটো গল্পের ধর্ম পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। তার আগে কিশোরীলালের 'গুলবহার' (১৯০২), ভগবান দাসের 'প্লেগ কী চুড়ৈল' (১৯০২), গিরিজাদত্ত বাজপেয়ীর 'পণ্ডিত ঔর পণ্ডিতানী' (১৯০৩) প্রভৃতি গল্পও সরস্বতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ছোটো গল্পের অনুবাদ এবং মুদ্রণও হতে থাকে। বাংলা থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্প— রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' (১৯০৩)। অনুবাদক কুমুদবন্ধু মিশ্র। 'রাজটীকা' অনুবাদ করেন লালা পার্বতীনন্দন। গল্পটি রাজটীকা নামেই ১৯০৫ সালে সরস্বতীতে প্রকাশিত হয়। গিরিজাকুমার মৌলিক হিন্দী গল্পও লিখেছেন।

রাজেন্দ্রবালা ঘোষও 'বঙ্গ-মহিলা' নামে বাংলা থেকে গল্পাদি অনুবাদ করতেন। কারো কারো মতে— বঙ্গমহিলার রচনা 'ঢুলাঈওয়ালী'ই (১৯০৭) আধুনিক হিন্দীর প্রথম যথার্থ ছোটো গল্প।[৬] ১৯০০ থেকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এক দশক হিন্দী ছোটো গল্পের প্রয়োগকাল রূপে চিহ্নিত। বিদ্যানাথ শর্মার 'বিদ্যাবহার', মৈথিলীশরণ গুপ্তের 'নিন্নানবে কা ফের' ও 'নকলী কিলা', বৃন্দাবনলাল বর্মার 'রাখীবন্দ ভাঈ' (১৯০৭) প্রভৃতি গল্পও এই সময়ে রচিত। বঙ্গমহিলার 'ঢুলাঈ-ওয়ালী' গল্পটিতে একটি ছোটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানব-মনের বিচিত্র বাস্তব চিত্র অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনা, ক্ষেত্র, পরিবেশ, ভাষা ও গল্পকারের তদ্‌গতচিত্ততা অতি উপাদেয় ভঙ্গিতে সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে ঢুলাঈওয়ালীতে। তাই পাঠক সম্প্রদায়কে অতি সহজেই গল্পটি আকৃষ্ট করেছে।

এইভাবে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করে বিভিন্ন লেখকের সৃষ্টি-কর্ম পুষ্ট হয়ে হিন্দী ছোটো গল্প সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় হিন্দীভাষী অঞ্চলে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই ছোটো গল্প প্রকাশিত হতে লাগল। এ প্রসঙ্গে 'সরস্বতী', 'সুদর্শন' ও 'ইন্দু' (১৯০৯)— পত্রিকা তিনটির নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইন্দু পত্রিকার দ্বিতীয় বছরেই জয়শংকর প্রসাদের প্রথম গল্প 'গাঁও' বা 'গ্রাম' (১৯১০) ছাপা হয়। তারপর 'আকাশদীপ', 'বিসাতী', 'প্রতিধ্বনি', 'স্বর্গ কে খণ্ডহর', 'চিত্রমন্দির' প্রভৃতি বহু ছোটো গল্প মুদ্রিত হয়। ১৯১১ সনেই বিশ্বম্ভরনাথ কৌশিক (১৮৯১-১৯৪৫), রাধিকারমণ প্রসাদ (১৮৯০-১৯৭১), জ্বালাদত্ত শর্মা (১৮৮৮-১৯১৮) প্রমুখের গল্প প্রকাশিত হয় ইন্দু ও সরস্বতীর পৃষ্ঠায়। চন্দ্রধর শর্মা গুলেরীর (১৮৮৩-১৯২২) অদ্বিতীয় ছোটো গল্প— 'উসনে কহা থা' ১৯১৫ সনে সরস্বতীতে ছাপা হয়। এ গল্পে বাস্তবতার মধ্যেই সুরুচির গুরুত্ব এবং ভাবুকতার মহত্ত্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে সমন্বিত। গল্পের ঘটনাটি স্থান, কাল ও পাত্রের সীমানা মুক্ত, তা থেকে স্বর্গের

রূপ উদ্ভাসিত। পাত্র-পাত্রী জীবন্ত ও ঘটনা গভীর মর্মস্পর্শী। প্রেমনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতাই গল্পের মূলভাব। তার জন্য আত্মোৎসর্গও তুচ্ছ।

হিন্দী সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকার প্রেমচাঁদের প্রথম গল্প 'পঞ্চ পরমেশ্বর' প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে। কাহিনীর সজীব-বাস্তবচিত্রণ, সহৃদয়-সহানুভূতি এবং শিল্পসম্মত পরিমিতি ও সহজ-স্বাভাবিক ভাষার সৌকর্যে গল্পটি পূর্ববর্তী সকল গল্পকেই অতিক্রম করে গেছে। অবশ্য 'উসনে কহা থা' গল্পটির কথা স্বতন্ত্র। এই দুই গল্পেরই আবেদন চিরন্তন। প্রেমচাঁদের শেষ গল্প 'কফন' (১৯৩৬)। তাঁর অধিকাংশ গল্পই সংস্কারবাদী উদ্দেশ্যপুষ্ট। যে-সব গল্পে তা সাংকেতিক, সেগুলি সাহিত্যকলার বিচারে সমধিক সার্থক। তাঁর প্রথম ও শেষ গল্প দুইটি তুলনা করলেই তা বোঝা যায়।

প্রেমচাঁদের গল্প হিন্দী কথাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পঞ্চ পরমেশ্বরে তিনি আধুনিক পাঠকের সামনে জনগণের ভিতরের শক্তির উদ্‌বোধন ঘটিয়েছেন। মানুষের বাস্তব জীবনের মূলের সমস্যাকে ভেদ করে সত্যকে স্বীকার করবার সেই শক্তির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যার অস্তিত্ব সহজে অনুভূত হয় না। প্রেমচাঁদের দ্বিতীয় গল্প 'আত্মারাম'-এ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাস্তবতার ভিতর থেকে মানবহৃদয়ের বিশালতার দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হৃদয়গ্রাহিতা, মনোহারিতা, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির শিল্পনৈপুণ্যে প্রেমচাঁদের এই গল্পগুলি সর্বকালীন সাহিত্যরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে 'বড়েঘর কী বেটী', 'রানী সারন্ধা', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' 'ঈদ্‌গাহ', 'গুল্লী ডণ্ডা', 'কজাকী', 'সজ্জনতা কা দণ্ড', 'নমক কা দরোগা', 'নশা', 'বূঢ়ী কাকী', 'কফন', 'পূস কী রাত', 'দো বৈলোঁ কী কথা' এবং 'সওয়া সের গেহূঁ'— প্রভৃতি গল্পের প্রসঙ্গ অবশ্যই স্মরণীয়। প্রেমচাঁদের গল্পসংখ্যা প্রায় তিনশো।

প্রেমচাঁদের গল্পগুলির বেশ কয়েকটি সুন্দর মনোজ্ঞ সংকলন বের হয়েছে। যেমন— 'প্রেরণা', 'কফন', 'কুত্তে কী কহানী', 'জঙ্গল কী

কহানিয়াঁ', 'নবনিধি', 'গ্রামজীবন কী কহানিয়াঁ', 'নারীজীবন কী কহানিয়াঁ', 'পঞ্চপ্রসূন', 'প্রেম দ্বাদশী', 'প্রেম পচীসী', 'প্রেম পূর্ণিমা', 'প্রেম চতুর্থী', 'মনমোদক', 'মানসরোবর' (৮ খণ্ড), 'সমর যাত্রা', 'সপ্ত সরোজ', 'অগ্নিসমাধি', 'প্রেম গঙ্গা', 'প্রেম পঞ্চমী' ও 'সপ্ত সুমন'। প্রেমচাঁদের এই গল্প-সমূহই তাঁকে অদ্বিতীয় জনপ্রিয় লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। সহানুভূতির সঙ্গে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী—কৃষক, মজুর, ফকির, বেশ্যা, গরিব ও অনাথ-আতুর প্রভৃতির মর্মব্যথা ও অসহায়তাকে তিনি গল্পে যথার্থ স্থান দিয়েছেন, সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। শোষিত অবহেলিত জনগণের ব্যথা যেমন রূপ পেয়েছে তেমনি সামাজিক রীতিনীতির অসারতা, ধনী-মানীর কপটতা ও অ-মানবিকতাও রূপায়িত হয়েছে। হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচাঁদ তাই আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী। অনেকে উপন্যাসকার অপেক্ষা 'কহানীকার' প্রেমচাঁদকেই সমধিক সফল শিল্পী মনে করেন। প্রেমচাঁদের কয়েকটি নাটকরূপে— 'কর্বলা', 'প্রেম কী বেদী', 'সংগ্রাম' এবং 'রূঠীরানী' প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

জয়শঙ্কর প্রসাদের ছোটো গল্পে কাহিনী অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কারণ জয়শঙ্করপ্রসাদ মূলত কবি। মানব-মনের সুখ-দুঃখ, সংযোগ-বিয়োগ, ত্যাগ ও সহানুভূতি প্রভৃতি সহজ বৃত্তিগুলি নিয়েই তাঁর গল্পগুলি রচিত। তাঁর 'পুরস্কার' গল্পটিতে রাজভক্তি ও ব্যক্তিগত প্রেমের সার্থক সমন্বয় মেলে। তার ব্যাপক ও গভীর বেদনা প্রত্যেকের প্রতিই আমাদের সহানুভূতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। প্রসাদ ৬৩টি গল্প লিখেছেন। সামাজিক গল্প লিখলেও জয়শঙ্করপ্রসাদের ঐতিহাসিক গল্পের সার্থকতাই বেশি। তাঁর ঐতিহাসিক গল্পে মোঘল-পাঠান এবং বৌদ্ধ যুগের পরিবেশ ও অনুভূতি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'ছায়া' (১৯১২), 'প্রতিধ্বনি' (১৯২৪-১৯২৬), 'আকাশদীপ' (১৯২৬-২৯), 'আঁধী' (১৯৩৩) এবং 'ইন্দ্রজাল' (১৯৩৬)— তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পসংকলন। জয়শঙ্কর প্রসাদের গল্পের মূল

প্রেরণাস্থল—ব্যক্তিসত্য বা ব্যক্তিহিত। তাঁর মতে 'ব্যক্তির বিকাশে সহায়ক না হলে সমাজ অর্থহীন'। প্রেমচাঁদের সঙ্গে আদর্শবাদিতা ও সমাজ-সংস্কারের ভাবনার দিক থেকে প্রসাদের মিল আছে। যদিও প্রেমচাঁদের গল্পের লক্ষ্য— সমাজসত্য বা সমাজহিত।

এই সময় বদরীনাথ ভট্ট (জন্ম: শেয়ালকোটে, ১৮৯৬-১৯৬৭) 'সুদর্শন' নামে হিন্দী গল্প-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। প্রেমচাঁদের মতো তিনিও উর্দু থেকে হিন্দীতে আসেন। তাঁর প্রথম ছোটো গল্প 'কমল কী বেটী'তে ছোটো গল্পের অভিনব শিল্পময় রূপ উদ্ভাসিত। সুদর্শনের গল্পের পাত্র-পাত্রীরা সব সাধারণ মানুষ। কোনো কোনো গল্পের কাহিনী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে গৃহীত। যেমন 'অঁধেরে মেঁ'। তাঁর 'জীত কী হার' গল্পে উচ্চ মানবতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত। হৃদয় পরিবর্তনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে গল্পটিতে। 'ন্যায়মন্ত্রী' গল্পটি অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাতে ন্যায় ও স্বামীভক্তির তীব্র সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। তাঁর ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্সধর্মী গল্পগুলি শাশ্বত সত্যের ভাব ফুটিয়ে তোলে। গল্পের ক্ষেত্রে সুদর্শন যেন শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এক সময় তাঁর গল্পের খুব বেশি প্রচার-প্রসার ছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প-সংগ্রহ—'তীর্থযাত্রা', 'পরিবর্তন', 'চার কহানিয়াঁ', 'সুদর্শনসুধা', 'পনঘট', 'সুপ্রভাত', 'বচ্চোঁ কা হিতোপদেশ', 'অংগূঠী কা মুকদমা', 'ঝরোখে', 'খটপটলাল', 'নগীনেঁ', 'পন্দ্রহ অগস্ত', 'রুস্তম-সোহরাব' এবং 'সুদর্শন সুমন'।

সুদর্শন দুইটি উপন্যাস 'ফূলবতী' ও 'ভাগ্যবন্তী'; একটি নাটক 'ভাগ্যচক্র' এবং একটি প্রহসন 'আনরেরী মজিস্ট্রেট'ও লিখেছেন।

অতঃপর হিন্দী ছোটো গল্প রচনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে চতুরসেন শাস্ত্রী (১৮৯১-১৯৬০), শিবপূজন সহায় (১৮৯৩-১৯৬৩), গোবিন্দবল্লভ পন্ত (১৮৯৮-১৯৬০), জ্বালাদত্ত শর্মা (১৮৮৮-১৯৫৮), পদুমলাল পুন্নালাল বখ্শী (১৮৯৪-১৯৭১),

রাজা রাধিকারমণ (১৮৯০-১৯৭১), গোপালরাম গহমরী, গঙ্গাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, বৃন্দাবনলাল বর্মা, রায়কৃষ্ণ দাস (১৮৯২-১৯৮০), বাচস্পতি পাঠক (১৯০৫-১৯৮০) ও বিনোদশংকর ব্যাস (১৯০৪-১৯৬৬) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীপ্রসাদ 'হৃদয়েশের' (১৮৯১-১৯২৭) 'উন্মাদিনী' ও 'শান্তিনিকেতন' গল্প দুইটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। উন্মাদিনীতে ঘটনার গতিশীলতা নেই, শান্তিনিকেতনে ঘটনা ও কথোপকথন দুই-ই নেই বললেই হয়। হিন্দী ছোটো গল্পের ভাণ্ডারে নবীন সংযোজন এই গল্প দুইটি। এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে হিন্দী ছোটো গল্প নিয়ে; বস্তু-বিন্যাসের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই। প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি এবং মানব-মনের বিভিন্ন বৃত্তি— সব কিছু নিয়েই ছোটো গল্প রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এখানে আরো কয়েকজন হিন্দী গল্পকার সম্পর্কে অল্পাধিক আলোচনা করা যেতে পারে।

জৈনেন্দ্রকুমার (১৯০৫)—গল্পকার জৈনেন্দ্রকুমারের রচনায় ভাবুকতা ও করুণার মাত্রা অধিক। ভাষা কথ্য, গতিশীল এবং প্রবাদবাক্য ও বাগ্‌ধারায় সমৃদ্ধ। ইংরেজি 'বাক্ রীতির'ও সুন্দর ব্যবহার করেছেন মাঝে মাঝে। প্রয়োজনমতো উর্দু শব্দও এনেছেন দক্ষতার সঙ্গে। মনোবৈজ্ঞানিকতা তাঁর কাহিনীতে একটু বেশি থাকে। মানব-জীবনের বহু দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর রচনায়। গান্ধী দর্শনের স্বীয়-বিশ্বাস ও ধারণা মতো প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র অপূর্ব মহিমামণ্ডিত। জৈনেন্দ্রকুমার ব্যষ্টিহিত, ব্যষ্টিসত্য ও ব্যষ্টিযথার্থ দ্বারা অনুপ্রেরিত কহানীকার। প্রায় ১৫০টি গল্পের রচয়িতা জৈনেন্দ্র তাঁর গল্পে একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে চান। তিনি সমাজের দিকে তত দৃষ্টিক্ষেপ করেননি যত করেছেন ব্যক্তির দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম ব্যক্তিগত বস্তু এবং বিবাহ সামাজিক। নারী যেন একটি দুর্বোধ্য ধাঁধা। যাই হোক একাকীত্ব থেকে মুক্তিই হল তাঁর গল্পের উদ্দেশ্য। তাই জীবনের সহজ দিকটি নিরূপিত তাঁর রচনায়। তাঁর মতে—

এই সহজতায় প্রধান বাধা— নারী ও পুরুষের কৃত্রিম সম্পর্ক। তাই বৌদ্ধিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চান না। এই বিরোধাভাসই তাঁর গল্পসাহিত্যের মূল সুর এবং তাঁর রচনাপ্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপলব্ধি ও বিচরণপরিধি সীমিত হওয়ার কারণও তাই।

তাঁর কহানী সংগ্রহ— 'একরাত' (১৯৩৪), 'স্পর্ধা', 'জয়সন্ধি', 'ধ্রুবযাত্রা', 'নীলম দেশ কী রাজকন্যা', 'দো চিড়িয়াঁ', 'বাতায়ন' (১৯৫৭), 'ফাঁসী', 'কথামালা'. 'পাজেব' ও 'জৈনেন্দ্র কী কহানিয়াঁ' (সাত খণ্ড)। জৈনেন্দ্র তাঁর গল্পে মনোবৈজ্ঞানিক ও নৈতিক প্রশ্নের যুক্তিনিষ্ঠ সমাধানের প্রয়াস পান নি, প্রশ্নের উপস্থাপনই তাঁর লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী গল্পের শিল্প ও স্বরূপে নতুনত্ব-বিধানও করেছেন তিনি। তাঁর সৃজনশীল মন ও বাস্তবতা-আশ্রিত সূক্ষ্ম অনুভূতির শিল্পসম্মত প্রকাশ ঘটেছে গল্পগুলিতে।

হিন্দী ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে কয়েকজন শক্তিশালী মহিলা লেখিকারও আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের লেখনীস্পর্শে হিন্দী গদ্য-সাহিত্য শাখাটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় জীবনধারার এমন সব দিক তাঁদের রচনায় উদ্ভাসিত যা পুরুষ লেখকদের রচনায় পাওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ ঘরোয়া চিত্র অঙ্কনে তাঁরা পুরুষ লেখকদের তুলনায় অধিক সাফল্যলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সুভদ্রাকুমারী চৌহান (১৯০৪-১৯৪৭) শিবরানী দেবী (১৮৮৯-১৯৭৬), কমলাদেবী চৌধুরী, হেমবতী দেবী (১৯০২-১৯৫১) তেজরানী পাঠক, চন্দ্রাবতী ঋষভ ও সুমিত্রা সিন্‌হা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উষা মিত্রা, চন্দ্রকিরণ সোনরিক্সা ও চন্দ্রাবতী জৈন (১৯০৯-১৯৬৯), সত্যবতী মল্লিক, রজনী পানিক্কর, কাঞ্চনলতা সব্বরওয়াল, শিবরানী বিশ্‌-নোঈ, শান্তি মেহরোত্রা, উষা-প্রিয়ংবদা, মন্নু ভাণ্ডারী, শিবানী, কৃষ্ণা সোবতী, শশিপ্রভা শাস্ত্রী, মমতা কালিয়া (১৯৪০), মৃদুলা গর্গ (১৯৩৮), মেহরুন্নিসা পরওয়েজ, কমলেশ বক্সী, মণিকা মোহিনী (১৯৪০) প্রমুখের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সুভদ্রাকুমারীর 'বিখরে

মোতী' গল্প-সংকলনটি বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে সত্যবতী মল্লিকের 'দোকুন', 'বৈশাখ কী রাত' ও 'দিনরাত', লীলা-অবস্থীর 'দুব কে ফ্‌ল', 'দো রাহেঁ', 'রিখরে কাঁটে' ও 'বদরওয়া বরসত আয়ে', উষা-প্রিয়ংবদার 'রুকেগী নহী রাধিকা', 'মোহভঙ্গ' ও 'খুলে হুয়ে দরওয়াজে', মন্নু-ভাণ্ডারীর 'ঊঁচাঈ', 'য়হী সচ হৈ', 'তীসরা আদমী' ও 'নকলী হীরে', শিবানীর 'কৃষ্ণকলী', 'ভৈরব' ও 'শ্মশান চম্পা', কৃষ্ণা সোবতীর 'মিত্রোঁ মরজানী', 'বাদলোঁ কে ঘেরে', 'জিন্দগীনামা' ও 'ডারসে বিছুড়ী' এবং শশিপ্রভা শাস্ত্রীর 'অমলতাস', 'অনুত্তরিত' ও 'জোড়বাকী' প্রভৃতি কৃতিও উল্লেখযোগ্য।

নারী জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র সমস্যা কণ্টকিত চিত্র এইসব গল্পে ফুটে উঠেছে। নারীর বিচিত্র আধুনিক রূপ ও সমস্যার দিকে লক্ষ রেখে গল্পগুলিকে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক— এই চার প্রকারের পটভূমিতে রেখে বিচার করা যায়। যুগ সমাজ ও পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। নারীজাতিও স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। সুভদ্রা কুমারী চৌহানের ভাষায়— 'এখন আমাদের মনোভাবের অভিব্যক্তির জন্য আর পুরুষের লেখনীর প্রয়োজন নেই। নারীর স্বভাব-সুলভ কোমলতা পুরুষের পক্ষে অপ্রাপ্য না হলেও দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, ঠিক যে কারণে— পুরুষসুলভ প্রখর ভাব নারীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য।'— নারী প্রগতির এই ধারায় আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা দুই গৌরবান্বিত। নারী-হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও জটিলতা প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত হচ্ছে— নারীর কলমেই, আর বকলমে নয়। তাই বলা যায়— পথ দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ কিন্তু নৈরাশ্য-জনক নয়।

হিন্দী ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে প্রেমচাঁদ সংস্কারমূলক যে ধারার প্রবর্তন করেন (পঞ্চ-পরমেশ্বর, ১৯১৬)— যশপাল সেই ধারারই অনুবর্তক। তবে তাঁর গল্পে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কসবাদের অনুসৃতি সুস্পষ্ট। ভাষা ও শিল্পের প্রতি কতকটা উদাসীন যশপালের

গল্পের প্রাণ হল— কাহিনীর আকস্মিক বাঁক-ফেরা। যশপাল প্রায় দুশো গল্প লিখেছেন। 'জ্ঞানদান' (১৯৪৭), 'চিত্র কা শীর্ষক' (১৯৫২), 'ফ়ুলোঁ কা কুর্তা' (১৯৫৩) এবং 'অভিশপ্ত' (১৯৫৬) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

অজ্ঞেয়ের ছোটো গল্পে আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ ব্যক্তির ধরাতলেই স্বীকৃত। ব্যক্তিসত্যের স্তরেই জীবনের জটিলতা ও তার মূল্যায়ন তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষিত হয়। মনোবৈজ্ঞানিকতা ও বৌদ্ধিকতার গভীর ছাপ রয়েছে তাঁর রচনায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অজ্ঞেয়ের সামনে উপস্থিত। অজ্ঞেয়ের গদ্য-শিল্পের বিবেচনায় তাঁর কাব্য ও উপন্যাস-শিল্পের গতিপ্রকৃতিও বিবেচ্য হয়ে ওঠে। সমকালের প্রতি সজাগতা অজ্ঞেয়ের গল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানব অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতাগুণে সবই সুন্দর ও সার্থক হয়ে শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাঁর পঞ্চাশটির অধিক গল্পের মধ্যে 'জয়দোল' (১৯৫১) এবং 'য়ে তেরে প্রতিরূপ' (১৯৬১)—সংকলন দুইটির গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক তাঁর গল্পে সামাজিক বিধিব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে— 'ব্যক্তির পীড়া খুঁজতে গিয়ে সমাজের পীড়ার স্রোত পাওয়া গেল, আর মনের অজ্ঞাত অব্যক্ত গভীরতাই যে কেবল চোখে পড়ল তা নয়, সামাজিক ব্যবস্থার সেই চক্রব্যূহও জানা গেল, যার মধ্যে ধরা পড়ে মানুষ মরেই বাঁচতে পারে।'— (সত্তর শ্রেষ্ঠ কহানিয়াঁ, ১৯৫৮)। বাস্তবচিত্রণ, বাস্তব জীবনের অভিব্যক্তি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিচার-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ অশ্‌কজীর রচনা। তবে তাঁর দৃষ্টি সর্বদা ব্যক্তির প্রতিই নিবদ্ধ। তাঁর 'পলঙ্গ' গল্প-সংকলনটিতে নগ্ন বাস্তবতা-আশ্রিত গল্পেরই প্রাধান্য। সার্ধশত গল্পে তিনি বিভিন্ন ভাব ও বিচিত্র ধারার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পরিপক্কতা তাঁর গল্পকে পরিমিতি দান করেছে।

ইলাচন্দ্র যোশীর গল্পে হয় সংস্কার ও কুণ্ঠার বিশ্লেষণ কিংবা ব্যক্তির অহংভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে। ব্যক্তিনিষ্ঠ গল্পে

তিনি কুণ্ঠিত ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। তাতে বৌদ্ধিকতার ছাপও গভীরভাবে লক্ষিত হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসও লক্ষণীয়। 'ডায়েরী কে নীরস পৃষ্ঠ' (১৯৫০) এবং 'দীওয়ালী ঔর হোলী'— যোশীজীর দুইটি গল্পসংগ্রহ।

জৈনেন্দ্র, অজ্ঞেয়, যোশী ও অশ্‌কের গল্প-শিল্পে ব্যক্তিমূলক জীবনদৃষ্টির প্রেরণা বিদ্যমান, তবে তাঁদের রচনাপ্রক্রিয়ায় মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে।

অতি সম্প্রতিকালে রচিত হিন্দী ছোটো গল্প 'নঈকহানী'— নামে পরিচিতি। কিন্তু 'নঈকহানী' বা যে-নামেই অভিহিত হোক না কেন বিষয়, শৈলী, স্বরূপ, জীবনের দৃষ্টি, প্রভৃতি নিয়ে এত বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে এবং তা নিয়ে এত মতবাদ বা মতভেদ গড়ে উঠেছে যে, আজকের হিন্দী গল্পের রচনা ও আলোচনা শাস্ত্রীয় অথবা ঐতিহ্যগত বিধিতে সম্ভব নয়, হয়তো বাঞ্ছনীয়ও নয়। গল্পের বহিরঙ্গ যেন ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে, প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে তার আভ্যন্তর সংগতি ও ঐক্য। যার ফলে রেখাচিত্র, লঘুকথা, ডায়েরী, সাংবাদিকতা, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতিও গল্পের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। কবিতা, সংগীত ও চিত্রকলার বিশেষত্বকেও গল্পে গ্রহণের চেষ্টা চলছে। এই সব কারণে শিল্পের আকার-প্রকার আর স্থির বা সুনির্দিষ্ট নেই। এই যার অবস্থা তাকে কি কোনো এক বিশেষ বা সুনিশ্চিত সংজ্ঞায় বাঁধা যায়? জীবনের প্রাচীন সত্য ও তার বন্ধন খসে পড়ছে, তাই নতুন-দিক ও অভিব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই সুযোগে বাধা-বন্ধনহীন কহানী ও কহানীকারের সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠেছে। তাই 'কবিতাবাদে'র মতোই নানা শ্রেণীর 'কহানীবাদে'রও সৃষ্টি হয়েছে। অন্তত নামে সেই পরিচয় স্পষ্ট। যেমন— 'সমকালীন কহানী', 'সহজ কহানী', 'নঈ-কহানী', 'সচেতন কহানী', 'অ-কহানী', 'গ্রাম কথা', 'নগর কথা', 'আঞ্চলিক কহানী',

'কস্‌বে কী কহানী', 'সাংকেতিক' বা 'প্রতীকাত্মক কহানী', 'ফ্যান্টাসি' ও 'রূপক কহানী' প্রভৃতি। এই সব নামে হিন্দী ছোটো গল্পের চরিত্র, শিল্পের অভিনবত্ব ও অন্তবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। কেবল হিন্দীরই নয় অন্য ভারতীয় ভাষার ছোটো গল্পের অবস্থাও বস্তু, ভাষা ও শিল্পের বিচারে প্রায় অনুরূপ।

আজ হিন্দী গল্পে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-চিন্তনের রূপ তেমন স্পষ্ট ও স্থূল নয়, যেমন পূর্বে ছিল। আজকের গল্পে অনেক সুর, অনেক রূপ, অনেক রং ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও উষা-প্রিয়ংবদা, মন্নু ভাণ্ডারী, কৃষ্ণা সোবতী, নির্মল বর্মা, রমেশ বক্সী, কৃষ্ণ বলদেব বৈদ (১৯২৭), রামকুমার (১৯০৫), শ্রীকান্ত বর্মা (১৯৩১) প্রমুখের রচনায় ব্যষ্টি-চেতনার খবরই সমধিক প্রবল, যা প্রসাদ, জৈনেন্দ্র, অজ্ঞেয় প্রমুখের লেখায় ধ্বনিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে অমরকান্ত, ভীষ্ম সাহনী (১৯১৫), অমৃত রায়, মোহন রাকেশ, কমলেশ্বর, ধর্মবীর ভারতী, রাজেন্দ্র যাদব, শিবপ্রসাদ সিংহ প্রমুখের অধিকাংশ গল্পে সমষ্টিচেতনার খবরই মুখ্য, যা প্রেমচাঁদ, যশপাল প্রমুখের ধারাবাহী। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। সংকেতাত্মক শৈলীতে গল্প রচনার কারণ— সম্ভবত জীবনের জটিলতার রূপায়ণে সংকেত বিশেষ সহায়ক। সংকেত শৈলীতে গল্পের স্বরূপ বহুলাংশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই সংকেতধর্মী গল্পের সংখ্যাই বেশি। বর্তমানে হিন্দী গল্পের ক্ষেত্রে সংকেত যেন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। রচনা প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও মূল্যবোধ— এই তিনেরই পারস্পরিক মিলন ঘটে যায় তাতে। গল্পের সংবেদনশীলতাকেও বাড়িয়ে দেয়। তাই সংগীতের ভাষাতেও গল্প বলার প্রবণতা লক্ষিত হয়। ফণীশ্বরনাথ রেণু তাঁর গল্পকে 'সংগীতধর্মী' বলেছেন। নির্মল বর্মা তাঁর গল্পকে 'পিয়ানো সংগীত' আখ্যা দিয়েছেন। উষা-প্রিয়ংবদার গল্পে 'সেতার' এবং অজ্ঞেয়ের কাহিনীতে 'গিটারে'র ঝংকার শোনা যেতে পারে বলে মনে করা হয়।

মোটামুটিভাবে বিষয় ও জীবনদৃষ্টির বিচারে সাম্প্রতিক কালের হিন্দী ছোটো কহানীকে তিন শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে।—এক শ্রেণীর

গল্পে গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ, সেই জীবনের ভেঙে-পড়া পুরানো মূল্যবোধ, পারিবারিক ও মানসিক মূল্যের পরিবর্তন, আধুনিকতার ধাক্কা খাওয়া ও তার প্রতিক্রিয়া—সততার সঙ্গে চিত্রিত। প্রাচীনতার প্রতি মোহ ও মোহভঙ্গজনিত ব্যর্থতা, প্রগতিশীলতার রোমান্টিক ভাবধারা প্রভৃতি সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে— শিবপ্রসাদের 'দাদীমা', মার্কণ্ডেয়ের 'গুলরা কে বাবা', ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'লালপান কী বেগম', 'তীসরী কসম' প্রভৃতি গল্পে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে ফের-বদল, উত্থান-পতন ঘটে তাতে মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাইরে তার প্রকাশ না ঘটলেও মানসিক দিকটি বেশ ক্ষত-বিক্ষত, ব্যথিত-মথিত। কোনো কোনো কহানীকার সেই ব্যথা-বেদনা-মথিত সমাজের সন্তান, তাই তাঁদের রচনায় মধ্যবিত্ত জীবনই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই জাতীয় রচনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে উল্লেখ করা যায়। মোহন রাকেশের 'মলওয়ে কা মালিক' ও 'আর্দ্রা'; ভীষ্ম সাহনীর 'অমৃতসর আ গয়া' ও 'চীফ্ কী দাওয়ত', বিষ্ণু প্রভাকরের 'মেরা ওয়তন', কমলেশ্বরের 'নিরবংশিয়া', 'দৈবা কী মা' ও 'খোঈ হুঈ দিশায়েঁ', রাজেন্দ্র যাদবের 'খেল খিলৌনে', 'জো আদমী কৈদ হৈঁ', 'পাসকেল টূটন', অমরকান্তের 'দোপহর কা ভোজন', 'ডিপটি কলেক্টরী', মার্কণ্ডেয়ের 'ভাঈ', নির্মল বর্মার 'লণ্ডন কী রাত', 'লীচিং' এবং 'কুত্তে কী মৌত' প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণীর।

আধুনিক নারীর মানসিকতা ও যৌন মূল্যবোধক গল্পগুলিকে পরবর্তী বা তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা যায়। পুরুষ গল্পকারদের মধ্যে রাজেন্দ্র যাদবের 'এক কমজোর কহানী' ও রঘুবীর সহায়ের 'মেরে ঔর নঙ্গী ঔরত কে বীচ' গল্পে নবনৈতিকতা ও পুরানো সম্বন্ধের অসারতা প্রদর্শিত। মহিলা গল্পকারদের মধ্যে মন্নূ ভাণ্ডারীর 'ঈসা কে ঘর ইন্‌সান', 'কীল ঔর কসক', 'য়হী সচ হৈ', বিজয়া চৌহানের (১৯৩০) 'ঋণু মিরাসী' ও 'এক বুৎ-শিকন কা জন্ম', উষা-প্রিয়ংবদার—

'মোহভঙ্গ', 'ছুট্টী কা দিন', 'ওয়াপসী', 'জিন্দগী' ও 'গুলাব কা ফূল' প্রভৃতি গল্পে নারীহৃদয়ের হাহাকার ও বিষবাষ্প, যেমন আছে তেমনি বন্ধন-মুক্তির প্রয়াসও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র যাদবের 'ছোটে ছোটে তাজমহল' (১৯৬১) এবং মন্নু ভাণ্ডারীর 'মৈ হার গঈ' (১৯৫৯)— কহানী-সংগ্রহ দুইটি উল্লেখযোগ্য।

আরও পরবর্তীকালে অর্থাৎ সাতের ও আটের দশকে অভিনব রূপ, রং, বর্ণ-গন্ধ নিয়ে অস্থির অবস্থার যে কহানী বা গল্প নানা নাম ও মতবাদের আশ্রয়ে রচিত হয়েছে— তার মধ্যে বিদ্রোহ, মূল্যহীনতা, অনাস্থা, নিরাশা, ব্যর্থতা, আত্মনির্বাসন প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। এই শ্রেণীর কহানীকারদের মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ বিমল (১৯৩৯), রবীন্দ্র-কালিয়া, পরেশ, মহেন্দ্র ভল্লা, গিরিরাজ কিশোর (১৯৩৭), মণিমধুকর, সোনাবীরা প্রভৃতির রচনা উল্লেখযোগ্য। কালিয়ার 'নৌসাল ছোটী পত্নী', 'ভরী হুঈ ঔরত', 'এক প্রামাণিক ঝূঠ', সড়ক পর অঁধেরা থা', 'শীর্ষকহীন কহানী' এবং দূধনাথ সিংহের 'সুখান্ত' প্রভৃতি গল্পে সমসাময়িক জীবন চিত্রিত। কাশীনাথ সিংহ ও রাজকমল চৌধুরীর কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অবশেষে প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীন মূল্যবোধের জন্য কোনো মোহ আর লক্ষিত হয় না হিন্দী ছোটো গল্পে। কোনো আক্ষেপও ধ্বনিত হয় না। সমকালীন বাস্তবতা ও পশ্চিমী পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার সুফল-কুফল-আশ্রিত গল্প লিখেছেন জ্ঞানরঞ্জন, কামতানাথ, ইসরাইল, ইব্রাহিম শরীফ প্রমুখ। জ্ঞানরঞ্জনের 'ঘণ্টা' ও 'পিতা' কামতানাথের 'পহাড়' ও 'পূর্বার্ধ' প্রভৃতি গল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গ্লানি অভিনব স্বাদ নিয়ে উপস্থিত।

সাম্প্রতিক হিন্দী ছোটো গল্পের মধ্যে স্বদেশী ও বিদেশী— নানা স্বর ও সুর ধ্বনিত হয়ে— বিশ্ব-অনুভূতির কম্পন সৃজনের দিকে তার প্রবণতা লক্ষিত হয়। ভাষা, ভাব, আকার-প্রকার সব কিছুর গ্রহণ ও রূপায়ণে সে দ্বিধামুক্ত— উদারমনা। তার এই প্রবণতা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক।

যুগপৎ একদিকে প্রাচীন মূল্যবোধের প্রতি ঈর্ষালু দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি এবং অন্যদিকে সমসাময়িক যুগের অক্টোপাসিক চাপের প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে হিন্দী ছোটো গল্পের নানা রূপ সামনে এসে গেছে। গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছোটো গল্পে সামাজিকতা প্রাধান্য পেলেও যুগের যন্ত্রণাও তাতে প্রতিফলিত। এক্ষেত্রে হিন্দী কহানীর ভাষা যে কি অদ্ভুত এবং অপূর্বভাবে বিবর্তিত হয়েছে— তা একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কোনো কোনো গল্পকারের ভাষার সংযমই সর্বপ্রথম চোখে পড়ে। কমলেশ্বরের 'দৈবা কী মাঁ' 'রাজা নিরবংশিয়া' ও 'নীলী ঝীল'—প্রভৃতি গল্পের ভাষা এই জাতীয়। এক্ষেত্রে ভাষাই গল্প এবং গল্পই যেন ভাষা হয়ে উঠেছে। ছোটো গল্পের রূপ ও ভাষা কবিতার মতো হয়ে উঠেছে এমনও দেখা যায়। নরেশ মেহতা রঘুবীর সহায় সর্বেশ্বর দয়াল সক্সেনা ধর্মবীর ভারতীর ছোটো গল্পে মাঝে মাঝে এই বিশিষ্টতাও ফুটে ওঠে। মনে হয় এসব গল্পে কবিতাই বুঝি মুখ্য হয়ে পড়েছে। নরেশ মেহতার 'তথাপি', 'নিশানী' প্রভৃতি এই জাতীয় গল্প। তবে ধর্মবীর ভারতী গল্পকে কবিতা থেকে দূরে রাখার পক্ষপাতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'গুল কী বন্নো', 'সাবিত্রী নং দো' ও 'বন্দগলী কা আখিরী মকান' প্রভৃতি রচনায় সে প্রয়াস সুস্পষ্ট।

সাম্প্রতিক মহিলা গল্পকারদের মধ্যে উষা-প্রিয়ংবদার আধুনিকতার বোধ ও ভাষার সংযম লক্ষণীয়। আধুনিকতার বোধে উদ্দীপ্ত—মমতা কালিয়া, সুধা অরোড়া, নিরুপমা সেবতী, মণিকা মোহিনী, অচলা শর্মা, লীলা রোহেকার, বর্তিকা অগ্রওয়াল ও দীপ্তি খণ্ডেলওয়াল— প্রভৃতির ছোটো গল্প নতুন আস্বাদন এনে দিয়েছে। সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আবার ইব্রাহিম শরীফ, বিশ্বেশ্বর সিদ্ধেশ, প্রকাশ বাথম, হৃষীকেশ, সুদর্শন নারঙ্গ, জীতেন্দ্র ভাটিয়া প্রমুখের নামও হিন্দী ছোটো কহানীকাররূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রচলিত মূল্যবোধ ও আধুনিকতার প্রতি সজাগ। তবে সাধারণভাবে বলা যায় সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য

স্তরের ও বিভিন্ন স্থলের মানুষের মতো— সাহিত্যিকসমাজও, বিশেষ করে হিন্দী সাহিত্যের ছোটো-গল্পকারগণ, মনে করেন—তাঁরা কোনো বিধি-বিধান, প্রণালী বা পদ্ধতি এবং সংস্কার বা ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ নন। সর্বত্র সব রকমের শিষ্টাচার লঙ্ঘন, সত্যকে তিরস্কৃত ও মিথ্যাকে পুরস্কৃত করার মধ্যেই তাঁদের চরম্ প্রাপ্তি ও পরম তৃপ্তি নিহিত।

এই চরম বিপর্যয়মুখী রচনার জন্য অনুরূপ ভাষার সৃজন, সন্ধান ও প্রয়োগ করতে হয়েছে। যদি আত্যন্তিক আধুনিকতাবাদী ছোটো গল্পের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়— তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে ভাষা সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং 'শান্তম্'-'শিবম্'-'সুন্দরমে'র সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ভ্রষ্ট হয়ে কিম্ভূতকিমাকার রূপ লাভ করেছে। এ যেন বস্তুহীনতা ও ভাবহীনতাকে আবৃত করার জন্য পরতের পর পরত ভাষা সাজিয়ে আত্মরতিতে মগ্নতার অভিশপ্ত অবস্থা। ভাষার এই কারিকুরি সত্যের উদ্‌ঘাটন বা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং সত্যকে অর্ধসত্য বা মিথ্যা এবং মিথ্যাকে অর্ধসত্য বা সত্যরূপে প্রদর্শন করার একটি অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত।— এটাই বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো।

বর্তমান শতাব্দীর সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে এমন একটি বিঘটনমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ্যতা, অশালীনতা ও শৃঙ্খলাহীনতার উত্তেজক প্রবৃত্তির চরম রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের বুদ্ধি-আশ্রিত রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিল। এই আন্দোলনই ভাষার সমস্ত শৃঙ্খলা ও শ্রেয়োবোধকে বিপর্যস্ত করে তার পরিবর্তন সাধন করল। ভাষাতে এইভাবে কাট-খোট্টা-অমসৃণ, তীক্ষ্ণ, বাস্তবধর্মী ও নিঃশঙ্ক রূপ-দানের শক্তির উৎস বা পরম সমর্থকরূপে ড. রামমনোহর লোহিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭] যাই হোক, আজ হিন্দী ছোটো গল্প বা কহানীর ভাষা এরকমই। কিন্তু ভাষা যেমন স্বয়ংভূ নয়, তেমনি এক জনের এক দিনের প্রয়াসেও তার সৃজন বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। তার

জন্য চাই বহুজনের বহুদিন ধরে সমবেত প্রয়াস। সৃষ্টির আন্তরিক ব্যাকুলতা ও বিবশতাই ভাষাকে তার অনুরূপ রচনাত্মক স্তর ও সাহিত্যিক মান দান করে। উপযোগী (না, তুরুপযোগী ?) পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই তরুণ ছোটোগল্পকারগণ হিন্দী ভাষাকে নিজ-নিজ মনোস্থিতি প্রকাশের মাধ্যমরূপে গড়ে নিয়েছেন। সে যাই হোক, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাম্প্রতিক কালের হিন্দী ছোটো গল্পের ভাষা— যুগধর্ম, যুগের চাহিদা ও অবক্ষয়ী যুগমানসিকতার ছাপ বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, পঞ্চম দশক পর্যন্ত হিন্দী ছোটো গল্পের রূপ ও রীতি অনেকটা সুস্থির ছিল। জৈনেন্দ্র ও অজ্ঞেয় হিন্দী ছোটো গল্পে অভিনবতা সংযোজন করেন। কথাবস্তু ও চরিত্র-সৃজনে পরিবর্তন এলেও কাহিনী উপস্থাপনার পদ্ধতির চল তখনও ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ছোটো গল্পের রূপ ও আকৃতি বিষয়ক সমস্ত সংস্কারই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাই ক্রমে ক্রমে নিবন্ধ, রেখাচিত্র, রিপোর্তাজ, সংস্মরণ (বা স্মৃতিচারণ), ডায়েরী প্রভৃতির ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ ঘটে যায় ছোটো গল্পের রাজ্যে।[৮] হিন্দী কবিতা ও প্রবন্ধ শাখার মতোই হিন্দী ছোটো গল্পের প্রয়োগ বিচিত্র ও পরিধির সীমাও বেড়ে গেছে অনেকখানি।

সুতরাং ভাষা, রূপবৈচিত্র্য, ব্যঞ্জনাময়তা ও আস্বাদময়তার বিচারে আজ হিন্দী ছোটো গল্প কতদূর প্রাগ্রসর তা সহজেই অনুমেয়। দেখা যাচ্ছে, বাংলা ছোটো গল্পের তুলনায় বয়সে নবীন হয়েও হিন্দী ছোটো গল্প বিষয়, আকৃতি, ভাষা ও স্বাদে যেন বাংলা ছোটো গল্পকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে হিন্দী সাহিত্যের পঁচিশটি শ্রেষ্ঠগল্পের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটলে। সে গল্পগুলিকে এইভাবে চয়ন করা যেতে পারে— 'উসনে কহা থা' (চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী); 'পঞ্চপরমেশ্বর', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', 'কফন' (প্রেমচাঁদ); 'পুরস্কার', 'আকাশদীপ' (জয়শঙ্কর প্রসাদ);

'পত্নী' (জৈনেন্দ্রকুমার) ; 'পরদা' (যশপাল) ; 'রোজ' (অজ্ঞেয়) ; 'গদল' (রাঁগেয় রাঘব) ; 'পরমাত্মা কা কুত্তা', 'মলওয়ে কা মালিক' (মোহন রাকেশ) ; 'তীসরী কসম' (ফণীশ্বরনাথ রেণু) ; 'পক্ষী ঔর দীমক' (মুক্তিবোধ) ; 'পরিন্দে', 'লন্দন কী রাত' (নির্মল বর্মা) ; 'চাচা মঙ্গলসেন' (ভীষ্ম সাহানী) ; 'বহির্গমন' (জ্ঞানরঞ্জন) ; 'জিন্দগী ঔর জোঁক', 'দোপহর কা ভোজন' (অমরকান্ত) ; 'য়হী সচ হৈ' (মন্নু ভাণ্ডারী) ; 'বীচ কে লোগ' (মার্কণ্ডেয়) ; 'সেঠ বাঁকেমল' (অমৃতলাল নাগর) ; 'রীছ' (দূধনাথ সিংহ) ও 'সুধীর ঘোষাল' (কাশীনাথ সিংহ)।

দেখা যাচ্ছে— প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে হিন্দী কহানী রূপ, শিল্প, বক্তব্য ও ভঙ্গির বিচারে বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে, বহু আন্দোলন, প্রয়োগ-পরীক্ষা এবং বাদ-প্রতিবাদের কল্যাণে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির স্মারক হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক পরিবেশ, প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কহানীর ঐতিহ্য ও সংস্কারের সংশোধন ও পরিবর্ধন করেছেন সমকালীন হিন্দী কথাশিল্পী সম্প্রদায়। তাই আজ হিন্দী ছোটো গল্পের এত বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি।

উল্লেখপঞ্জী

১. বাংলা থেকে হিন্দীতে অনুবাদের মুখ্য কারণ— হিন্দীর উপন্যাস ভাণ্ডারের রিক্ততার পূর্তি। তাই বলা হয়েছে— 'রিক্তহস্তা হিন্দী নে বঙ্গলা কে সদ্যঃ পূর্ণ ভাণ্ডার সে কেবল 'উপন্যাস' শব্দহী গ্রহণ নহীঁ কিয়া, উসকা বহুত-সা উপকরণ ভী ইস লঘীয়সী কো উস মহীয়সী সে মিলা।'

—হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস খণ্ড-১২, পৃ. ১৪৭

২. এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) 'কাঞ্চনমালা' (১৮৮২) ও 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯)—নামক বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতি আশ্রিত উপন্যাস দুইখানির কথা স্মরণীয়।

৩. দ্রষ্টব্য. 'সমালোচক' পত্রিকা (হিন্দী, আগরা)—যথার্থবাদ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

৪. দ্রষ্টব্য. হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস (দ্বাদশ খণ্ড, না. প্র. স., কাশী) পৃ. ১৫২

৫. দ্রষ্টব্য— ড. ধনঞ্জয়ের এই বিষয়ের আলোচনা— 'সারিকা' পত্রিকা, মে. ১৯৬৮, পৃ. ৫ এবং কমলকিশোর গোয়েনকার প্রবন্ধ 'হিন্দী কী পহলী কহানী', 'মধুমতী' (পত্রিকা, রাজস্থান সাহিত্য অকাদমী), নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃ. ১১৯-১২৯।

হিন্দীর প্রারম্ভিক পর্বের উল্লেখযোগ্য প্রথম পনেরোটি গল্পের তালিকা এইভাবে সাজানো যেতে পারে—

১. 'রানী কেতকী কী কহানী'—মুন্সী ইন্সাআল্লা খাঁ, ১৮০৩-০৮
২. 'রাজা ভোজকা সপনা'—রাজা শিবপ্রসাদ, ১৮৫০-এর পর রচিত
৩. 'জমীন্দার কা দৃষ্টান্ত'—রেভরেণ্ড. জে. নিউটন, ১৮৭১
৪. 'প্রণয়িনী-পরিণয়'—কিশোরীলাল গোস্বামী, ১৮৮৭
৫. 'ইন্দুমতী' পূর্ববৎ, ১৯০০
৬. 'মন কী চঞ্চলতা'—মাধবপ্রসাদ মিশ্র, ১৯০০
৭. 'এক টোকরী ভর মিট্টী'—মাধবরাও সপ্রে, ১৯০১

৮. 'গুলবহার'— কিশোরীলাল গোস্বামী, ১৯০২
৯. 'প্লেগ কী চুড়ৈল'—মাস্টর ভগবান দাস, ১৯০২
১০. 'গ্যাবহবর্ধ কা সময়'—রামচন্দ্র শুক্ল, ১৯০৩
১১. 'পণ্ডিত ঔর পণ্ডিতানী'—গিরিজাদত্ত বাজপেয়ী, ১৯০৩
১২. 'দুলাঈওয়ালী'—'বঙ্গমহিলা' (রাজেন্দ্রবালা ঘোষ), ১৯০৭
১৩. 'গ্রাম'—জয়শঙ্কর প্রসাদ, ১৯১১
১৪. 'উসনে কহা থা'—চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী, ১৯১৫
১৫. 'পঞ্চ পরমেশ্বর'—প্রেমচাঁদ, ১৯১৬

৬. দ্রষ্টব্য—লেখকের 'মৌলিক হিন্দী ছোটো গল্প ও বঙ্গমহিলা' প্রবন্ধ—যুগান্তর পত্রিকা, রবিবার ১ এপ্রিল, ১৯৭৯
৭. দ্রষ্টব্য—বচ্চনসিংহ কৃত 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (১৯৭৮), পৃ. ৪০৯
৮. পূর্ববৎ

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাটক

নাটক রচনার প্রাচীন সংস্কার থাকা সত্ত্বেও হিন্দীতে নাটক রচনার সূচনা ঘটে বহু বিলম্বে। হিন্দী খড়ীবোলীর উদয়কালে দেশে রাজনৈতিক অশান্তি এবং মুসলমান শাসনে মূর্তিপূজা-বিরোধী মনোভাব থাকায় নাটক রচনা ও অভিনয়ের তেমন সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া হিন্দীগদ্য তখনও সুস্পষ্ট ও দৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করেনি। সর্বোপরি মানুষের জীবন ছিল উৎসাহ-উদ্যমহীন, আকর্ষণ ও প্রত্যাশা-শূন্য। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই নাটক ও নাট্যধর্মী কোনো কিছুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি যায় নি। তাই নাটক রচনার প্রারম্ভ ঘটে দেরিতে। ইংরেজ রাজত্বে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হল কিন্তু তা ছিল উর্দুভাষীদের অধিকারে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের অভিরুচি ও খেয়াল-খুশিমতো নাটক রচনা ও তার অভিনয় সম্পন্ন হয়েছে তাদের জন্যই। তবু ধীরে ধীরে নাট্য-অভিনয় দর্শনের প্রতি সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট হতে থাকে। পরে দেশে রাষ্ট্রীয় জাগরণের ফলে দেশব্যাপী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় হিন্দীর প্রতি। তার ফলেই হিন্দীতে নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে। এই প্রসঙ্গে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের মহৎ প্রয়াস ও কৃতিত্বের কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। একথাও বলছি যে, ভারতেন্দুর প্রয়াস সত্ত্বেও হিন্দীতে মৌলিক নাটক রচনার তেমন উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হতে পারেনি। অনুবাদের ক্রমই বজায় ছিল।

ভারতেন্দুর নাটকে কয়েকটি শ্রেণী লক্ষিত হয়— যথার্থবাদী, স্বচ্ছন্দতাবাদী, আদর্শবাদী, জাতীয়তাবাদী ও সমাজসংস্কারমূলক প্রহসন। পরবর্তীকালে ভারতেন্দুর সমসাময়িক এবং উত্তরকালীন নাট্যকারগণ এই সব-কয়টি ধারাকেই সমৃদ্ধ ও গতিশীল করতে চেষ্টিত

হয়েছেন। তাঁরা আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী রাজনৈতিক, পৌরাণিক, ধার্মিক ও কল্পিত কাহিনী অবলম্বন করেন। বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও করুণ রসের নাটক লেখার প্রয়াস দেখা দেয়। তথাকথিত দুঃখান্ত নাটকের অভাব আর রইল না। কারণ অনেকগুলিও দুঃখান্ত নাটক লেখা হল। দেশপ্রেম-আশ্রিত নাটকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। হাস্য-রসাত্মক নাটক লেখার ঝোঁক বেড়ে গেল। সামাজিক নাটকে বিবাহ-জনিত সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করে। প্রেমের বিবিধ অবস্থা এবং প্রেমতত্ত্ব-নিরূপণের বিশদ বিবেচনা এ-যুগের একটি লক্ষণীয় প্রবণতা। আদর্শবাদী নাটকেরই দুইটি ধারা— পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। প্রথম দিকে পৌরাণিক ধারাই ছিল প্রবল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐতি-হাসিক ধারা প্রাধান্য লাভ করে। আদর্শবাদী পৌরাণিক নাটকরূপে দেবকীনন্দনের 'সীতাহরণ' (১৮৭৬) ও 'রামলীলা' (১৮৭৯), চন্দ্র-শরণের 'উষাহরণ' (১৮৮৭), শ্রীনিবাস দাস কৃত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৮), বিন্ধ্যেশ্বরপ্রসাদ ত্রিপাঠী রচিত 'মিথিলেশকুমারী' (১৮৮৯), শালিগ্রাম বৈশ্য কৃত 'মোরধ্বজ' (১৮৯০) ও 'অভিমন্যু' (১৮৯৬), কার্তিকপ্রসাদ বর্মার 'উষাহরণ' (১৮৯১), অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় কৃত 'প্রদ্যুম্নবিজয়' (১৮৯৩), বালকৃষ্ণ ভট্টের 'দময়ন্তী স্বয়ংবর' (১৮৯৫), জগন্নাথশরণ বিরচিত 'প্রহ্লাদ-চরিতামৃত' (১৯০০), দেবরাজের 'সাবিত্রী' (১৯০০), কবি অনূপ কৃত 'লঙ্কা বিজয়' (১৯০০) এবং রাম-নাথের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৯০০) প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐতিহাসিক নাটকরূপে 'পদ্মাবতী' (১৮৮২), 'শ্রীহর্ষ' (১৮৮৪), 'মহারাণা প্রতাপ' (১৮৯৭), রামনরেশ শর্মার 'সিংহল বিজয়' (১৮৯৭) ; শ্রীনিবাস দাসের 'সংযোগিতা-স্বয়ংবর' (১৮৮৬) ও রাধাচরণ গোস্বামীর 'অমরসিংহ রাঠোর' (১৮৯৫) প্রভৃতির কথা স্মরণীয়।

সমস্যা প্রধান নাটকে বাল্য-বিবাহ ও সাধু-প্রবঞ্চনার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই জাতীয় নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— শরণ কৃত 'বাল-বিবাহ' (১৮৭৪),

'দুঃখিনীবালা' (১৮৮০), দেবকীনন্দন ত্রিপাঠীর 'বাল-বিবাহ' (১৮৮১), 'বিবাহিত বিলাপ' (১৮৮৩), 'বিবাহ বিড়ম্বন' (১৮৮৪), 'বাল্য-বিবাহ' (১৮৮৪), 'অবলা-বিলাপ' (১৮৮৪), 'বালবিবাহ-দূষক' (১৮৮৫), 'বৃদ্ধাবস্থা বিবাহ' (১৮৮৮) এবং ছুট্টনলাল স্বামী কৃত 'বালবিবাহ' (১৮৯৮) প্রভৃতি।

ঊনবিংশ শতকের হিন্দী নাটকের সর্বপ্রধান প্রবণতা লক্ষিত হয় প্রহসন রচনায়। ভারতেন্দুর তিনটি প্রহসন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রহসনের লক্ষ্য মুখ্যত সমাজসংস্কার। ঊনবিংশ শতকের লেখকদের প্রাণময়তার ফলে, প্রহসন বেশ বলিষ্ঠ রূপ নেয়। নাট্যকারগণ প্রহসন রচয়িতারূপেই রেশি সাফল্য লাভ করেছেন। এ-যুগের প্রহসন-কারদের মধ্যে দেবকীনন্দন ত্রিপাঠী এবং পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবকীনন্দন ১৮৭০ সাল থেকেই প্রহসন রচনা শুরু করেন। দেবকীনন্দন ত্রিপাঠীর 'রক্ষা-বন্ধন' 'জয় নারসিংহ কী' (১৮৭৬), 'কলিযুগী জনেউ' (১৮৮৬) ও 'কলিযুগী বিবাহ' (১৮৯৮); বালকৃষ্ণ ভট্টের 'জৈসা কাম ওয়ৈসা দুষ্পরিণাম' (১৮৭৭), প্রতাপনারায়ণ মিশ্রের 'কলি-কৌতুক' (১৮৮৬); রাধাচরণ গোস্বামীর 'বূঢ়ে মুঁহ মুঁহাসে' (১৮৮৮) প্রভৃতি প্রহসন সার্থক কৃতি-রূপে গণ্য। অনুরূপ আরও কয়েকটি হাস্যরসাত্মক প্রহসন হল—'ঠগী কী চপেট' (১৮৮৪), 'হাস্যার্ণব' (১৮৮৫), 'অপূর্ব রহস্য' (১৮৮৮), 'তন-মন-ধন গোঁসাঈজী কে অর্পণ' (১৮৯০), 'চৌপট চপেট' (১৮৯১), 'ভঙ্গতরঙ্গ' (১৮৯২), 'দাদা ঔর মৈঁ' (১৮৯৩), 'অতি অঁধের নগরী' (১৮৯৫) ও 'দেসী কুত্তা বিলায়তী বোল' (১৮৯৮)। বলাই বাহুল্য ভারতেন্দু ও তাঁর অনুগামী প্রহসনকারদের রচনায় মধুসূদনের প্রহসনের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। রাধাচরণের 'বূঢ়ে মুঁহ মুঁহাসে'-তে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির ছাপ থাকা স্বাভাবিক।

ভারতেন্দুর 'চন্দ্রাবলী'-নাটকে রোমান্টিক প্রেমের সন্ধান খুঁজে পাওয়া গেলেও সেটি আসলে 'ভক্তিমূলক' রচনা। কেশবরাম ভট্টের

'সম্পাদ-সুম্বুল' (১৮৭৭) সম্ভবত প্রথম হিন্দী নাটক যাতে যথার্থবাদ ও রোমান্টিকতার সহাবস্থান ঘটেছে। তবে যথার্থবাদী নাটকরূপেই এটি গণ্য। রাধাকৃষ্ণ দাসের 'দুঃখিনীবালা' (১৮৮০), শ্রীনিবাস দাসের 'রণধীর প্রেম মোহিনী' (১৮৮০) ও 'তপ্তসংবরণ' (১৮৮৩), অম্বিকাদত্ত ব্যাসের 'ললিতা' (১৮৮৪), অমলসিংহ গোতিয়া রচিত 'মদনমঞ্জরী' (১৮৮৪), বিশ্বেশ্বরনাথ পাঠক কৃত 'লবঙ্গলতা' (১৮৮৫), কৃষ্ণদেব সিংহের 'মাধুরী' (১৮৮৮), দামোদর সিংহ রচিত 'মদনলেখা' (১৮৯০), কিশোরীলাল গোস্বামীর 'ময়ঙ্ক মঞ্জরী' (১৮৯১), শালিগ্রাম বৈশ্য কৃত 'লাবণ্যবতী-সুদর্শন' (১৮৯২), রামানন্দ সিংহের 'কুবলয়মালা' ও ব্রজ-প্রসাদ রচিত 'মালতী-বসন্ত' (১৮৯০)— এই শ্রেণীর কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য নাট্যকৃতি।

ঐতিহাসিক নাটকরূপে রামনরেশ শর্মা কৃত 'সিংহলবিজয়' (১৮৯৬) ও রাধাকৃষ্ণ দাসের 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' (১৮৯৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' নাটকটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে ও বহুদিন ধরে সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়। আজও তার লোকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে বলা যায়। এই ঐতিহাসিক নাটকের শৈলী পরবর্তীকালে জয়শঙ্কর প্রসাদের হাতে নতুন রূপ পেয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাঁর হাতেই ধারাটি বিকশিত ও পরিণত হয়ে উঠতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় ভাবনামূলক 'প্রেমযোগিনী' ও 'ভারতদুর্দশা' নাটক রচনা করে ভারতেন্দু যে ধারার প্রচলন করলেন—সেই ধারাটিও গতিবেগ লাভ করে। অম্বিকাপ্রসাদ ব্যাসের 'গো-সংকট' ও 'ভারতসৌভাগ্য' (১৮৮৭), খড়্গবাহাদুর মল্ল রচিত 'ভারতললনা' (১৮৮৮), জগৎ-নারায়ণ শর্মা কৃত 'ভারতদুর্দিন' (১৮৮৯), বদ্রী নারায়ণ চৌধুরী রচিত 'ভারতসৌভাগ্য' (১৮৮৯), দুর্গাদত্ত কৃত 'বর্তমান দশা' (১৮৯০), গোপালদাস গহমরী রচিত 'দেশ দশা' (১৮৯২) প্রভৃতি নাটকে জন-চিত্তকে সামাজিক সমস্যার দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস রয়েছে। রাষ্ট্র-

চেতনা ও আত্মগৌরববোধের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের স্ফুরণই এ-জাতীয় নাটকের লক্ষ্য ছিল।

ভারতেন্দু বিভিন্ন ভাষা থেকে বিশেষ করে বাংলা থেকে নাটক অনুবাদের যে ধারা প্রচলন করলেন তাও অব্যাহত থাকে।

বাংলা থেকে অনুবাদ : রামকৃষ্ণ বর্মা দ্বারকানাথ গংগোপাধ্যায়ের 'বীরনারী' (১৮৭৪) এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'পদ্মাবতী' নাটক অনুবাদ করেন। প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুবাদ করেন পণ্ডিত ব্রজনাথ— 'ক্যা ইসীকো সভ্যতা কহতে হৈঁ' নামে। মুন্সী উদিত নারায়ণলাল মনোমোহন বসুর 'সতী' তথা 'দীপ নির্বাণ' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' অনুবাদ করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাবুগোপাল রায় 'বনবীর', 'বভ্রুবাহন' (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ), 'দেশ-দশা' (হরিমোহন ভট্টাচার্যের 'দেশের গতিক', ১৮৭৪) এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অনুবাদ করেন। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পতিব্রতা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'মেবার পতন', 'সাহজহাঁ', 'দুর্গাদাস' এবং 'তারা-বাঈ' সহ বহু নাটক অনুবাদ করেন। ভাষা ও ভাবের বিচারে এই অনুবাদগুলি বেশ উঁচু মানের, রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'ও তিনি অনুবাদ করেন। আলোচ্য যুগে হিন্দীতে যে-সব নানা স্তরের নাটক লেখা হয়েছে, সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮, কালিপ্রসন্ন সিংহ), 'বাল্যবিবাহ' (১৮৬০, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়), 'সীতার বনবাস' (১৮৬৫, উমেশচন্দ্র মিত্র), 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫, রামনারায়ণ তর্করত্ন), 'সংযুক্তা স্বয়ংবর' (১৮৬৭, প্রাণনাথ দত্ত), 'দেশাচার' (১৮৭২, অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়), 'ভারত-মাতা' (১৮৭৩, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ভারত-বিলাপ' (১৮৭৫, বামাচরণ চক্রবর্তী), 'এই কলিকাল' (১৮৭৫, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়), 'ভারত-বিজয়' (১৮৭৫, রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী), 'ভারতের সুখস্বপ্ন' (১৮৭৫, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী), 'ভারতী

দুঃখিনী' (১৮৭৫, হারাণচন্দ্র ঘোষ), 'ভারত বন্দিনী' (১৮৭৬, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা), 'সাবিত্রী সত্যবান' ও 'হরিশ্চন্দ্র' (দুই-ই ১৮৭৮, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)—প্রভৃতি নাট্যকৃতির কথা স্মরণীয়।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ : জয়পুরের গোপীনাথ পুরোহিত ১৮৯০ সনে শেক্‌সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' ('প্রেমলীলা'), 'অ্যাজ্‌ য়ু লাইক ইট' ও 'ভেনিস কা বৈপারী' অনুবাদ করেন। মথুরাপ্রসাদ চৌধুরী 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেন। এটিকে সার্থক অনুবাদের মর্যাদা দেওয়া যায়। অতঃপর তিনি 'হ্যামলেট' অনুবাদ করেন 'জয়ন্ত' নামে। এটি হ্যামলেটের মারাঠী অনুবাদের সাহায্য-পুষ্ট বলে মনে করা হয়।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ : এক্ষেত্রে রায়বাহাদুরলাল সীতারামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই তিনি সংস্কৃত থেকে নাটক অনুবাদে ব্রতী হন। ১৮৮৩তে 'মেঘদূত', ১৮৮৭তে 'নাগানন্দ' এবং পরে 'মৃচ্ছকটিক', 'মহাবীর চরিত', 'উত্তর-রামচরিত', 'মালতী মাধব' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' প্রভৃতির অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের ভাষা সহজ ও সুবোধ্য। পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র 'বেণী-সংহার' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অনুবাদ করেন। ভারতেন্দুর 'রত্নাবলী'র আরব্ধ অনুবাদকার্য সমাধা করেন— বালমুকুন্দ গুপ্ত। সত্যনারায়ণ 'কবিরত্ন', 'উত্তররামচরিত' এবং 'মালতীমাধব'— অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ ভালো হলেও ভাষা মাঝে মাঝে বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে।

পরবর্তীকালে অনুবাদের ধারা তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ হয়ে এলেও অনুবাদ বন্ধ হয় নি। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' (সত্যজীবন বর্মা), 'পঞ্চরাত্র', 'মধ্যম ব্যায়োগ', 'প্রতিজ্ঞায়োগন্ধরায়ণ' (ব্রজজীবন দাস), 'প্রতিমা' (বলদেব শাস্ত্রী) ও দিঙ্‌নাগ কৃত 'কুন্দমালা' (বাগীশ্বর বিদ্যালঙ্কার) প্রভৃতিও অনূদিত হয়। জার্মান কবি গ্যেটের 'ফাউস্ত'-এর অনুবাদ করেন ভোলানাথ শর্মা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল— অন্যভাষা থেকে যেমন নাটক অনূদিত হয়েছে, তেমনি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য ভাষার উপন্যাস জাতীয় বা অন্যবিধ কাহিনীরও হিন্দী নাটকে রূপ দান করা হয়েছে। তার ফলে মৌলিক নাটক রচনার দিকেও প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বাংলা থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে কেউ কেউ যেমন মূল নাটকের ভাবকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি কেশবরাম ভট্ট ও ব্রজনাথ প্রমুখ কয়েকজন অনুবাদে নিজ নিজ কল্পনাশক্তিরও সাহায্য নিয়েছেন। ফলে নাটকের মূল ভাবটি আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

এইভাবে নানা ভাষা থেকে অনুবাদের মাধ্যমে হিন্দী মৌলিক নাটক রচনার প্রেরণা ও উৎসাহ দেখা দেয়। অনুবাদক এবং অন্য লেখকদেরও কেউ কেউ মৌলিক নাট্যরচনায় হাত দেন। সে প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

মৌলিক হিন্দী নাটকের রূপ যেমন বিচিত্র, বিষয়ও তেমনি নানা-প্রকার। জ্বালাপ্রসাদ মিশ্রের (১৮৬২-১৯১৬) 'সীতা বনবাস' (১৮৯৫) নাটকটি বিষয় ও উপাদানের বিচারে বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের উপর আধৃত। বলদেবপ্রসাদ মিশ্র 'প্রভাস মিলন' (সম্ভবত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রভাস মিলন', ১৮৭০) নাটকের অনুবাদ।) 'মীরাবাঈ' (১৯১৮) ও 'লল্লাবাবু'— নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। বলাই বাহুল্য প্রথমটি পৌরাণিক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক ও তৃতীয়টি প্রহসন। তিনটিতেই লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। তাঁর 'অসত্য সংকল্প' (১৯২৫) ও 'বাসনা বৈভব' (১৯২৫) নাটক দুইটিও উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল— শিবনন্দন সহায়ের (১৮৬০-১৯৩২) 'সুদামা নাটক'। দেবীপ্রসাদ রায় রচিত 'চন্দ্রকলা-ভানুকুমার' কল্পিত ভাববস্তুভিত্তিক নাট্যকৃতি। তবে মধ্যযুগের ইতিহাসের আলতো স্পর্শ এতে অনুভূত হয়। নাটকটি পুরোপুরি সাহিত্যিক বা পাঠ্য, অভিনেয় নয়। ললিত ও অলংকৃত ভাষার

দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে মধ্যে সুমধুর সংগীত মূর্ছনায় নাটকটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য পর্বে হিন্দী নাটকের প্রবৃত্তির দুইটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যতই নাটক অগ্রসর হয়েছে ততই তা দেবতা, রাক্ষস, গন্ধর্ব-কিন্নর প্রভৃতি অমানুষিক পাত্র-পাত্রীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে। দৈবী-লীলা ও অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য ক্রিয়া-কলাপ ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধি ও তার ভাবের চমৎকারিত্বের দ্বারা তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছে। নাটকের বিষয় মনুষ্যজীবনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে লেগেছে। দ্বিতীয় লক্ষণীয় দিক হল— পদ্যের স্থান গদ্য অধিকার করতে শুরু করেছে। পদ্য সাধারণ জীবনের ভাষা বলে গণ্য হত না। এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের অনুবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার ও পথনির্দেশ করেছে। এই নাটকগুলির অনুবাদ পণ্ডিত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় (১৮৮৪-১৯৫৮) বেশ সফলতাপূর্বক করেছেন সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমদিকে হিন্দী নাটক লেখা হত ব্রজভাষায়। পরে তা খড়ীবোলীতে রচিত হতে লাগল কিন্তু তার কবিতাংশ বা গীতের ভাষা ব্রজভাষাই থাকল। অবশ্য বর্তমানে গদ্যেরই প্রাধান্য। কবিতা এবং গীতও আজ-কাল খড়ীবোলীতেই লেখা হচ্ছে। কারণ সৌকর্যের দৃষ্টিতে গদ্য ও পদ্যের ভাষা এক হওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দী নাটকের যে গতি-প্রকৃতি ও প্রগতি লক্ষিত হয় পরবর্তীকালে তা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে— সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে সাহিত্যের অন্য শাখার তুলনায় তখনকার নাটক যেন দুর্বল ও নিষ্প্রভ। ভারতেন্দুযুগে বিবিধ ও বিচিত্র প্রকারের অসংখ্য নাটক লেখা হয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিবেদী যুগে (১৯০০-১৯১৮) নাটক রচনা পরিমাণে কমে এসেছে, কারণ, এ-যুগে নাটক-রচনার উৎসাহ ও উদ্যম স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই নাট্যকার রামকৃষ্ণ বর্মা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভূমিকায় ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন— 'যখন থেকে ভারতভূষণ শ্রীযুক্ত ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, বিশেষ করে বিদ্বৎ-

শিরোমণি লালা শ্রীনিবাস দাস পরলোকে গেছেন, তখন থেকে মন্দ-ভাগ্য হিন্দী ভাষায় কোনো নাটক, উপন্যাস বা অপূর্ব মনোহর কোনো গ্রন্থ আর চোখে পড়ল না। নাটকের এই যে দুর্দশা, তা কেবল তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরা নাটকের দোষ-গুণ এবং লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ। এখন তো একটিই ধারা চোখে পড়ে— দুই-তিন জন পুরুষ-চরিত্রের কথাবার্তা অথবা মঞ্চে অকারণ হাত-পা ছোঁড়া! এ-সবকেই নাটক বলে তুলে ধরা হচ্ছে।'[১]

এ-কথার সমর্থন করেছেন স্বয়ং মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীও। তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র'-পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন—

> 'নাটক লেখার প্রণালীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান যাঁদের নেই, তাঁরাও হিন্দীতে নাটক লেখার অনুগ্রহ করেছেন। তাঁদের বোঝা উচিত— এইভাবে যা-তা লিখলে কেবল হিন্দীরই নয়, তাঁদেরও সমূহ ক্ষতি। নাটক লেখা সকলের কাজ নয়, তার জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি ছাড়াও লোক-ব্যবহার ও মানব-প্রকৃতির পুরোপুরি জ্ঞান থাকা চাই।'[২]

পরবর্তীকালে নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অবয়বসংস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে য়ুরোপীয় নাটকের কোনো কোনো বিশিষ্টতা হিন্দী নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায় অঙ্কের প্রারম্ভে ও মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ক নির্দেশ, বর্ণনা, স্বগতোক্তি, সংলাপের হ্রস্বতা ও ছোটো ছোটো বাক্যের সংলাপ; এক অঙ্কবিশিষ্ট একাঙ্কী নাটিকা রচনার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ— এ-যুগের হিন্দী নাটকের লক্ষণীয় বিষয়। মনে রাখা দরকার একাঙ্কী রচনার ধারা সংস্কৃত-আগত নাট্যপ্রক্রিয়াতেও রয়েছে।

স্মরণ করা চলে যে, বাংলা নাটকের সংস্পর্শ, অনুপ্রেরণা ও অনুকৃতির ফলে হিন্দী নাটকের কলাকৌশল পাশ্চাত্যানুসারী হয়ে পড়েছিল। নান্দী, মঙ্গলাচরণ এবং প্রস্তাবনা ক্রমশ বর্জিত হচ্ছিল। ভারতেন্দুর 'নীলদেবী' ও 'সতীপ্রতাপে'— প্রস্তাবনা নেই, তবে মঙ্গলা-চরণ আছে। পরবর্তীকালে মঙ্গলাচরণও বাদ পড়েছে। ক্রমে ক্রমে

ইংরেজি নাটকের আদর্শ গৃহীত হল। 'দৃশ্য' ও 'গর্ভাঙ্ক' সমার্থক হয়ে পড়ল। পরে 'দৃশ্য'ও অদৃশ্য হল। 'বিষ্কম্ভক' ও 'প্রবেশক' নামে পরিচিত দৃশ্য থেকে গেলেও নামের প্রয়োগ প্রায় উঠেই গেল। প্রস্তাবনার সঙ্গেই উদ্‌ঘাতক, কথোৎঘাত প্রভৃতিও উঠে গেল। প্রাচীন নাটকের বিদূষক চরিত্র আর থাকল না, অন্য কোনো পাত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে হাস্য-বিনোদনের কাজটি সেরে নেওয়া হত। নাটকে ও নাট্যমঞ্চে পাশ্চাত্যনাট্যসুলভ গুণাগুণ গৃহীত হলেও প্রাচীন ভারতীয় নাটকের মূল সুরটুকু বজায় রাখার চেষ্টা লক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মাশ্রিত নাটক রচয়িতাদের মধ্যে পণ্ডিত রাধেশ্যাম ও নারায়ণপ্রসাদ 'বেতাবে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত রাধেশ্যামের নাটকগুলির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ-অবতার', 'রুক্মিণীমঙ্গল', 'বীর অভিমন্যু' এবং নারায়ণপ্রসাদ বেতাবের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' প্রধান। রঙ্গমঞ্চের বিবেচনায় সার্থক হলেও এগুলিতে সাহিত্যিকগুণ কম ও উর্দু'র প্রভাব বেশি চোখে পড়ে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই ধর্মাশ্রিত নাটকগুলির দৌলতে হিন্দী ভাষা রঙ্গমঞ্চে স্বীকৃতি লাভ করল এবং উর্দু'র প্রভাব কিছুটা খর্ব হল। হরিকৃষ্ণ রচিত সামাজিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র রচিত রাজনৈতিক নাটকের প্রসঙ্গও এ-স্থলে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিবেদী যুগের পর পুনরায় হিন্দী নাটকে নবীন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন জয়শঙ্করপ্রসাদ। এ-যুগের প্রধান নাট্যকার তিনিই। বিভিন্ন ভাষা থেকে নাটকের অনুবাদ করে হিন্দী নাট্য সাহিত্যের শক্তি, শৈলী ও ভাবের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য সঞ্চারের ক্রম অব্যাহত ছিল। শেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুবাদের ফলে হিন্দী নাটকে ভাবুকতার সঞ্চার ও অন্তর্দ্বন্দ্বের গুরুত্ব স্বীকৃতিলাভ করছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকও বিশেষভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। অমিল প্রবহমান বন্ধের সংলাপপুষ্ট তাঁর নাট্যসম্ভার হিন্দীতে অভিনব আঙ্গিকের সংযোজন ঘটায়। ভাবোন্মত্ততা এবং করুণার গুরুত্ব ছিল সমধিক। সুতরাং জয়শঙ্কর প্রসাদের সামনে একদিকে ভারতেন্দুর নাট্যরীতি, অন্যদিকে

পাশ্চাত্য নাট্যকলার পরীক্ষিত আদর্শ বিদ্যমান ছিল। এইরূপ সন্ধিক্ষণে প্রসাদ নাট্যরচনায় অগ্রসর হন। তাই তাঁর নাটকে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা ও পাশ্চাত্যনাট্যকলা— উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে। প্রাচ্য নাট্যরস পরিবেশনে পাশ্চাত্য শৈলী-বৈচিত্র্যের সুচিন্তিত সহায়তা গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে সমন্বয়বাদী নাট্যকারও বলা যেতে পারে। আলোচ্য যুগে হিন্দী নাটক রচনা করে যাঁরা সম্যক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে জয়শঙ্করপ্রসাদ ও হরিকৃষ্ণ 'প্রেমী'র নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। প্রসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'স্কন্দগুপ্ত' (১৯২৮) এবং হরিকৃষ্ণ প্রেমীর শ্রেষ্ঠ নাটক 'রক্ষাবন্ধন' (১৯৪৩)। 'শিবাসাধনা' (১৯৩৭), 'প্রতিশোধ' (১৯৩৭), 'স্বপ্নভঙ্গ' (১৯৪০), 'বন্ধন' (১৯৪০), 'কীর্তিস্তম্ভ', 'বিষপান' (১৯৪৪), 'পাতাল বিজয়', 'উদ্ধার' (১৯৪৯) ও 'মিত্র' (১৯৫৫)— নাটকের রচয়িতা প্রেমীজীর একাঙ্কী সংগ্রহ 'মন্দির' (১৯৪২) প্রকাশিত হয়েছে।

জয়শঙ্করপ্রসাদ—প্রসাদের নাটকে চিত্রময়ী কল্পনার স্পর্শে, মধুর ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে ঐতিহাসিক কাহিনী যেন কাব্য হয়ে উঠেছে। কারণ, ভাবাবেগের আধিক্য রয়েছে তাঁর নাটকে। প্রসাদ ও প্রেমীর নাটকে স্বদেশচেতনার যুগোপযোগী প্রকাশ লক্ষ করা যায়।[৩] প্রসাদের স্কন্দগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত এবং প্রেমীর শিবাসাধনা ও রক্ষাবন্ধন এই শ্রেণীর নাটক। রক্ষাবন্ধনে মেবারের রানীর সঙ্গে বাদসাহ হুমায়ুনের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের স্বীকৃতি এবং ভগিনীর বিপদকালে ভ্রাতার রক্ষকরূপে উপস্থিতি হুমায়ুনের উদারতা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-ভাবনা অবসানের একটি শুভ ও বলিষ্ঠ ইঙ্গিত-সূচক। প্রসাদের 'ধ্রুব স্বামিনী'তেও সামাজিক সমস্যা সমাধানের অনুরূপ দ্যোতনা রয়েছে।

সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলায় গভীর অধ্যয়ন ও মননের ফলে প্রসাদের নাটক সংস্কৃতি নির্মাণেও সহায়ক হয়েছে। কবিত্বময় বাতা-বরণ, মানবতার প্রতি অটুট আস্থা এবং গীতিধর্মী চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট পাত্র-পাত্রী সৃজন ও উদাত্ত ভাবনাপুষ্ট মুগ্ধকর রোমান্স—তাঁর নাটকের

প্রধান আকর্ষণ। জয়শঙ্কর প্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সহজেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) নাটকের সঙ্গে জয়শঙ্কর প্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯৩১) নাটকের বিস্ময়কর সাদৃশ্য।[৪] 'রাজ্যশ্রী' (১৯১৫), 'বিশাখ' (১৯২১), 'অজাতশত্রু' (১৯২২), 'জনমেজয়কা নাগযজ্ঞ' (১৯২৩), 'স্কন্দগুপ্ত' (১৯২৮), 'এক ঘূঁট' (১৯৩০), 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'ধ্রুব স্বামিনী' (১৯৩৩)—প্রসাদজীর প্রসিদ্ধ নাট্যকৃতি। জয়শঙ্কর প্রসাদের নাট্যরচনার প্রারম্ভ একাঙ্কী দিয়ে। তাঁর চারটি একাঙ্কী হল—'সজ্জন' (১৯১০-১১), 'কল্যাণী পরিণয়' (১৯১২), 'করুণালয়' (১৯১২) এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯১৪)। তাঁর নাটক মূলত সাহিত্যিক অর্থাৎ পাঠ্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় সম্ভব নয়। মনোবিশ্লেষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রসাদজীর নাটকের বিশেষ ধর্ম। তাঁর নাটকের 'গান'ও বিচিত্র ও সমৃদ্ধ-সাহিত্যের সামগ্রী। তবে নাটকের সংস্কৃতনিষ্ঠ ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট করে তুলেছে নাট্যধর্মকে। সাধারণ পাত্র-পাত্রীও সহজ ভঙ্গিতে দর্শন-চিন্তা করে। আর নাটকের মুখ্য চরিত্রের ক্ষেত্রেও দার্শনিকতার ত্যাগ এবং নিয়তিবাদের শরণ-গ্রহণ লক্ষিত হয়।

'কামনা' (১৯২৩-২৪) প্রসাদজীর একটি নাট্যরূপক। 'কামনা'তেই আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের 'রূপকনাট্য' বা নাট্যরূপকের সূচনা। হিন্দীর আধুনিক একাঙ্কীর সূত্রপাতও তিনিই করেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'একঘূঁট' নাটিকাটির কথা স্মরণীয়। প্রসাদের পূর্বেও অনেকগুলি একাঙ্কী রচিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সংস্কৃত নাট্যধর্মাশ্রিত রচনা। তাই আধুনিক একাঙ্কীর-শৈলীতে রচিত প্রথম নাটক 'এক ঘূঁট-ই' (১৯২৯)।

প্রসাদজীর তেরোটি নাট্যকৃতির অধিকাংশই ঐতিহাসিক বা ইতিহাস আশ্রিত। তবে স্বদেশ-চেতনার স্ফুরণই যে তাঁর নাটকের মূল সুর তাতে সন্দেহ নেই। 'বিশাখ' (১৯২১) নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'যে-কোনো জাতির পক্ষে স্বীয়-আদর্শ গঠনে তার ইতিহাস-অনুশীলন পরম সহায়ক। ··· কেননা অধঃপতিত অবস্থা থেকে পুনরুত্থানের জন্য আমাদের জলবায়ুর অনুকূল আমাদের অতীত সভ্যতার চেয়ে অন্য কোনো আদর্শ অধিক উপযুক্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।··· ভারতীয় ইতিহাসের অপ্রকাশিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের সেই সব ঘটনাবলীর দিগ্দর্শন করাতে চাই, যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে গড়ে তুলতে বহুলাংশে প্রযত্নশীল।'

শেঠ গোবিন্দদাস (১৮৯৬-১৯৭৪)—প্রতিষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্যিক গোবিন্দদাস 'উষা', 'হর্ষ', 'কর্তব্য', 'প্রকাশ', 'কুলীনতা' (১৯৪০) ও 'নবরস' (১৯৪১) প্রভৃতি নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সামাজিক নাটক হল— 'প্রেম য়া পাপ' (১৯৩৮), 'দুঃখ কোঁ্যা' (১৯৩৮), 'পতিত সুমন' (১৯৩৮), 'সন্তোষ কহাঁ' (১৯৪১), 'সুখ কিসমেঁ' (১৯৪১) এবং 'বড়া পাপী কৌন' (১৯৪৮)। রাম ও কৃষ্ণের অবতারবাদ, বৌদ্ধধর্মের পলায়নবাদ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি গভীর-ভাবে চিন্তন ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর নাটকে। 'চতুষ্পথ' নামে একটি সংবাদাত্মক (Monologue) নাটকও রচনা করেন। 'কর্তব্য' (১৯৩৫), 'হর্ষ' (১৯৩৫) ও 'প্রকাশ' (১৯৩৫)— নাটক তিনটিতে অবতারবাদ, ইতিহাস ও সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির কলাসম্মত চিত্রণ ঘটেছে। সাধারণভাবে নাটক তিনটি সার্থক সৃষ্টি বলা চলে। ছোটো ছোটো নাট্য-নাম প্রদানের বিশিষ্টতাটুকুও লক্ষণীয়। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নাটকে গোবিন্দদাসের গান্ধীপ্রীতি ও গান্ধীবাদে নিষ্ঠা সুপরিস্ফুট। এই প্রসঙ্গে 'সেবাপথ' (১৯৪০), 'বিকাশ' (১৯৪১), 'শশিগুপ্ত' (১৯৪২), 'কর্ণ' (১৯৪৬) এবং 'মহত্ত্ব কিসে' (১৯৪৭) প্রভৃতি নাটকও উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র (১৯০৩)—হিন্দী বুদ্ধিবাদী সাহিত্যিক-মহলে লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তিনি নাট্যকার ও

কবি। বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর নাটকে বাস্তববাদিতার রূপ-চিত্রণের প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁর মতে মানুষের জীবনে ও সমাজে ভাবালুতার স্থান নেই। পাশ্চাত্য যাথার্থ্যবাদ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ নাট্যকার নারীসমাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি ব্যক্তির পক্ষে। কাব্যগন্ধহীন তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ বিশেষভাবে অনুসৃত। যুক্তিবাদের দৃঢ় বিন্যাসে নাটক ভারাক্রান্ত। 'সন্ন্যাসী' (১৯৩০), 'রাক্ষস কা মন্দির' (১৯৩১), 'মুক্তি কা রহস্য' (১৯৩২), 'রাজযোগ' (১৯৩৪), 'সিন্দূর কী হোলী' (১৯৩৪), 'আধীরাত' (১৯৩৬), 'অশোক' (১৯৩৯), 'গুড়িয়া কা ঘর', 'গড়ুরধ্বজ' (১৯৪৫), 'নারদ কী বীণা', 'বৎসরাজ' (১৯৫০) এবং 'বিতস্তা কী লহরেঁ' (১৯৫৩)— প্রভৃতি তাঁর নাট্যকৃতি। তাঁর সমস্যা-প্রধান নাটক— সন্ন্যাসী, রাক্ষস কা মন্দির, মুক্তি কা রহস্য, রাজযোগ, আধীরাত ও সিন্দূর কী হোলী— সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইসব নাটকে আটপৌরে জীবনের জটিল সমস্যার সতর্ক বিশ্লেষণ রয়েছে। গড়ুরধ্বজ—ঐতিহাসিক নাটক। তাতে শক-শাসনের পরবর্তী আর্য সংস্কৃতির পুনঃস্থাপনার প্রয়াস লক্ষিত হয়। বৎসরাজ নাটকে ইতিহাস-বিশ্রুত বৎসরাজ উদয়নের কীর্তিগাথা প্রাধান্য পেয়েছে। 'দেশ কে শত্রু', 'স্বর্গ মেঁ বিপ্লব', 'বিষপান', 'বলহীন' ও 'নারী কা রঙ্গ' প্রভৃতি সার্থক একাঙ্কীও রচনা করেছেন মিশ্রজী। 'অশোকবন', 'প্রলয় কে পংখ পর' ও 'কাবেরী মেঁ কমল' প্রভৃতি—তাঁর একাঙ্কী সংগ্রহ।

উদয়শঙ্কর ভট্ট (১৮৯৮-১৯৬৬)—কবি, নাট্যকার ও উপন্যাসকার উদয়শঙ্কর ভট্ট বিষয়, আকৃতি ও প্রকৃতির বিবিধতায় হিন্দী নাট্য-সাহিত্য শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য' (১৯৩১), 'বিক্রমাদিত্য' (১৯৩৩), 'দাহর অথবা সিন্ধ পতন' (১৯৩৪), 'অম্বা' (১৯৩৫), 'সগরবিজয়' (১৯৩৭), 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৩৭), 'বিশ্বামিত্র' (১৯৩৮), 'কমলা' (১৯৩৯), 'রাধা' (১৯৪১), 'অন্তহীন অন্ত' (১৯৪২), 'আদিম যুগ', 'মুক্তিপথ' (১৯৪৪), 'শক-বিজয়' (১৯৪৯), 'তীন

নাটক', প্রভৃতি নাটক এবং 'একলা চলো রে', 'কালিদাস-রূপক' (১৯৪৯), 'মেঘদূত' (১৯৫০), 'বিক্রমোর্বশীয়' (১৯৫০), 'দশহজার', 'আজকা আদমী', 'সমস্যা কা অন্ত' ও 'ধূপশিখা' প্রভৃতি একাঙ্কী সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ভট্টজীর। মৎস্যগন্ধা ও বিশ্বামিত্র গীতিনাট্যরূপে গণ্য হতে পারে। দাহির য়া সিন্ধুপতন— খলিফা বিরচিত 'সিন্ধ কী পরাজয়'— আশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক। বিক্রমাদিত্যও ঐতিহাসিক নাটক কমলাতে আধুনিক যুগের রাজনীতির আশ্রয়ে রোমান্স চিত্রিত। ভট্টজীর ভাব-প্রধান নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের সুর প্রতিধ্বনিত। 'একলা চলো রে'-তে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-ভাবাদর্শকে নাট্যকার স্বমতে রূপ দিতে চেয়েছেন। তবে তাঁর নাট্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় পৌরাণিক নাটকে। অম্বা, সগরবিজয়, মৎস্যগন্ধা ও বিশ্বামিত্রের পাত্র-পাত্রীদের প্রতিকূল পরিস্থিতির অনুভূতি বা আবেদন বর্তমান যুগকেও ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত না করে পারে না। এই সব নাটকে পৌরাণিক উপকরণের সুন্দর ও সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। হিন্দীর নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক নাট্যকাররূপে প্রসাদজীর যে স্থান— পৌরাণিক নাট্যকাররূপে ভট্টজীরও সেই স্থান। একাঙ্কী, প্রহসন ও রেডিও নাটক রচনা করে তিনি হিন্দী নাট্যসাহিত্যকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছেন। ভট্টজীর নাটকের ভাষা প্রায়ই ক্লিষ্ট। কোনো কোনো নাটকে তা অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। সংলাপও দীর্ঘ। তবে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ ছোটো ছোটো বাক্যে এবং আকারে ছোটো তথা ভাষা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'মুক্তিদূত', 'কমলা' এবং 'শক-বিজয়' নাটক তিনটি স্মরণীয়।

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক (১৯১০)—প্রথমে উর্দু এবং পরে হিন্দীতে অশ্‌কজীর সাহিত্য-সৃজন শুরু হয়। তাই তাঁর উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতায় একপ্রকার সজীবতা প্রত্যক্ষ করা যায়। 'জয়-পরাজয়' (১৯৩৭), 'স্বর্গ কী ঝলক' (১৯৩৮), 'ছঠা বেটা' (১৯৪০), 'আদি মার্গ' (১৯৪৩), 'অঞ্জো দীদী' (১৯৪৩), 'অলগ-অলগ রাস্তে' (১৯৪৪), 'কৈদ' (১৯৪৫), 'উড়ান' (১৯৪৬), 'পৈতঁরে' (১৯৫২), এবং 'অন্ধী-

পলী' (১৯৫৬), প্রভৃতি নাটক এবং 'চরওয়াহে', 'পক্‌কা গানা', 'দেবতাওঁ কী ছায়ামেঁ' ও 'পর্দা উঠাও পর্দা গিরাও'— প্রভৃতি তাঁর একাঙ্কী সংকলন। ঐতিহাসিক নাটক 'জয়-পরাজ'য়ে রাজপুত যুগের ইতিহাসের কঠোর সংকল্প এবং বৃদ্ধের বিবাহসমস্যার প্রতিক্রিয়া মেলে। অন্যদিকে স্বর্গ কী ঝলকে আধুনিক যুগের স্ত্রীশিক্ষা ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা চিত্রিত। একাঙ্কী সৃষ্টিতেও অশ্‌কজী সহজ সাফল্য লাভ করেছেন। হিন্দী সামাজিক নাট্যামোদীমহলে অশ্‌কজী শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নারী জাতির প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী এবং সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর নাটক সাহিত্যধর্মিতা, অভিনেয়তা এবং সংলাপাদির গুণে বিশিষ্ট। 'সামাজিক নাটকেরই প্রয়োজন সর্বাধিক'— এই কথা মনে রেখে তিনি সেই অভাবপূর্তির কাজে রত। তাঁর নাট্যসংলাপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পূর্ণ হলেও হৃদয়গ্রাহী।

সত্যেন্দ্র (১৯০৭)—মহারাজ ছত্রসালের বিষয় নিয়ে সত্যেন্দ্রজী 'মুক্তিযজ্ঞ' (১৯৩৮) নামক বীর-রসাত্মক একটি ঐতিহাসিক সার্থক নাটক লিখেছেন। তাঁর 'কুণাল' (১৯৩৮), 'বিক্রম কা আত্মমেধ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি একাঙ্কী সাহিত্যরসাশ্রিত হয়েও অভিনয়োপযোগী।

কবি সুমিত্রানন্দন পন্ত—'পরী', 'রানী', 'ক্রীড়া' ও 'জ্যোৎস্না' নাটক রচনা করে পন্তকবি নাট্যকার রূপেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। জ্যোৎস্না-ই তাঁর সর্বাধিক সার্থক ও জনপ্রিয় নাট্যকৃতি। পাঁচ অঙ্কের এই রূপক নাটকে পন্তজী কবিকল্পনাকে দৃশ্য রূপ প্রদান করে প্রাকৃতিক রূপ-সৌন্দর্যের সঙ্গে লোকসমস্যা উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই রূপক-নাটকে তাঁর রাজনীতিক, আধ্যাত্মিক ও শিল্প-সম্পর্কিত ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামনরেশ ত্রিপাঠীর (১৮৮৯-১৯৬২)—'জয়ন্ত', রামবৃক্ষ বেণীপুরীর (১৯০১-১৯৬৮) 'আম্রপালী', জগন্নাথপ্রসাদ মিলিন্দে-র (১৯০৭-) 'প্রতাপ প্রতিজ্ঞা' প্রভৃতি নাটকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাখন-

লাল চতুর্বেদী (১৮৮৯-১৯৬৮), বদরীনাথ ভট্ট, গোবিন্দবল্লভ পন্ত, ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী ('ছলনা') প্রভৃতির নাটকে ক্রমে ক্রমে আধুনিকতার স্বীকৃতি ঘটেছে। এই সব নাটক যেমন অভিনয়-উপযোগী তেমনি সাহিত্য হিসাবেও সুখপাঠ্য। মৈথিলী শরণগুপ্ত, বিয়োগী হরি, বিশ্বম্ভরনাথ শর্মা প্রমুখের নাট্য-প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। যদিও কবি ও ঔপন্যাসিকরূপেই তাঁরা মুখ্যত পরিচিত।

আলোচ্য যুগের হিন্দী নাটকের উপর হেনরিক ইব্‌সন (১৮২৮-১৯০৬), জর্জ বানার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) প্রভৃতি পাশ্চাত্য নাট্যকারদের প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। সংক্ষেপে এই প্রবৃত্তিকে এইভাবে দেখানো যায়— ১. নাটক আকারে ছোটো হয়েছে, দুই বা তিন অঙ্কের মধ্যে সীমিত ২. সাম্প্রতিক জীবনসম্পর্কিত যথার্থবাদের প্রাধান্য ৩. মনোবৈজ্ঞানিকতা ও সমস্যার প্রধানতা ৪. নাট্যমঞ্চে সংকেত বা নির্দেশের বাহুল্য ও ৫. ঐক্যত্রয় (Three Unities) মান্য করার প্রবৃত্তির অভিবৃদ্ধি।

লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের 'সিন্দূর কী হোলী', পণ্ডিত পৃথ্বীরাজ শর্মার 'দুবিধা' (দ্বিধা) ও 'অপরাধী' প্রভৃতি নাটকে এই প্রভাব বা প্রবণতা সমধিক উজ্জ্বল। সমসাময়িক অন্য নাট্যকার ও একাঙ্কীকারদের সাহিত্যকৃতিতেও এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

জয়শঙ্করপ্রসাদ ও প্রেমচাঁদের যুগের পর হিন্দী সাহিত্যে নাট্যকার ও নাটকের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যথার্থ নাটক এবং প্রতিভাশালী নাট্যকারের সংখ্যা তেমন বাড়ে নি। সার্থক নাটকের জন্য চাই রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা এবং মর্মগ্রাহী সংলাপ রচনার ক্ষমতা। সরসতা ও স্বাভাবিকতার ভিত্তিতেই নাটকে মর্মগ্রাহিতা আসে। সরসতা অর্থে সাহিত্যগুণ এবং স্বাভাবিকতা অর্থে জীবনানুরূপতা বুঝতে হবে। সম্ভাব্যতাভিত্তিক কল্পনার সংগত এবং সংযত দান এই জীবনানুরূপতা। উপরন্তু এই সময় হিন্দী নাটকে বিশেষভাবে 'প্রতীকাত্মকতা', 'গীতিময়তা', 'হাস্যরসতা', 'আকাশভাষিতা' ও 'ঔপন্যাসিকতা'— প্রভৃতি গুণাশ্রিত শৈলীর প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রতীকাত্মক শৈলীর প্রয়োগ অতি প্রাচীন। পূর্ণ প্রতীক ও আংশিক প্রতীকের প্রয়োগ দেখা যায় এযুগে। পূর্ণপ্রতীক নাটকে পাত্র-পাত্রী ও কথাবস্তু সবই প্রতীকাত্মক হয়। শেঠ গোবিন্দ দাসের 'নবরস' (১৯৪১) এবং লক্ষ্মীকান্ত-কৃত 'ভারতরাজ' (১৯৪৯) পূর্ণ প্রতীকাত্মক নাটক। এই প্রসঙ্গে রমেশ সহগল ও পৃথ্বীরাজ কাপুরের 'দীওয়ার' (১৯৪৫) নাটকটিও উল্লেখযোগ্য। 'নবরসে' নয় রসের প্রতীক— পাত্ররা হল— বীরসিংহ (বীররস), উগ্রসেন (রৌদ্ররস), অদ্ভুতচন্দ্র (অদ্ভুতরস), ভীম (ভয়ানক রস), গ্লানিদত্ত (বীভৎস রস), শান্তা (শান্তরস), প্রেমলতা (শৃঙ্গার রস), করুণা (করুণ রস) এবং লীলা (হাস্যরস)। 'ভারতরাজে'র সব চরিত্রই ভারতের দুর্দশার প্রতীক। 'দীওয়ার' নাটকের সব চরিত্রই আমাদের পরিচিত— হিন্দু ও মুসলমান। তাদের চালনা করেছে শাসক ইংরেজ। অবশেষে ঘর ভাগাভাগী হল— দেওয়াল বা প্রাচীর তুলে। দেশ-বিভাজন তুলে ধরা হয়েছে এইভাবে। আংশিক প্রতীক নাটকে কাহিনীর অংশ-বিশেষ বা কোনো কোনো পাত্র-পাত্রী প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা চলে ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ীর 'ছলনা' নাটকের কয়েকটি চরিত্র, গোবিন্দ দাসের 'সুখ কিস মেঁ'-এর কয়েকটি পাত্র ও উপেন্দ্রনাথ অশ্‌কের 'পহেলী' (১৯৩৬) নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য প্রতীকাত্মক।

গীতিনাট্য রচনার ধারা পূর্ব ও পশ্চিমে বহমান ছিল। তবে ইব্‌সন ও বার্নার্ড শ-এর বিরোধিতায় গদ্য নাটকেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। তাই বলে কাব্যনাট্য বা গীতিনাট্য সমাপ্ত হয়ে যায় নি। কাব্য-নাটকের উৎকর্ষও অস্বীকার করা যায় না। গীত ও নৃত্য সহযোগে অভিনেয় গীতিনাট্য এমন সৃষ্টি যাকে চলচ্চিত্রও পরাস্ত করতে পারে না। সংস্কৃত নাটকে কবিতার স্বীকৃতি ছিল। ছিল বাংলা নাটকেও। বাংলায় কাব্যনাট্যের বা গীতিনাট্যেরও অভাব ছিল না। তার অনেকগুলি হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। আলোচ্য যুগে আনন্দীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব চারটি কাব্যনাট্য রচনা করেন— 'পার্বতী ঔর সীতা', 'শিবাজী ঔর

ভারতলক্ষ্মী', 'নূরজহাঁ' এবং 'চাণক্য ঔর চন্দ্রগুপ্ত'। চারটিই অমিত্রাক্ষরে বা অমিল প্রবহমান ছন্দে রচিত। এই প্রসঙ্গে বেচনপ্রসাদ উগ্রের 'হওয়াঈ হায়দরাবাদ' (১৯৪০)ও উল্লেখযোগ্য। উদয়শঙ্কর ভট্টের 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৩৭), 'বিশ্বামিত্র' (১৯৩৮) ও 'রাধা' (১৯৪১); ভগবতীচরণ বর্মার 'তারা', 'দ্রৌপদী' (১৯৪৫) ও 'মহাকাল' (১৯৫৬); শেঠ গোবিন্দ দাসের 'স্নেহ য়া স্বর্গ' (১৯৫৬), রামধারী সিংহ দিনকর রচিত 'মগধমহিমা' (১৯৫১) প্রভৃতি নাটকও গীতিনাট্যের পর্যায়ে পড়ে। এ-যুগের গীতিনাট্যকাররূপে কেদারনাথ মিশ্র, হংসকুমার তেওয়ারী ও গিরিজাকুমার মাথুর প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগে এ-সবের উপযোগিতা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারই প্রভাবে ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যেও কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য প্রভৃতি রচনার প্রবণতা দেখা দেয় নতুন উদ্যমে। এক্ষেত্রে অনুকরণ নয়, অনুপ্রাণিত হয়ে লেখকদের অনুসরণ ও নব সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দীতে প্রহসন এবং হাস্যরসাত্মক নাটকের তেমন প্রাচুর্য নেই। গান ও হাস্যরসাশ্রিত একাঙ্কী রচিত হলেও প্রহসন বা ব্যঙ্গ নাটক খুব বেশি লেখা হয় নি। দৃশ্যবদ্ধ বা অঙ্কবদ্ধ নাটকরূপেই এই শ্রেণীর রচনা পরিচিত। এই প্রসঙ্গে শেঠ গোবিন্দদাসের তিন অংশে বিভক্ত (প্রকৃতপক্ষে তিন দৃশ্যে বিভক্ত) 'ভবিষ্যৎবাণী' প্রহসনটির কথা বলা চলে। উপেন্দ্রনাথ অশ্‌কের অঞ্জোদীদী ব্যঙ্গ-নাটিকারূপে উল্লেখ করার মতো। প্রহসনে ব্যক্তি ও সমাজের দোষের বিষয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হয়, আর ব্যঙ্গ-নাটিকায় সেই অদৃশ্যের লক্ষ্যের প্রতি প্রহার করা হয়। প্রথমটিতে হাসি তো দ্বিতীয়টিতে বৌদ্ধিক আনন্দ-উপভোগ করে সামাজিক চিত্ত। জয়নাথ নলিন, বিমলা লুথর, মধুকর খের, বিষ্ণু প্রভাকর, জ্যোতিপ্রসাদ, নির্মল, যাদবেন্দ্র শর্মা, সুবোধ মিশ্র, রাজেন্দ্রলাল চন্দ্রকান্ত, চিরঞ্জীত, প্রভাকর মাচওয়ে প্রমুখ সাহিত্যিক হাস্য-

রসাত্মক শৈলীতে নাটক লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মাত্র কয়েকটি রচনাই নাটক-শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যের 'ভাণ'-রূপকে আকাশভাষিত শৈলী (অর্থাৎ বক্তা আকাশের দিকে মুখ করে যেন কারো সঙ্গে কথা বলে) ব্যবহৃত হত। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের 'বিষস্য বিষমৌষধম্', এই ভাণ জাতীয় রচনা। পাশ্চাত্যের মেলোড্রামায় ভাণ-এর প্রয়োগ পাওয়া যেতে পারে। একক পাত্রের বা একটি মাত্র চরিত্রের এই জাতীয় নাটকে শেঠ গোবিন্দ দাস বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'ষড়্দর্শন' নাটকে নারীর ছ'টি বিচিত্র রূপ— বালিকা, অজ্ঞাতযৌবনা, যুবতী, বিবাহিতা, অন্তঃসত্ত্বা ও বৃদ্ধা চিত্রিত। তাঁর 'প্রলয় ও সৃষ্টি' এবং 'সচ্চাজীবন'ও উল্লেখযোগ্য কৃতি। বিষ্ণু প্রভাকরের 'সড়ক', রাজারাম শাস্ত্রীর 'বড়বেরী' ও 'ফুল বূট', ভৃঙ্গ তুপ-কেরীর 'ঘেরা' ও পরদেশী রচিত 'ভগবান বুদ্ধ কী আত্ম-কথা'— এই শ্রেণীর রচনা। ঔপন্যাসিক শৈলীর (বারোয়ারী) নাটক হল উপেন্দ্র-নাথ অশ্‌কের 'অন্ধী গলী' (১৯৫৬)। এই সপ্তাংক নাটকটি উন্মুক্ত উপন্যাসের ভঙ্গিতে অর্থাৎ বিভিন্ন লেখক রচিত কাহিনী বা একই লেখকের বিভিন্ন কাহিনীর গ্রন্থনার সাহায্যে রচিত। বৃন্দাবনলাল বর্মার কয়েকটি নাটক এই শৈলীর অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে 'পীলে হাথ'— উল্লেখযোগ্য। স্বপ্ন-আশ্রিত শৈলীতে অশ্‌কজী 'ছঠা বেটা' রচনা করেছেন। শেঠ গোবিন্দ দাসের 'বিকাস'ও এই জাতীয় রচনা।

শিল্পবিধির বিচারে বর্তমান হিন্দী নাটকে হয় সংস্কৃত নাট্যশিল্প, নয় ইংরেজি নাট্যশিল্প, অথবা দুইয়ের মিশ্রণ, আবার ক্বচিৎ-কদাচিৎ নাট্য-কারের স্বতন্ত্র অভিরুচির পরিচয় মেলে। অঙ্ক, দৃশ্য, সংলাপ, ঘটনা-বিন্যাস, উত্থান-পতন— সব দিক দিয়েই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় কারো কারো নাটকে। তাতে নাট্যকারদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিল্প-বিধানের প্রবণতার ছাপ সুস্পষ্ট।

বর্তমানে হিন্দী গদ্য নাটকের চারটি ধারা লক্ষিত হয়—সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক

ধারাই অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ বলা চলে। ঐতিহাসিক ধারার প্রারম্ভ জয়-শঙ্কর প্রসাদের হাতে, পরে তা আরো সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করে। যুগটি সামাজিক উত্থান-পতনের, তাই সমসাময়িক ঘটনার প্রতিফলন নিয়েসামাজিক নাটকও বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্ত্রীশিক্ষা, হরিজন-উত্থান প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াও সবেগে অগ্রসর হয়েছে—ফলে সামাজিক নাটক আরো প্রচার-প্রসার ও সমৃদ্ধির সুযোগ লাভ করেছে। রাজনৈতিক বিষয়ে নাট্য রচনা তুলনায় কম। তবে জীবন-সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে রচিত নাটকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সংস্কৃতানুসারী পৌরাণিক নাটকের ধারা ভারতেন্দু যুগে এসে আরো গতিশীল হয়েছিল। বর্তমান যুগে সে ধারা আবার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এখন পৌরাণিক বীরদের তুলনায় ঐতিহাসিক যোদ্ধারাই উজ্জ্বলরূপে চিহ্নিত এবং চিত্রিত হচ্ছেন। কারণ তাঁরা আমাদের অনেক কাছের মানুষ।

সামাজিক নাটক—সামাজিক নাটকে বহু সামাজিক সমস্যা গৃহীত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে স্ত্রী-সমস্যাই তাতে প্রধান। স্ত্রী-জাতির বিবিধ সমস্যা ছাড়াও বিবাহ, উচ্চ ও নিম্ন স্তরের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, পরিবারের ভঙ্গুরতা, সমাজের শাসন ও আর্থিক বৈষম্য প্রভৃতিও সামাজিক নাটকে গৃহীত। হিন্দী সামাজিক নাট্যকারদের অগ্রগণ্য হলেন— উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক। স্ত্রী-জাতির সমস্যার প্রতি তিনি সমধিক সজাগ সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সূক্ষ্ম ও সহানুভূতিসুন্দর আলোকপাতে উদ্দিষ্ট সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে সাহিত্যধর্মিতা, অভিনেয়তা এবং সুন্দর সংলাপের সমন্বয় ঘটেছে। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের প্রাবল্যও অনুভূত হয়। তাঁর নাট্যকৃতির মধ্যে 'স্বর্গ কী ঝলক' (১৯৩৮), 'ছঠা বেটা' (১৯৪০), 'অঞ্জো দীদী' (১৯৪৩), 'আদি মার্গ' (১৯৪৩), 'ভওঁর' (১৯৪৩), 'কৈদ' (১৯৪৫), 'উড়ান' (১৯৪৬), 'পৈঁতরে' (১৯৫২) ও 'অন্ধী গলী' (১৯৫৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অশ্‌কজীর নাটকে সময়, ঘটনা, স্থান ও পাত্র-পাত্রীর ভিড় থাকলেও সব কিছু অতিক্রম করে স্ত্রী-জাতির

স্বরূপ, পরিবর্তন ও পরিণতির রূপায়ণই বড়ো হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয় নারীর মহত্ত্বের প্রতি নাট্যকার সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল।

শেঠ গোবিন্দদাস 'প্রেম য়া পাপ' (১৯৩৮), 'দুঃখ কেঁ্যা' (১৯৩৮), 'পতিত সুমন' (১৯৩৮), 'সন্তোষ কহাঁ' (১৯৪১), 'সুখ কিসমেঁ' (১৯৪১) ও 'বড়া পাপী কৌন' (১৯৪৮) প্রভৃতি সামাজিক নাটক লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আদর্শবাদী নাট্যকার শেঠজী সামাজিক বিধান ও নৈতিকতার প্রতি আস্থাবান। সত্য, সন্তোষ, যথার্থ সমাজসেবা, নিঃস্পৃহতা ও অহিংসা প্রভৃতি গুণের সাহায্যে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নত হয়। কলুষিত প্রেম বা পাপ ব্যক্তি ও সমাজের পতনের মূল। ঈর্ষা-দ্বেষ প্রভৃতি ব্যক্তিকে পশুতে রূপান্তরিত করে—সুতরাং এ-সব কু-প্রবৃত্তি সর্বৈব পরিত্যাজ্য। শেঠজীর নাটকের লক্ষ্য হল—সমাজের আস্থা-সূচক গুণের প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গলকর গুণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনলাল বর্মার নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি 'রাখী কী লাজ' (১৯৪৩), 'ফূলোঁ কী বোলী' (১৯৪৭), 'বাঁস কী ফাঁস' (১৯৪৭), 'লো ভাঈ পঞ্চোঁ লো' (১৯৪৭), 'পীলে হাথ' (১৯৪৯), 'মঙ্গল সূত্র' (১৯৪৯), 'খিলৌনে কী খোজ' (১৯৫০) প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা-আশ্রিত নাটকের রচয়িতা। ঐতিহাসিক উপন্যাসকার বর্মাজীর নাটক একপ্রকার উপ-ন্যাসই— তবে তা সংলাপপ্রধান। মানুষের মন— জাতি-ধর্ম, অর্থের প্রাচুর্য বা অর্থহীনতার সংকীর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ নয়—এই হল তাঁর সামাজিক নাটকের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে অন্য নাট্যকারদের নাট্যকৃতিরও উল্লেখ করতে হয়। তাঁরাও সমাজের বিভিন্ন স্তর ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে সমসাময়িক ও চিরন্তন সমস্যাকে নাটকে রূপায়িত করেছেন। পৃথ্বী-রাজ শর্মার 'দুবিধা' (১৯৩৮), 'অপরাধী' (১৯৩৯) ও 'সাধ' (১৯৪৪); জনার্দন রায়ের—'আধীরাত' (১৯৩৮); সর্বানন্দের 'প্রশ্ন' (১৯৩৮); ভগ-বতী প্রসাদ বাজপেয়ীর 'ছলনা' (১৯৩৯); কুমার হৃদয় কৃত 'ভগ্নাবশেষ' (১৯৩৯); দ্বারিকানাথ মিশ্রের 'আদমী' (১৯৪০); হরিকৃষ্ণ প্রেমীর 'ছায়া' (১৯৪০); শিবানন্দ সরস্বতীর 'ব্রহ্মচর্য' (১৯৪১); জয়নাথ নলীনের 'নবাবী সনক' (১৯৪১); সারদা মিশ্রের 'বিবাহ মণ্ডপ'

(১৯৪১) ; উদয়শঙ্কর ভট্টের 'অন্তহীন অন্ত' (১৯৪২), 'স্ত্রী কা হৃদয়' (১৯৪২), 'নয়াসমাজ' (১৯৫৯) ; বেচনশর্মা উগ্রের 'অওয়ারা' (১৯৪২) ; ভারত ভূষণের 'পলায়ন' (১৯৪২) ; ভানুপ্রতাপ সিংহের 'তরুণী' (১৯৪২) ; চন্দ্রশেখর পাণ্ডেয়ের 'জীত মেঁ হার' (১৯৪২) ; গোবিন্দবল্লভ পন্তের 'সুহাগ বিন্দী' (১৯৪৩)— প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক। এই শ্রেণীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক হল—'সীতা-রাম চতুর্বেদীর 'বিশ্বাস' (১৯৪৮) ; প্রেমনারায়ণ টণ্ডনের 'সংকল্প' (১৯৪৯) ও 'কর্মপথ' (১৯৫০) ; কৃষ্ণদেবপ্রসাদ গৌড়ের 'অভিনেতা' (১৯৪৯) ; রামসিংহাসন রায়ের 'মাংস কা বিদ্রোহ' (১৯৪৯) ; জগন্নাথ প্রসাদ 'মিলিন্দ' কৃত 'সমর্পণ' (১৯৫০) ; দয়াশঙ্কর পাণ্ডেয়ের 'একহী রাস্তে' (১৯৫০) ; প্যারেলাল কৃত 'মৈঁ কুছ সোচতা হূঁ' (১৯৫০) ; কেশবচন্দ্র বর্মার 'রস কা সিরকা' (১৯৫২) ; মোহনলাল মহাতোর— 'কসাঈ' (১৯৫২) ; বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর 'মানব' (১৯৫০) ; সিদ্ধনাথ কুমারের 'কবি' (১৯৫০) ; মুক্তাবাঈ দীক্ষিতের 'জুয়া' (১৯৫২), সত্যজীবন বর্মার 'প্রেম কী পরাকাষ্ঠা' (১৯৫৩) ও জয়দেব মিশ্র কৃত 'রেশমী গাঁঠ' (১৯৫৩) প্রভৃতি।

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌কের পর রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাট্যরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন জগদীশচন্দ্র মাথুর। সাহিত্যিকগুণেরও অভাব ঘটেনি তাঁর নাটকে। আন্তরিক দ্বন্দ্বভিত্তিক নাটকে অতীতের কথোপকথনের মাধ্যমে চরিত্র ও তার আনুষঙ্গিক পরিস্থিতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংঘর্ষ তুলে ধরেছেন। তাঁর সংলাপ, কাহিনী এবং নাট্যগঠনে গভীরতা ও সার্থকতা লক্ষিত হয়। অভিনয়ের বিচারেও তা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'ভোর কা তারা' (১৯৪৬), 'কোণার্ক' (১৯৫০), 'শারদীয়া', 'পহলা রাজা' ও 'দশরথ-নন্দন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পহলা রাজা ও দশরথ নন্দন নাটক দুইটিতে লোকনাট্যের প্রথায় ঘটনাশৃঙ্খলা ও অভিনয়-শৈলীপ্রযুক্ত। এই নবীন প্রয়োগে হিন্দী নাট্যসাহিত্যে এক নব-দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত ধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ', কাব্যনাটক হলেও অভিনেয়তাগুণ ও মহাভারতের কাহিনীর আশ্রয়ে

সমাজ ও ব্যক্তির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে তুলে ধরার বিচারে একটি অনন্য কৃতি।

সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত নাটকে একদিকে যেমন দেশপ্রেমকে গ্রহণ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সমস্যার চিত্রণ ও তার প্রতিকারের পথনির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি নাটক হল—প্রেমচাঁদের 'সংগ্রাম' (১৯২২), কহৈয়ালালের 'দেশদশা' (১৯২৩), লক্ষ্মণ সিংহের 'গুলামী কা নশা' (১৯২৪), গোপাল দামোদর তামস্করের 'রাধামাধব' (১৯২২), জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদীর 'মধুরমিলন' (১৯২৩), ছবিনাথ পাণ্ডের 'সমাজ' (১৯২৯), আনন্দীপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের 'অছূত' (১৯৩০), জয়গোপাল কবিরাজের 'পশ্চিমী প্রভাব' (১৯৩০), ঘনানন্দ বহুগুণার 'সমাজ' (১৯৩০), নরেন্দ্রের 'নীচ' (১৯৩১), আনন্দস্বরূপ মহারাজের 'সংসার চক্র' (১৯৩২), প্রেমচাঁদের 'প্রেম কী বেদী' (১৯৩৩), ব্রজনন্দন সহায়ের—'উষাঙ্গিনী' (১৯২৫) এবং ধনীরামের 'প্রাণেশ্বরী' (১৯৩১)।

তখন ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে নাটকের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য হাস্যরসাত্মক সস্তা-সংলাপাদি জুড়ে দেবার নিয়ম গড়ে উঠেছিল। তারই সঙ্গে ছিল প্রহসন রচনার প্রয়াস। তবে প্রহসনের মান যেমন সাধারণ স্তরের সংখ্যাও তেমনি কম। ইংরেজিয়ানার ঠাট্টা-তামাসা করাই যেন প্রহসনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রহসনের নামোল্লেখ করা গেল।—

জি. পি. শ্রীবাস্তবের— 'উলট-ফের' (১৯১৮), 'দুমদার আদমী' (১৯১৯), 'গড়-বড়-ঝালা' (১৯১৯), 'মরদানী ঔরত' (১৯২০) ও 'ভূলচুক' (১৯২০); রাধেশ্যাম মিশ্রের— 'কৌন্‌সিল কী মেম্বরী' (১৯২০), হরশঙ্করপ্রসাদ উপাধ্যায়ের 'ভারত দর্শন নাটক' (১৯২১), হরদ্বারকাপ্রসাদ জালানের 'ঘরকট স্যূম' (১৯২২), গোবিন্দবল্লভ পন্তের 'কঞ্জূস কী খোপড়ী' (১৯২৩), রামদাস গৌড়ের 'ঈশ্বরীয়-ন্যায়' (১৯২৪), বদ্রীনাথ ভট্টের 'লবড় ধোঁধোঁ' (১৯২৬), 'বিবাহ বিজ্ঞাপন' (১৯২৭) ও 'মিস অমরীকন' (১৯২৯), বেচনশর্মা উগ্রের

'চার বেচারে' (১৯২৯), ঠাকুরদত্ত শর্মার 'ভূলচূক' (১৯২৯) ও 'টাইতুম' এবং সুদর্শনের 'আনরেরী মজিস্ট্রেট' (১৯২৯) প্রভৃতি।

রাজনৈতিক নাটক—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের যে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে তার প্রতিফলন ভারতের সমসাময়িক প্রায় সকল সাহিত্যে লক্ষিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। পরাধীনতার সমাপ্তি ঘটল কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিল। দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কর্মঠ দেশসেবক শেঠ গোবিন্দ দাস অনেকগুলি রাজনৈতিক নাটক রচনা করেন। তাঁর এই শ্রেণীর নাটকে জনক-জননীর চেয়ে দেশমাতৃকা বড়ো, অহিংসায় জগতের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব; ভারত-পাকিস্তান বিভাজন— ভ্রমাত্মক কার্য, তার সংশোধন হবেই অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত ভারত আবার সংযুক্ত হয়ে এক হবে। ভূদান আন্দোলনের উপযোগিতাই তার প্রমাণ— এই সব ভাব-প্রবৃত্তি, উপদেশ-নির্দেশ চিত্রিত হয়েছে তাঁর নাটকে। এই প্রসঙ্গে 'সিদ্ধান্ত স্বাতন্ত্র্য' (১৯৩৮), 'হিংসা য়া অহিংসা' (১৯৩৮), 'মহত্ত্ব কিসে' (১৯৩৮), 'সেবাপথ' (১৯৪০), 'বিকাস' (১৯৪০), 'নবরস' (১৯৪১), 'সন্তোষ কহাঁ' (১৯৪৫), পাকিস্তান (১৯৪৬), 'গরীবী য়া অমীরী' (১৯৪৭) এবং 'ভূদান যজ্ঞ' (১৯৫৩) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্য উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক— 'দীওয়ার' (১৯৪৫, পৃথ্বীরাজ কাপূর ও রমেশ সোহগল), 'আহুতি' (১৯৪৯, পৃথ্বীরাজ কাপূর ও লাল চন্দ্র বিস্মিল), 'বন্ধু ভারত' (১৯৩৮, তুলসীদাস শর্মা), 'খেতিহরদেশ' (১৯৩৯, সূর্যনারায়ণ শুক্ল), 'স্বর্ণযুগ' (১৯৩৯, সীতারাম বর্মা), 'বফাতী চাচা' (১৯৩৯, রামনরেশ ত্রিপাঠী), 'হথকড়িয়াঁ' (১৯৪৩, মোতীলাল বিলাঙ্গ্যা), 'স্বতন্ত্র ভারত' (১৯৪৭, দশরথ ওঝা), 'ভারত ছোড়ো' (১৯৪৭, রাধাকৃষ্ণ), 'কাশ্মীর কা কাঁটা' (১৯৪৮, বৃন্দাবনলাল বর্মা), 'আজ কা কিসান' (১৯৪৯, রাজেন্দ্রপ্রসাদ অগ্রওয়াল), 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' (১৯৪৯, রামচন্দ্র), 'ভারতরাজ' (১৯৪৯, লক্ষ্মীকান্ত মুক্ত), 'গান্ধীদর্শন' (১৯৫২, চতুরসেন শাস্ত্রী)। এই নাটকগুলি সবই যে সার্থক কৃতি তা

নয়, তবে কোনো কোনোটি শিল্প ও বক্তব্যের সুবাদে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে— একথা বলা চলে।

ঐতিহাসিক নাটক—জয়শঙ্কর প্রসাদের প্রবর্তিত ঐতিহাসিক নাটকের ধারা এযুগে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটক রচনার পিছনে ঐতিহাসিক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সেই ব্যক্তি ও ঘটনা থেকে এ-যুগের উপযোগী প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্য থাকে। আধুনিক দৃষ্টিতে ইতিহাসের ব্যক্তি ও ঘটনার নব মূল্যায়ন প্রয়াস; স্বীয় মনোভাব বা বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য ঐতিহাসিক চরিত্রের অনুসন্ধান ও তার সাহায্যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়াস এবং ইতিহাসের বিশেষ কোনো ঘটনা বা চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাট্যকারের নাট্য রচনায় ব্রতী হওয়ার প্রেরণাও কাজ করে। ঐতিহাসিক নাটক মুখ্যত দুই-প্রকারের হয়—

১. ইতিহাসপ্রধান নাটক—যাতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে।
২. কল্পনাপ্রধান নাটক— ইতিহাসের আশ্রয়ে রচিত হলেও কল্পনারই প্রাধান্য থাকে এই শ্রেণীর নাটকে।

ঐতিহাসিক নাটক লিখে সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন হরিকৃষ্ণ প্রেমী। তাঁর অধিকাংশ নাটকই ইতিহাসপ্রধান ও সরস। মুসলমান শাসনকালই মুখ্যত তাঁর নাটকের পরিধি ও বিষয়রূপে গৃহীত। আদর্শ-বাদী নাট্যকার প্রেমীজী উদ্দেশ্যহীন নাটক লেখার ঘোরতর বিরোধী। পাঠক ও দর্শকের মনে দেশ ও জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনাদের ওজঃপূর্ণ চিত্র ও চরিত্র এঁকেছেন। তাঁর নাটক পাঠক-মনকে উদ্‌বেল করে তোলে। রাজপুত জাতির দুর্বলতার বা নির্বলতার রূপটিও তাঁর নাটকে উদ্‌ঘাটিত। আধুনিক যুগসমস্যাও সাবলীলভাবে এসে গেছে— মাঝে মাঝে। তাঁর 'বন্ধন' (১৯৪০), 'আহুতি' (১৯৪০), 'স্বপ্নভঙ্গ' (১৯৪০), 'বিষপান' (১৯৪৪), 'উদ্ধার' (১৯৪৯), 'শপথ' (১৯৫১) এবং 'মিত্র' (১৯৫৫) প্রভৃতি নাটকে সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কার-অন্ধতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে নির্মম কুঠার হানা হয়েছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের ‘অশোক’ (১৯৩৯), ‘গড়ুরধ্বজ’ (১৯৪৫), ‘বৎসরাজ’ (১৯৫০) ও ‘বিতস্তা কী লহরেঁ’ (১৯৫৩) প্রভৃতি নাটকে ভারতীয়তার স্বরূপ ও ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মিশ্রজীর নাটকে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির গুণগান ও তার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থাকলেও বৌদ্ধধর্মের খর্বতাও প্রদর্শিত হয়েছে। বৌদ্ধ-ধর্মকে নাট্যকার ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে করেন। শেঠ গোবিন্দ দাসও ‘কুলীনতা’ (১৯৪১), ‘শশিগুপ্ত’ (১৯৪২), ‘শের-শাহ’ (১৯৪৫), ‘মহাত্মা গান্ধী’ (১৯৪৯) ও ‘মহাপ্রভু বল্লভাচার্য’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। গান্ধীজীর অনুগামী শিষ্য গোবিন্দ দাস বেশ কয়েকবার কারাবরণও করেন। সুতরাং তাঁর নাটকে অভিজ্ঞতা-পুষ্ট দেশপ্রেম ও গান্ধীবাদ বেশ প্রবলরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। বৃন্দাবন-লাল বর্মার ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে ‘ঝাঁসী কী রানী’ (১৯৪৮), ‘হংস ময়ুর’ (১৯৪৯), ‘পূর্ব কী ওর’ (১৯৫০), ‘বীরবল’ (১৯৫০), ‘জহাঁদর শাহ’ (১৯৫০) ও ‘ললিত বিক্রম’ (১৯৫৩) প্রমুখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও উল্লেখযোগ্য কৃতি বলা যায়। সংলাপের সাহায্যে বর্মাজী যেন উপন্যাসই রচনা করেছেন। নাট্যতত্ত্ব বা নাট্যশিল্পের প্রতি তিনি যেন উদাসীন। এ-যুগের অপরাপর নাট্যকারের ঐতিহাসিক নাটকে হিন্দু যুগের শৌর্য ও ব্যক্তিত্বই প্রধানত গৃহীত; বুদ্ধদেব, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, সিকন্দর, অশোক, বিক্রমাদিত্য ও সমুদ্রগুপ্তপ্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সেগুলি রচিত। এই প্রসঙ্গে রামবৃক্ষ বেণীপুরীর ‘তথাগত’, বিশ্বম্ভর সহায়ের ‘বুদ্ধদেব’(১৯৪০), রামপ্রসাদ বিদ্যার্থীর ‘প্রবুদ্ধ সিদ্ধার্থ’(১৯৫১) জগন্নাথ প্রসাদ মিলিন্দ-কৃত ‘গৌতমানন্দ’ (গৌতমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ১৯৫২), রামকুমার বর্মার ‘কৌমুদী মহোৎসব’ (১৯৪৩), জনার্দন রায় কৃত ‘আচার্য চাণক্য’ (১৯৫৩), বিরাজ-কৃত ‘বিক্রমাদিত্য’ (১৯৩৯), ঠাকুরপ্রসাদ সিংহের ‘বিক্রম’ (১৯৪৩), উদয়শঙ্কর ভট্টের ‘শক বিজয়’ (১৯৪৪) ও ‘কালিদাস’ (১৯৫০), বৈকুণ্ঠনাথ দুগ্‌গল রচিত—‘হর্ষ’ (১৯৪১) ও ‘সমুদ্রগুপ্ত’ (১৯৪৯), দশরথ ওঝার ‘সমুদ্রগুপ্ত’ (১৯৫০),

ভানুপ্রতাপ সিংহের 'রাজ্যশ্রী' (১৯৪৩), গোবিন্দবল্লভ পন্ত-কৃত 'অন্তঃপুর কা ছিদ্র' (১৯৪০), উমেশ রচিত 'চতুর্যুগ', রত্নশঙ্করের 'কুণীক' (১৯৫১) ও অর্জুন চৌবের 'আদি ভারত' (১৯৫২) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের কথাও স্মরণীয়।

ভক্ত গায়িকা মীরার জীবন ও সাধনা অবলম্বনে মুরারি মাঙ্গলিক কৃত 'মীরা' (১৯৪০) এবং ঠাকুরপ্রসাদ সিংহ রচিত 'মতওয়ালী মীরা'ও উল্লেখ্য। জগন্নাথপ্রসাদ মিলিন্দের 'প্রতাপ প্রতিজ্ঞা' (১৯৩৮), দেবরাজ দিনেশ কৃত 'মানবপ্রতাপ' (১৯৫৩), মিশ্রবন্ধু কৃত 'শিবাজী' (১৯৩৮), চতুর সেন শাস্ত্রীর 'অমরসিংহ', 'অজিত সিংহ' ও 'রাজসিংহ', পরিপূর্ণানন্দ কৃত 'রানী ভবানী' (১৯৩৮), সীতারাম চতুর্বেদীর 'অনারকলী' (১৯৪৯) প্রভৃতি নাটক প্রধানত ইতিহাসের ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, প্রেম ও যুদ্ধ নিয়ে রচিত। ইংরেজ শাসনকালের বিষয়-আশ্রিত নাটকের মধ্যে রমেশ কৃত 'লক্ষ্মীবাঈ' (১৯৫০), বিমলা রৈনা রচিত 'অনন্ত' (১৯৫০), কাঞ্চনলতা সব্বরওয়াল রচিত 'লক্ষ্মীবাঈ' (১৯৫১) ও রাজেশ্বর গুরু কৃত 'লক্ষ্মীবাঈ' (১৯৫১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরিপূর্ণানন্দের 'নানা ফড়নবীশ' (১৯৪৯) ও রাসবিহারী লালের 'কালকন্যা' (১৯৫৩) নাটক দুইটিও ঐতিহাসিক শ্রেণীভুক্ত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

পৌরাণিক নাটক—সংস্কৃতের ধারা বেয়ে পৌরাণিক নাটক হিন্দী সাহিত্যে এসে পৌঁছেছে বলা যায়। ভারতেন্দুর যুগে এই ধারা নবরূপ ও নবগতি লাভ করে। কিন্তু জয়শঙ্কর প্রসাদের যুগে ধারাটি ক্ষীণ হয়ে আসে। পৌরাণিক অর্থাৎ পুরাকালিক বা পুরাণ-আশ্রিত বিষয়, ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে রচিত ভক্তিভাবপূর্ণ নাটকই পৌরাণিক নাটকরূপে অভিহিত হতে পারে। হিন্দীর পৌরাণিক নাটকে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে— রাম ও কৃষ্ণের চরিত্র, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী এবং রামায়ণ-মহাভারতের তথাকথিত অ-মহৎ চরিত্র। এই শ্রেণীর চতুর সেন শাস্ত্রীকৃত 'সীতারাম' (১৯৩৮), 'মেঘনাদ' (১৯৩৯), 'শ্রীরাম' (১৯৪০), 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৪০) ও 'গান্ধারী' (১৯৪২)

প্রভৃতি উল্লেখ্য নাট্যকৃতি। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অনুসরণে 'মেঘনাদে'র চরিত্রকে মহত্ত্ব দান করা হয়েছে। দেবরাজ দিনেশের 'রাবণ' (১৯৪৮) নাটকেও রাবণ চরিত্রের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। উদয়শঙ্কর ভট্টের 'রাধা' (১৯৪১) ও 'বিশ্বামিত্র' (১৯৪৮) ; গৌরীশঙ্কর মিশ্রের 'শবরী' ও 'অছূত'; পৃথ্বীনাথ শর্মার 'উর্মিলা' (১৯৫০), সীতারাম চতুর্বেদীর 'শবরী', সদ্‌গুরুশরণ অবস্থীর 'মঝলী রানী', কিশোরীদাস বাজপেয়ীর 'সুদামা' (১৯৩৯), হরিনারায়ণ মেড়ওয়াল কৃত 'কৃষ্ণ-বিয়োগিনী' (১৯৫৩) ও বীরেন্দ্রকুমার শুক্লের 'সুভদ্রা-পরিণয়' প্রভৃতি নাটকও পৌরাণিক শ্রেণীভুক্ত।

মহাভারতের কাহিনী বা তার অংশবিশেষ নিয়ে রচিত হিন্দী নাটকের সংখ্যাও খুব কম নয়। বেচন শর্মা উগ্র কৃত 'গঙ্গা কা বেটা' (১৯৪০), সীতারাম ভট্টের 'বীর অভিমন্যু' (১৯৪৫), শেঠ গোবিন্দ দাসের 'কর্ণ' (১৯৪৬) ও প্রেমনিধি শাস্ত্রীর 'প্রণমূর্তি' (১৯৫০)— এই শ্রেণীর নাটক। প্রণমূর্তি আসলে সংস্কৃত 'বেণীসংহার'— নাটকের অনুবাদ। রাঁগেয় রাঘবের 'স্বর্গভূমি কা যাত্রী' (১৯৫১), উমাশঙ্কর বাহাদুর কৃত 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৫২), মোহনলাল জিজ্ঞাসুর 'পর্বদান' (১৯৫২) ও লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের 'চক্রব্যূহ' (১৯৫৩) প্রভৃতি নাটকও পৌরাণিক আখ্যা লাভের অধিকারী। চক্রব্যূহে দুর্যোধনের সুযোধন বা মানবীয় রূপটি বিশ্লেষিত।

পৌরাণিক ব্যক্তি ও ঘটনার আশ্রয়ে সমসাময়িক কালের ভারতীয় চিন্তা ও সমস্যার পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন কোনো কোনো লেখক। ব্রজনন্দন শর্মার 'সত্যাগ্রহী হরিশ্চন্দ্র' (১৯৩৯), লক্ষ্মণ স্বরূপের 'নলদময়ন্তী' (১৯৪১), লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের 'নারদ কী বীণা' (১৯৪১), কৈলাশনাথ ভটনাগর কৃত 'শ্রীবৎস' (১৯৪১), হরেকৃষ্ণ প্রেমীর 'পাতাল বিজয়' (১৯৪১), তারাকুমারীর 'দেবযানী' (১৯৪৪), গোবিন্দবল্লভ পন্তের 'যযাতি' (১৯৫১), গুলাব রচিত 'কচ দেবযানী' (১৯৫২) প্রভৃতি নাটকে তার আভাস পাওয়া যায়।

তা ছাড়া অন্য উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক হল—সীতারাম চতুর্বেদীর 'অলকা' (১৯৪৪), রামনরেশ ত্রিপাঠীর 'শ্রবণকুমার' (১৯৪৬), উদয়শঙ্কর ভট্টের 'বিক্রমোর্বশী' (১৯৫০) ও হরিশংকর সিন্‌হার 'মা দুর্গা' (১৯৫৩)। মা দুর্গাতে সতী চরিত্রের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালের নাট্যমঞ্চ-সফল নাট্যকার হলেন— মোহন রাকেশ। তিনি কেবল নাটকেই নয়, নাট্যমঞ্চেও প্রগতির হাওয়া বইয়েছেন। তাঁর নাটকের বিষয় ও কাল যাই হোক না কেন তিনি মানসিক দ্বন্দ্ব, অন্তর্বিরোধ ও পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ বা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে সূক্ষ্ম-সংবেদনাত্মক ভঙ্গিতে রূপকের সাহায্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কথ্য ভাষার চাতুর্যও তাঁর নাটকের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'আষাঢ় কা একদিন', 'লহরোঁ কে রাজহংস' ও 'আধে-অধূরে'—নাটক তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীনারায়ণ লালও প্রগতিবাদী নাট্যকার। প্রয়োগধর্মী নাটকরূপে দয়াপ্রকাশ সিংহের 'মন কে ভওঁর', 'ইতিহাস-চক্র ঔর ওয়হ্', 'অমরিকা' এবং 'কথা এক কংস কী'; জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রীর 'শুতুর মুর্গ'; রেবতীশরণ শর্মার 'অঁধেরে কা বেটা', 'ন ধর্ম ন ইমান' ও 'দীপশিখা', 'তুম্‌হারে গম মেরে হৈঁ', 'রাজা বলি কী নয়ী কথা'; রাজেন্দ্রকুমার শর্মার 'অপনী কমাঈ' ও 'একসে বঢ়কর এক', বিপিনকুমার অগ্রওয়ালের 'তীন অপাহিজ' ও 'কোটন'; বিষ্ণুপ্রভাকরের 'যুগে যুগে ক্রান্তি', 'ট্ৰটতে পরিবেশ' ও 'তীসরা আদমী'; সত্যব্রত সিংহ-কৃত 'নব রং' ও 'অমৃত পুত্র'; সুরেন্দ্র বর্মা কৃত— 'তীন নাটক' এবং 'সূর্য কী অন্তিম কীরণ সে সূর্য কী পহলী কিরণ তক'; রমেশ বক্‌সীর 'দেবযানী কা কহনা হৈ', 'তীসরা হাথী' ও 'বামাচার'; হমী দুল্লা কৃত 'উসকী আকৃতিয়াঁ' ও 'পরিন্দে'; মুদ্রারাক্ষস রচিত 'তিলচট্টা' ও 'তেন্দুয়া'; সর্বেশ্বর দয়াল সকসেনা কৃত 'বকরী'; সুশীলকুমার সিংহ কৃত 'সিংহাসন খালী হৈ' ও 'চার ইয়ারোঁ কী মার'; মণি মধুকর কৃত 'রস' ও 'গন্ধর্ব'; বৃজমোহন শাহের 'বুদ্ধমন'; ভারতভূষণ অগ্রওয়ালের 'অগ্নিলোক' প্রভৃতি নাট্যকৃতির উল্লেখ করা চলে।

এই সব নাটকে সমকালীন অসঙ্গতি ও তার বিড়ম্বনা, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের অবনমন, আর্থিক ও রাজনৈতিক অনাচার ও অত্যাচার, সামাজিক ভ্রষ্টাচার, জাতিবাদ ও সম্প্রদায়বাদ, প্রজাতন্ত্র ও পুঁজিবাদ, আর্থিক-রাজনৈতিক পরনির্ভরতা, দেশ-জাতি ও ব্যক্তির কুণ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বহীনতা প্রভৃতির নগ্ন-রূপায়ণ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তবে অতি সম্প্রতি যে সব নাটক রচিত হচ্ছে—তাদের বিষয়, প্রয়োগ-সৌকর্য এবং সৃষ্টি-সার্থকতা প্রভৃতির বিচার-বিশ্লেষণ সময়-সাপেক্ষ, আজই তা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

একাঙ্ক নাটিকা বা একাঙ্কী

আলোচ্য শতাব্দীর নাটকের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পাশ্চাত্য আদর্শে একাঙ্কী রচনার সূচনা, প্রসার ও সমৃদ্ধি। মহাকাব্যের স্থলে গীতিকাব্য, উপন্যাসের বদলে ছোটো গল্পের অনুরূপ নাটকের পরিবর্তে একাঙ্কীর রচনা, পাঠ ও অভিনয়-উপভোগ— এ যুগের মানুষের জীবনের কর্মব্যস্ততা ও কালমহার্ঘতার প্রত্যক্ষ অথচ গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম। তবে ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে একাঙ্কী নামটা অভিনব হলেও বিষয়টি অতি প্রাচীন। অবশ্য তখন তার প্রকৃতি ও প্রকার ছিল অন্যরকম।

সংস্কৃত নাটকে একাঙ্কীগোত্রীয় যে রচনা ছিল তার জটিলতা কম ছিল না। সেই সংস্কৃতের একাঙ্কী জাতীয় রচনার প্রভাবে ভারতেন্দু ও দ্বিবেদী যুগের একাঙ্কীতে প্রাচীনধর্মিতার সুর সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। পাশ্চাত্য একাঙ্কীর প্রভাব পুষ্ট হয়ে হিন্দী একাঙ্কী অভিনব রূপ গ্রহণ করেছে। তবে সংস্কৃত একাঙ্কী জাতীয় ব্যায়োগ, প্রহসন, ভাণ, বীথি, নাটিকা, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রকাশিকা, উল্লাপ্য, কাব্য প্রেংখণ,

শ্রীগদিত, বিলাসিকা, প্রকরণিকা ও পৃথ্বীশ প্রভৃতির সঙ্গে আধুনিক হিন্দী একাঙ্কীর যে কোনো যোগ নেই—তা জোর করে বলা যায় না।

আধুনিক হিন্দী একাঙ্কীর সূচনাকার জয়শঙ্কর প্রসাদ। 'আধুনিক একাঙ্কী নাটক'— নামে সংকলিত গ্রন্থে শ্রীসুদর্শন, রামকুমার বর্মা, ভুবনেশ্বর, উপেন্দ্রকুমার অশ্ক, ভগবতীচরণ বর্মা, ধর্মপ্রকাশ আনন্দ ও উদয়শঙ্কর ভট্ট প্রমুখের একাঙ্কী সংকলিত হয়েছে। রামকুমার বর্মা ও উদয়শঙ্কর ভট্টের একাঙ্কী বেশ জনপ্রিয়।

হিন্দীর একাঙ্ক নাটিকার— রাষ্ট্রীয়, ঐতিহাসিক, সামাজিক, যথার্থবাদী, ধার্মিক-পৌরাণিক, হাস্য-ব্যঙ্গপ্রধান প্রভৃতি কয়েকটি ভাগ লক্ষিত হয়। ভারতেন্দু, দ্বিবেদী ও জয়শঙ্কর প্রসাদের যুগ পর্যন্ত এই ধারা কয়টি প্রবাহিত হয়েছে। তবে দ্বিবেদী যুগে সামাজিক-ব্যঙ্গাত্মক ধারা, রাষ্ট্রীয়-ঐতিহাসিক ধারা এবং ধার্মিক-পৌরাণিক ধারারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। প্রসাদের যুগে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ভাবাত্মক একাঙ্কীই বেশি লেখা হয়েছে। এই সময়কার হিন্দী নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের রচনা-পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল সে কথা আমরা জানি। অতঃপর হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব অতিমাত্রায় লক্ষিত হয়। ফলে হিন্দী নাটকের একাঙ্ক নাটিকা শাখাটি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। জনমানসে আত্মসচেতনতা ক্রমবর্ধমান ছিল তাই এ যুগের একাঙ্কীতে রাষ্ট্রচেতনা, স্বদেশপ্রেম, পরাধীনতার অসন্তোষ ও বিদ্রোহ গভীরভাবে ব্যঞ্জিত ও ঝংকৃত হয়েছে। গান্ধীবাদী বিচারও একাঙ্কীর রূপ লাভ করেছে। রাষ্ট্র আন্দোলনের সশক্ত ধারাটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক একাঙ্কীতে রূপায়িত হয়েছে। হিন্দী একাঙ্কীতে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে তার প্রচলিত আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে গেল। ১৯৩০ সালটি হিন্দী একাঙ্কীর বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় থেকেই পাশ্চাত্যপ্রভাবিত হিন্দী একাঙ্কীর সুস্পষ্ট জয়যাত্রা লক্ষিত হয়।

ড. রামকুমার বর্মার (১৯০৫) একাঙ্কীতে সুস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁর 'বাদল কী মৃত্যু' (১৯৩০) ও

পৃথ্বীনাথ শর্মার ‘দুবিধা’ এই সময়ের রচনা। তবে বর্মাজীর একাঙ্কীতে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-চিত্রণ, কোনো সমস্যাবিশেষের বিশ্লেষণ, একটি উদ্দীপ্ত মুহূর্তের চিত্রণ, নাটকীয় বিন্দুর রূপায়ণ এবং কাব্যময় ভাষা লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। প্রাকরণিক দিকটিও তাঁর হাতে সুস্থির রূপ লাভ করেছে। সর্বোপরি আছে অভিনেয়তাগুণ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র, ভুবনেশ্বর প্রসাদ, শেঠ গোবিন্দ দাস, উদয়শঙ্কর ভট্ট প্রমুখের নামও স্মরণীয়। ১৯৩৮ সালে ‘হংস’ পত্রিকার ‘একাঙ্কী’ সংখ্যাটি হিন্দী নাট্যরসপিয়াসী জগতে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করে। একদল হিন্দী সাহিত্যিক সাহিত্যক্ষেত্র থেকে একাঙ্কীর নির্বাসন দাবী করেন। সে দলের নেতা চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালংকার। অপরপক্ষে উপেন্দ্র-নাথ অশ্‌ক, রামকুমার বর্মা, শেঠ গোবিন্দ দাস এবং উদয়শঙ্কর ভট্ট প্রমুখ একাঙ্কীর উপযোগিতার দিকটি উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন। ফলে প্রকরণ (টেক্‌নিক) স্থির হওয়ায় তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। হিন্দী সাহিত্যে একাঙ্কী উপযুক্ত স্থান পায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভের ফলে। অতঃপর হিন্দী একাঙ্কীকে বিষয় ও শিল্পগত বিশিষ্টতা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের রচনার কথায় আসা যাক।

রামকুমার বর্মা পাশ্চাত্য শৈলীর অভিনেয় একাঙ্কী রচনার পথ-প্রদর্শক। তাঁর একাঙ্কীসংগ্রহ ‘পৃথ্বীরাজ কী আঁখে’ (১৯৩৭), ‘রেশমী টাঈ’ (১৯৪১), ‘চারুমিত্রা’ (১৯৪৩), ‘বিভূতি’ (১৯৪৩), সপ্তকীরণ’ (১৯৪৭), ‘রূপরঙ্গ’ (১৯৪৮), ‘কৌমুদী মহোৎসব’ (১৯৪৯), ‘ধ্রুব-তারিকা’ (১৯৫০), ‘ঋতুরাজ’ (১৯৫১), ‘রজতরশ্মি’ (১৯৫২), ‘দীপদান’ (১৯৫৪), ‘কামকন্দলা’ (১৯৫৫), ‘ইন্দ্রধনুষ’ (১৯৫৭) ও ‘রিমঝিম’ (১৯৫৭)— প্রভৃতি কেবল সংখ্যাতেই নয়, মান ও বৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ। প্রধানত ঐতিহাসিক ও সামাজিক একাঙ্কীকার বর্মাজীর সফলতা আদর্শবাদী-ঐতিহাসিক একাঙ্কীতেই সমধিক। এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি সমসাময়িক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও ইতিহাসসম্মত সত্যতা ও গাম্ভীর্য প্রদান করেছেন। সামাজিক নাটিকায় তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা

সমস্যাকে যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। জীবনের বাস্তবতা, প্রাণীতত্ত্বের রহস্যঘন সংকেত, যথার্থ অভিজ্ঞতাভিত্তিক কাহিনী নির্মাণ প্রভৃতির উপরই তাঁর সামাজিক একাঙ্কী প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কবিসুলভ কল্পনার স্পর্শে রচনা বেশ সার্থক এবং উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রধানত সামাজিক একাঙ্কীপ্রণেতা উদয়শঙ্কর ভট্টের প্রকাশিত একাঙ্ক-নাটিকাসংগ্রহ— 'বিশ্বামিত্র ঔর দো ভাবনাট্য', 'আদিম যুগ', 'পর্দে কে পীছে', 'কালিদাস', 'জওয়ানী ঔর ছহ একাঙ্কী' 'সাত প্রহসন' 'সমস্যা কা অন্ত', 'আজ কা আদমী' এবং 'অভিনব একাঙ্কী' প্রভৃতি। আজকের সমাজের ও আধুনিক জীবনের বিবিধ সমস্যা, সংঘর্ষ, কু-রীতি, অ-নীতি, ধর্মাড়ম্বর, অনাচার, অন্ধবিশ্বাস ও আর্থিক দুরবস্থার বিষয় চিত্রিত হয়েছে ভট্টজীর রচনায়। 'ক্রান্তিকারীতে' (১৯৫৩) রাষ্ট্রীয় নব-জাগরণের পরিচয় আছে। ছায়াবাদের প্রভাব রয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর বেশির ভাগ একাঙ্কীই অভিনয়যোগ্য।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেরণায় পাশ্চাত্য আধারেই একাঙ্কী রচনার প্রয়াসী হয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র। তবে তাঁর রচনা বাস্তব জীবনভিত্তিক যুক্তি-তর্ক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত। 'অশোকবন', 'প্রলয় কে পংখ পর', 'কাবেরী মেঁ কমল'— প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় একাঙ্কীসংগ্রহ। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক— সব রকমের একাঙ্ক নাটিকাই তিনি লিখেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাকৌশলের মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর রচনায়।

স্বদেশী ও বিদেশী নাট্যশাস্ত্রের অধ্যেতা শেঠ গোবিন্দ দাস আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটিকা লিখেছেন। গান্ধীবাদ তাঁর আদর্শ। তিনি ১২৫টি একাঙ্ক-নাটিকা রচনা করেছেন। তাঁর ইতিহাস ও সমাজের সমস্যাপ্রধান, সত্য ঘটনাশ্রিত একাঙ্কীর আবেদন সুস্পষ্ট এবং বেশ প্রবল।

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌কের রচনায় পাশ্চাত্য প্রকরণ, বাতাবরণ সৃষ্টির সততা, অনুভূতির যথার্থতা, সাংকেতিকতা ও প্রতীকময়তা সুস্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। বাস্তববাদী ব্যঙ্গাত্মক শৈলীতে তিনি সামাজিক ও পারিবারিক একাঙ্কী রচনা করেছেন। পাত্র-পাত্রীর হৃদয়-রহস্য বিশ্লেষণে তিনি সুনিপুণ। মঞ্চসাফল্যও লাভ করেছেন। তাঁর 'দেবতাওঁ কী ছায়া মেঁ' এবং 'চরওয়াহে' প্রভৃতি একাঙ্কী বেশ পরিণত স্তরের।

ভুবনেশ্বর প্রসাদ পাশ্চাত্য প্রভাবপ্রধান একাঙ্কী রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর ভাব ও বিচার দুই-ই বার্নার্ড শ-এর প্রভাবপুষ্ট। 'কারওয়াঁ' তাঁর উল্লেখযোগ্য একাঙ্কী সংকলন। অসংগৃহীত একাঙ্কীর সংখ্যাও তাঁর কম নয়। তাঁর রচনায় গৃহীত সমস্যা প্রায়শই বিদেশী সমাজ ও জীবনসম্পর্কিত।

জগদীশচন্দ্র মাথুর (১৯১৭-১৯৭৮) তাঁর একাঙ্কীতে আধুনিক সভ্য জগতের নানা সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। পাত্র-পাত্রীর স্বকীয়তা তাঁর রচনার একটি বিশিষ্টতা। তাঁর 'ভোর কা তারা' (১৯৩৭) ও 'মেরে সপনে' (১৯৫৩)—দুইটি একাঙ্কীসংগ্রহ প্রকাশিত। তিনি প্রহসনে ভাবের তীব্রতা, তথাকথিত সভ্য সমাজের সারহীন সভ্যতার প্রতি কষাঘাত ও যথার্থবাদিতাকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন। শম্ভুদয়াল সক্সেনা পৌরাণিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক একাঙ্কী রচনা করেছেন। আদর্শবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সক্সেনাজীর একাঙ্কীসংগ্রহ 'বিজয়া' ও 'বারুণী'তে সভ্যনামধারী পাত্রের মুখোশ খুলে দিয়ে তার ভিতরের যথার্থ বিকৃত রূপটি নগ্ন করে দেখিয়েছেন। হরিকৃষ্ণ প্রেমী নৈতিক আদর্শবাদী লেখক। সমাজের সমসাময়িক গান্ধীবাদ প্রভাবিত নব আদর্শ অনুসারে তিনি রাষ্ট্রগঠনে উৎসুক মনে হয়। 'বাদলোঁ কে পার' সংগ্রহের একাঙ্কীগুলি রাষ্ট্রীয়তা, নৈতিকতা ও আদর্শবাদিতার পরিচায়ক। পৃথ্বীনাথ শর্মার 'দৃষ্টি কা দোষ'— একাঙ্কী সংগ্রহে সামাজিক যাথার্থ্যের চিত্রণ চোখে পড়ে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তবর্গের সমস্যাই এখানে গৃহীত। সে সমস্যা প্রধানত সামাজিক ও পারিবারিক। সদ্‌গুরুশরণ অবস্থীর 'নাটক ঔর নায়ক' নামে একাধিক একাঙ্কীসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। আদর্শবাদের ব্যাখ্যায় দার্শনিক চিন্তন গভীর ও গম্ভীররূপে অনুস্যূত। তা ছাড়া গণেশ দ্বিবেদী, গিরিজাকুমার মাথুর, বৃন্দাবনলাল বর্মা, ডা. সত্যেন্দ্র,

গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ভগবতীচরণ বর্মা, চতুরসেন শাস্ত্রী, চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যা-লংকার ও সজ্জাদ জাহীর প্রভৃতি একাঙ্কী রচয়িতা যথেষ্ট শক্তি, শিল্প-বোধ ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের রচনায় প্রতি-দিনের মধ্যবিত্তীয় সমস্যা, নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে প্রযুক্ত ভাষা-সংবাদ, সামাজিক জীবনের কাজ-কর্ম এবং মনোবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ও গুরুত্ব বার বার প্রকট হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক কালে, হিন্দী নবীন একাঙ্কীর যুগে, সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ধারাই প্রধান। জনজীবনের সামাজিক সংঘর্ষ, দুর্নিবার ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একাঙ্কী যেন জেহাদ ঘোষণা করেছে। প্রগতিবাদের আন্দোলন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে গোবিন্দ-লাল মাথুর, অনন্তকুমার পাবান, অর্জুন চৌবে, গোবিন্দ শর্মা, বিনোদ রস্তোগী, লক্ষ্মীনারায়ণ লাল, গিরিজাকুমার মাথুর, কর্তার সিংহ দুগ্‌গল, বিমলা লুথরা, ভারতভূষণ অগ্রওয়াল, বিষ্ণুপ্রভাকর, ভগবৎ শরণ উপাধ্যায়, জয়নাথ নলিন ও সত্যেন্দ্র শরৎ প্রমুখের রচনার উল্লেখ প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর বিচারধারা নিয়েও প্রচুর একাঙ্কী রচিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে শিবকুমার ওঝা, প্রেমরাজ শর্মা, দেবদত্ত অটল, হরিশঙ্কর শর্মা, জানকীচরণ বর্মা, বিষ্ণু প্রভাকর, ড. সুধীন্দ্র, হরি-কৃষ্ণ প্রেমী, রামচন্দ্র তেওয়ারী, শম্ভুদয়াল সক্‌সেনা প্রমুখ রয়েছেন। ঐতিহাসিক একাঙ্কী রচনার ধারা সঞ্জীবিত রেখেছেন ড. রামকুমার বর্মা, লক্ষ্মীনারায়ণ লাল, গণেশদত্ত গৌড় ও রামবৃক্ষ বেনীপুরী প্রমুখ।

ধার্মিক-পৌরাণিক শাখা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু কৃষ্ণদত্ত ভরদ্বাজ, শম্ভুদয়াল সক্‌সেনা প্রমুখ কয়েকজন ধার্মিক একাঙ্কী রচনার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন।

যুগ-প্রয়োজন, যুগের অভিরুচি এবং যুগ পরিস্থিতির নিরিখে জীব-নের জটিলতাই মুখ্যত একাঙ্কীতে বিশ্লেষিত হচ্ছে। মার্কস্‌বাদ ও ফ্রয়েড-বাদ-নিয়ন্ত্রিত একাঙ্কীও রচিত হচ্ছে। দেশ বিভাজন ও নানাপ্রকার

উত্থান-পতনের ফলে উদ্ভূত নানা সমস্যা নিয়ে একাঙ্ক নাটিকা লেখা হয়েছে। রেডিওতে বহু একাঙ্কী অভিনীত হচ্ছে বেশ সাফল্যের সঙ্গে। এই ধরনের একাঙ্কীকে তিন ভাগে রাখা যায়— যথার্থোন্মুখ আদর্শবাদী, সামাজিক যথার্থবাদী ও মনোবিশ্লেষণাত্মক নগ্নবাদী। এক্ষেত্রে রেবতীশরণ শর্মা, উদয়শঙ্কর ভট্ট, প্রভাকর মাচওয়ে, উপেন্দ্র-নাথ অশ্‌ক, চিরঞ্জীত, বিষ্ণু প্রভাকর, ধর্মবীর ভারতী, লক্ষ্মীনারায়ণ লাল, গোপাল শর্মা, কৃষ্ণকিশোর শ্রীবাস্তব, রামপূজন মালিক প্রভৃতি লেখকদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বর্তমানে জীবনের যথার্থবাদের অঙ্গ হয়ে পড়েছে একাঙ্কী— তা বলা যায়। অভিনয়ে পাশ্চাত্য কৌশল গৃহীত হচ্ছে। খোলা আসরে অভিনয় সম্ভব এমন একাঙ্কীও রচিত হয়েছে। অভিনেয়তা অপর্যাপ্ত এবং সংগীতহীনতা পর্যাপ্ত হলেও ভাষা, সংলাপ ও পাত্র-পরিচিতিতে সর্বত্র স্বাভাবিকতা, শিল্পময়তা, নাট্যধর্মিতা ও পরিণতির উৎকর্ষ ঘটেছে। কি অভিনয়, কি পাঠসৌকর্য, কি বিষয় বা ভাববৈচিত্র্য—সব দিকের বিচারে 'একাঙ্কী' বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ শাখার ভবিষ্যৎ যে আরও উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধি-ময়— তাতে সন্দেহ নেই।

ধ্বনি নাটক

অত্যাধুনিক হিন্দী নাটকের একটি শক্তিশালী শাখা হল রেডিও বা ধ্বনি নাটক। পুরোপুরি শ্রব্য হবার ফলে তা প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু নাট্যক্রিয়ার অন্যান্য কৌশল তাতে বিদ্যমান। তাই এটি এমন নাটক যার আধার ধ্বনি। ভাবাভিব্যক্তির একটি জোরালো মাধ্যম এই ধ্বনি। উচ্চারণ ভঙ্গির ভিন্নতায় একই শব্দের সাহায্যে প্রেম, ঘৃণা, ক্রোধ ও হতাশা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবনার প্রকাশ সম্ভব। তা ছাড়া ভাষা, ধ্বনি-প্রভাব ও সংগীত— তিন প্রকারে ধ্বনির ব্যবহার ঘটে। এই ধ্বনির লীলাখেলাই রেডিও নাটকের প্রধান আকর্ষণ। ভাষার শ্রব্যরূপই রেডিও নাটকের আধার হওয়ায় তা 'শ্রুতিনাট্য' নামেও অভিহিত হয়। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে চারটি বা পাঁচটি নাটক রেডিওতে প্রচারিত হয়। সুতরাং আজকাল রেডিওর জন্য যত নাটক রচিত হয়, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তত হয় না। বিষয়, ভাব ও আঙ্গিকের বিবিধতার জন্য ধ্বনি নাটকের বহু প্রকারভেদ দেখা যায়। তবে শিল্পের বিচারে— নাটক, রূপান্তর, ফ্যান্টাসী মনোলগ, সংগীত-রূপক, নক্‌শা এবং রূপকই প্রধান।

কেবলমাত্র শ্রব্য হবার ফলে 'রেডিও নাটকে'র রচনা ও অভিনয় দুই-ই বেশ সহজ। এই নাটক সংলাপপ্রধান। হিন্দীতে ১৯২০ সালে রেডিও নাটকের প্রথম প্রচার হয়। আকাশবাণী (অল ইণ্ডিয়া রেডিও) থেকে প্রচারিত প্রথম হিন্দী নাটক চতুর সেন শাস্ত্রীর 'রাধা-কৃষ্ণ' একাঙ্কীটি মূলত রেডিও নাটকের পদবাচ্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই রেডিও নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ শুরু হয়। আজ রেডিও নাটক ও নাট্যকারের সংখ্যা অনেক। যারা রেডিও নাটক লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন— তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু প্রভাকর, রেবতীশরণ শর্মা, হরিশ্চন্দ্র খান্না, প্রভাকর মাচওয়ে, ভারতভূষণ অগ্রওয়াল, গিরিজাকুমার মাথুর,

বিশ্বম্ভর মানব, শ্রীকৃষ্ণকিশোর শ্রীবাস্তব, ভগবৎশরণ উপাধ্যায়, হংস-কুমার তিওয়ারী, ব্রজকিশোর নারায়ণ, প্রফুল্লচন্দ্র ওঝা, 'অজ্ঞেয়', অমৃত-লাল নাগর, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, রামচন্দ্র তিওয়ারী প্রমুখ গদ্য-রেডিও নাট্যকার। অপর পক্ষে পদ্য-নাটক বা কাব্যনাটক ও গীতি-নাট্যও কম লেখা হচ্ছে না।

হিন্দীতে শৈলী, বিষয় ও রচয়িতার প্রাচুর্যের ফলে প্রচুর রেডিও নাটক রচিত হচ্ছে, কিন্তু তাতে নাটকের মানের ইতরবিশেষ ঘটেনি। স্বল্প পরিসরে সীমিত সুযোগে শিল্পিত নাটকের সাক্ষাৎও মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়— এই প্রসঙ্গে সিনোরিও, স্ব-উক্তি নাটক এবং দূরদর্শনে অভিনীত নাটকের কথা স্মরণীয়। প্রকাশমাধ্যম, প্রচারমাধ্যম এবং শিল্পের বিচারে কিছুটা পৃথক হলেও তিনটি রূপই একই উদ্দেশ্যে রচিত, অভিনীত ও প্রচারিত। যুগের চাহিদা, গতিশীলতা ও ব্যস্ততার জন্য দীর্ঘ বা বৃহৎ নাটকের অভিনয় দর্শন বা শ্রবণ অথবা পঠন-পাঠন খুবই অসুবিধাজনক। অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই স্বল্প-পরি-সরের সিনোরিও, রেডিও নাটক ও একাঙ্কীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। প্রচুর প্রয়োগে কিছু সাফল্য যে না এসেছে এমন নয়। লক্ষণীয় হল— এ সবের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পরই হিন্দী রেডিও নাটকের যথার্থ বিকাশ ঘটেছে। সর্বাধিক লেখা হয়েছে নাটক ও রূপক (বা 'ফিচার')। মনোলগ ও ফ্যান্টাসী কমই লেখা হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে এই নতুন শাখাটির মান যে খুব সন্তোষপ্রদ, তা বলা যায় না। অবশ্য মাঝে মধ্যে দুই-একটি এমন রচনাও মেলে নাট্যগুণের বিচারে যা যথার্থই শিল্প এবং প্রভাবশালী কৃতি রূপে স্বীকার্য। তার থেকে মনে হিন্দী রেডিও নাটকের উজ্জ্বল পরিণতির প্রত্যাশা জাগে।[৫]

হিন্দী নাট্যমঞ্চ

নাটকের উন্নতি বা উৎকর্ষ বহুলাংশে অভিনয়মঞ্চ-আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। হিন্দী নাটকের অভিনয়ের প্রসঙ্গে রঙ্গমঞ্চের অভাব একটি সাধারণ বাস্তব সত্য। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সময়েই তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু তার স্থায়ী এবং উপযুক্ত প্রতিকার আজও যে সম্ভব হয়েছে তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। কোনো কোনো সাহিত্যিক-গোষ্ঠী বা নাট্যগোষ্ঠী স্ব-প্রয়াসে নাটক মঞ্চস্থ করলেও তাতে শিক্ষিত ও শিষ্টসমাজ তেমন আকৃষ্ট হয় নি। অবশ্য সাধারণভাবে গ্রাম্য সমাজে যাত্রাগানের মতো নাটক, 'নাচ' ও 'নৌটংকী'র প্রচলন বহুদিন ধরে আছে। ক্রমে ক্রমে তার প্রসারও ঘটেছে। এই নাচ বা নৌটংকী-নামধেয় নাটকের আয়োজন গ্রামবাসীর মনোরঞ্জন সাধনে সময় কাটায়, মাঝে-মধ্যে নীতিশিক্ষাও দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার ফলে সাহিত্য বা নাটকের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তা সম্ভবও নয়। প্রথমদিকে নাট্যমঞ্চ ছিল উর্দুভাষীদের দখলে। তাও আবার সেই বোম্বাই অঞ্চলের দিকে। সেখানে হিন্দী নাটক অভিনয়ের কোনো সুযোগ ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোনোক্রমে তা সম্ভব হয়। হিন্দী নাটকের অভিনয় শুরু হয় মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসে। তাই হালকা বা লঘুভাবভঙ্গি, রঙ্গ-তামাসা, হাস্য-পরিহাস ও ভাঁড়ামি-আশ্রিত অভিনয়ের সীমা অতিক্রম তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পারসী নাট্যমঞ্চই হিন্দীভাষী অঞ্চলে একমাত্র অভিনয়-কেন্দ্র ছিল। তবে হিন্দীর বদলে উর্দুভাষায় পৌরাণিক নাটকের অনুবাদের অভিনয় দর্শকমণ্ডলীকে খুশী করতে পারে নি। তাই ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই পারসী-নাট্যমঞ্চের অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে 'মডার্ন থিয়েটার্স' সিনেমা তৈরির কাজ শুরু করে। ১৯৩২ সালে 'নিউ আলফ্রেড' এবং ১৯৩৫-এ 'কোরং-

পিয়ং থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৩ সালে কাশীতে 'রত্নাকর রসিক মণ্ডল' জয়শঙ্কর প্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর অভিনয় করে। সৌখীন নাট্য-গোষ্ঠীর সহকারিতায় এই প্রয়াস সফল হয়। পারসী নাট্যমঞ্চের অনুস্মৃতি ছিল এই সৌখীন নাট্যসংস্থার আদর্শ। তবে এ সংস্থাও স্থায়ী হতে পারে নি। ১৯৩৯ ও ১৯৪৩ সালে নতুন করে হিন্দী নাট্যমঞ্চ নির্মাণের প্রয়াস হয়। কিন্তু সে প্রয়াসও সফল হতে পারেনি। ১৯৪২ সনে বোম্বাইতে 'অখিল ভারতীয় জন নাট্য সংঘে'র উদ্যোগে প্রথম হিন্দী নাটক অভিনীত হয়। শহরে আলোড়ন পড়ে যায়। সারবালকরের 'দাদা' এবং সরদার জাফরীর 'য়হ কিসকা খ়ূন হৈ'— নাটক দুইটির অভিনয়ও বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতীয় নাট্যসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে নানারকমের প্রয়াস চললেও হিন্দীর মৌলিক নাট্যমঞ্চ তার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা নিয়ে দেখা দেয় বহুকাল পরে। বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ এরই মধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে। হিন্দী নাটকের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, কারণ রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের মতো নাট্যামোদী শিল্পরসিক প্রতিভার নিতান্ত অভাব ছিল হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে।[৬] তবু অখিল ভারতীয় নাট্য-সংঘ এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেয়। বাংলার দুর্ভিক্ষ-আশ্রিত নাটকের অভিনয়ের সাহায্যে তারা দর্শকের হৃদয় জয় করে। সুতরাং প্রয়াস সার্থক হয়। ফলে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এই নাট্য আন্দোলন ভাষার সীমা মুছে দেয়, জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। দেখতে দেখতে সারা দেশ জুড়ে এই নাট্যসংস্থার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় জননাট্য সংঘের কাজ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলে। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এই সংঘের কাজে ও চিন্তায় শৈথিল্য এসে যায়। অতঃপর গ্রামের নাট্যমণ্ডলীর মতোই কোনোক্রমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ভারতীয় নাট্যসংঘ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। এই সময় (১৯৪৪) বোম্বাইতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আবার হিন্দী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত

হল। তবে একেবারে আধুনিক ধরনের। নাম 'পৃথ্বী থিয়েটার্স'। সংস্থাটি প্রায় ষোলো বৎসর পর্যন্ত এক টানা দেশের বিভিন্ন অংশে নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করে বহু খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করে। ১৯৬০ সালে তা উঠে যায়। কিন্তু তার প্রভাব থেকে যায়। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, বারাণসী, এলাহাবাদ, লাখনাউ, কানপুর এবং পাটনা প্রভৃতি নগর ও শহরে ছোটো-বড়ো বহু নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হয়ে হিন্দী নাটক ও তার অভিনয়-কলার অগ্রগতির পরিচয় তুলে ধরে।

হিন্দী রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে দুইটি অহিন্দীভাষী মহানগর কলকাতা ও বোম্বাই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। আধুনিক নাট্যমঞ্চয়ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য স্থল— এই দুই কেন্দ্র। পরে এদের সঙ্গে দিল্লীর নামও যুক্ত হয়। তারই সঙ্গে পাটনা, বারাণসী, এলাহা-বাদ, লাখনাউ কানপুর, জব্বলপুর, ভূপাল, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি হিন্দী অধ্যুষিত কেন্দ্রেও নাটকের প্রয়োগ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলেছে। গ্রামে-গঞ্জেও আজকাল নতুন নাট্যবিধানের প্রয়োগ হচ্ছে— 'নৌটংকী' বা 'মণ্ডলী' নামক সংস্থাতেও। নাটকের সমৃদ্ধি ও জন-প্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে সরকারের তরফ থেকেও নানা ব্যবস্থা অব-লম্বিত হয়েছে। অনেক স্থলে সংগীত-নাটক একাডেমি স্থাপিত হয়েছে। বহু নাট্য-রচনা ও অভিনয় প্রতিযোগিতা এবং দেশ-বিদেশের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সহায়তায় দেশের নাট্যমঞ্চের উন্নতিবিধানের প্রয়াস চলছে। সংগীত নাটক একাডেমীর সহায়তায় ড. সুরেশ অবস্থী হিন্দী রঙ্গমঞ্চের বিকাশের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল। এই উদ্দেশ্যে 'রাষ্ট্রীয় নাট্য-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার কথাও স্মরণীয়। ১৯৬০ সালে দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। তবে এক সময়ের প্রসিদ্ধ 'এশিয়ান থিয়েটার ইন্‌স্টিট্যুট' এখন অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী এবং বড়ো বড়ো শহরে রবীন্দ্র-নাট্যমঞ্চ বা 'রবীন্দ্র-সদন' প্রতিস্থাপনের কথাও স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রচর্চা বিশেষ করে রবীন্দ্র-নাট্যচর্চা ও অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই এইরূপ

মঞ্চ নির্মাণ-পরিকল্পনা গৃহীত। অবশ্য অন্যপ্রকার নাটকেরও অভিনয় হয়। হিন্দী রঙ্গমঞ্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল 'নটরঙ্গ' পত্রিকার প্রকাশন। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি ১৯৬৫ সনে প্রথম প্রকাশিত হয় নেমিচন্দ্র জৈনের সম্পাদনায়। হিন্দীভাষী ক্ষেত্রের বিশালতার দিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন স্থানের রঙ্গমঞ্চের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভারতময় তার প্রচার যে রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

নানাভাবে প্রয়াস চললেও 'হিন্দী নাট্যমঞ্চ' বা 'রঙ্গমঞ্চ' এখনো সুন্দর ও সুস্থির রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে— সে কথা বলা যায় না। তবে আন্তরিক আগ্রহ এবং বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিরলস প্রয়াস— আশার সংকেত দিয়ে চলেছে।

দেশ, সমাজ, রুচি ও সংস্কৃতি প্রভৃতির বিষয়ে নব-জাগরণ ঘটায় সুন্দর-উচ্চস্তরের অভিনয়, বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ, ভাষার শুদ্ধি ও অভিনয়-শক্তির প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হয়েছে। অভিনয়ে মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতিই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ আত্মবিশ্লেষণ ও তুলনাত্মক-সমীক্ষার সুযোগ পায় অভিনয় দর্শনে। অভিনয়ে তার পরিচিত পরিবেশ, মানুষ এবং হৃদয়ানুভূতির প্রতিফলন লক্ষ করে সে চমৎকৃত হয়, অভিভূত হয়, তদ্‌গতচিত্ত হয়— এক কথায় প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। খড়ী হিন্দীর আগে নাটকীয় সংলাপের বাহন ছিল ব্রজভাষা, ক্রমে-ক্রমে খড়ী হিন্দী তার স্থান গ্রহণ করে। মাঝে-মাঝে নাট্যসংলাপে অমিল প্রবহমান বা অমিত্রাক্ষর ছন্দোরূপ প্রযুক্ত হতে লাগল। গদ্যের শুষ্কতা কমিয়ে পদ্যের লালিত্য আনবার প্রয়াস দেখা দিল। নাট্যমঞ্চের অভিনয়ে একাধারে লাবণ্য এবং ওজঃ শ্রোতা ও দর্শক-মণ্ডলীকে আকর্ষণে সক্ষম হল। চলচ্চিত্র নাটকের অভিনয় বা রঙ্গ-মঞ্চের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে চাইলেও বিভিন্ন সঙ্ঘ, গোষ্ঠী, সভা, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নানা উপলক্ষে নানাভাবে অভিনয়ের যে ব্যবস্থা করে থাকেন— তাতে একাঙ্কী

নাটকের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মথুরা, কাশী, এলাহাবাদ লাখনাউ-কানপুর প্রভৃতি স্থানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অভিনব নাট্যকৌশল প্রয়োগের যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে 'তাতে অভিনয়শিল্প ও রঙ্গমঞ্চ দুইয়েরই উৎকর্ষবিধানের আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে রেডিওতে নাট্যাভিনয়ের প্রচার-প্রসার ও সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখযোগ্য। দর্শন নয়, কেবল শ্রবণের দ্বারাই গৃহে বসে পরিপূর্ণ নাট্যানুভূতি গ্রহণ—সম্ভব করার সপ্রশংস প্রয়াসের ফল বেতার-নাটক। এখন অবশ্য দূরদর্শনের কল্যাণে গৃহে বসেই অভিনয়-দর্শন ও শ্রবণ দুই সম্ভব হচ্ছে।

হিন্দী নাটকের ক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বিষয়ে সূক্ষ্মবোধ-সম্পন্ন, অভিনয়শিল্পে দক্ষ, সংগীতজ্ঞ, ভাষা ও মঞ্চজ্ঞানের অধিকারী শিল্পী ও মানবদরদী নাট্যকারের প্রয়োজন, যিনি যুগোপযোগী সমাজের চাহিদা এবং বিশ্ব নাট্যজগতের স্তর বা মান রক্ষা করে নাটক রচনা ও অভিনয় করতে ও করাতে পারবেন। একাধারে হয়তো সর্বগুণের সমাবেশ পাওয়া সম্ভব নয়, তবু হিন্দী নাট্যমঞ্চের উন্নয়নে— এ সব গুণের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন অনুকূল রুচি, পরিবেশ ও আন্তরিক প্রয়াস।

অবশ্য অতি সম্প্রতি হিন্দী নাট্যমঞ্চের উন্নতির সপ্রশংস চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। হিন্দী-নাটক বুঝি তার সঙ্গে আর পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। তাই অন্যান্য ভাষার নাটকের অনুবাদ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। সফলতা এবং জনপ্রিয়তাও লাভ করছে। বাংলার বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মারাঠীর বিজয় তেন্দুলকার, শিরয়াড়ুকর, গানেলকর, দেশপাণ্ডে, কন্নড় ভাষার গিরীশ কারনাড, ওড়িয়ার মনোরঞ্জন দাস, জগন্নাথ প্রসাদ দাস প্রভৃতি বহু নাট্যকারের নাটক হিন্দীতে অনূদিত ও অভিনীত হচ্ছে। সুতরাং যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে হিন্দী রঙ্গমঞ্চ নিজেকে সামলে নিয়ে জনপ্রিয়তার গভীরে প্রবেশ করতে চলেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। অতি সাধারণ মঞ্চে বা মঞ্চ

ছাড়াই নাটক অভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বেশ প্রসার লাভ করছে। অবশ্য নতুনত্ব থাকলেও জনগণের চিত্ত আকর্ষণের উপযোগী আপাত উপকরণ তাতে কম। তবে, এ-ধরনের নাটক সকলের জন্য নয়। কারণ তার জন্য চাই উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, দর্শকদের উচ্চ নাট্য-রুচি এবং কল্পনাশক্তির উৎকর্ষ। এই ধরনের মানসিক বিশিষ্টতা সব শ্রেণীর দর্শকের কাছে আশা করা সমীচীন নয়। তবে তা যে অসম্ভব—সে কথাও ঠিক নয়।

উল্লেখপঞ্জী

১. হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, নবম খণ্ড, না. প্র. স. কাশী, (বি. সং ২০৩৪), পৃ. ৩২।

২. পূর্ববৎ, পৃ. ৩৩।

৩. স্মরণীয়—(ডি. এল.) 'রায়বাবুকে নাটক মূল অথবা অনুবাদ রূপ সে প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় সাহিত্যকার পর প্রভাব ডাল রহে থে। হিন্দী ভাষাকে নাট্যকার শ্রী হরিকৃষ্ণ 'প্রেমী' 'ইস প্রভাব সে সবসে অধিক প্রভাবিত হুয়ে'।
—ড. দশরথ ওঝা, হিন্দী নাটক : উদ্ভব ঔর বিকাশ (১৯৫৪), পৃ. ৪৪৫।

৪. জয়শঙ্কর প্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব বা অনুপ্রেরণার প্রসঙ্গটি বহুচর্চিত। কবি প্রসাদ বাংলা জানতেন। আর তাঁর কাছে থেকে, তাঁরই অনুপ্রেরণায় রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় বাংলা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক একের পর এক হিন্দীতে অনুবাদ করেন। এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ড. দশরথ ওঝা লিখেছেন—

'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কা প্রভাব দো ওর সে হিন্দীভাষী সাহিত্য-কারোঁ পর পড় রহা থা। এক ওর তো উনকে অনূদিত নাটক অভিনীত হোতে থে, দূসরী ওর উনকী শৈলী পর হিন্দী মেঁ মৌলিক নাটক লিখে জাতে থে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে ঐতিহাসিক নাটকোঁ কে প্রভাব সে 'প্রসাদ'জী বচ নহীঁ সকতে থে। পণ্ডিত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় 'প্রসাদ'জী কে ঘর মেঁ রহকর ডি. এল. রায়কে বঁগলা নাটকোঁ কা হিন্দী অনুবাদ প্রস্তুত কর রহে থে। পাণ্ডেয়জীনে ডি. এল. রায়কে চন্দ্রগুপ্ত, মহারাণাপ্রতাপ, মেওয়াড় পতন, দুর্গাদাস, নূরজহাঁ, শাহজহাঁ কে অতি রমণীয় অনুবাদ প্রস্তুত কিয়ে। ...প্রসাদ কে সামনে প্রকৃতি কে উপাদানোঁ সে রাষ্ট্রীয়তা কে

দো রূপ থে। এক রূপ ভারতেন্দু কা ঔর দূসরা শ্রী রায় (ডি. এল. রায়) কা।'

—হিন্দী সাহিত্যকা বৃহৎ ইতিহাস, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬। এই প্রসঙ্গে ড. ওঝার হিন্দী নাটক : 'উদ্ভব ঔর বিকাশ' (১৯৫৪) গ্রন্থটির 'প্রসাদ ঔর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়'-শীর্ষক আলোচনাটিও (পৃ. ৩৫৮-৩৬২) দ্রষ্টব্য।

বাংলা ও হিন্দী 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক দুইটিতে বিষয় ও চরিত্রগত মিল তো আছেই, সংলাপ, কতকাংশে সংলাপের ভাষা, এমন-কি শব্দ-গত মিলও সুলভ। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' (১৯৫৭) গ্রন্থে।

৫. হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, চতুর্দশ খণ্ড, না. প্র. স. কাশী, (বি. সং ২০২৭), পৃ. ৩৫৬।

৬. বিংশ শতকের প্রথম দশকে শান্তিনিকেতনে যে রঙ্গমঞ্চীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা ও প্রয়োগ ঘটে তাতে আশ্রমে এক সঙ্গে সাহিত্য, চিত্র, সংগীত এবং শিল্পের দিক্‌পাল প্রতিভাধরদের সমন্বয় সাধিত হয়। এ-দেশের উপযোগী—নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনা ও সজ্জার রূপায়ণ ঘটে শান্তিনিকেতনেই। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'শান্তিনিকেতনের এই আতিশয্যহীন, সুরুচিসম্মত নাট্যাঙ্গিক-চেতনা ক্রমে ক্রমে ভারতের নানা অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। মঞ্চসজ্জার এই নব আলোকে নাট্যক্রিয়া ও অভিনয় শিল্পের শিক্ষা-দান শুরু হয় কাশীতে সর্বপ্রথম।'

—হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, চতুর্দশ খণ্ড, না. প্র. স. কাশী, (বি. সং ২০২৭), পৃ. ২৭২-৭৩।

সপ্তম অধ্যায়

প্রবন্ধসাহিত্য

গদ্যোৎকর্ষের নিকষ প্রবন্ধসাহিত্য। মানুষ তার ভাবনা-চিন্তা, ব্যক্তি-গত অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিচিত্র হৃদয়বেদ্য ও মনোনিষ্ঠ ভাবনিচয়কে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে চায়। তার এই প্রয়াস যখন প্রকৃষ্ট বাঁধুনিতে প্রাঞ্জল হয়ে রূপ লাভ করে, তখনই সৃষ্টি হয় প্রবন্ধের। সুতরাং প্রবন্ধেই ভাষাশক্তির পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব। সেই জন্যই গদ্যশৈলীর বিবেচনায় প্রধানত প্রবন্ধ-নিবন্ধের উপরই নির্ভর করতে হয়। বিচার-বিবেচনা, ভাব ও বর্ণনাকে আশ্রয় করে যথাক্রমে বিবেচনাত্মক, ভাবাত্মক ও বর্ণনাত্মক— এই তিন প্রকারের প্রবন্ধ হতে পারে। বিষয়, লক্ষ্য ও লেখকের ব্যক্তিত্ব-অনু-সারে প্রবন্ধের শৈলী বিভিন্ন প্রকারের হয়।

ভারতেন্দু যুগেই হিন্দী প্রবন্ধের সূচনা ঘটে। সে সময় ছোটো-বড়ো নানা বিষয়ে নানা প্রকার প্রবন্ধ রচনা শুরু হয়। হাল্‌কা ভাব ও ভাষার কল্যাণে প্রবন্ধগুলি বেশ উপভোগ্য হত। 'রাজাভোজ কা সপনা' ও 'এক অদ্ভুত অপূর্ব স্বপ্ন'[১]— প্রভৃতিতে কথা, ফ্যান্টাসী ও ললিতকল্পনার সমন্বয় ঘটেছে। অবশ্য গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও যে দুই-একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে— সে কথা বলাই বাহুল্য। দেশ-ভাবনা, ব্রত-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, আমোদ-প্রমোদ নিয়েই বেশির ভাগ প্রবন্ধ লেখা হত। সাধারণভাবে ভাবপ্রধান ও বর্ণনা-প্রধান প্রবন্ধ লেখারই প্রচলন ছিল। ধর্ম-প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও লেখকরা সমাজ-সংস্কারকেই গুরুত্ব দিতেন সমধিক। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধেও হাস্যপরিহাস জুড়ে দিয়ে সজীব ও উপভোগ্য করার প্রয়াস থাকত। লেখকের সহৃদয়তায় প্রবন্ধ সার্থক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যের এই প্রারম্ভিক যুগের লেখকদের মধ্যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, বালকৃষ্ণ ভট্ট, বদরীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীনিবাস দাস, কেশবরাম ভট্ট, অম্বিকাদত্ত ব্যাস, রাধাচরণ গোস্বামী, বালমুকুন্দ গুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রয়াসে বিবিধ ও বিচিত্র ভাব ও বিষয়ের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে খড়ীবোলী গদ্যের শক্তির যে নানা প্রকার পরীক্ষা হয়েছে তার সম্ভাব্য সফলতাই পরবর্তী যুগের হিন্দী প্রবন্ধের পথ নির্দিষ্ট করেছে, এ কথা বলা যায়।

ভারতেন্দু-উত্তর পর্বে হিন্দী প্রবন্ধকারদের দিগ্‌দর্শনের জন্য দুইটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চিপলুণকরের[১] কয়েকটি মারাঠী প্রবন্ধের অনুবাদ করেন গঙ্গাপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী— 'নিবন্ধমালাদর্শ' (১৯১৫) নামে। লর্ড বেকনের (Francis Bacon, 1561-1626) কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করেন মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী— 'বেকন-বিচার রত্নাবলী' (১৯২০) নামে। তবে সাধারণভাবে এই দুইটি প্রবন্ধ পুস্তকের ধারা অনুসৃত হয় নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হত ঠিকই তবে রঙে ও ওজনে তা অতিমাত্রায় হাল্‌কা হত। মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর প্রবন্ধ 'সত্য কথন'ও নতুন প্রেরণায় ভরপুর হলেও খুব গভীর ও উচ্চ স্তরের বলা যায় না। তা সত্ত্বেও হিন্দী সাহিত্যের গঠনে তাঁর দান কম নয়। এই সময় রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। গভীর চিন্তন ও মননমূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেন। স্বচ্ছ ও সরস শৈলীর বিনোদপ্রিয় লেখক বালমুকুন্দ গুপ্ত, স্ফূর্তিদায়ক গম্ভীর বিবেচনা-ঋদ্ধ লেখার সাহায্যে পাঠক-সম্প্রদায়কে উদ্‌বুদ্ধ করতে সক্ষম পূর্ণসিংহ এবং সরস ভাষায় জ্ঞান-স্পৃহা জাগাতে সমর্থ চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী— এই যুগেই আবির্ভূত হন। বাবু শ্যামসুন্দর দাস বহু নবীন বিষয়ে নানাপ্রকার গ্রন্থ রচনা করে হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যকে পরিণতি প্রদান করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ-যুগে এমন অনেক কৃতী প্রবন্ধকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়— যাঁরা ভাষাকে সক্ষম ও শক্তিশালী এবং সাহিত্যকে মননশীল, সরস ও সমৃদ্ধ করেছেন।

ভারতেন্দুর যুগে হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধও লেখা হত। ধারাটি নতুন হলেও তাতে প্রাণময়তা ছিল। দ্বিবেদী যুগে এসে দেখা যায় প্রবন্ধের যেন বান ডেকেছে। বিষয় ও শৈলীর অভিনবতার শেষ নেই। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, মনোবিজ্ঞান এবং সমীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কিন্তু এই বিরাট ভাণ্ডারে ব্যঙ্গ-বিনোদ পূর্ণ রচনার খুবই অভাব। একমাত্র চন্দ্রধর শর্মা গুলেরীর রচনাতেই মাঝে-মধ্যে রঙ্গ-রসের সাক্ষাৎ ঘটে। সম্ভবত তখন ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধকে সাহিত্য-পদ-বাচ্য বলে মনে করা হোত না। তাই লেখা হয় তো অল্প-স্বল্প হয়েছে কিন্তু তার স্বীকৃতি বা উল্লেখ সহজে চোখে পড়ে না। দ্বিবেদী-উত্তর যুগের সূচনা রামচন্দ্র শুক্লের হাতে। সে যুগে হাস্যব্যঙ্গমূলক প্রবন্ধের রচনা আবার শুরু হয়। সে ক্ষেত্রে যেমন নতুন নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেছে তেমনি নূতন ও বিচিত্রতর শৈলীও দেখা দিয়েছে। হরিশঙ্কর পরসাঈ বিষয়, শৈলী, ভঙ্গিমা প্রভৃতি সব দিক দিয়েই একজন অনুপম স্রষ্টা। লক্ষ্মীকান্তের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোপালপ্রসাদ একাধারে হাস্যরসের কবি ও প্রবন্ধকার দুই। তবে হরিশঙ্কর শর্মা এবং 'বেঢব বনারসী'র নিছক হাস্যরসের শৈলী যেন 'সেকেলে' হয়ে পড়েছে। ব্যঙ্গ, কটাক্ষ এবং কশাঘাতমূলক প্রবন্ধ আজ হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা।

সাম্প্রতিক হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যের দিকে তাকালে সর্বাঙ্গীণ বিচারে বলতে হয়— সমালোচনাত্মক নিবন্ধের মতো সাধারণ নিবন্ধ তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। ব্যক্তিগত ও ললিত নিবন্ধ (রম্য-রচনা) শাখার অবস্থাও অনেকটা তাই। তবে রচনার অজস্রতায় ছেদ নেই।

এখন হিন্দী সাহিত্যের কয়েকজন প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।—

মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী (১৮৭০-১৯৩৮)—দ্বিবেদীজী হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, মারাঠী এবং গুজরাটী ভাষাও জানতেন।

২২

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সরস্বতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সহজ-সুবোধ ভাষা-গঠন ও ব্যবহারেব পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তৎসম শব্দ, ব্যাকরণ-শুদ্ধি ও যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ এবং ছোটো-ছোটো বাক্যের ফের-বদল ঘটিয়ে তিনি তাঁর 'বিচারাত্মক' প্রবন্ধ লিখতেন। 'হিন্দী ভাষা কী উৎপত্তি' (১৯০৭), 'সাহিত্য-সীকর' (১৯৩০), 'রসজ্ঞ-রঞ্জন', 'সাহিত্য-সন্দর্ভ', 'প্রাচীন পণ্ডিত ঔর কবি' —প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়বস্তু চয়ন করেন। বিষয়-উপযোগী ভাষা ও শৈলীর সাহায্যে, প্রবন্ধ রচনা করেন। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'সরস্বতী'র সহায়তায় তিনি নিজে লিখেছেন, অন্যকে লেখায় উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, অ-লেখককে লেখক বানিয়েছেন, হিন্দী ভাষাকে সুস্থির, সুদৃঢ়, সবল ও সুন্দর রূপ দিয়েছেন। অন্যের ভাষা, ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর সংস্কার সাধন করেছেন। এইভাবে জনসাধারণের সামনে হিন্দীর একটি আদর্শরূপ তুলে ধরেছেন। মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর হিন্দীর ক্ষেত্রে এই কাজ, বঙ্গদর্শনের সাহায্যে 'সব্যসাচী' বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ভাষার নির্মাণ-কার্যের সঙ্গে বহুলাংশে তুলনীয়।

মাধবপ্রসাদ মিশ্র (১৮৭১-১৯০৭)—পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রবন্ধ-লেখনই মিশ্রজীর সাহিত্য-সাধনার মাধ্যম ছিল। এই শক্তিশালী লেখক কিছুদিন 'বৈশ্যোপকার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বারাণসী থেকে তিনি 'সুদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সম্পাদনাকালে তিনি বহু সাহিত্যিক প্রবন্ধ, সমীক্ষা প্রভৃতি লেখেন। তাঁর অন্তরে ছিল স্বদেশপ্রেম। স্নিগ্ধ-গম্ভীর ভাষায় তিনি লিখতেন। তাঁর ভাবাত্মক প্রবন্ধে যুক্তি-তথ্যের সঙ্গেই মাঝে মাঝে ঝাঁঝালো আক্রমণও থাকত। প্রায় ষাটটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। অধিকাংশ প্রবন্ধই সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো শাখা অথবা সংস্কৃত কবি-পণ্ডিত বা বিদ্বানদের নিয়ে লেখা। বিভিন্ন পার্বণ ও ব্রত-আদি বিষয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। প্রবন্ধপাঠে মনে

হয়, স্বমত-পোষণে তিনি বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন তাই বিরুদ্ধমত-খণ্ডনে অত্যন্ত আবেশ, রোষ এবং বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর প্রবন্ধের ভাষা বেশ সজীব ও জোরালো হয়ে উঠেছে। পরমত-অসহিষ্ণুতা তাঁর রচনার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব।

গোপালরাম গহমরী (১৮৬৬-১৯০৭)—প্রধানত ডিটেক্‌টিভ বা 'জাসুসী' উপন্যাসকাররূপে পরিচিত হলেও গহমরীজী সজীব, মনোরঞ্জক এবং কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ রচনা করেও খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী। তাই পাঠক তাঁর লেখায় যুগপৎ দর্শন ও পঠনের আনন্দ লাভ করে। এখানেই 'গহমরী'জীর ভাষার বিশেষত্ব। 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি কলকাতায় আসেন। পরে 'জাসুস' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর গদ্যভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' ও 'লোকরহস্যে'র গদ্যভঙ্গির অনুসৃতি লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ঋদ্ধি-সিদ্ধি' জাতীয় প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

বালমুকুন্দ গুপ্ত (১৮৬৫-১৯০৭)—দক্ষ সম্পাদক গুপ্তজী হিন্দী 'বঙ্গ-বাসী'র সম্পাদক হয়ে কলকাতায় আসেন। অবশেষে বঙ্গবাসী ছেড়ে 'ভারত মিত্রে'র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একজন আত্ম-বিশ্বাসী শক্তিশালী প্রবন্ধকার ছিলেন। তাঁর নানা রকমের বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে— 'গুপ্ত নিবন্ধাবলী' (১৯১২) নামে। সজীব, গতিশীল ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর ইপ্সিতভাব বিনোদপূর্ণ রচনা থেকে ব্যঞ্জিত বা বিচ্ছুরিত হয়ে আসত। গুপ্তজীর প্রবন্ধের এটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'শিবশম্ভুকা চিট্‌ঠা' (১৯৪৫-এ প্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গটি আগেই উল্লিখিত হয়েছে।[৩]

গোবিন্দনারায়ণ মিশ্র (১৮৫৯-১৯২৬)— সাহিত্যিক-নিবন্ধ রচয়িতা মিশ্রজীর লেখনী স্পর্শে ভাষা এবং ভঙ্গির মাহাত্ম্যে সাধারণ বিষয়ও কৌলীন্য লাভ করত। গদ্য রচনাতেও ধ্বনরি খেলা বা অনুপ্রাস যোজনায় তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাই কখনো-কখনো তাঁর গদ্য কাব্য-

ময়তার গুণে অপূর্ব হয়ে উঠত। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন 'প্রগল্ভ প্রতিভাস্রোত সে সমুৎপন্ন শব্দকল্পনা কলিত অভিনব ভাবমাধুরী' রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি 'তমতোম সটকতী মুকাতী পূরণ-চন্দ কৌ সকল মনভাঈ ছিটকী জুহ্ন পাঈ'ও আছে। সে যাই হোক, স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে তিনি গদ্যকে অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন— তেমনটি সে যুগে দুর্লভ ছিল।

শ্যামসুন্দর দাস (১৮৭৫-১৯৪৫)—কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শ্যামসুন্দর দাস হিন্দী ভাষা, সাহিত্য, প্রাচীন কবি-জীবনী ও পুঁথির অনুসন্ধান এবং ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু কাজ করেন, বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন। সুতরাং গুরু-গম্ভীর বিষয়ই তাঁর নিবন্ধে গৃহীত হয়েছে। বিচারমূলক ও ভাবাত্মক— উভয় প্রকার প্রবন্ধই তিনি লিখেছেন। বহু অস্পৃষ্ট বিষয়ও তিনি গ্রহণ করেছেন। তৎসমবহুল ভাষায় তদ্ভব শব্দের 'বেধড়ক' প্রয়োগ থাকলেও আরবি পারসি শব্দের ব্যবহার খুবই কম। সন্ধি-সমাস-প্রবাদ-বচন— প্রভৃতির প্রয়োগও কমই করেছেন। উপমা ও রূপকের সাহায্যে বিষয় প্রতিপাদন করেছেন। আধুনিক সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং প্রয়োজনের অনুকূল ভাষাকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন।

স্নাতক শ্যামসুন্দর দাস বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় হিন্দী পাঠ্যপুস্তকের অভাবপূরণে মনোযোগী হন। 'সাহিত্যালোচন' ও 'ভাষাবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বহু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেন। তাতে একদিকে যেমন প্রাচীন গ্রন্থাবলী আছে তেমনি 'হিন্দী-অভিধান', 'বৈজ্ঞানিক কোশ' এবং 'অশোকের ধর্মলিপি'ও আছে। কুড়িটি গ্রন্থ সম্পাদনা ছাড়াও তিনি— 'নাগরী-লিপি', 'সাহিত্যালোচন', 'ভাষা-বিজ্ঞান', 'ভাষা ঔর সাহিত্য', 'গদ্য-কুসুমাবলী', 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র', 'রূপক রহস্য', 'হিন্দী ভাষা কা বিকাস' ও 'গোস্বামী তুলসীদাস' প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন।

এখানে শ্যামসুন্দর দাসের আলোচক ও প্রবন্ধকার— দুই রূপই আমরা দেখতে পাই। ভাষা কোথাও গম্ভীর, বিশ্লেষণাত্মক ও গবেষণাসুলভ আবার কোথাও বা সরল, সুবোধ, সুগম ও বর্ণনামূলক। এক কথায় তাঁর ভাষা ও শৈলী সর্বত্র বিষয়ানুকূল। নাগরী প্রচারিণী সভার মাধ্যমে তিনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের যে উন্নতিবিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন, হিন্দীভাষা ও সাহিত্যানুরাগী মহলে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে যে উদ্যম, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শ্যামসুন্দর দাসের প্রয়াসও তদ্রূপ, কিংবা সমধিক, বললে অত্যুক্তি হবে না।

রামচন্দ্র শুক্ল (১৮৮৪-১৯৪০)—মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর যুগেই রামচন্দ্র শুক্ল লিখতে শুরু করেন। কিন্তু দ্বিবেদীজীর প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত এবং স্বতন্ত্র ছিলেন। উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলায় জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শেষে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রধানের পদে সমাসীন হন। এইরূপ, উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা থেকেই তাঁর স্বাধ্যায়ের গভীরতা ও প্রতিভার অনন্যসাধারণতা বুঝতে পারা যায়। তিনি একাধারে কবি, অনুবাদক, প্রবন্ধকার, সম্পাদক ও সমালোচক ছিলেন। তবে প্রবন্ধকাররূপেই তিনি সুপরিচিত। 'বুদ্ধচরিত', 'মনোহর ছটা', 'আমন্ত্রণ', 'মধুস্রোত', 'প্রকৃতি প্রবোধ' ও 'হৃদয় কা মধুরভাব'— প্রভৃতি তাঁর কাব্যকৃতি। তিনি বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজি থেকে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। 'নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা' ও 'আনন্দকাদম্বিনী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। 'তুলসী গ্রন্থাবলী' (দুই খণ্ড), 'জায়সী গ্রন্থাবলী' ও 'ভ্রমর-গীত-সার' (সুরদাস)— গ্রন্থত্রয়ের অনন্যকরণীয় সম্পাদনা করেন। সমালোচক-রূপেও তিনি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস রচনাও তাঁর অনন্য কৃতি।

রামচন্দ্র শুক্লের প্রবন্ধসাহিত্য যেমন বিশাল তেমনি বিচিত্র। তাঁর প্রবন্ধগুলি 'চিন্তামণি' নামে সংকলন গ্রন্থে (দুই খণ্ড) গৃহীত। চিন্তামণি প্রথম ভাগে দুই-শ্রেণীর প্রবন্ধ রয়েছে— মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। মনোবৈজ্ঞানিক অংশে উৎসাহ, শ্রদ্ধা-ভক্তি, করুণা, ঈর্ষা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবিকারের ভাবাত্মক-বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাহিত্যিক শ্রেণীতে রয়েছে সমীক্ষাধর্মী প্রবন্ধ। চিন্তামণির দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ভাবপ্রধান বিচারোত্তেজক ব্যবহারিক প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধে গদ্যের দুইটি রূপ চোখে পড়ে—সহজ-সরল, কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচনাত্মক শৈলী এবং গভীর-গম্ভীর গবেষণাত্মক শৈলী। বিষয়ানুকূল ভাষাশৈলী গড়ে নিতে শুক্লজীর কোনো অসুবিধা হত না। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক হলেও প্রত্যেকটি শব্দ যেন ওজন করে বসানো। নিবন্ধে অতি সহজেই গভীর হাসির সূক্ষ্ম রেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিবেচনাত্মক প্রবন্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— 'বিশুদ্ধ বিবেচনাত্মক প্রবন্ধের চরম উৎকর্ষ সেখানেই, যেখানে এক-একটি অনুচ্ছেদে বেশ ঘন করে বিচার-বিবেচনা ঠেঁসে ভরে দেওয়া হয়েছে আর এক-একটি বাক্য এক-একটি বিচার-খণ্ডে পরিপূর্ণ।' প্রতিপাদনের মৌলিকতা, স্বপক্ষ সমর্থনের বলিষ্ঠ উদ্যোগ এবং হাস্য-ব্যঙ্গময়তায় শুক্লজীর প্রবন্ধ নিতান্ত শুষ্ক ও বিষয়-প্রধান হতে পারে নি। তাঁর বহু-বাক্য প্রবাদ সূত্ররূপে প্রচলিত, যেমন— 'শত্রুতা হল রাগের আঁচার বা মোরব্বা' ('বৈর ক্রোধ কা অঁচার য়া মুরব্বা হৈ')। তাঁর ব্যঙ্গ-প্রধান রচনার কয়েকটি পংক্তি—

> 'লোভিয়োঁ! তুম্হারা অক্রোধ, তুম্হারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তুম্হারী মানাপমানসমতা, তুম্হারা তপ অনুকরণীয় হৈ ; তুম্হারী নিষ্ঠুরতা, তুম্হারী নির্লজ্জতা, তুম্হারা অবিবেক, তুম্হারা অন্যায় বিগর্হণীয় হৈ ; তুম ধন্য হো! তুম্‌হে ধিক্‌কার হৈ।'

এই অংশটি পড়তে পড়তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র 'গর্দভ', 'ইংরেজ-স্তোত্র' বা 'বাবু' প্রবন্ধের ভঙ্গি মনে পড়ে যায়। সব মিলিয়ে রাম-

চন্দ্র শুক্ল হিন্দী প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব। তাঁর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পথেই হিন্দীর প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য অগ্রসর হয়েছে।

চন্দ্রধরশর্মা গুলেরী (১৮৮৩-১৯২২)—সংস্কৃত ও ইংরেজির মনোযোগী ছাত্র চন্দ্রধর শর্মা সাদাসিদে— সরল ও সরস ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পাণ্ডিত্য ও হাস্য-ব্যঙ্গময়তার অপূর্ব সমন্বয় পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। 'সুখময় জীবন' (১৯১১), 'উসনে কহা থা' (১৯১৫) ও 'বুদ্ধ কা কাঁটা'— মাত্র এই তিনটি গল্প লিখেই তিনি হিন্দী ছোটো গল্পের জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনায় এই জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জয়পুর থেকে 'সমালোচক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। গুরু-গম্ভীর ভাবের বিনোদপূর্ণ রচনায় তিনি পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরিয়ে রাখতেন। সাহিত্যিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং আলোচনাত্মক— সব রকম প্রবন্ধই তিনি রচনা করেন। বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে তাঁর প্রবন্ধের ভাষা কোথাও হিন্দী বাক্‌রীতিসুলভ, সরল ও প্রাঞ্জল, আবার কোথাও সংস্কৃতনিষ্ঠ গুরু-গম্ভীর। ব্যাকরণের মতো শুষ্ক বিষয়কেও তিনি সরস ও উপভোগ্য করে তুলতেন। প্রাচীন হিন্দীর বিষয়ে গুলেরীজী বেশ মূল্যবান গবেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

সর্দার পূর্ণ সিংহ (১৮৮১-১৯৩২)—স্মরণ করা যেতে পারে এ-দেশে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল আধ্যাত্মিকতাও। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী রামতীর্থ ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও রাষ্ট্রীয়তার সমন্বয় ঘটে। সর্দার পূর্ণ সিংহের চিন্তায় স্বামী রামতীর্থের প্রভাব সক্রিয় ছিল। গভীর ভাবুকতায় তাঁর গদ্য রচনায় কাব্যের স্বাদ এসে যায়। ভাবুক প্রকৃতির ব্যক্তি হলেও বেশ দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে অহিতকর সমাজ-বিধানের বিরূপ সমালো-

চনা ও খণ্ডন করেন। সহজ-সরল ভঙ্গিতে সব রকমের শব্দ প্রয়োগ করে গদ্যকে অনায়াসে শিল্পরসে স্নিগ্ধ করেছেন। স্বাভাবিকতাই পূর্ণ সিংহের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাত্র পাঁচটি নিবন্ধ—'কন্যাদান য়া নয়নোঁ কী গঙ্গা', 'পবিত্রতা', 'আচরণ কী সভ্যতা', 'মজদূরী', 'প্রেম ওয় সচ্চী বীরতা'—রচনা করেই তিনি হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছেন। কারণ ভাষা, ভাব, ভঙ্গি ও স্বাভাবিকতার বিচারে তাঁর উচ্চ স্তরের রচনা 'স্বর্ণমুষ্টি'র মতো। পাঠক অতি সহজেই লেখকের সঙ্গে আনুভূতিক ঐক্য লাভ করে। এই আত্মীয়তা-বোধের সৃজনেই সর্দারজীর রচনার সার্থকতা। যেখানে ব্যঙ্গ বা লাক্ষণিকতা অভীপ্সিত, সেখানে তাঁর গদ্যভঙ্গি আরও সার্থক, সংবেদক ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক প্রবন্ধকারদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র পূর্ণ সিংহের রচনাতেই পাশ্চাত্য প্রবন্ধের গঠন সৌষ্ঠবের প্রতিফলন সমধিক।

জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদী (১৮৭৫-১৯৩৯)—কলকাতাবাসী জগন্নাথ-প্রসাদ হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ রচয়িতারূপেই পরিচিত। তিনি নানা উপ-লক্ষে অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক ভাষণ দেন—সেইগুলিই প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁর 'অনুপ্রাস কা অন্বেষণ' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ উচ্চ স্তরের। সরল-শুভ্র হাস্য-পরিহাস-ময়তার জন্য তাঁকে 'হাস্য-রসাবতার' বলা হত।

পদ্মসিংহ শর্মা (১৮৭৬-১৯৩২)—আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে তুলনাত্মক-আলোচনার সূত্রপাত পদ্মসিংহ শর্মাই প্রথম করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯০৭ সালের সরস্বতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর 'কবি বিহারী' ও পারসী কবি 'শেখসাদী'র কবিতার তুলনাত্মক আলোচনার কথা বলা যায়। অতঃপর 'ভিন্ন ভাষাওঁ কে সমানার্থী পদ্য', 'সংস্কৃত ঔর হিন্দী কবিতা কা বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব' এবং 'ভিন্ন ভাষাওঁ কী কবিতা কা বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব' (অগাস্ট ১৯০৯)— প্রভৃতি প্রবন্ধ তিনি লেখেন। তাঁর ভাষা বেশ সজীব এবং ওজঃপূর্ণ। একই প্রকারের বাক্য বা শব্দগুচ্ছের বার বার ব্যবহারের ফলে তাঁর বক্তব্য জীবন্ত হলেও অনেক সময় হালকা হয়ে

পড়েছে। অর্থাৎ বিষয়ানুকূল ভাষা-প্রয়োগের দিকে তাঁর লক্ষ ছিল না। উর্দু ও পারসীর অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর গদ্যে। তবে হাস্য ও ব্যঙ্গের প্রবাহে তিনি পাঠকদলকে সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। এখানেই তাঁর সার্থকতা। 'পদ্ম-পরাগ' ও 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন এবং 'হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্তানী'— তাঁর ভাষণ সংগ্রহ।

বাবু গুলাব রায় (১৮৮৭-১৯৬৩)—বিচার-বিশ্লেষণমূলক এবং ভাবাত্মক উচ্চস্তরীয় প্রবন্ধ রচনা করলেও গুলাব রায়ের প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই কম। 'কর্তব্য বিষয়ক রোগ', 'ব্যবস্থাপত্র ও চিকিৎসা' 'সমাজ ও কর্তব্য-পালন', 'আবার নিরাশ কেন ?'— জাতীয় যুগোপযোগী বিষয় নিয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। সাহিত্য ও সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। 'ফির নিরাশা ক্যোঁ ?' — ছোটো গ্রন্থ-টিতে বিচিত্র বিষয়ের ছোটো ছোটো প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'মেরী অসফলতায়েঁ' ও 'মন কী বাত' তাঁর আরও দুইটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সংগ্রহ। রায়জীর রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, নীতি-উপদেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিচার-ধারার পরিচয় মেলে। আর পাঠক, সহজ-সরল ও সুবোধ ভাষার আকর্ষণে লেখকের সঙ্গে কতকটা আত্মীয়তা অনুভব করে।

সিয়ারাম শরণগুপ্ত (১৮৯৫-১৯৬৩)—কবি মৈথিলীশরণ গুপ্তের অনুজ। তিনি কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটো গল্প এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর গদ্যে ও পদ্যে ধীর, শান্ত ও নির্মল প্রবাহ লক্ষিত হয়। তাতে পাঠকমন সহজে অভিভূত হয়। বিবিধ-বিচিত্র বিষয়ের স্বভাব-সুলভ আলোচনা করেছেন প্রবন্ধগুলিতে। 'ঝূঠ-সচ' প্রবন্ধ সংগ্রহে ভাষার নিজস্বতা, লঘুভাব ও সুখপাঠ্যতা লক্ষণীয়। গান্ধীবাদী গুপ্তজী নৈতিকতা, সত্য, অহিংসা ও প্রেম কে জীবনের শাশ্বত ভিত্তি বলে মনে করেন। কবিত্ব ও বিবেচনার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধে। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ-প্রহারও করেছেন 'ঘোড়াশাহী' জাতীয় নিবন্ধে। তাঁর অনাড়ম্বর, সহজ-সরল গতিসম্পন্ন ভাষার নিজস্ব আকর্ষণ রয়েছে।

জৈনেন্দ্রকুমার (১৮৯৫)—মূলত কথাসাহিত্যিক হলেও জৈনেন্দ্রের সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে নানা রকমের প্রবন্ধ-নিবন্ধ। গান্ধীর অহিংসাবাদ ও জৈনধর্মের অহিংসাত্মক-জীবনদর্শনের সমন্বয়ে জৈনেন্দ্রের যে জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে তার সুন্দর সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধে। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান দিয়েই তাঁর সাহিত্যশিল্প গড়ে উঠেছে। প্রবন্ধকাররূপে জৈনেন্দ্র যে এত খ্যাতি লাভ করেছেন তার মূলে রয়েছে এই দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সমন্বয়। তাঁর প্রবন্ধে বিষয় ও ভাষার সঙ্গে ব্যক্তিত্বেরও সুসমঞ্জস অন্বয় লক্ষিত হয়। তবে বিশ্লেষণাত্মক রচনায় বুদ্ধিনির্ভরতার মাত্রাধিক্য ঘটায় প্রবন্ধ কিছুটা গুরুভার হয়ে পড়েছে। জৈনেন্দ্রকুমারের চিন্তন ও মনন কত গভীর, ব্যাপক এবং বিচিত্র তা বোঝা যায় তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন-গুলির শীর্ষনামেই। যেমন— 'জড় কী বাত', 'গান্ধীনীতি', 'জৈনেন্দ্র কে বিচার', 'সংস্মরণ', 'ব্যক্তিবাদ', 'প্রস্তুতপ্রশ্ন', 'পূর্বোদয়', 'কাম, প্রেম ঔর পরিবার' এবং 'সাহিত্য কা শ্রেয় ঔর প্রেয়'।[৪] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি ভারতীয় ব্যক্তি, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা ও মানসিকতা প্রভৃতি— গভীর-ভাবে দেখেছেন ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও সার্থকতা।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী (১৯০৭-১৯৭৯)—উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার 'আরত তুবে কা ছপরা' গ্রামে জন্ম। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় কাশী থেকে 'শাস্ত্রী' ও 'জ্যোতিষাচার্য'-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত ও হিন্দীর অধ্যাপকরূপে যোগ দেন (১৯৩০-১৯৫০)। স্বাধ্যায়ে সংস্কৃত পালি-প্রাকৃত, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করেন। শান্তিনিকেতনে গভীর অধ্যয়ন ও মননের ফলে যে রুচি ও সৃজনশক্তির অধিকারী হন তাতে হিন্দী সাহিত্য অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে রামচন্দ্র শুক্লের পরেই দ্বিবেদীজীর স্থান। তাঁর আলোচনা গম্ভীর, সংযত,

ব্যাখ্যামূলক ও গবেষণাত্মক। আলোচক হলেও হিন্দী প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি বিষয়-চয়ন, লেখন-শৈলী এবং ব্যক্তিত্বের স্পর্শ প্রদানের নব-পন্থা নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে শিশুসুলভ সরলতা, অহংশূন্যতা এবং দৃঢ় আশাবাদ প্রতিফলিত। তিনি 'রম্য প্রবন্ধ' বা 'ললিত নিবন্ধ' রচনার দ্বারা হিন্দী প্রবন্ধশাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বিশেষত্ব হল, বক্তব্য— ঋজু ও প্রসন্ন এবং ভাষা— গদ্যকাব্যধর্মী। সে ভাষা— বাংলা ভাষার লালিত্য, ভোজপুরীর প্রবাদ ও বাগ্‌ধর্মিতা, সংস্কৃতের সমাসবৈদগ্ধ্য এবং বাউল ও নাথ-সাহিত্যের বাউণ্ডুলেপনা— মিলেমিশে অদ্ভুত মনোরম রূপ নিয়েছে। আবশ্যক গভীরতা ও গম্ভীরতার সঙ্গে তাঁর হাস্যোচ্ছল ব্যক্তিত্ব বিধৃত রয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। অতি সাধারণ বিষয়ও তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে এবং ভাষা ও ভঙ্গিমার গুণে রমণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'প্রাচীন ভারত কা কলাবিলাস', 'অশোক কে ফূল' (১৯৪৮), 'বিচার ঔর বিতর্ক' (১৯৪৫), 'কল্পলতা' (১৯৫১), 'বিচার প্রবাহ' (১৯৫৯), 'কুটজ' (১৯৬৪), 'হমারী সাহিত্যিক সমস্যায়েঁ' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে যে গদ্যরীতি হাজারীপ্রসাদ হিন্দী সাহিত্যে এনেছেন তা অনুপম এবং অনুকরণীয়। নিবন্ধ এবং তার বাহন ভাষাও যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শিল্প হয়ে উঠতে পারে—দ্বিবেদীজীর প্রবন্ধ পাঠে তা সহজেই বোঝা যায়।

প্রবন্ধ রচনায় বিষয়ানুসারী শৈলী প্রয়োগের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দ্বিবেদীজীর। তাই প্রবন্ধরাজ্যে তিনি স্বেচ্ছায় অবাধ বিচরণের অধিকারী ছিলেন। ললিত নিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমীক্ষাত্মক ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধও প্রচুর লিখেছেন। প্রবন্ধের মর্যাদায় ভূষিত তাঁর ভাষণও। পুরাণ ও ইতিহাসের বিলুপ্ত প্রসঙ্গের সংকেত দ্বিবেদীজীর প্রবন্ধে এক দুর্লভ শক্তি-দীপ্তি ও প্রাসঙ্গিকতা এনে দিয়েছে। হাজারী-প্রসাদ দ্বিবেদীর প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনি-কেতনের প্রেরণা অনেকখানি কাজ করেছিল— সে কথা দ্বিবেদীজী

মুক্তকণ্ঠে বার বার উল্লেখ করেছেন।[৫] বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের আন্তর ধর্ম দ্বিবেদীজীর মধ্যস্থতায় হিন্দী সাহিত্যে বিকাশলাভের সুযোগ পেয়েছে, এ কথা বললে অন্যায় হবে না।[৬]

পদুমলাল পুন্নালাল বক্সী (১৮৯৪-১৯৭১)—বক্সীজী ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-রচনার পক্ষপাতী। উদার ভাবের উদার অভিব্যক্তিই তাঁর প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। সমালোচক ও প্রবন্ধকার রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত। বিচারমূলক, সমীক্ষামূলক এবং ভাবপ্রধান— এই তিন শ্রেণীর প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। 'কলা ঔর কাব্য', 'আলোক ঔর তিমির', 'কল্পনা ঔর সত্য', 'সত্য ঔর ঝূঠ' তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'পঞ্চপাত্র', 'কুছ মকরন্দবিন্দু', 'প্রবন্ধ পারিজাত' ও 'ত্রিবেণী'।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩)—বহু ভাষাবিদ্‌ ও বহু বিষয়ের লেখক রাহুলজী সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গভীর মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। 'যাত্রানিবন্ধাবলী', 'যাত্রাকে পন্নে', 'বচপন কী স্মৃতিয়াঁ', 'মেরী জীবনযাত্রা' ও 'তুম্‌হারী ক্ষয়'— প্রভৃতি তাঁর প্রধান প্রবন্ধ-সংকলন। নামকরণেই প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য সূচিত হয়। 'তুহ্মারী ক্ষয়'—প্রবন্ধ সংকলনটিতে রাহুল সাংকৃত্যায়নের তীক্ষ্ণ ও বিধ্বংসী মনো-বৃত্তির পরিচয় মেলে। দেশ-বিদেশের ভ্রমণ কাহিনী নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। সংস্কৃতের খ্যাতনামা পণ্ডিত হয়েও তিনি প্রবন্ধের ভাষাকে সহজ, গতিশীল ও বিষয়ানুগ করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী শব্দের অবাধ ও সাবলীল ব্যবহার চোখে পড়ে।

নন্দদুলারে বাজপেয়ী (১৯০৬-১৯৬৭)—সমীক্ষার মাধ্যমে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন। প্রবন্ধই তাঁর বক্তব্যের মাধ্যম। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের আলোকে কবি ও কাব্যকৃতির মূল্যায়ন করেছেন। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধকে তিনি নৈতিকতার উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য বীসবীঁ শতাব্দী', 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯৫০), 'নয়া সাহিত্য

নয়ে প্রশ্ন' (১৯৫৫), 'জয়শঙ্কর প্রসাদ' এবং 'নিরালা' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত। প্রাঞ্জলতা, প্রবাহ ও শক্তির ছটায় তাঁর প্রবন্ধের ভাষা-বিশিষ্ট। সংযত ও সুসংগত ভাষার প্রবন্ধগুলি বিবেচনা ও সমীক্ষার বিচারে সার্থক। আলোচকের ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য শক্তি এবং সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। সাহিত্যের শাশ্বত মূল্যকে সৌন্দর্যবোধের কষ্টিপাথরে পরখ করার প্রয়াস তাঁকে সৌষ্ঠববাদী সমীক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী (১৯০৬-১৯৬৭)—ছায়াবাদী কাব্যের একজন বলিষ্ঠ সমালোচক শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদীর প্রবন্ধে কাব্যাত্মক সৌন্দর্য এবং মৌলিক প্রতিভার দীপ্তি-ছটা সর্বত্র ব্যাপ্ত। সাহিত্য ছাড়াও সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সার্থক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'সঞ্চারিণী', 'সাময়িকী', 'সাহিত্যিকী' 'কবি ঔর কাব্য', 'যুগ ঔর সাহিত্য', 'পথ-চিহ্ন', 'ধরাতল' (১৯৪৮), 'প্রতিষ্ঠান' (১৯৫৩), 'সাকল্য' (১৯৫৫)— প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধসংকলন। তা ছাড়া 'পদ্মনাভিকা' (১৯৫৩), 'আধান' (১৯৫৭) এবং 'বৃন্ত ঔর বিকাশ' (১৯৫৯) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থও প্রৌঢ়তা, ব্যাপকতা এবং সৌষ্ঠবের পরিচায়ক। তাঁর গদ্য-শৈলীতে বাংলা গদ্যের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হয়। 'কবি ও কাব্য' গ্রন্থে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ধৃতির সাহায্যে তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন। তিনি ললিত শৈলীর প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর ব্যক্তিনিষ্ঠ শৈলীই তাঁকে অন্য প্রবন্ধকারদের থেকে পৃথক রূপে চিহ্নিত করেছে।

রামধারী সিংহ 'দিনকর' (১৯০৮-১৯৭৫)—শক্তিমান কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'দিনকর'জী প্রবন্ধকাররূপেও স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। কোনো কোনো প্রবন্ধে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা সুস্পষ্ট। 'সংস্কৃতি কে চার অধ্যায়', 'অর্ধনারীশ্বর', 'মাটী কি ওর', 'রেতী কে ফূল' (১৯৫৪), 'হমারী সাংস্কৃতিক একতা', 'প্রসাদ', 'পন্ত ঔর মৈথিলী-শরণ গুপ্ত', 'রাষ্ট্রভাষা ঔর রাষ্ট্রীয় সাহিত্য'— প্রভৃতি দিনকরজীর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধগ্রন্থ। গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি সমস্যার মূলে প্রবেশ

করে প্রকৃতি ও গুরুত্ব বুঝে তার যোগ্য সমাধান খোঁজেন। তাঁর ভাষা বেশ বলিষ্ঠ এবং ওজঃপূর্ণ, সপ্রাণ ও সবেগ। উর্দু, আরবি, পারসি ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে তিনি সুদক্ষ। বিবেচক, বিশ্লেষক, দিনকরজী যে কবি ছিলেন, তা তাঁর হৃদয়ের মার্মিকতা ও ভাবুকতা দিয়েই বোঝা যায়। তাঁর শৈলী এমনই সহজ, নির্বাধগতি ও মনোরম যে, বিষয়ের গুরুত্ব ও ভাষার গাম্ভীর্য কখনও বোঝা বা ভার হয়ে উঠতে পারে না।

ড. নগেন্দ্র (১৯১৫)—শক্তিধর সমালোচকরূপে হিন্দী সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে ড. নগেন্দ্র প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগী হন। তাঁর প্রকাশিত পাঁচ-সাতটি প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'বিচার ঔর অনুভূতি' (১৯৩৪), 'বিচার ঔর বিবেচন' (১৯৪৯), 'বিচার ঔর বিশ্লেষণ' (১৯৫৫), 'অনু-সন্ধান ঔর আলোচনা' ও 'কামায়নী কে অধ্যয়ন কী সমস্যায়েঁ'—সমধিক প্রসিদ্ধ। বিচারপ্রধান শাখায় তাঁর সাহিত্যিক, সমীক্ষাত্মক ও সৈদ্ধান্তিক প্রবন্ধগুলি পড়ে। অন্য শাখায় পড়ে আত্মকথা, স্মৃতিচারণ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রবন্ধনিচয়। প্রবন্ধে বিচার বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সুপ্রযুক্ত শব্দাবলী তাঁর রচনাশৈলীর বিশিষ্টতার পরি-চায়ক। ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ রয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। নীরস-বিচার, বিতর্ক ও প্রমাণাদির তথ্য তাঁর রচনার প্রসাদগুণকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ব্যঙ্গ, হাস্য ও বিনোদ সৃষ্টি করে তিনি পরিবেশকে সরস ও আকর্ষণীয় করে রাখেন। তাঁর প্রবন্ধসমগ্র 'আস্থা কে চরণ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য যুগের হিন্দী প্রবন্ধরচয়িতাদের মধ্যে নগেন্দ্রজীর স্থান বেশ উঁচুতে— সে কথা বলাই বাহুল্য।

হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কয়েকজন লেখক আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা অল্প লিখেও বিষয়বস্তু, চিন্তন-মনন ও স্টাইলের জন্য স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছেন। দার্শনিকতা ও অস্তিভাবনামূলক বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিষয়ে বেশ উচ্চস্তরের প্রবন্ধ রচনা করেছেন হরিভাউ উপাধ্যায়। বনারসী দাস চতুর্বেদী এবং কহ্নৈয়ালাল মিশ্রের স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধও অনুরূপ গুরুত্বের সাক্ষ্য দেয়। কহ্নৈয়া-

লাল মিশ্রের রচনাভঙ্গির স্বকীয়তা কেবল স্মৃতিচারণেই নয়, যে কোনো বিষয়ে কলম ধরলেই, তাতে ফুটে ওঠে।

সাম্প্রতিককালে প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ছাপও উত্তরোত্তর গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনাও প্রবন্ধের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে সংযুক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন অতি সুন্দরভাবে সুষ্ঠু শৈলীর সাহায্যে রুচিকররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর বিচার-বিবেচনাও প্রবন্ধের গৌরবলাভ করে নিবন্ধ-প্রবন্ধের পংক্তিতে আসন লাভ করেছে। মনোবিজ্ঞান ও মনোবিশ্লেষণের পটভূমিতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-চিন্তন ব্যাপকভাবে পরিবেশের অনুকূল প্রমাণিত হয়েছে। রাজনীতি ও সমাজশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধও রচিত, সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

বিচারমূলক শৈলীর সাহায্যে সমীক্ষাত্মক প্রবন্ধ রচয়িতারূপে চন্দ্রবলী পাণ্ডেয়, ড. শিবনাথ, রাঁগেয় রাঘব, রঘুবংশ, গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেয়, বিশ্বম্ভর মানব, রামরতন ভটনাগর ও কহ্হৈয়ালাল সহল প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। সমালোচনার দিক্‌নির্দেশক গল্প ও কাব্যসমালোচনায় স্পষ্ট অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে নামবর সিংহ, বিজয়েন্দ্র স্নাতক এবং ইন্দ্রনাথ মদানের নাম স্মরণীয়। আলোচ্য যুগের হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ রচনাকারীদের মধ্যে হরিশঙ্কর পরসাঈ বিষয়বস্তু, শৈলী, ভঙ্গিমা প্রভৃতি সকল দিকের বিচারেই অনুপম। লক্ষ্মী-কান্তের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখায় গভীর ব্যঙ্গ আত্মগোপন করে থাকে। হাস্যরসের হিন্দী কবি গোপাল প্রসাদের ব্যঙ্গ-হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধগুলিও সার্থক-সৃষ্টি। নামবর সিংহের 'বকলম-খুদ' চিহ্নিত রচনাতেও হাস্যরস বিদ্যমান। এই সব প্রবন্ধকার হিন্দী হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধের ধারাটিকে উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় করে তুলেছেন। শাখাটি উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও পরিণতির পথে অগ্রসরমান। তবে তাতে 'নঈকহানী' ও 'নঈকবিতা'র মতো অরাজকতা আসে নি। বিচার-

বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিবেচক লেখকদের কল্যাণে প্রবন্ধ শাখার পুষ্টিবিধান ঘটছে। আলোচনাত্মক প্রবন্ধের লেখকরূপে পরশুরাম চতুর্বেদী, বিশ্বনাথপ্রসাদ মিশ্র, বিনয়মোহন শর্মা, শিবপূজন সহায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিন বিলোচন শর্মা, রামকুমার বর্মা, প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য। অন্যান্যদের মধ্যে ভদন্ত-আনন্দ কৌশল্যায়ন, মহাদেবী বর্মা, অমৃত রায়, মোহন রাকেশ, রঘুবীর সহায়, লক্ষ্মীচন্দ্র জৈন, শিবপ্রসাদ সিংহ, বিবেকী রায় এবং বালকৃষ্ণ রাও প্রমুখেরও উল্লেখ করা চলে। বালকৃষ্ণ রাও 'কমলাকান্ত জী নে কহা'— জাতীয় রচনায় গোষ্ঠী-স লাপ নিয়ে নতুন পরীক্ষা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তী' শৈলী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বলা চলে।

সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে রচিত ব্যক্তিনিষ্ঠ, সমীক্ষা-বিষয়ক ও হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধই এ যুগের প্রবণতার পরিচায়ক। প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সম্পূর্ণানন্দ, হাজারীপ্রসাদ, বাসুদেব শরণ, বিদ্যানিবাস, ভগবতীশরণ প্রমুখ ভারতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন লোকপারম্পর্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পূর্ণ অভিনব শৈলীতে বর্ণনা করেছেন। সমীক্ষামূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিকোণ এসেছে। শাস্ত্র ও অনুভূতির ভিত্তিতে সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয় এ যুগেই প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। সৌষ্ঠববাদী সমালোচক নন্দদুলারে বাজপেয়ীর আলোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অভিনব শৈলীতে রচিত। কাব্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এড়িয়ে হৃদয়ের সংবেদনশীলতা এবং আহ্লাদকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সমীক্ষামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি প্রয়োজনের মাপদণ্ডে কাব্যের মূল্যায়ন স্বীকার করেন নি। তাঁর প্রবন্ধগুলি গভীরতা ও ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। ড. নগেন্দ্রের মতো শক্তিমান সমালোচকও এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কাব্যশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে তাঁর প্রবন্ধে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। সেই আধারেই সমালোচনাও করেছেন। রসসিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন ও স্বীকরণের সহায়তায় তিনি মনোবিশ্লেষণাত্মক বিবেচনায় কবি ও কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন। বহু বিচিত্র প্রবন্ধ রচনার জন্য ড. নগেন্দ্র প্রবন্ধকার রূপেও প্রতিষ্ঠিত। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর সমীক্ষায় মানবতাবাদী ভিত্তিভূমি

ফুটিয়ে তোলার সুস্পষ্ট প্রয়াস লক্ষিত হয়। তিনি পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহায়তায় সাহিতিক সমীক্ষায় সমাজশাস্ত্রীয় তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। গবেষণা ও ইতিহাসের সমন্বয় দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধে।

হাস্যরসের ক্ষেত্রে প্রবন্ধশাখার বিস্তার এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। রামচন্দ্র শুক্লের যুগে হরিশঙ্কর শর্মা ও বেঢব বনারসীর হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধে ব্যঙ্গের তেমন গভীরতা ছিল না। তবে ব্যঙ্গ-কশাঘাত ও কটাক্ষপাতে পুষ্ট রচনায় বা প্রবন্ধে অনেকেই কুশলতা দেখিয়েছেন। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রভাষার সমস্যা নিয়েও বহু নিবন্ধ লিখিত হয়েছে। তাতে হিন্দীর প্রচার-প্রসারই নয়, ভাষার শক্তির দিকটিও বিশেষভাবে প্রতিপাদিত। স্বাধীনতালাভের পর ভাষাসমস্যা ও তার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত প্রয়োজন ছিল। আর প্রবন্ধ রচনা এবং পত্রকারিতা বা সাংবাদিকতার সাহায্যেই এই আলোকপাত সম্ভব। অতঃপর রাজনীতি ও সমাজশাস্ত্রের বিষয়েও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। তাই তার বিভিন্ন দিক যেমন— গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, জনগণ ও শাসন, নাগরিকতা, প্রজাতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নতুন করে বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। তবে বিচারের চেয়ে বর্ণনাই তাতে প্রাধান্য লাভ করেছে। হিন্দী মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকার সহযোগে হিন্দী প্রবন্ধশাখাটি সমৃদ্ধ হবার সুযোগ লাভ করেছে।[৭] এদিকে আবার 'নবলেখন' ধারার প্রভাবে হিন্দী প্রবন্ধে কিছুটা নতুনত্ব এসেছে। যদিও 'নবনিবন্ধ'— নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব এখনো স্বীকৃত হয় নি কিন্তু 'নবলেখন'-সমর্থক কিছুসংখ্যক লেখক হিন্দী প্রবন্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন দেখা যায়।

সাম্প্রতিক হিন্দী নিবন্ধের পরিধির দিকে লক্ষ করলে তার প্রবণতা বুঝে নিতে দেরি হয় না। হিন্দীর ব্যক্তিগত-প্রবন্ধ আলোচনাত্মক প্রবন্ধের মতো প্রগতিলাভ করতে পারে নি। হিন্দীর ললিত নিবন্ধে বা রম্য রচনায় তেমন উৎকর্ষ সামগ্রিকভাবে চোখে পড়ে না।

চার-পাঁচজন নবীন প্রবন্ধকার ছাড়া অন্যেরা প্রাচীন প্রভাব ও পারম্পর্যকেই অনুসরণ করে চলেছেন। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নগেন্দ্র, জৈনেন্দ্র ও অজ্ঞেয়ের প্রবন্ধশৈলীর সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম এমন লেখক বেশি নেই। বিদ্যানিবাস মিশ্র ও শিবপ্রসাদ সিংহের ঐতিহ্যবাদী লেখকও আর নেই। হরিশঙ্কর পরসাঈ হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে একক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এই সব অভাব সত্ত্বেও হিন্দীর প্রবন্ধশাখা পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, সমৃদ্ধ, ব্যাপক ও শৈলীগুণে বিশিষ্ট। প্রথম দিকে প্রবন্ধের পঠনপাঠন সীমিত ছিল পাঠ্যপুস্তকে। আজকাল পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতে এবং প্রবন্ধসংগ্রহে তা সুলভ এবং সুপাঠ্য।

লক্ষণীয়— হিন্দী কহানী-শাখার মতো প্রবন্ধের উৎকর্ষ চোখে পড়ে না। অর্থবৈচিত্র্য ও ভাষাশৈলীর গহন-গভীর অনুশীলন ও প্রয়োগ প্রাবন্ধিকদের বহুলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তবে ভাবপ্রধান প্রবন্ধে কাব্যধর্মী গদ্যের প্রয়োগ এ যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬)[৮] গ্রন্থের কাব্যাত্মক গদ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে হিন্দীর প্রবন্ধ লেখকগণ, তার অনুকরণে ব্রতী হন। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের ভাষার উদ্‌ভ্রান্তকারী প্রভাবের বেশ কিছুদিন ধরে অনুশীলন চলে প্রেমের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে এই শৈলীটি প্রেমেতর বিষয়ের মাধ্যমরূপেও স্বীকৃতি লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবন্ধভঙ্গির অনুসরণে রহস্যাত্মক, অলংকৃত এবং অন্যোক্তি-পদ্ধতিতেও প্রবন্ধ রচনার প্রবণতা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির সুললিত গদ্যের অনুসরণে হিন্দীতে অনুরূপ গদ্যের প্রবর্তন ঘটে। তাই এই গদ্যে রচিত ভাবাত্মক বা কাব্যময় সাহিত্যকে 'গদ্যকাব্য' নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে রায়কৃষ্ণ দাসের 'সাধনা', 'প্রবাল' ও 'ছায়াপথ'; বিয়োগী হরির 'ভাবনা' ও 'আর্তনাদ' এবং ভবঁরমল সিংঘীর 'বেদনা' প্রভৃতি গদ্যকাব্যের প্রসঙ্গ যথাস্থানে (পরবর্তী অধ্যায়ের 'আধুনিক কাব্যে'র শেষে 'গদ্যকাব্য'

অংশে) আলোচিত হয়েছে। 'বেদনা'র ভূমিকা লিখে দিয়েছেন রবীন্দ্রানুরাগী ভাষা-আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)।

অতীতের নানা ক্ষেত্রে বিচরণশীল ভাবুকতার প্রতি আকর্ষণের ফলে প্রবন্ধ রচনার শাখায় আরও একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে। অতীতের ভাবকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্রময় করে গদ্যরূপে তুলে ধরেছেন শ্রীরঘুবীর সিংহ। মুঘল যুগের মধ্যেই তাঁর বিচরণভূমি সীমিত রেখেছেন। তাজমহল, লালকেল্লা, জাহাঙ্গীর-নূরজাহাঁনের কবর প্রভৃতি নিয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধের ভাবাত্মক শৈলী এক কথায় অনবদ্য। তবে এই জাতীয় ভাবাতিরেকের ফলে হিন্দী গদ্য ও প্রবন্ধ যেন একদিক থেকে অতিমাত্রায় তরল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ফলে বিচার-বিবেচনা, সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য যে তথ্যনিষ্ঠা, বলিষ্ঠতা, ঋজুতা ও বিচক্ষণতা অপরিহার্য, তার স্বাভাবিক অনুশীলন ও বিকাশ যেন কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে— এ কথা বললে অন্যায় হবে না।

বিষয়-বৈচিত্র্য, স্টাইল ও অন্যান্য কারণে যে সব প্রাবন্ধিক বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের নাম এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।—

মাখনলাল চতুর্বেদী (১৮৮৯-১৯৬৮)—'সাহিত্য দেবতা'

পাণ্ডেয় বেচন শর্মা 'উগ্র' (১৯০১-১৯৬৬)—'ব্যক্তিগত' ও 'অপনী খবর'

রঘুবীর সিংহ (১৯০৮)—'সপ্তদীপ'

ধীরেন্দ্রকুমার বর্মা (১৮৯৭-১৯৭৩)—'বিচার ধারা'

রায়কৃষ্ণ দাস (১৮৯২-১৯৮০)—'রাম কে বনগমন কা ভূগোল'

বিয়োগী হরি (১৮৯৫)—'বুদ্ধিতরঙ্গ', 'বিচারতরঙ্গ' ও 'সাহিত্যতরঙ্গ'।

রামকৃষ্ণ শুক্ল (১৯০১-১৯৫৮)—'শিলী মুখ', 'কলা ঔর সৌন্দর্য' ও 'নিবন্ধ-প্রবন্ধ'।

রামবৃক্ষ বেনীপুরী (১৯০০-১৯৬৮)—'মাটী কী মূরতেঁ', 'গেহূঁ ঔর গুলাব' ও 'মঞ্জীরে ঔর দীওয়ারেঁ'।

বাসুদেব শরণ অগ্রওয়াল (১৯০৪-১৯৬৬)—'পৃথ্বীপুত্র' (১৯৪৯), 'কলা ঔর সংস্কৃতি' (১৯৫২) ও 'মাতৃভূমি' (১৯৫৩)।

সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন (১৯১১-১৯৮৭)—'ত্রিশঙ্কু', 'আত্মনেপদ' (১৯৬১), ও 'অরে যাযাবর রহেগা য়াদ'।

ইলাচন্দ্র যোশী (১৯০২)—'বিবেচনা', 'সাহিত্য সর্জনা' 'বিশ্লেষণ ওয় দেখা-পরখা'।

যশপাল (১৯০৩-১৯৭৭)—'চক্কর ক্লব', 'দেখা-সোচা-সমঝা', 'বাত মেঁ বাত', 'গান্ধীবাদ কী শব-পরীক্ষা' এবং 'ন্যায় কা সংঘর্ষ'।

প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত (১৯০৮-১৯৭০)—'নয়া হিন্দী সাহিত্য : এক ভূমিকা', 'সাহিত্যধারা' এবং 'রেখাচিত্র ঔর পুরানী স্মৃতি'।

রামবিলাস শর্মা (১৯১৪)—'প্রগতি ঔর পরম্পরা', 'সাহিত্য ঔর সংস্কৃতি', 'প্রগতিশীল সাহিত্য কী সমস্যায়েঁ' (১৯৫৪), 'প্রেমচন্দ', 'ভারতেন্দু যুগ', 'নিরালা' এবং 'বিরামচিহ্ন' (১৯৫৭)।

শিবদান সিংহ চৌহান (১৯১৮)—'সাহিত্যানুশীলন' (১৯৫৫), 'প্রগতিবাদ' : 'আলোচনা কে মান' (১৯৫৮) ও 'হিন্দী কে অস্সী বর্ষ'।

ড. সত্যেন্দ্র (১৯০৭)—'কলা', 'কল্পনা ঔর সাহিত্য', 'সাহিত্য কী ঝাঁকী' ও 'সমীক্ষাত্মক নিবন্ধ'।

বিনয়মোহন শর্মা (১৯০৫)—'দৃষ্টিকোণ' (১৯৫০), 'সাহিত্যাবলোকন' (১৯৫২), 'সাহিত্য-শোধ' ও 'সমীক্ষা' (১৯৬১)।

দেবরাজ উপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৮১)—'বিচার কে প্রবাহ', 'সাহিত্য তথা সাহিত্যকার', 'কথা কে তত্ত্ব', 'সাহিত্য কা মনোবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন', 'বচপন কে দিন' এবং 'জওয়ানী কে দিন'।

কন্হৈয়ালাল সহল (১৯১১-১৯৭৭)—'সমীক্ষাঞ্জলি', 'আলোচনা কে পথ পর' ও 'সমীক্ষায়ণ'।

প্রভাকর মাচওয়ে (১৯১৭)—'খরগোশ কে সীঁগ', 'ব্যক্তি ঔর বাঙ্‌ময়' ও 'সন্তুলন'।

বিদ্যানিবাস মিশ্র (১৯২৬)—'ছিতওয়ন কী ছাঁহ', 'তুম চন্দন হম পানী' ও 'কদম কী ফূলী ডাল'।

হিন্দী প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস করা গেল। এবার পর পর তার বিচিত্র রূপের অর্থাৎ 'সমালোচনা', 'সাহিত্যের ইতিহাস', 'গবেষণা', 'ভ্রমণ-কাহিনী', 'স্মৃতিচারণ', 'জীবন-চরিত', 'আত্মজীবনী', 'পত্রসাহিত্য', 'দৈনিকী', 'রেখাচিত্র', 'পত্র-কারিতা' ও 'ভেঁটবার্তা' বা 'সাক্ষাৎকার' প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দু-চার কথা বলা যাবে।

সমালোচনা সাহিত্য

সমালোচনা শব্দটি আধুনিক। সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রন্থাদির টীকাভাষ্য ও দোষগুণ নির্দেশের প্রথা ছিল। তবে তা সমালোচনারূপে গ্রাহ্য নয়।[৯] মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যে প্রথাটির অনুসৃতি লক্ষিত হয়। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগেও (১৮৫০-১৮৮৫) ধারাটি অব্যাহত ছিল। অবশ্য ভারতেন্দুর যুগেই আধুনিক সমালোচনার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় (১৮৮১) প্রবন্ধাকারে। গ্রন্থাকারে সমালোচনা ছিল চিন্তার অতীত।

এই সমালোচনা প্রথম মুদ্রিত হয় বদরীনারায়ণ চৌধুরীর 'আনন্দ-কাদম্বিনী'-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। লেখকের প্রধান লক্ষ্য ছিল শ্রীনিবাস দাসের 'সংযুক্তা স্বয়ংবর' নাটকের দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন। তুলনামূলক আলোচনার আভাস পাওয়া যায় বালকৃষ্ণ ভট্টের কয়েকটি প্রবন্ধেও। সে যুগের সমীক্ষকরূপে গঙ্গাপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী, বালমুকুন্দ গুপ্ত এবং অম্বিকাদত্ত ব্যাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। গ্রন্থরূপে কোনো সমালোচনার প্রকাশ তখনও শুরু হয় নি। পুস্তকাকারে সমালোচনা প্রকাশ করলেন মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীই সর্ব প্রথম। লালা সীতারাম কৃত সংস্কৃত গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদের ভাষা ও ভাব-বিষয়ক দোষ-গুণ বিচার করলেন দ্বিবেদীজী তাঁর 'হিন্দী কালিদাস কী সমালোচনা' (১৯০১) গ্রন্থে। অতঃপর তিনি কয়েকজন সংস্কৃত কবির বিশিষ্টতা ও ব্যতিক্রম-নির্দেশক আলোচনা গ্রন্থ লিখলেন। তার মধ্যে 'বিক্রমাঙ্ক দেবচরিত চর্চা', 'নৈষধ চরিত চর্চা' ও 'কালিদাস কী নিরংকুশতা'—প্রভৃতি প্রধান। যদিও এই সব আলোচনাকে সন্দেহাতীতভাবে সমালোচনা বলা চলে না, তবু, হিন্দী সাহিত্যিক মহলে ভাষা ও ভাব প্রভৃতির নির্বাচন ও ব্যবহারে বেশ সতর্কতা ও আন্তরিকতা দৃষ্ট

হয়। হিন্দী সাহিত্যের নির্মিতির পক্ষে যে এতে সুফল ফলেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই যুগের উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধরূপে মহাবীর-প্রসাদ দ্বিবেদীর— 'সমীক্ষা', 'কবি ঔর কবিতা' (১৯০৭), জয়শঙ্কর-প্রসাদের 'কবি ঔর কবিতা' (১৯১০), চন্দ্রমোহন মিশ্রের 'কবিতা কা মর্ম' (১৯১৫), দ্বারিকানাথ মৈত্রের 'আলোচনা', 'ভাষা ঔর সাহিত্য' (১৯১৫), কৃষ্ণবিহারী মিশ্রের 'ভাষা কী মধুরতা কা কবিতা পর প্রভাব' (১৯১৬), কম্লোমলের 'সাহিত্য ক্যা হৈ ?' (১৯২২) এবং রাম-চন্দ্র শুক্লের 'কবিতা ক্যা হৈ ?' (১৯০৯) তথা 'কাব্য মেঁ প্রাকৃতিক দৃশ্য' (১৯২৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দী সমালোচনা সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগ থেকে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর যুগ পর্যন্ত হিন্দী পত্র-পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে-ছিল। সেই সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'কবিবচনসুধা' (১৮৬৮), 'হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা' (১৮৭৩), 'হিন্দীপ্রদীপ' (১৮৮১), 'আনন্দ-কাদম্বিনী' (১৮৮১), 'কবি ও চিত্রকর' (১৮৯১), 'নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা' (১৮৯৭), 'সুদর্শন' (১৯০০), 'সরস্বতী' (১৯০০) ও সমা-লোচক' (১৯০২) প্রভৃতির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক আলোচনার রূপদানে সরস্বতীর গুরুত্ব সর্বাধিক সে কথা বলাই বাহুল্য। হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 'ঔর সমালোচনা সম্ভূষিতা'ও উদ্‌ধৃত থাকত। তার থেকে অনুমিত হয় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রই প্রথম আধুনিক হিন্দী সমালোচনা প্রকাশের কথা চিন্তা করে থাকবেন।

সমালোচনার দিকে আরও যাঁরা আকৃষ্ট হলেন তাঁদের মধ্যে মিশ্রবন্ধু, পদ্মসিংহ শর্মা, কৃষ্ণবিহারী মিশ্র এবং লালা ভগবান দাস স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মিশ্রবন্ধুদের প্রকাশিত 'হিন্দী নবরত্ন' (১৯১১) গ্রন্থটিতে কবিদের ভাষা, বিষয় ও শিল্পগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে হিন্দীর নয়জন কবি

সাহিত্যিকের মূল্যায়ন-প্রয়াস লক্ষণীয়। 'কবিদেব' কে বিহারীর চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়ে মিশ্রবন্ধুরা একটি বিতর্কের সৃষ্টি করলেন। হিন্দী সাহিত্যের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। 'বিহারী' ও 'দেবে'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিচার-বিশ্লেষণ, তথ্য-যুক্তি ও ভাব-অনুরাগভিত্তিক আলোচনা শুরু হল নানা মহল থেকে। ফলে বিহারী ও দেবের সাহিত্য বা কবিত্বের তুলনামূলক মূল্যবান আলোচনাতে হিন্দী পাঠক ও সাহিত্যরসিক মহল কৌতূহলী হয়ে উঠল, হল উপকৃতও।

পদ্মসিংহ শর্মা (১৯১৫-১৯৭৪) 'বিহারী সতসঈ কী ভূমিকা'— গ্রন্থে তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারা বিহারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন। ফলে বিহারী সম্পর্কে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হল। 'গাথা' সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হল। যদিও সে সমালোচনা, অত্যধিক-অনুরাগ ও পক্ষপাতদুষ্ট। তাঁর মতে—'বিহারী কী কবিতা শক্কর কী রোটী, জিধর সে তোড়ো মীঠী হী মীঠী।' (অর্থাৎ— 'বিহারীর দোহা চিনির পিঠে, যে দিকেই চাখো, স্বাদে মিঠে')। তাই মাঝে-মাঝে প্রভাববাদী সমালোচনার (Impressionist Criticism) রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলা যায়। তবে শর্মাজী পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাতে শাস্ত্রীয়নিষ্ঠা দেখাতেও কসুর করেন নি। মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়ও নিয়েছেন। তাই ব্যক্তিগত রুচি ও লক্ষ্যের বিচারে তিনি সর্বত্র সহানুভূতি ও উদারতা বজায় রাখতে পারেন নি।

কৃষ্ণবিহারী মিশ্র (১৮৯০-১৯৫৯) 'দেব ঔর বিহারী'— গ্রন্থে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তুলনামূলক বিচার করে, দেব ও বিহারী উভয়ের গুণ ও দোষ নির্দেশ করে দেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর বিচারে দেব 'পদ্মফুল' আর বিহারী 'জুঁই'। মিশ্রজীর 'মতিরাম গ্রন্থাবলী'র ভূমিকাটিও তুলনাত্মক আলোচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত। লালা ভগবান দীন 'বিহারী ঔর দেব' গ্রন্থে বিহারীর পক্ষ সমর্থন করেছেন। বিশ্বনাথ মিশ্রের 'বিহারী কী বাগ্‌বিভূতি'— শীর্ষক গ্রন্থে বিহারীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও ব্যঞ্জনা— প্রভৃতি বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনা করেছেন। শিলাকারীজীর লেখা 'বিহারী-দর্শন' গ্রন্থটিও এই ধারায় একটি মূল্যবান সংযোজন।

হিন্দী সমালোচনা সাহিত্যের আধুনিক দিকটি সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় রূপ নিয়েছে রামচন্দ্র শুক্ল এবং শ্যামসুন্দর দাসের যুগে। সমালোচনার দুইটি প্রধান ধারা দেখা গেল— সৈদ্ধান্তিক ও ব্যাবহারিক রূপে। যার একটি অপরটির পরিপূরক। একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বই অকল্পনীয়। তবে লক্ষণীয়— কোথাও এক পক্ষ দুর্বল, অপরটি সবল, আবার কোথাও উভয় পক্ষই সমান শক্তিসম্পন্ন। প্রাচীন ভারতীয় সমীক্ষা প্রধানত সিদ্ধান্তভিত্তিক। উদাহরণ-প্রয়োগের মধ্যেই ব্যাবহারিক পক্ষ সীমিত ছিল। হিন্দীতে ব্যাবহারিক আলোচনার মূলে আছে পাশ্চাত্যপ্রভাব। লক্ষিতব্য হল— সিদ্ধান্তপক্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য এত সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দীর আধুনিক সমালোচনার সূচনা ব্যাবহারিক সমালোচনাকে আশ্রয় করেই। দ্বিবেদী যুগ পর্যন্ত যে ব্যাবহারিক আলোচনা মেলে, তার ভিত্তি অবশ্য প্রাচীন-সাহিত্য-শাস্ত্রই। আধুনিক সৈদ্ধান্তিক ও ব্যাবহারিক সমীক্ষার প্রারম্ভ দ্বিবেদী যুগের পরে— রামচন্দ্র শুক্লের যুগে। শুক্ল-যুগের সৈদ্ধান্তিক হিন্দী সমালোচনাকে অন্তত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. শাস্ত্রীয় আলোচনা
২. সমন্বয়াত্মক আলোচনা
৩. স্বচ্ছন্দতাবাদী ও অভিব্যঞ্জনাবাদী আলোচনা
৪. উপযোগিতাবাদী আলোচনা
৫. মনোবিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
৬. সমাজশাস্ত্রীয় আলোচনা।

ভারতেন্দু ও দ্বিবেদী যুগে গ্রন্থের ভাব ও ভাষার দোষ-গুণ, নির্দেশ, কবিদের তুলনাত্মক আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমেই ব্যাবহারিক আলোচনার সূচনা—সে কথা আমরা জানি। রামচন্দ্র শুক্লের যুগেও ব্যাবহারিক আলোচনারই প্রাধান্য ছিল। তবে এক্ষেত্রে নূতনত্ব হল একই

আলোচক বিভিন্ন সাহিত্যিক বা সাহিত্যের পৃথক-পৃথক আলোচনা করে তার সংকলন প্রকাশ করলেন। এই যুগ থেকেই হিন্দী সাহিত্যের আলোচনাত্মক ইতিহাস লেখা শুরু হল। ব্যাবহারিক আলোচনায় সাহিত্য-কৃতি বা সাহিত্যকারের দোষ-গুণ, জীবন-বৃত্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যুগ-প্রভাব, লেখকের অন্তর্বৃত্তি এবং দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনাও বিবেচিত হতে লাগল। দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্র শুক্লের যুগে নির্ণায়ক ও তুলনাত্মক প্রবৃত্তি হ্রাস পেয়ে ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যামূলক, সমাজশাস্ত্রীয় ও মনস্তাত্বিক সমীক্ষা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ-যুগের ব্যাবহারিক আলোচনাকে চার শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে—

১. প্রাচীন কাব্য ও কবির সমালোচনা

২. আধুনিক কাব্য ও কবির সমালোচনা

৩. আধুনিক গদ্যকার ও গদ্যসাহিত্যের সমালোচনা

৪. মিশ্র বিষয়ের আলোচনাত্মক প্রবন্ধের সংকলন।

এই সব স্থূল ও সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখার ভাগ ও উপ-বিভাগ থাকলেও সাধারণভাবে সমালোচনা সাহিত্যের চারটি শ্রেণী পাওয়া যায়। তা হল—

১. প্রভাবাত্মক সমালোচনা (Impressionistic Criticism)— কোনো সাহিত্যকৃতি পাঠক বা সমালোচকের মনে যে ভালো বা মন্দ অনুভূতিজাত ধারণা সৃষ্টি করে, তারই পরিচয় প্রাধান্য পায় প্রভাবাত্মক সমালোচনায়। সমালোচকের ব্যক্তিগত ভালো লাগা ও মন্দ লাগাই এখানে উপজীব্য। এই ভালো বা মন্দ লাগার কোনো কারণ সমালোচক দেন না।

২. শাস্ত্রীয় নির্ণায়ক সমালোচনা (Judicial Criticism)— ভরত-মুনি, অভিনব গুপ্ত, মম্মট, বিশ্বনাথ, 'দশরূপক'-প্রণেতা ধনঞ্জয় প্রমুখ পণ্ডিতদের নির্দেশিত বিধান-অনুসরণে সমালোচ্য গ্রন্থের দোষ-গুণ নিরূপণ করে, তাকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলে অভিমত

প্রদান— শাস্ত্রীয় নির্ণায়ক সমালোচনার বিশিষ্টতা। মহাবীর-প্রসাদ দ্বিবেদী এবং মিশ্রবন্ধুদের সমালোচনা এই শ্রেণীর।

৩. ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা (Inductive Criticism)—সমালোচক প্রভাববাদীদের মতো নিজের অভিরুচি অথবা নির্ণয়াত্মক-বাদীদের মতো আচার্যদের নির্দেশিত পন্থাকে প্রাধান্য না দিয়ে কবি বা সাহিত্যিককেই প্রাধান্য দেন এই শাখায়। কবির সৃষ্টি-শীল আত্মায় প্রবেশ করে তাঁর আদর্শকে উপলব্ধি করে সমালোচ্য কৃতির স্বীয় আদর্শানুকূল ব্যাখ্যা করেন। সমালোচক যেন স্রষ্টা ও পাঠকের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ করে থাকেন। প্রাচীন ভারতের টীকা-ভাষ্য ছিল এই পর্যায়ের প্রয়াস। প্রাক্ আধুনিক ও আধুনিক যুগেও তার নিদর্শন দুর্লভ নয়।

৪. সৈদ্ধান্তিক আলোচনা (Speculative Criticism)—যে বিচার-বিবেচনা দ্বারা কাব্যের আদর্শ, তার বিভিন্ন অঙ্গের পরিচয় এবং সেই আদর্শের আনুকূল্য বিধানের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে সৈদ্ধান্তিক আলোচনা বলা চলে। এই আলোচনা নির্ণয়াত্মক সমালোচনার আধাররূপে গ্রাহ্য। হিন্দীতে শ্যামসুন্দর দাসের 'সাহিত্যালোচন', রামচন্দ্র শুক্লের 'চিন্তামণি' (দুই খণ্ড), গুলাব রায়ের 'সিদ্ধান্ত ঔর অধ্যয়ন', কন্হৈয়ালাল পোদ্দারের 'রস-মঞ্জরী' ও 'অলঙ্কারমঞ্জরী', পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র রচিত 'কাব্য-দর্পণ'— প্রভৃতি এই পর্যায়ের সমালোচনা গ্রন্থ। এই শ্রেণীর আলোচনায় সাধারণ জনরুচির দিকে লক্ষ রেখেই বিধান ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়ে থাকে।

আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল, তুলসীদাস, সুরদাস ও জায়সী— প্রভৃতির যে আলোচনা করেছেন তা ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার শ্রেণীভুক্ত। তাতে লোকজীবন-নিয়ন্ত্রণকারী নৈতিকতারও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই ধরনের আলোচনায়— ইতিহাসভিত্তিক পন্থানুসরণে কবির সমসাময়িক, রাজ-নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও তার প্রভাবের কথাও জানা যায়। লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর আধৃত তাঁর মানসিকতার সহায়তায়

তাঁর কৃতি অনুধাবনের প্রচেষ্টা করা হয়। এই আলোচনা মনোবৈজ্ঞানিক-পর্যায়েও স্থান পেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে লেখকমনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করা হয়। ড. নগেন্দ্র, সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' প্রমুখের আলোচনায় এই পদ্ধতির অনুসৃতি লক্ষিত হয়। প্রগতিবাদ নামের আড়ালে মার্কস্‌বাদী আলোচনা ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠেছে। এই আলোচনায় চাষী-মজুর, দলিত-শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের কাছে শিল্পের গুরুত্ব গৌণ হয়ে পড়েছে। এই শ্রেণীর আলোচক শ্রেণীহীন সমাজের সমর্থক। অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে সজাগ থেকে যাঁরা সমালোচনা করেন— তাঁদের মধ্যে শিবদান সিংহ চৌহান, রামবিলাস শর্মা, প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, ভগবৎশরণ উপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ-যুগের হিন্দী আলোচনা জগতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল। অবশ্য সাম্প্রতিককালে শুক্লজীর নীতি-নির্দেশ আর অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। তা সত্ত্বেও হিন্দী কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ প্রধানত তাঁর নির্দেশিত পথেই হচ্ছে। সাহিত্যিকদের বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। পণ্ডিত কৃষ্ণশঙ্কর শুক্লের 'কবিবর রত্নাকর' গ্রন্থে বিভাব-চিত্রণ এবং অলঙ্কার ও রসের তাত্ত্বিক বিবেচনার সঙ্গে ভাষার বিষয়ও আলোচিত। গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ (১৮৯৯-১৯৭৫) 'কেশব কী কাব্যকলা' (১৯৩৩) গ্রন্থে কেশবদাসের আচার্যত্ব ও কবিত্ব বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর 'পদ্মাকর কী কাব্যসাধনা'য় কবি পদ্মাকর সম্বন্ধে বহু অভিনব তথ্যের হদিস পাওয়া গেছে। ভুবনেশ্বর মিশ্র কৃত 'মীরা কী প্রেম সাধনা' (১৯৩৪) একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা-কৃতি। তাতে মীরার বিরহকীর্ণ-গীতিকাব্যের সুন্দর বিবেচন পাওয়া যায়। 'বঙ্গীয় হিন্দী পরিষদ্' (কলকাতা)-প্রকাশিত 'মীরাস্মৃতি' গ্রন্থেও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধে মীরার পদের উৎকর্ষ নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষিত হয়। রামকুমার বর্মা তাঁর 'কবীর কা রহস্যবাদ' (১৯৩১) গ্রন্থে হঠযোগ, রহস্যবাদ এবং কবীরের

অভিমতের প্রাঞ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'কবীর' (১৯৪১), 'সূর সাহিত্য' (১৯৪৩), 'নাথ সিদ্ধোঁ কী বাণিয়াঁ' এবং 'নাথ সম্প্রদায়' (১৯৫০)— প্রভৃতি গ্রন্থে সূরদাসের, কবীরের ও নাথপন্থী সাধকদের রচনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য ও গুরুত্ব বিচার করেছেন। গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেয় 'মহাদেবী বর্মা' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মহাদেবীজীর কবিতার মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। 'আধুনিক কবি' শৃঙ্খলার 'মহাদেবী বর্মা' গ্রন্থের ভূমিকায় মহাদেবীর স্ব-লিখিত অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের ভূমিকায় সুমিত্রানন্দন পন্ত, রামকুমার বর্মা ও গোপালশরণ সিংহের কাব্য-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। মহাদেবী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন নন্দদুলারে বাজপেয়ী তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য : বীসবীঁ শতাব্দী' গ্রন্থে। কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী-'নিরালা', সুমিত্রানন্দন পন্ত প্রভৃতির সাহিত্যিক-মূল্যায়ন করেছেন বাজপেয়ীজী ওই গ্রন্থে। গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেয় লিখিত 'মহাপ্রাণ নিরালা' গ্রন্থে 'নিরালা'র কবিত্ব-ব্যক্তিত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা রয়েছে। ড. নগেন্দ্র রচিত সুমিত্রানন্দন পন্ত (১৯৪২), 'সাকেত : এক অধ্যয়ন' প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচনার অভিনব শৈলীর সাক্ষাৎ মেলে। তাতে ভাবপক্ষের রসাস্বাদনের সঙ্গে বিশ্লেষণ-বুদ্ধি এবং শাস্ত্রীয় বিচার-পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে। তবে ক্ষেত্র-বিশেষে শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় সমালোচক স্ব-অভিরুচির দ্বারা চালিত হয়েছেন। সুমিত্রানন্দন পন্তের ভাষা ও শিল্পের অনবদ্য আলোচনা করেছেন তিনি। 'ছায়াবাদ' বা রহস্যবাদের ব্যাখ্যায় মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন। ড. নগেন্দ্রের 'রীতিকাব্য কী ভূমিকা' ও 'দেব কী কবিতা' গ্রন্থ দুইটি সৈদ্ধান্তিক ও ব্যাখ্যাত্মক সমালোচনার সুন্দর বিশ্লেষণাত্মক নিদর্শনরূপে গ্রাহ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ও উচ্চতম স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে রচিত কতিপয় গবেষণাপত্রও হিন্দী সমালোচনা শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। 'হিন্দী কাব্য মেঁ নির্গুণ সম্প্রদায়' (ড. বড়থ্বাল, মূল গ্রন্থটি ইংরেজিতে লিখিত), 'হিন্দী কবিতা মেঁ যুগান্তর' (১৯৫৭, ড. সুধীন্দ্র), 'মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী ঔর উনকা যুগ' (ড. উদয়ভানু), 'মালিক

মহম্মদ জায়সী' (ড. কমলকুল শ্রেষ্ঠ), 'হিন্দী কাব্য মেঁ প্রকৃতি চিত্রণ' (ড. কিরণকুমারী), 'প্রকৃতি ঔর হিন্দী কাব্য' (ড. রঘুবংশ) প্রভৃতি গবেষণাগ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। পরবর্তীকালে হিন্দীতে গবেষণা-কর্ম ও গবেষণা গ্রন্থের প্রাবল্য ঘটেছে। তবে আলোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম এমন গবেষণা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম।

জয়শঙ্কর প্রসাদের সাহিত্য নিয়েও উৎকৃষ্ট আলোচনা হয়েছে। নন্দদুলারে বাজপেয়ী (১৯০৬-১৯৬৭) কৃত 'জয়শঙ্করপ্রসাদ', রামনাথ 'সুমন' রচিত 'প্রসাদ কী কাব্য সাধনা', গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেয় কৃত 'কামায়নী এক পরিচয়', ব্রজভূষণ শর্মার 'কামায়নী এক বিবেচন', ফতে সিংহের 'কামায়নী সৌন্দর্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। 'প্রসাদ জী কী ধ্রুব স্বামিনী'ও কৃষ্ণকুমারের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা গ্রন্থ।

তুলসীদাসের জীবন ও সাহিত্য নিয়েও সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাগরী প্রচারিণী সভা প্রকাশিত 'তুলসী গ্রন্থাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। পরে তার রামচন্দ্র শুক্লের 'প্রস্তাবনা' অংশটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত। তাতে তুলসীদাসের ভাব যেন গদ্যে এসে নব রূপ লাভ করেছে। ব্যাখ্যাত্মক সমালোচনা হিসাবে যে এটি একটি উচ্চ স্তরের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। শ্যামসুন্দর দাসের 'তুলসীদাস' গ্রন্থে সন্ত-কবির জীবনী বিষয়ে 'মূল গুসাঁঈ চরিত' (তুলসী-শিষ্য বেনীমাধব দাস-কৃত 'গোঁসাঈঁ চরিত্র') আশ্রয় করে নব-আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থটিতে তুলসীদাসের শিল্প নিয়েও সার্থক আলোচনা করা হয়েছে। সদ্‌গুরু শরণ অবস্থী (১৯০১-১৯৭৩) তাঁর 'তুলসী কে চারদল' গ্রন্থটিতে তুলসীদাসের অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত 'জানকীমঙ্গল', 'পার্বতীমঙ্গল', 'রামললা নহছূ' এবং 'বরওয়ৈ রামায়ণ'— রচনাচতুষ্টয়কে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করেছেন। তাতে রস ও অলঙ্কার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। মাতাপ্রসাদ গুপ্ত রচিত 'তুলসীসন্দর্ভ' গ্রন্থে তুলসী-দাসের জীবন ও কালবিষয়ক বহু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত। রামদাস গৌড় রচিত 'রামচরিত মানস কী ভূমিকা'য় বৌদ্ধিকতা ও ভাবুকতার

মিশ্রণে রামায়ণের মূল্যায়নে নবীনতা এসেছে। রামবহোরে মিশ্র রচিত 'তুলসীদাস' পুস্তকে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঙ্গে তুলসী সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুস্মৃতি বা অনুকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। আলোচনায় মৌলিকতা ও বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। বলদেবপ্রসাদ মিশ্র (১৮৬৯-১৯০৫) তাঁর 'তুলসীদর্শন' গ্রন্থে তুলসীদাসের দার্শনিক-মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন—নিপুণতার সঙ্গে। তাঁর মতে তুলসীদাস অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

সুরদাসের 'ভ্রমরগীত-সার' গ্রন্থের ভূমিকায় রামচন্দ্র শুক্ল বিশদ মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন। বিয়োগ-শৃঙ্গার এবং প্রেম-প্রধান প্রবন্ধ (কাহিনী) কাব্যের বিচারে তাঁর জায়সী গ্রন্থাবলীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নলিনীমোহন সান্যালের 'ভক্তবর তুলসীদাস' এবং শিখরচন্দ জৈনের 'সুর : এক অধ্যয়ন' গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগ্রন্থ। নলিনীমোহন সান্যালের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মভিত্তিক হয়েও সাহিত্যিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। রামরতন ভটনাগর (১৯১৬) ও বাচস্পতি ত্রিপাঠী লিখিত 'সুরসাহিত্য কী ভূমিকা'য় সুর সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন— ভক্তির ইতিবৃত্ত, বল্লভাচার্যের সিদ্ধান্ত, সুরসাগরের সঙ্গে ভাগবতের তুলনা— প্রভৃতির মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে। রস-সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী সঞ্চারী ভাব ও মনোদশার আলোচনায় সুর-সাগর থেকে মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত সংকলিত হয়েছে। এই জাতীয় আলোচনা তুলসীসাহিত্য নিয়েও হয়েছে এবং হচ্ছে।

নলিনীমোহন সান্যালের (১৮৬১-১৯১৫) 'উচ্চবিষয়ক নিবন্ধমালা', হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'সুরসাহিত্য' ও ড. সত্যেন্দ্রজী রচিত 'সাহিত্য কী ঝাঁকী' প্রভৃতি গ্রন্থে বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক সামগ্রী আলোচিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর প্রথম এম. এ. (১৯২১-২২) সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতাদর্শের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর গ্রন্থে সুরদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।[১০] সত্যেন্দ্রজীর গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মের

ইতিহাসের সঙ্গে কিছু কিছু নতুন তথ্যও সংযোজিত হয়েছে। এই বিষয়ের আরও তথ্য পাওয়া যায় কন্হৈয়ালাল সহলের 'সমালোচনাঞ্জলি' গ্রন্থে। ড. নগেন্দ্রের 'সূরদাস' এবং হরবংশলাল শর্মার 'সূর ঔর উনকা সাহিত্য' সুন্দর সমালোচনার দৃষ্টান্ত। বর্তমানে সূর বিষয়ক বহু স্মারক গ্রন্থ ('সূর পঞ্চশতী অঙ্ক' ও 'আলোচনা গ্রন্থ') প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

হিন্দী সমালোচনা সাহিত্যে রামচন্দ্র শুক্লের স্থান শীর্ষে সে কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। তিনি তুলসীদাস-জায়সী ও সূরদাসের ('ভ্রমরগীত') বিষয়ে বিস্তৃত ও বিদগ্ধ সমালোচনা করেছেন। তার ফলে সমালোচনার সুন্দর আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। তাঁর আলোচনার সূত্র ও প্রণালী পাশ্চাত্য-সমালোচনার দ্বারা পুষ্ট ও অভিনবায়িত। তা সত্ত্বেও স্ব-মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ভারতীয় রসশাস্ত্রের বাইরে যেতে চান নি। তাঁর সৈদ্ধান্তিক আলোচনার প্রথমে তিনি সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে তার অনুযায়ীই আলোচনা করে থাকেন। তাঁর মতে ভাব ও বিভাব— উভয়ের পূর্ণ বর্ণনাই কবির কর্তব্য। বর্ণনার ভঙ্গি ও বর্ণ্য বিষয়— দুয়েরই উৎকর্ষের উপর সৎসাহিত্যের সৃজন নির্ভর করে। বিষয়-প্রাধান্যের সমর্থক শুক্লজী অভিব্যঞ্জনাবাদ (Expressionism)-এর গুণগ্রাহী ছিলেন না। ভাষা ও শৈলীর গুরুত্ব স্বীকার করলেও বিষয়ের উৎকর্ষের প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। অর্থাৎ 'সুন্দর' অপেক্ষা 'সত্য' ও 'শিবকে'ই তিনি শ্রেয় বলে মনে করতেন। শিল্প ও শিল্পাধারের বিচ্ছিন্নতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। সামাজিক মঙ্গল-ভাবনা দ্বারা তাঁর রসসিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত। তিনি মনে করেন— মানুষের চরিত্র বা স্বভাবের বিকাশের সাধন হল কাব্য। তার দ্বারাই বুদ্ধি, হৃদয় ও কর্ম-শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। এই তিনের সামঞ্জস্যশীলতাই বিকাশের চরম পরিণতি।

শ্যামসুন্দর দাস (১৮৭৫-১৯৪৫) তাঁর 'সাহিত্যালোচন' গ্রন্থে সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সমৃদ্ধি ও মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করে সমালোচনার কৃত্যটিকে সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন। সাহিত্য-

বিষয়ক কিছু সৈদ্ধান্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে নাটক, উপন্যাস ও কহানী প্রভৃতি সাহিত্যাঙ্গের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী হিন্দী সমালোচনার উপর যার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্বের প্রারম্ভিক তুলনাও নৈপুণ্যের সঙ্গে করা হয়েছে 'সাহিত্যালোচন' পুস্তকটিতে।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য'[১১] (১৯০৭) গ্রন্থটির অনুবাদ হিন্দী সাহিত্যের পাঠকবর্গের সাহিত্য ও সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধীয় রুচিকে সংস্কৃত ও পরিমার্জিত করেছে। এই অনুবাদ-পাঠ সাহিত্যানুভূতির নব-স্তর প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। 'সুধাংশুজী'র 'কাব্য মেঁ অভিব্যঞ্জনাবাদ' উচ্চ স্তরের কৃতি। তাতে ক্রোচের অভিব্যঞ্জনাবাদের অতিরিক্ত ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের কয়েকটি অভিমতের সার্থক বিচার-বিশ্লেষণ আছে। নলিনীমোহন সান্যালের 'সমালোচনা-তত্ত্ব'-এ মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইলাচন্দ্র যোশীর 'সাহিত্যসর্জনা' গ্রন্থে 'শিল্পের জন্য শিল্প' অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। আলোচনা প্রাচীনপন্থী ও ভাবুকতাপূর্ণ। পুরুষোত্তম শ্রীবাস্তবের 'আদর্শ ঔর যথার্থ' পুস্তিকায় উভয়পক্ষের অতি প্রাঞ্জল বিচার-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন-পরম্পরার রস ও অলঙ্কারের পুস্তকাদির মধ্যে কন্হৈয়া-লাল পোদ্দারের 'রসমঞ্জরী', 'অলঙ্কার মঞ্জরী', গুলাব রায়ের 'নবরস', অর্জুনদাস কেড়িয়াজীর 'ভারতী-ভূষণ', রামশঙ্কর শুক্ল 'রসালজী'র (১৮৯৮-১৯৮০) 'অলঙ্কার পীযূষ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। গুলাব রায়ের 'সিদ্ধান্ত ঔর অধ্যয়ন' এবং 'কাব্য কে রূপ' গ্রন্থ দুইটিতে রসনিষ্পত্তি ও সাধারণীকরণ প্রভৃতি রসসিদ্ধান্তের সমস্যা এবং সাহিত্যালোচনার প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার লক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিবেচনার জন্য রামদহিন মিশ্রের (১৮৮৬-১৯৫২) 'কাব্যালোক' বিশেষ উপযোগী। বলদেব উপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তারই সঙ্গে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের অভিমতও বিচার করেছেন। ড. ভগীরথ মিশ্র ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাস লিখেছেন।

হিন্দীর সাহিত্যাচার্য ও লেখকদের শাস্ত্রীয় শাখায় দানের পরিমাণ ও তার গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন।

প্রগতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত আলোচনা পদ্ধতির বিষয়েও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে শ্রীরামেশ্বর শুক্ল 'অঞ্চল' (১৯১৫) রচিত 'সাহিত্য ঔর সমাজ' ও জগন্নাথপ্রসাদ মিশ্র-কৃত 'সাহিত্য কী বর্তমান ধারা'— গ্রন্থ দুইটি প্রশংসার দাবী রাখে। শিবদান সিংহ চৌহান রচিত 'প্রগতিবাদ' পুস্তকটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দীতে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকা আলোচনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আজও রত। আগ্রা থেকে (চতুর্থ দশকে) প্রকাশিত 'সাহিত্য-সন্দেশ' আলোচনা-সাহিত্যকেই প্রধান লক্ষ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছে। 'সাহিত্য-সন্দেশে'র সৎ-প্রয়াসের ফলে আলোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব দ্রুততা ও সমৃদ্ধি এসেছে। 'সাহিত্য-সন্দেশে'র 'মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী', 'জয়শঙ্করপ্রসাদ', 'রামচন্দ্র শুক্ল', 'শ্যামসুন্দর দাস' ও 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র'-সংখ্যায়, তাঁদের সাহিত্যকৃতি ও ব্যক্তিত্বের সুন্দর সমীক্ষা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। 'উপন্যাস'-সংখ্যায় উপন্যাস-বিষয়ে নানাপ্রকার মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে 'সমালোচনা'-সংখ্যা, 'কহানী'-সংখ্যা এবং 'আধুনিক কাব্য'-সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আলোচনা' পত্রিকার সাহিত্যেতিহাস সংখ্যা প্রকাশ সত্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

আনন্দের বিষয় হিন্দীর আলোচনা সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার অগ্রগতি তেমন সন্তোষজনক নয়। সাম্প্রতিককালে পদুমলাল পুন্নালাল বকৃশী, ড. ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত, ড. রামচরণ 'মহেন্দ্র', ড. ধর্মবীর ভারতী, ড. বিনয়মোহন শর্মা, ড. গোপীনাথ তিওয়ারী, ড. পদ্মসিংহ শর্মা 'কমলেশ', অমৃত রায়, ড. সূর্যকান্ত শাস্ত্রী, ড. রামরতন ভটনাগর, ড. সরনাম সিংহ শর্মা প্রভৃতি সমালোচক তাঁদের মননশীলতা ও শিল্প-

মনস্কতার দৌলতে হিন্দী সমালোচনাকে উত্তরোত্তর বিকাশের পথে নিয়ে চলেছেন। সেই বিকাশ-ধারার স্বরূপটি আর একবার দেখা যেতে পারে।

হিন্দী সাহিত্য সমীক্ষার ক্ষেত্রে আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল একটি নিশ্চিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। কিছুটা পরিবর্তিত এবং সংশোধিত রূপে সেই পদ্ধতিই আজও অনুসৃত হচ্ছে বলা যায়। এই পদ্ধতি 'শুক্ল সমীক্ষাপদ্ধতি' নামে পরিচিত। এই পদ্ধতির পর স্বচ্ছন্দতাবাদী ও সৌষ্ঠববাদী পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা দেয়। বেশ প্রাচীন হলেও এই দুই পদ্ধতিই আবার সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে শুক্ল-পরবর্তী-কালে। ছায়াবাদী যুগের সাহিত্য সমীক্ষায় শুক্ল-পদ্ধতি পুরোপুরি সফল হতে পারে নি। নব রহস্যবাদী-সৌন্দর্যচেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত, দার্শনিক আভা ও মধুর কল্পনাপূর্ণ-অভিব্যঞ্জনার নবীনতা এবং সঙ্গীতময় ভাষার সাহায্যে পুষ্ট সাহিত্যের সমীক্ষার জন্য স্বচ্ছন্দতাবাদী ও সৌষ্ঠব-বাদী সমালোচনা পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যে মঙ্গলময় সৌন্দর্যের অনুভূতি লাভ ও অপরকে সেই অনুভূতি দানই সৌষ্ঠববাদী সমীক্ষার লক্ষ্য। সৌন্দর্য ও মঙ্গল, অনুভূতি ও অভিব্যক্তির সুন্দর সমন্বয়, ভাবজ্যোতির সংবেদনময় সাক্ষাৎকার প্রভৃতির স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নই সৌষ্ঠববাদী সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় শিল্পকৃতির তুলনায় শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও পরিবেশই সমধিক গুরুত্ব পায়। প্রত্যেক সাহিত্যকারই পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শাস্ত্রীয় নিয়মের সীমায় প্রতিভার সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি সর্বদা ঘটতে পারে না। তাই কাব্য-সৌষ্ঠব বা রমণীয়তা-সৃষ্টি এবং তার অভিব্যক্তির জন্য শাস্ত্রীয়নিয়মমুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। তাই সৌষ্ঠববাদী সমীক্ষায় স্বচ্ছন্দতাও এসে যায়। এই সমীক্ষার মাপদণ্ড সর্বদা পরিবর্তনশীল। শিল্পকৃতি থেকেই তার শাস্ত্রীয় কাঠামো নিয়ত গড়ে ওঠে। তারই ভিত্তিতে সে প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যায়নেও সক্ষম। কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে এই প্রণালীর সব

সমীক্ষকই দার্শনিকতা ও নৈতিকতাকে গৌণ করে— ভাবের গরিমা, মর্মস্পর্শিতা ও অভিব্যঞ্জনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তার জন্য প্রয়োজন সমীক্ষকের উচ্চস্তরের সহৃদয়তা এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি। নীতিমূলক আখ্যান কাব্যের চেয়ে প্রেম-গীতিমূলক কবিতার মধ্যেই ভাবসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা সহজ। অন্তত সহৃদয় সংবেদ্য বিশুদ্ধ কাব্যরস আস্বাদনের পক্ষে। এই স্বকীয় আস্বাদন ভঙ্গিরই আর এক নাম সৌষ্ঠববাদিতা। হিন্দী সমালোচনা যখন এইভাবে সুষ্ঠু, সুন্দর, সার্থক এবং চিরন্তন পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনই অকস্মাৎ তার গতিরোধ হল। রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার প্রবাহপথ। কিন্তু গতিশক্তি লোপ পায় নি। ফলে, তা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। সমালোচনার কয়েকটি প্রথা স্পষ্ট রূপ নেয়—ঐতিহাসিক, চরিতমূলক, প্রভাববাদী, সৌন্দর্যান্বেষী ও অভিব্যঞ্জনাবাদী নামে। জয়শঙ্করপ্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্ত, মহাদেবী বর্মা, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা', নন্দদুলারে বাজপেয়ী, ড. নগেন্দ্র ও হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী সৌষ্ঠববাদী ধারার প্রধান সমালোচক। এই ধারার ঐতিহাসিক শৈলীই মার্কস্‌বাদী সমালোচনা পদ্ধতির আশ্রয়ে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে শৈলীর স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে সুরক্ষিত। ভগবৎশরণ উপাধ্যায় ('নূরজাহান') ও ভুবনেশ্বর মিশ্র ('সন্ত সাহিত্য') প্রভাববাদী সমীক্ষক। শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী ও প্রকাশচন্দ্র গুপ্তের সমালোচনাতেও প্রভাববাদী স্বর স্পষ্ট। ইলাচন্দ্র যোশীর মেঘদূতের ব্যাখ্যায় সৌন্দর্যান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। অজ্ঞেয় সৌন্দর্যকেই কাব্যের লক্ষ্য মনে করেন। হিন্দী-সাহিত্যচিন্তকদের মধ্যে ইটালিয়ান দার্শনিক ক্রোচের অভিব্যঞ্জনাবাদ ও সৌন্দর্যদর্শনের অল্পাধিক অনুসৃতি লক্ষিত হয়। এই অভিব্যঞ্জনাবাদের সূচনা সম্ভবত ১৯২০ সালে, জার্মানিতে।

মানবতাবাদী সমাজশাস্ত্রীয়, ছায়াবাদোত্তর ও মার্কস্‌বাদী নামেও হিন্দী সমালোচনার ধারাকে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

যুগপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য ও সাহিত্যকারের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন— ঐতিহাসিক সমালোচনারূপে গণ্য হতে পারে। বিভিন্ন যুগে এই প্রণালী অবলম্বিত হলেও হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর হাতেই তার সম্যক ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সমালোচনায় ঐতিহাসিক শৈলীর অস্তিত্ব বেশ ভালোভাবেই অনুভূত হয়। মানবতা-বাদী সমাজশাস্ত্রীয় সমালোচকরূপেও দ্বিবেদীজীর কথাই বিশেষভাবে বলতে হয়। ছায়াবাদী কাব্য ও কাব্যদৃষ্টির প্রবণতা ছিল মুখ্যত শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দিকে। সমীক্ষাতেও ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিরই প্রাধান্য ছিল। আধুনিক হিন্দী সমালোচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব বেশ দ্রুত ও বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। তাই দ্বিবেদীজী সমাজশাস্ত্রীয় এবং বাজপেয়ী ও নগেন্দ্রজী ব্যক্তিবাদী পদ্ধতির দিকে প্রবণতা দেখিয়েছেন। ছায়াবাদোত্তরকালে এই ধারা দুইটি প্রবল হয়ে ওঠে। মনস্তাত্ত্বিক শাস্ত্র এবং দ্বন্দ্বাত্মক ঐহিকতার প্রভাবে হিন্দীতে যথাক্রমে ব্যক্তিবাদী ও সমষ্টিবাদী সাহিত্যদর্শন গড়ে ওঠে। তার থেকেই মনোবিশ্লেষণাত্মক এবং প্রগতিবাদী সমীক্ষা পদ্ধতির আবির্ভাব। যার ফলে স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে সাহিত্য ও সাহিত্যসমীক্ষার বিকাশ হয়েছে এবং হচ্ছে। 'জনতার জন্য সাহিত্য'— এই ধুয়ার সার্থকতার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা দিখা দিল, তার প্রয়োজনও স্বীকৃত হল। প্রথমদিকে প্রগতিশীলতার এই ধারা রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমচাঁদের স্বীকৃতি লাভ করলেও, পরে মার্কস্‌বাদী জীবন-দর্শন গ্রহণ করে তা সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। হিন্দীর প্রগতি-বাদী সমীক্ষা বুঝতে গেলে মার্কস্‌বাদী জীবনবোধের সঙ্গে সম্যক পরিচয় অপরিহার্য। ১৯৩৫ সন থেকেই হিন্দীতে মার্কস্‌বাদ গৃহীত হতে লেগেছে। শৈলীর বিচারে মার্কস্‌বাদী সমীক্ষা মূলত ঐতিহাসিক সমীক্ষার অনুগামী। সমাজের পটভূমিতে সাহিত্যের বিচার, তাতে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-সংগ্রামের স্বরূপ নির্দেশিত হয়। মুক্তিবোধ, নামবর সিংহ, চন্দ্রবলী সিংহ, প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, রাঁগেয়

রাঘব, শিবদান সিংহ চৌহান, রামবিলাস শর্মার সমালোচনা মার্কস্‌-বাদী-ধারায় পড়ে। এই ধারা সাধারণভাবে সমাজ-মঙ্গলের প্রবৃত্তির দিকে হিন্দী জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমালোচনায় ব্যক্তিনিষ্ঠা, ভাববাদিতা ও রূপবাদিতার বদলে— বিজ্ঞান, জনকল্যাণ, ইতিহাস ও বস্তুনিষ্ঠার দিকে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মার্কস্‌বাদী সমীক্ষার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পরবর্তী নব-সাহিত্যের সমালোচনার জন্য নব পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ প্রচলিত সমীক্ষার ধারা ও সিদ্ধান্ত সামনে রেখে নব-জাত (বিবর্তিত) সাহিত্যের সমালোচনা হয়তো সম্ভব ছিল না। তাই নব সমালোচনা পদ্ধতির চিন্তা দেখা দিল। এর ফলে উদ্ভূত বা গৃহীত সমালোচনা পদ্ধতিই 'নব সমালোচন' নামে পরিচিত। নব সমালোচনের ভিত্তি-নব-মানবতাবাদ। আর নব মানবতাবাদের উপর অতি-যথার্থবাদ, অস্তিত্ববাদ ও অরবিন্দ দর্শনের গভীর প্রভাব রয়েছে। এই পদ্ধতি সাহিত্যের অসাহিত্যিক মানদণ্ড মানে না, কেবল সাহিত্যরূপেই সাহিত্যের মূল্যায়ন চায়। তা সাহিত্যকারের সৃষ্টি ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সৌন্দর্যবোধের বিকাশ প্রভৃতিতেই সাহিত্যের শাশ্বত রূপ দেখতে চায়। তাতে অবশ্য বুদ্ধির স্বীকৃতিও আছে। প্রথম তারসপ্তক (১৯৪৩) সংকলনটির ভূমিকায় প্রথম নব সমালোচনার সুর শোনা যায়। 'প্রতীক' পত্রিকায় (১৯৪৬)— এই সমীক্ষাধারার রূপ স্পষ্ট হতে চায়। অতঃপর 'আলোচনা' পত্রিকায় (১৯৫৩) নব সমালোচনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মবীর ভারতী, নন্দদুলারে বাজপেয়ী, শিবদান সিংহ চৌহান, নামবর সিংহ প্রমুখের সম্পাদনায় 'আলোচনা' পত্রিকাটি এই শাখাকে সমৃদ্ধি ও পরিণতি দান করেছে। 'সমালোচক' (১৯৫৮-৫৯), 'বার্ষিকী' (১৯৬২), 'সমীক্ষা' (১৯৬৭) এবং 'নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা', 'হিন্দুস্তানী' ও 'মাধ্যম' প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকাও এই ধারার বিকাশে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

হিন্দীর ব্যাবহারিক সমালোচনার ইতিহাস দীর্ঘ না হলেও তার গুরুত্ব ও উপযোগিতা নগণ্য নয়। সমালোচনার নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তি-ভূমি প্রস্তুত হয়ে গেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে মানদণ্ড নিয়ে মত-পার্থক্য থাকলেও একই সঙ্গে ঐতিহাসিক, মনোবৈজ্ঞানিক, চরিতমূলক ও শাস্ত্রীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শৈলীর মিশ্রণে সমালোচনা এগিয়ে চলেছে। এতেই হিন্দী সমীক্ষার বর্তমান রূপ ও স্থায়িত্ব প্রতিফলিত। তবে মিশ্রণ এখনও সুমিত 'সমন্বয়ে' পর্যবসিত হয় নি। ভবিষ্যতে সমন্বয়বাদী সমালোচক গোষ্ঠির উদ্ভবে হয়তো সে অভাব দূর হবে এবং হিন্দী সমালোচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

নানাপ্রকার সংকোচ, সংস্কার ও রূঢ়িবাদিতা প্রভৃতির ফলে হিন্দীর ব্যাবহারিক সমালোচনা প্রত্যাশিত উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি, বলা চলে। যদিও সাহিত্য-শিল্পীর গুণ-বিচার, বৈশিষ্ট্য-নিরূপণ, তুলনামূলক সমীক্ষার সাহায্যে সূক্ষ্ম-পার্থক্য নির্দেশ ও শিল্পবিধির ক্রমবিকাশে পরিণত সমালোচনার দিকেই তার অগ্রগমন সূচিত হয়। উৎকৃষ্ট সমালোচনাও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এই সমালোচনা এখনও মুখ্যত পরিচয়াত্মক স্তর ও বর্ণনামূলক শৈলীকে অতিক্রম করে অধিক অগ্রসর হতে পারে নি। তাই অনুভূতির গভীরতা, সৃজনশীলতা, প্রভাব-গভীরতা ও উৎকর্ষের মূল্যায়নে সক্ষম সমালোচনার অভাব পুরোপুরী মেটে নি। স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী সমালোচক সিদ্ধান্ত ও শৈলীর আশ্রয় নিলেও তাতে সহজ-স্বাভাবিক সৃষ্টি-সৌন্দর্য, ভাবাত্মক সঙ্গীত-সুষমা, সুন্দর আনন্দময় জীবনাভিমুখী পথ-প্রদর্শনের প্রৌঢ়তা ও বৌদ্ধিকতার সুস্পষ্ট ও সঠিক পরিচয় সর্বত্র মেলে না। তা সত্ত্বেও সমীক্ষা-সচেতন হিন্দী-সাহিত্যের আত্মসমালোচনার প্রবণতা, শক্তি-সামর্থ্য ও বিশালতা তার সমালোচনা শাখার প্রত্যাশিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভরসা দেয়। প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি সাম্প্রতিক সমালোচনা ও আলোচনামূলক গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।— 'হিন্দীবাঙ্‌ময়' (১৯৭২)—ড. নগেন্দ্র; 'শুক্লোত্তর কাব্য

চিন্তন' (১৯৭৩)—শ্যামবিহারী রায় ; 'সাহিত্যসমীক্ষা ঔর সংস্কৃতি-বোধ' (১৯৭৭)—ড. দেবরাজ ; 'সমীক্ষা সিদ্ধান্ত' (১৯৭৮)—ড. কৃষ্ণ-দেব শর্মা ; 'শুক্লোত্তর হিন্দী আলোচনা' (১৯৮০)— সত্যদেব মিশ্র ; 'সাহিত্য কে নয়ে ধরাতল' (১৯৮০)— কেশরীকুমার ; 'সমকালীন হিন্দী কবিতা' (১৯৮২)—বিশ্বনাথপ্রসাদ তিওয়ারী ; 'সাঠোত্তরী হিন্দী কবিতা : পরিবর্তিত দিশায়েঁ' (১৯৮৬)— বিজয়কুমার এবং 'হিন্দী আলোচনা কী পরম্পরা ঔর আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল' (১৯৮৬)—শিবকুমার মিশ্র।

সব দিকের বিচারে হিন্দী প্রবন্ধ সাহিত্যের সমালোচনা শাখাটি যে সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যধারায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার এই সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সমালোচনা, আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচনা এবং উল্লেখযোগ্য অভিনব ভারতীয় সমালোচনা—ধারা-ত্রয়ের সমন্বয় এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যুগাভিমুখিতা।

সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্যের ইতিহাস বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আলোচনা নয়, তবু আলোচনার ইতিহাস বা বিকাশ-অনুধাবনের সময় তার উপেক্ষা করা চলে না। তাই হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গেল বর্তমান অধ্যায়ে। যদিও তা অতি সংক্ষেপে।

হিন্দী সাহিত্যের সর্বপ্রথম ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন একজন বিদেশী— 'গ্যাসেঁ ছ তাসী' (১৭৯৪-১৮৭৮)। গ্রন্থটির নাম 'ইস্তার ছলা লিতেরাত্যুর য়্যেন্দুঈ য়ে য়েঁ্যন্দুস্তানী' (তুই খণ্ড, ১৮৩৯ ও ১৮৪৬)। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে 'শিবসিংহ সেঁগর', 'শিবসিংহ সরোজ' (১৮৭৮) এবং 'জর্জ গ্রিয়র্সন' (১৮৫১-১৯৪১), 'মডার্ণ ভার্নাকুলার লিটারেচার অব্ হিন্দুস্তান' (১৮৮৯) রচনা করেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মিশ্রবন্ধু বিরচিত 'মিশ্রবন্ধু বিনোদ'ও (১৮১৩) এই জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলিকে সাহিত্যের ইতিহাসরূপে গণ্য করার প্রয়াস হলেও, কবি ও লেখকদের নাম এবং ইতিবৃত্ত সংকলন ব্যতীত অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। মিশ্রবন্ধু বিনোদে প্রায় পাঁচ হাজার কবির উল্লেখ আছে। একটি 'সুবৃহৎ কবি-বৃত্ত সংকলন' হলেও গ্রন্থটি ইতিহাস নয়। সাহিত্যের ইতিহাস কেবলমাত্র উপাদান সংকলন না হয়ে বিচার-নির্ভর ইঙ্গিতময়-সৃষ্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এদিক দিয়ে হিন্দী সাহিত্যের প্রথম বিবেচনাত্মক ইতিহাসের মর্যাদা পেতে পারে রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' গ্রন্থটি। এটি কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার বৃহৎ 'হিন্দী শব্দ সাগরে'র অষ্টম খণ্ডের ভূমিকারূপে 'হিন্দী সাহিত্য কা বিকাস' (১৯২৯) নামে লিখিত এবং পরে পরিবর্ধিত হয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৯৪০) হয়।

গ্রন্থটি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাত্মক পদ্ধতিতে রচিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রথম হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস। হিন্দী সাহিত্যের সুবিস্তৃত অঞ্চলের কবিদের বৃত্ত সংগ্রহ এবং সামগ্রিক সাহিত্যকৃতির আদি, মধ্য (পূর্ব ও উত্তর) এবং আধুনিক কালবিভাজনই সাহিত্যের ইতিহাসের একমাত্র পরিচায়ক নয়। শুক্লজীর মতে, 'শিক্ষিত জনগণের যে সব বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির অনুসরণে আমাদের সাহিত্যধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে এবং যে সব বলিষ্ঠ প্রভাবের প্রেরণায় কাব্যধারায় ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হয়েছে—সেই সবের সম্যক নিরূপণ এবং তদনুকূল সুসঙ্গত কালবিভাজন ব্যতীত সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ অধ্যয়ন সুকঠিন।'— (ভূমিকা : হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস) তাই শুক্লজীর ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নয়। প্রাসঙ্গিকভাবে যুগ-সাহিত্যের প্রবৃত্তি বোঝাতে গিয়ে তাঁকে আলোচনার সাহায্য নিতে হয়েছে। এক কথায় রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থটি 'হিন্দী সাহিত্যের সমীক্ষাত্মক ইতিহাস'।

১৯৩০ সালে শ্যামসুন্দর দাসের 'হিন্দী ভাষা ঔর সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। বৃহৎ অংশ জুড়ে ভাষার আলোচনা এবং শেষ অংশে সংক্ষেপে হিন্দী সাহিত্যের প্রগতির গতিপথ চিহ্নিত করেছেন লেখক। এক্ষেত্রে তিনি অন্যের অভিমত-সংকলন করেছেন, স্ব-মতের উপস্থাপনা করেন নি। কবি-পরিচয় ও কবি-কৃতি-সমীক্ষা যৎ-সামান্য থাকায় তাতে ইতিহাস-পাঠের তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাই শ্যামসুন্দর দাসের 'হিন্দী ভাষা ঔর সাহিত্য' গ্রন্থটিকে দ্বিধাহীন চিত্তে সাহিত্যের সার্থক ইতিহাস বলা চলে না। সূর্যকান্ত শাস্ত্রীর 'হিন্দী সাহিত্য কা বিবেচনাত্মক ইতিহাস' (১৯৩১) গ্রন্থটি এফ. ই. কীর (F. E. Key) 'হিন্দী লিটারেচার' (১৯২০) ও মিশ্রবন্ধুদের ইতিহাস গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত এবং উচ্চ স্তরের ছাত্র-পাঠ্যোপযোগী। ১৯৩১ সালে রামশঙ্কর শুক্ল 'রসাল' 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' রচনা করেন। বৃহদাকার পুস্তকে সম্ভাব্য

সকল প্রকার উপকরণের সমাবেশ ঘটেছে বললে অন্যায় হবে না। তবে আলোচনায় সঙ্গতি বা ভারসাম্যের নিতান্তই অভাব লক্ষিত হয়। কোনো-কোনো যুগের কোনো-কোনো বিভাগের আলোচনা অসঙ্গত-ভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তাই এটিকে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস বা আলোচনা না বলে 'সাহিত্যিকঅভিধান' বলা চলে। কবি অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় 'হরিঔধে'র 'হিন্দী ভাষা ঔর সাহিত্য কা বিকাশ' (১৯৩৪) গ্রন্থটি কবির পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণমালার সংকলন। আপন অভিরুচি অনুযায়ী লেখক হিন্দী সাহিত্যের রূপরেখা প্রস্তুত করেছেন। আবশ্যক মতো মতামতও ব্যক্ত করেছেন সাহিত্য-কৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে। রামচন্দ্র শুক্ল ও শ্যামসুন্দর দাসের উল্লিখিত রচনাদ্বয়ের সঙ্গে 'হরিঔধজী'র পুস্তকের কিছুটা সাম্য পরিলক্ষিত হয়। কবির সংখ্যা ও তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ অধিক হলেও কাব্যপ্রকৃতি, তার মূল-স্রোত ও প্রভাবের বিচার হয় নি, বললেই হয়। তবে আধুনিক যুগের সাহিত্যপ্রবৃত্তির, অর্থাৎ ছায়াবাদ, রহস্যবাদ, উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতি বিষয়ের অল্প-স্বল্প আলোচনা আছে।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা' (১৯৪০) বইটি ঠিক ইতিহাস নয়, কিন্তু তাতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হিন্দী সাহিত্যের প্রারম্ভিক ও মধ্য যুগের বিভিন্ন ধারার মূল স্রোত এবং তার প্রভাব যেভাবে আলোচিত হয়েছে, তাতে কৃতিটির ইতিহাস-ধর্মিতা নানা কারণে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এটি কেবল হিন্দী সাহিত্যেরই ভূমিকা নয়, হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসেরও ভূমিকারূপে গণ্য হতে পারে। তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য : উদ্ভব ঔর বিকাস' (১৯৫২) ছাত্রোপযোগী পুস্তকরূপে রচিত হলেও সতর্কতা ও সচেতনতার সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের প্রধান প্রবৃত্তিগুলিকে যথাসম্ভব পূর্ণ ও সরসরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাঝে-মাঝে নতুন তথ্য ও নব-সিদ্ধান্তের সাহায্যে বইটির গুরুত্ব ও স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ-ছাড়াও ছাত্র-উপযোগী পুস্তক আরও রচিত হয়েছে—রামনরেশ ত্রিপাঠীর 'হিন্দী কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'

(১৯২৩), রামশঙ্কর শ্রীবাস্তবের 'হিন্দী সাহিত্য কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৯৩০), মুন্সীরাম শর্মার 'হিন্দী সাহিত্য কে ইতিহাস কা উপোদ্‌ঘাত' (১৯৩১), গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'হিন্দী সাহিত্য' (১৯৩১), রামশঙ্কর শুক্ল-কৃত 'সাহিত্যপ্রকাশ ঔর সাহিত্য পরিচয়' (১৯৩১), নন্দদুলারে বাজপেয়ী রচিত— 'হিন্দী সাহিত্য কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৯৩১), ব্রজরত্নদাস-কৃত 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (১৯৩২), গুলাব রায় রচিত 'হিন্দী সাহিত্য কা সুবোধ ইতিহাস' (১৯৩৭), ড. সূর্যকান্ত শাস্ত্রী-কৃত 'হিন্দী সাহিত্য কা বিবেচনাত্মক ইতিহাস' (১৯৩২) ও 'হিন্দী সাহিত্য কী রূপরেখা' (১৯৩৮) এবং দেবীশরণ রস্তোগী রচিত 'হিন্দী সাহিত্য কা বিবেচনাত্মক ইতিহাস' (১৯৫২) প্রভৃতি। এইসব পুস্তকে সাধারণভাবে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা বা বিচার-বিশ্লেষণের গভীরতার ছাপ সব পুস্তকে বিশেষ নেই।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে হিন্দী সাহিত্যের সব দিকের প্রতিই লক্ষ্য রেখে। কিন্তু এমন ইতিহাস কৃতিও আছে, যাতে বিশেষ কোনো কাল অথবা সাহিত্যের বিশেষ কোনো প্রবৃত্তি বা বিভাগের বিকাশের ইতিহাসই বিধৃত হয়েছে। রামকুমার বর্মার 'হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস' (১৯৩৮) পুস্তকে আদি ও পূর্ব-মধ্যকালের হিন্দী সাহিত্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে। গৃহীত পরিধির ইতিহাস সুব্যবস্থিত ও সু-আলোচিত। পুস্তকটি গবেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে লেখা। তাই কোনো কোনো প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, সবগুলি নয়। ফলে অসঙ্গতি এসে গেছে। কালবিভাজন থাকলেও, আলোচনাকালে লেখক সেই বিভাজন মানেননি। কৃষ্ণশঙ্কর শুক্লের 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (১৯৩৪)-এ কেবলমাত্র আধুনিক যুগই আলোচিত, নাম থেকেই তা বোঝা যায়। লক্ষ্মীসাগর বার্ষ্ণেয় রচিত 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা' এবং 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য' (১৯৪০)-এ কেবল ভারতেন্দু পূর্ব (১৭৫৭-১৮৫৭) ও

ভারতেন্দু যুগের (১৮৫০-১৮৮৫) হিন্দী সাহিত্যের প্রসঙ্গ আলোচিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লালের 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য (১৯০০-১৯২৫) কা বিকাস' (১৯৪২) এবং ড. ভোলানাথের 'হিন্দী সাহিত্য' (১৯২৬-১৯৪৬) পুস্তক দুইটিও উল্লেখযোগ্য। হিন্দী নাটক ও উপন্যাস বিকাশের বিষয়েও বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। বিশ্বনাথপ্রসাদ মিশ্রের (১৯০৬-১৯৮২) 'হিন্দী নাট্যসাহিত্য কা বিকাস' (১৯২৯), ব্রজরত্ন দাসের (১৮৯০-১৯৬৩), 'হিন্দী নাট্যসাহিত্য' (১৯৩৮), গুলাব রায়-কৃত 'হিন্দী নাট্যবিমর্শ' (১৯৪০), দিনেশ নারায়ণ উপাধ্যায় রচিত 'হমারী নাট্যপরম্পরা' (১৯৪০), তারাশঙ্কর পাঠক (১৯১১-১৯৭৪)-কৃত 'হিন্দী কে সামাজিক উপন্যাস' (১৯৩৯), শিবনারায়ণ লালের 'হিন্দী উপন্যাস' (১৯৪০) প্রভৃতি কৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হিন্দী গদ্যসাহিত্য এবং তার বিভিন্ন বিভাগের ও শৈলীর বিকাশবিষয়ক এমন কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে যা একাধারে ইতিহাস ও ব্যাবহারিক সমীক্ষা— দুই-ই। গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'হিন্দী সাহিত্য কা গদ্যকাল' (১৯৩৪), রমাকান্ত ত্রিপাঠী রচিত 'হিন্দী গদ্য মীমাংসা' (১৯২৬), জগন্নাথ শর্মার 'হিন্দী গদ্যশৈলী কা বিকাস' (১৯৩০) ও প্রেমনারায়ণ টণ্ডন-কৃত 'হমারে গদ্য নির্মাতা' (১৯৪০) প্রভৃতি এই ধরনের কৃতি। হিন্দী সমালোচনার ইতিহাসরূপে— 'হিন্দী আলোচনা : উদ্ভব ঔর বিকাশ' (১৯৫৪), ভগবৎস্বরূপ মিশ্র ; 'হিন্দী আলোচনা কা ইতিহাস' (১৯৬০), রামশরণ মিশ্র এবং 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য মেঁ সমালোচনা কা বিকাশ' (১৯৬২), ভেংকট শর্মা— প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ড. পীতাম্বর বড়থ্বাল (১৯০১-১৯৪৪), রাহুল সাংকৃত্যায়ন, চন্দ্রবলী পাণ্ডেয় (১৯০৪-১৯৫৮), হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও গৌরীশঙ্কর 'সত্যেন্দ্র' প্রমুখের বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধে সাহিত্য, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারের বিষয়ে বহু নবীন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নব-মতের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাখ্যাও পাওয়া গেছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের

'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী'তে মহাযান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, 'বজ্রযান ঔর চৌরাসী সিদ্ধ', 'হিন্দীকে প্রাচীনতম কবি ঔর উনকী কবিতায়েঁ'—প্রভৃতি প্রবন্ধে মধ্যযুগের নির্গুণ কাব্যধারার পূর্ব পীঠিকা ও পারম্পর্য এবং তার মূল স্রোতের পরিচয় স্পষ্টতর হয়েছে। বড়থ্বালজীর গবেষণাপত্র 'দি নির্গুণ স্কুল অব্ হিন্দী পোইট্রী'র হিন্দী অনুবাদ 'হিন্দী কাব্য মেঁ নির্গুণধারা' ও তাঁর প্রবন্ধসংকলন 'যোগপ্রবাহ' (১৯৪৬)—কৃতি দুইটি পাণ্ডিত্য ও নানা মৌলিক তথ্যে পূর্ণ। কবিদের কাব্যের ভিত্তিতে তিনি নির্গুণ মতের দার্শনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। কবিদের জীবনবৃত্ত ও কাব্য-সম্বন্ধীয় অন্যান্য তথ্যও দেওয়া হয়েছে। নির্গুণ-ধারা বিষয়ে কৌতূহলী ব্যক্তির কাছে এ-দুইটির মূল্য অপরিসীম। চন্দ্রবলী পাণ্ডেয় নাগরী প্রচারিণী পত্রিকায়— কবীর, তুলসী, জায়সী প্রভৃতির জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। তথ্য, আলোচনাভঙ্গি এবং গুরুত্ব-নিরূপণের আন্তরিকতায় প্রবন্ধ কয়টি বিশেষ মূল্যবান। গৌরীশঙ্কর 'সত্যেন্দ্র' রচিত 'সাহিত্য কী ঝাঁকী' (১৯৩৬)-তেও কয়েকটি মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলিত।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা', 'কবীর', 'সূর-সাহিত্য' প্রভৃতি যে উচ্চস্তরের গবেষণা-কর্ম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম খণ্ডটি 'আধুনিক সাহিত্যের প্রাঞ্জলতা সাধন' এবং ভবিষ্যতের ইতিহাসের পথপ্রদর্শনের জন্য রচিত। আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা সুস্পষ্ট। প্রেরণা, আন্তর ও বাহ্য প্রভাব প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেছেন দ্বিবেদীজী। বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, দর্শন, জাতি-কুলের উৎপত্তি, বিকাশ এবং হ্রাসের কথাই সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণ ভারতীয় পটভূমিতে রেখে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। হিন্দী সাহিত্য যাতে মূল ভারতীয় সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখা হয়— তার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। হিন্দী সাহিত্যে উপলব্ধ সমগ্র উপকরণ একত্রিত করে ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে তার শৃঙ্খলাবিধান, সম্পর্ক-নিরূপণ এবং মূল্যায়ন করে দ্বিবেদীজী হিন্দী সাহিত্য পাঠের নবীন পন্থা ও নব

উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন। 'সূর সাহিত্য' ও 'কবীর' গ্রন্থ দুইটিতে বস্তু-বিন্যাস, আলোচনাভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত-নিরূপণে সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য, বাঙালি বুদ্ধিপ্রবণতা এবং বিস্তৃত ও উদার মানসিকতার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। যেভাবে যে মৌলিক-সিদ্ধান্তে লেখক উপনীত হয়েছেন, নানা কারণে তা 'বৃহৎ-উপলব্ধি' হয়ে থাকবে। তা ছাড়াও নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা মূল্যবান উপকরণ একত্রিত করে তা দিয়ে ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ রচনা ও তাতে প্রয়োজনীয় টীকাভাষ্য সংযোজন করে তিনি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভাষা ও গ্রন্থনা-গুণেও 'সূরসাহিত্য' ও 'কবীর' মৌলিকতার স্বাদ বহন করে।

হিন্দী সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস—এ পর্যন্ত অন্তত চোদ্দ-পনেরোটি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে দশটি একখণ্ডে এবং পাঁচটি দুই থেকে ষোলো খণ্ডে সম্পূর্ণ। আবার বেশ কয়েকটি খণ্ডিত ইতিহাসও লেখা হয়েছে। আর যুগ বিশেষের প্রবৃত্তি ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ের সংখ্যাও কম নয়।[১২]

'হিন্দী সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস' রচনার মহৎ এবং গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—'কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা'। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে সভার হীরকজয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে হিন্দী 'শব্দসাগর', 'হিন্দী বিশ্বকোষ' ও 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কাল-বিভাগ, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রধান-প্রধান প্রবৃত্তি ও তার বিকাশ-পথ, উত্থান-পতন, সামঞ্জস্য ও সমন্বয়, সমীক্ষা ও মূল্যবিচার, এবং প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণের সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার প্রভৃতিকে আদর্শরূপে সামনে রেখে, শুদ্ধ সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, সমাজ-শাস্ত্রীয় ও মানবীয় দৃষ্টির সাহায্যে ষোলো খণ্ডে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কার্য সম্পন্ন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দী সাহিত্যের জন বাইশেক দিক্‌পাল সাহিত্যিক ও পণ্ডিতকে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক করে প্রায় আশি থেকে একশো জন যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে এই বৃহৎ ইতিহাস রচনার মহাযজ্ঞের সূচনা ঘটে। প্রত্যেকটি খণ্ডের বিভিন্ন

পর্যায়গুলি চার থেকে ছ'জন লিখেছেন, পৃথক পৃথক ভাবে অথবা বারোয়ারি-ভিত্তিতে। বিষয় ও কালের দিকে দৃষ্টি রেখে খণ্ডগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে এইভাবে—

প্রথম ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি
দ্বিতীয় ভাগ—হিন্দী ভাষার বিকাশ
তৃতীয় ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের উদয় ও বিকাশ (১৩৪৩ সাল পর্যন্ত)
চতুর্থ ভাগ—ভক্তিকাল (নির্গুণ ভক্তি : ১৩৪৩-১৬৪৩)
পঞ্চম ভাগ—ভক্তিকাল (সগুণ ভক্তি : ১৩৪৩-১৬৪৩)
ষষ্ঠ ভাগ—শৃঙ্গারকাল (রীতিবদ্ধ : ১৬৪৩-১৮৪৩)
সপ্তম ভাগ—শৃঙ্গারকাল (রীতিমুক্ত : ১৬৪৩-১৮৪৩)
অষ্টম ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের অভ্যুত্থান (ভারতেন্দু কাল : ১৮৪৩-১৮৯৩)
নবম ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের পরিষ্করণ (দ্বিবেদী কাল : ১৮৯৩-১৯১৮)
দশম ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষকাল (কাব্য : ১৯১৮-১৯৩৮)
একাদশ ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষকাল (নাটক : ১৯১৮-১৯৩৮)
দ্বাদশ ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষকাল (গল্প-উপন্যাস : ১৯১৮-১৯৩৮)
ত্রয়োদশ ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষকাল (প্রবন্ধ-সমালোচনা : ১৯১৮-১৯৩৮)
চতুর্দশ ভাগ—হিন্দী সাহিত্যের সাম্প্রতিক কাল (১৯৩৮-১৯৫৩)
পঞ্চদশ ভাগ—হিন্দীতে শাস্ত্র ও বিজ্ঞান
ষোড়শ ভাগ—হিন্দী লোকসাহিত্য

এই প্রকাশন যে অতি মূল্যবান ও অদ্বিতীয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডই হিন্দী সাহিত্যের এক-একটি কাল-পরিধিকে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছে। প্রাসঙ্গিক হলেও উপযুক্ত ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই অন্য-ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় সাহিত্যও আলোচিত হয়েছে সশ্রদ্ধচিত্তে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভা' এক অভূতপূর্ব সাহিত্যিক মহাযজ্ঞে বহুর 'পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' হিন্দী-ভারতীর অভিষেক-মানসে 'সবার পরশে

পবিত্র করা' চিত্ত-নীরে ভারতমাতার অভিষেক সম্পন্ন করে কৃতার্থ হয়েছেন। ঋণী করেছেন সাহিত্যানুরাগী মানবজাতিকে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ-এক অচিন্তিতপূর্ব, অবশ্যানুকরণীয় আদর্শ। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে এ-কথাও বলতে হয় যে, 'গল্প-উপন্যাসে'র দ্বাদশ খণ্ডটির এবং অন্য কোনো কোনো খণ্ডের সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষ বিধানের আরো অবকাশ ছিল, বলে মনে হয়।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে লেখা আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বচ্চন সিংহ-কৃত 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (১৯৭৮)। এ-গ্রন্থে লেখক আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের বিভিন্ন দিক কিছুটা বিশ্লেষণ ও কিছুটা সমন্বয়াত্মক ভঙ্গির সাহায্যে আলোচনা করেছেন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপ এবং ঐতিহাসিক রেখাপথ পাওয়া যায় গ্রন্থখানিতে।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের আলোচনাও আজকাল হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ড. রূপচন্দ পারীকের 'হিন্দী সাহিত্য কে ইতিহাস গ্রন্থো কা আলোচনাত্মক অধ্যয়ন' (১৯৭২) এবং ড. কিশোরীলাল গুপ্তের 'হিন্দী সাহিত্য কে ইতিহাসোঁ কা ইতিহাস' (১৯৭৮)— গ্রন্থ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে— ইতিহাস শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ, ইতিহাস গ্রন্থের পূর্ব পীঠিকা, কবিবৃত্তসংগ্রহ, ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস, শুক্লযুগ, হাজারীপ্রসাদ যুগ, খণ্ডিত ইতিহাস, বৃহৎ ইতিহাস, মাঝারি ইতিহাস, বিভিন্ন শাখার ইতিহাস এবং উপসংহার নিয়ে এগারোটি অধ্যায় আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থেও প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই আছে আটটি অধ্যায়। বই দুইটির একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়।

গবেষণা সাহিত্য

গবেষণা বা 'শোধ' কর্মটি আধুনিক। গবেষণা প্রবন্ধ শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও সাহিত্যের কোঠায় তাকে রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে সাহিত্যরসে স্নিগ্ধ হতে গবেষণা পত্রের কোনো বাধা নেই। তাই তার প্রাসঙ্গিক আলোচনার সার্থকতাও মেনে নেওয়া যায়।

হিন্দী সাহিত্যের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'হিন্দী কাব্য কী নির্গুণ কাব্যধারা (১৯৩৪), পীতাম্বর বড়থ্বালের ইংরেজি শোধগ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ। এই গুরুত্বপূর্ণ শোধকর্মের জন্য তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। গ্রন্থটি পাণ্ডিত্য ও মৌলিক আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। তাতে নির্গুণধারার কবিদের কাব্যের নিরিখে নির্গুণ মতের দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিরূপিত হয়েছে। বেদ-উপনিষদ্, বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ প্রভৃতির সঙ্গে সাম্য প্রদর্শিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য এমন আলোচনা এর আগে হয় নি। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর গবেষণাত্মক গ্রন্থ 'সূরসাহিত্য' ও 'কবীর'-এর প্রসঙ্গ আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

স্বাধীনতা লাভের পর অন্তত এগারো-বারো শো হিন্দী গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, হিন্দীতে গবেষণা করার সুযোগ দেখা দিয়েছে সারা দেশ জুড়ে। তাই প্রচুর সংখ্যায়, বিপুল-বিপুল আয়তনের গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। তবে অধিকাংশ কৃতিই উপাধি লাভের জন্য, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নি। তাই প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থের সংখ্যা তুলনায় কমই। গবেষণার দ্বারা নবীন তথ্য, নতুন সংবাদ, নবীন বিচারধারা ও নব সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। সৃজনমূলক রচনা ও অনুসন্ধান কৃতি এক বস্তু নয়। গবেষণা বস্তু-প্রধান তথ্যনিষ্ঠ রচনা। তাতে গবেষক অতি সতর্কতায় নিঃসঙ্গতার

সঙ্গে তথ্যের ও তত্ত্বের অনুশীলন করে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কখনও কখনও গবেষকের সাহিত্যবোধ, রুচি ও প্রকাশভঙ্গির গুণে গবেষণা-কৃতিও সাহিত্যরসমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কিন্তু হিন্দী গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাংশে এ-সব কথা ঘটে না। পরিমাণ ও সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলেও সব দিকের বিচারে গবেষণা-স্তরের তেমন উন্নতি হয়েছে বলে মনে করা হয় না।

ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান, কাব্যসিদ্ধান্ত ও কাব্যশাস্ত্র, কবিতার বিভিন্ন দিক, সাম্প্রদায়িক সাহিত্য, গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন দিক, নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ, লোকসাহিত্য, লোকগীতি, লোকসংস্কৃতি ও লোকতত্ত্ব, তুলনাত্মক ও অনুপ্রেরণাত্মক বিষয়; প্রাদেশিক সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাস; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে হিন্দী সাহিত্য; পাঠালোচনা বা পাঠানুসন্ধান— প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিয়ে হিন্দীতে গবেষণার কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। উপাধি-প্রত্যাশাযুক্ত গবেষণাকর্মই সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তবে রাহুল সাংকৃত্যায়ন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, বিশ্বনাথ-প্রসাদ মিশ্র, পরশুরাম চতুর্বেদী (১৮৯৪-১৯৭৯), অগরচন্দ নাহটা, মুনি জিন বিজয় (১৮৮৮-১৯৭৬), বাসুদেব শরণ অগ্রওয়াল, প্রভুদয়াল মীতল — প্রমুখের নাম স্বচ্ছন্দ ও সার্থক গবেষকরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের গভীর মনন ও অনুসন্ধানের গুরুত্বের সামনে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারীর কাজে অপূর্ণতা, অবৈজ্ঞানিকতা, অলৌকিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা বড়ই করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। তাতে আর যাই হোক, সাধারণভাবে হিন্দী গবেষণার স্তর যে বেশ সন্তোষজনক নয়, তা সহজে বোঝা যায়। কিছু ব্যতিক্রমও অবশ্যই আছে। গবেষণা যেন আর জ্ঞান-আহরণের বিদ্যা নেই, মান-আহরণের কৌশলে পর্যবসিত। সম্প্রতি তুলনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রটি বেশ গুরুত্ব লাভ করে জনপ্রিয় এবং উপযোগী হয়ে উঠেছে। তার চাহিদা ও প্রয়োজনের কারণ সুস্পষ্ট।

ভ্রমণ কাহিনী : যাত্রাসাহিত্য

ভ্রমণকাহিনী লেখা আধুনিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এক্ষেত্রে সফল হতে গেলে কুশল ভ্রমণ-স্মৃতিচারীদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি বেশ রুচিকর, উপভোগ্য এবং সুবোধ্যরূপে উপস্থাপন-দক্ষতার অধিকারী হওয়া চাই। মানুষের জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের বৃত্তিকে যিনি যত বেশী সন্তুষ্ট করতে পারেন তিনি ততই সফল লেখকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এক্ষেত্রে হিন্দী ভ্রমণ-সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে ভ্রমণের মহত্ত্ব বিদিত। বেদে, সংস্কৃত সাহিত্যে, এমন কি, প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যেও ভ্রমণের গুরুত্ব ও উপযোগিতা স্বীকৃত। আবার এমনিতেও মানুষের মন সর্বদাই 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'— মন্ত্র জপ করতে থাকে। এই ভ্রমণের বর্ণনা, ঘটনা, পরিবেশ, ব্যক্তি ও সমাজ যখন ভ্রমণকারীর হৃদয়কে দোলা দেয়, স্পর্শ করে তার চিত্তলোক, তখন মনের আবেগ বা অনুভূতিকে সে লিপিবদ্ধ না করে পারে না। এই আনন্দ ও উল্লাসের ভাবনায় চালিত এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে মানুষ তার যাযাবর বৃত্তিকে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মনোবৃত্তিতে পরিণত করে। তখন তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মনোরম অভিব্যক্তি 'যাত্রাসাহিত্য' বা 'ভ্রমণসাহিত্য' আখ্যা লাভ করে।

রেল ও নৌকোর কল্যাণে দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ ও পত্র-পত্রিকায় সেই ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির শোভা-বর্ণন হিন্দী সাহিত্যে প্রথম স্পষ্ট রূপ নেয় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগে। তিনি ভ্রমণ-বিলাসী, লেখক ও সম্পাদক ছিলেন, তাই তাঁর হাতে এই শাখাটি

গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। তাঁর এই প্রবৃত্তি বাংলার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের— ভ্রমণ, লেখন ও পত্রিকা-সম্পাদন-প্রবৃত্তির সঙ্গে তুলনীয়।

হিন্দীতে বেশ কিছু দিন ধরে ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা হলেও, প্রথম মুদ্রিত হিন্দী ভ্রমণ-কাহিনী গ্রন্থ হল হরদেবী রচিত 'লণ্ডন যাত্রা' (১৮৮৩)। অতঃপর ভগবানদাস বর্মা, দামোদর শাস্ত্রী প্রমুখের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে 'কেদারনাথ যাত্রা' (১৮৯০), 'বিলায়ত কী যাত্রা' (১৮৯২), 'রামেশ্বর যাত্রা' (১৮৯৩) প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর যুগেও যাত্রা-সাহিত্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রচিত হয়। ১৯০১ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্বামী সত্যদেব, দেবীপ্রসাদ খত্রী, সত্যদেব পরিব্রাজক, জওয়াহর-লাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪), রামনারায়ণ মিশ্র, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রামশরণ বিদ্যার্থী প্রমুখ লেখকগণ ভ্রমণসাহিত্য শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের রচনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-অরণ্য, মরুভূমি ও তীর্থক্ষেত্র যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বহির্ভারতের নানা দেশ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত এবং সমুদ্র-অরণ্য প্রভৃতিও ভীষণ-মধুর রূপ ও কোমল-কঠিন প্রকৃতি নিয়ে সমুপস্থিত। পরবর্তীকালে ভ্রমণ-প্রবণতা ও ভ্রমণসাহিত্য-সৃষ্টি দুই-ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত-রচয়িতার আবির্ভাব ঘটেছে বর্তমান যুগে। তাঁদের কৃতির পরিমাণ ও স্তর দুই-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারো কারো রচনার উৎকর্ষ স্পৃহনীয়। রাহুলজীর 'মেরী লদ্দাখ যাত্রা' (১৯৩৯), 'লঙ্কা তিব্বত মেঁ সওয়া বর্ষ', 'মেরী তিব্বত যাত্রা', 'মেরী য়ুরোপ যাত্রা', 'জাপান, ইরান, রুসমেঁ পচ্চীশ মাস', 'সোভিয়েৎ ভূমি', 'যাত্রাকে পন্নে' (১৯৫১) এবং 'কিন্নর দেশ' (১৯৪৮), 'যাত্রাবলী' (১৯৪৯) প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র ভ্রমণরসে পূর্ণ সাহিত্য। ভ্রমণতত্ত্ববিষয়ক তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল— 'ঘুমক্কড় শাস্ত্র'। রামনারায়ণের 'য়ুরোপ কে ঝকোরে মেঁ' (১৯৩৮), সত্যনারায়ণের 'রোমাঞ্চক রুস মেঁ' (১৯৩৯) ও 'যুদ্ধযাত্রা' (১৯৪০), শিবনারায়ণ

সহায় রচিত 'কৈলাস দর্শন' (১৯৪০), কহৈয়ালাল মিশ্রের 'ইরাক কী যাত্রা' (১৯৪০), শ্রীগোপাল নেওটিয়া রচিত 'কাশ্মীর' (১৯৪০), সন্তরামের 'স্বদেশ-বিদেশ যাত্রা' (১৯৪০), রামচন্দ্র শর্মার 'ইংল্যাণ্ড যাত্রা' (১৯৪১), ড. ধীরেন্দ্র বর্মা কৃত (১৮৯৭-১৯৭৩), 'য়ুরোপ কে পত্র' (১৯৪২) উল্লেখযোগ্য কৃতি। উপরন্তু স্বামী প্রণবানন্দ— 'কৈলাস মানস সরোবর' (১৯৪৩), লক্ষ্মীনারায়ণ ট্যাণ্ডন— 'সংযুক্ত প্রান্ত কী পহাড়ী যাত্রায়েঁ' (১৯৪৩), স্বামী রামানন্দ ব্রহ্মচারী— 'কৈলাস দর্শন' (১৯৪৬), ভগবৎশরণ উপাধ্যায়— 'বিশ্বযাত্রী' (১৯৪৭), 'লালচীন' (১৯৫৩), মহেন্দ্রপ্রসাদ শ্রীবাস্তব— 'দিল্লী সে মস্কো' (১৯৫১), রামবৃক্ষ বেনীপুরী— 'পৈরোমেঁ পংখ বাঁধকর' (১৯৫২), 'পেরি নহীঁ ভূলতী' (১৯৫২) এবং 'উড়তে চলো' ; যশপাল— 'লোহে কী দীবার কী দোনোঁ ওর' (১৯৫৩) ও 'রাহবীতী', অজ্ঞেয়— 'অরে যাযাবর রহেগা য়াদ' (১৯৫৩), জওয়াহরলাল নেহরু— 'আঁখোঁ দেখা রুস' (১৯৫৩), শেঠ গোবিন্দদাস—'পৃথ্বী পরিক্রমা' রাজবল্লভ ওঝা— 'বদলতে দৃশ্য', অমৃত রায়—'সুবহকে রঙ্গ' প্রভৃতি রচনা করে এই সাহিত্য-শাখাটিকে নানা দিক থেকে বিশেষ জনপ্রিয়তা দান করেছেন। তাছাড়া মোহন রাকেশের 'আখিরী চট্টান তক', ভগবৎশরণ উপাধ্যায়ের 'কলকত্তা সে পেকিঙ', মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দারের 'হিমালয় কী গোদ মেঁ', সজ্জন সিংহের 'লদ্দাখ যাত্রা কী ডায়েরী', কালেলকার রচিত 'হিমালয় কী যাত্রা', যশপাল জৈনের 'জয় অমরনাথ' এবং মাধব উপাধ্যায়ের 'জয় কেদারনাথ' প্রভৃতি ভ্রমণগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। আজকাল এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচুর লেখা হচ্ছে। যেমন ভ্রমণ বাড়ছে তেমন-ই ভ্রমণসাহিত্যও বাড়ছে। বেশির ভাগ ভ্রমণসাহিত্য স্মৃতি-চারণমূলক সৃষ্টি। তাতে লেখকের অভিরুচি, মনোভাব, প্রতিক্রিয়া ও সংবেদনশীলতা বেশি গুরুত্ব লাভ করে। তাই সে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সমধিক সাহিত্যরসসিক্ত হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্রণ ভ্রমণসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। এক শ্রেণীর ভ্রমণকারীর উদ্দেশ্য থাকে দেশ বিদেশের

বিচিত্র জীবনকে তার ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে নির্মাণ করা। কোনো কোনো লেখক বিদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজের বৈশিষ্ট্য ও রূপ তুলে ধরতে চান অনুভূতির মাধ্যমে, ফলে ভ্রমণ-কাহিনীটি গল্পের মতো আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের রুচি, স্মৃতি-চারণের মতো আত্মীয়তা ও ভাবশীলতাও এসে যায় কারো কারো ভ্রমণ-কাহিনীতে। উচ্চস্তরের ভ্রমণসাহিত্যের জন্য এই সব তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজন। সাম্প্রতিক হিন্দী ভ্রমণসাহিত্যে এ-সব গুণই ফুটে উঠতে শুরু করেছে। আজকের হিন্দী ভ্রমণসাহিত্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায়— ভ্রমণের সাধন বা উপায়-আশ্রিত রচনা এবং বর্ণিত-বিষয়-আশ্রিত রচনা। তাতে স্থলপথ, জলপথ ও আকাশ পথের ভ্রমণ এবং পশুপাখির ভ্রমণ, তীর্থস্থান ভ্রমণ, শিকার, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ভ্রমণ প্রভৃতির স্বাদবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। এই ভ্রমণ যেমন স্বদেশের মধ্যে তেমনি স্বদেশের বাইরেও ঘটে থাকে। পাঠকের কাছে বিদেশ-ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতার আকর্ষণ বেশি। ভ্রমণকাহিনীকে আজকের পাঠক— প্রাকৃতিক, দার্শনিক ও বিনোদন-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়ে ও উপভোগ করে। প্রথম দুই ধরনের ভ্রমণ-কাহিনীতে গভীরতা ও গাম্ভীর্যের, কিন্তু শেষেরটিতে লঘুভাবেরই প্রাধান্য। সে যাই হোক হিন্দী ভ্রমণসাহিত্য আজ বেশ পুষ্ট ও সুখপাঠ্য। আর তার বৈচিত্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভ্রমণ সাহিত্যের ভাষা ও ভঙ্গি বা শৈলীর একটি নিজস্ব আকর্ষণ ও সার্থকতা আছে। সুতরাং লেখকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বই সেখানে প্রধান। হিন্দী ভ্রমণ-সাহিত্য ক্রমে ক্রমে আরও সার্থক ও সুষ্ঠু রূপ লাভ করবে আশা করা যায়।

স্মৃতিসাহিত্য

অতীতে যে সব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, ঘটনা ও পরিবেশের সংস্পর্শে বা প্রভাবে মানুষের জীবন কোনো না কোনোভাবে পুষ্ট, সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়ে উঠেছে— স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সেই ব্যক্তি ঘটনা ও পরিবেশের পরিচয় সহৃদয়তা ও রসস্নিগ্ধতার সঙ্গে তুলে ধরার প্রয়াসের ফল 'স্মৃতিকথা-সাহিত্য' বা 'স্মৃতিসাহিত্য'। তাকেই 'সংস্মরণ' বা 'স্মৃতি-চারণ'ও বলা হয়ে থাকে। তবে সার্থক স্মৃতিসাহিত্যকারকে সর্বদা মনে রাখতে হয় স্মৃতিচারণের প্রধান কেন্দ্র বা আশ্রয় একমাত্র ব্যক্তি বা মানুষ। প্রাসঙ্গিকভাবে কোনো ঘটনা, আন্দোলন এবং পরিবেশের বর্ণনা এলেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ব্যক্তির প্রতিই আলোকপাত ঘটে। অতিরঞ্জনে এবং ছিদ্রান্বষণে স্মৃতিচারণের চরিত্র খর্ব হয়। প্রভাব-ঐক্যের প্রতিও লেখককে সজাগ থাকতে হয়। ঘটনা, অভিজ্ঞতা, স্বাভাবিক বিশিষ্টতা এমনভাবে লিখতে হয় যাতে তার সামগ্রিক প্রভাব পাঠকের মনকে পূর্ণ করতে পারে, তৃপ্তি দিতে পারে। তাতে যেন কোনোপ্রকার অসঙ্গতি বা বিচ্ছিন্নতাবোধ না জাগে। সুস্পষ্ট এবং একাগ্র প্রভাবান্বয় স্মৃতিচারিতার একটি অপরিহার্য গুণ। মূলে নানাপ্রকার প্রেরণা সক্রিয় থাকলেও ব্যক্তিগত জীবন অথবা বিশিষ্ট চরিত্রের অংশবিশেষকে আলোকিত করাই স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য। মহৎ ও বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শই স্মৃতিচারণে প্রাধান্য পায়। তবে স্মৃতিচারণ ইতিহাস নয়, লেখার ভঙ্গি— রম্য-রচনা, ললিত-নিবন্ধ ও গল্পের ঢঙের হতে পারে। আত্মকথা ও জীবনীর মূলও বহুলাংশে স্মৃতিচারণই। পার্থক্য হল— স্মৃতিচারণে জীবনের খণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত হয়।

হিন্দী স্মৃতিকথা রচয়িতাদের মধ্যে বনারসী দাস চতুর্বেদী বিশেষ-ভাবে খ্যাত। তাঁর বহুলপঠিত জনপ্রিয় স্মৃতিগ্রন্থ হল— 'সংস্মরণ' ও

'রেখাচিত্র' (১৯৫২), শিবরানী দেবীর 'প্রেমচন্দ' : ঘর মেঁ'— গ্রন্থটিও বেশ জনপ্রিয়। যশপালের 'সিংহাবলোকন' (তিন খণ্ড) ও 'লোহে কী দীবার কী দোনোঁ ওর', উপেন্দ্রনাথ অশকের 'মণ্টো : মেরা দুশমন' ও 'জ্যাদা অপনী : কম পরায়ী', পদ্মসিংহ শর্মা রচিত 'মৈঁ ইনসে মিলা' (দুই খণ্ড, ১৯৫৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিগ্রন্থ। এ-ছাড়া প্রভাকর মাচওয়ে, ড. রঘুবংশ, বিদ্যানিবাস মিশ্র, প্রেমশঙ্কর, সুধাকর পাণ্ডেয় ও শিবপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ লেখকদের স্মৃতিগ্রন্থও স্মরণীয়। আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ হল— কাকা সাহেব কালেলকারের 'স্মরণ যাত্রা' (১৯৫৩), গুলাব রায়ের 'মেরী অসফলতায়েঁ' (১৯৪৬), মাখনলাল চতুর্বেদীর 'সময়কে পাঁও', রাধিকারমণ সিংহের 'ওয়ে ঔর হম' (১৯৫৬), 'তব ঔর অব' (১৯৫৯), রামবিলাস শর্মার 'সেবাগ্রাম কী ডায়েরী' (১৯৩৬), 'সন্ বয়ালীস্ কে সংস্মরণ' (১৯৪৮), রাহুল সাংকৃত্যায়ন— 'বচপন কী স্মৃতিয়াঁ' (১৯৫৩), সিয়ারামশরণ গুপ্ত— 'ঝূঠসচ' (১৯৩৯), মোহনলাল মহতো 'বিয়োগী'র 'সাতসুমন', রামবৃক্ষ বেনীপুরীর 'মাটী কী মূরতেঁ' (১৯৫৫), বিনোদশঙ্কর ব্যাসের 'প্রসাদ ঔর উনকে সমকালীন' (১৯৬০), রামনাথ সুমন— 'হমারে নেতা' (১৯৪২), ভদন্তআনন্দ কৌসল্যায়ন— 'জো ন ভূল সকা' (১৯৪৮), কন্হৈয়ালাল মিশ্র— 'দীপ জ্বলে শঙ্খ বাজে' (১৯৪৮), শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী— 'পদচিহ্ন' (১৯৪৬), মহাদেবী বর্মা—'অতীত কে চলচ্চিত্র' (১৯৪১), 'স্মৃতি কী রেখায়েঁ' (১৯৪৩), 'পথ কে সাথী' (১৯৫৬), হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী— 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩), রঘুবীর সিংহ— 'শেষ স্মৃতিয়াঁ' (১৯৩৯), দেবেন্দ্র সত্যার্থী— 'রেখায়েঁ বোল উঠীঁ' (১৯৪৯), ভগবৎশরণ উপাধ্যায়— 'মৈনেঁ দেখা' (১৯৫০), অজ্ঞেয়— 'অরে যাযাবর রহেগা য়াদ' (১৯৫৩) ও 'আত্মনেপদ' (১৯৬০) প্রভৃতি। শেঠ গোবিন্দ দাসের 'স্মৃতিকণ', 'রায়কৃষ্ণ দাসের 'জওয়াহরভাঈ', গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেয়ের— 'য়ে দৃশ্য : য়ে ব্যক্তি' প্রভৃতি গ্রন্থে ভাষা ও শৈলীর পরিণতিতে অতীত যেন রোমাঞ্চকর হয়ে

উঠেছে। সোজা কথায় 'হিন্দী স্মৃতি চিত্রণ' সুন্দর, সার্থক ও সরস সাহিত্যপদে উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। আচার্য হাজারীপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ করেছেন বার বার বহুভাবে। তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য, সংবেদনশীলতা, সরল ভাষা, ও নিপুণ শৈলীর মনোহারিতা সুস্পষ্ট। তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ গ্রন্থ হল 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ'। মহাদেবী বর্মা তাঁর 'পথ কে সাথী' গ্রন্থে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে সমসাময়িক অন্যান্যদের স্মৃতিকথার ডালি সাজিয়েছেন। এই দুই স্মৃতিচারী এবং তাঁদের কৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বতন্ত্রতা-সংগ্রামী শান্তিচরণ পিড়ারার 'জব যুগ বদলা' (১৯৮৪) গ্রন্থটিতে 'যেমন ভুগেছি ও যেমন দেখেছি'র মাধ্যমে গান্ধীজীর রণনীতির বিশ্লেষণ, 'পাকিস্তানের ভাবনার পুষ্টি' ভ্রষ্টাচার ও স্বজন-পোষণ নীতির কাহিনী, স্বাধীনতা লাভ ও অগ্রগতির পথে বাধা, সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি, প্রকৃতি, সমাজ, ব্যক্তি ও নৈতিকতার পরিবর্তনের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'আত্মকথা'র চেয়ে একষট্টি (১৯১৬-১৯৭৭) বছরের দেশের বিচিত্র ইতিহাসরূপেই গ্রন্থটি বিবেচ্য।

হিন্দী স্মৃতি-সাহিত্যের বিকাশে উপর্যুক্ত লেখকদের দান অবিস্মরণীয়। তাঁদের মধ্যে অনেকে ভাষাশৈলী, বিশেষ ভঙ্গি অথবা আত্মাভিব্যক্তির বিশেষ কৌশলের বিচারে এই শাখাটিকে স্বাভাবিক-ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে বহু লেখক—বহু স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করে শাখাটিকে সমৃদ্ধতর করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ভ্রমণসাহিত্যও বহুলাংশে স্মৃতিচারিতারই অভিব্যক্তি। তাই হিন্দী ভ্রমণসাহিত্য ও স্মৃতি-সাহিত্যের মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের অভিন্নতা লক্ষিত হয়।

জীবনচরিত

জীবনকথা বা জীবনীতে অন্য ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা হয়। ইতিহাস, সমাজ, অতীত বা বর্তমান থেকে স্বীয় কৃতির প্রধান পুরুষের নির্বাচন করে তাঁর সামগ্রিক জীবন, দেশ ও কালগত পরিস্থিতি অনুসারে লেখক চিত্রিত করেন। যথাযথ ঘটনাবিন্যাস অথবা কাল্পনিক বিবরণ দান জীবনী নয়। সাধারণত মহৎ ব্যক্তিদের জীবনীই রচিত হয়। সম্রাট, শাসক, যোদ্ধা, নেতা, সমাজসংস্কারক, কবি, লেখক এবং বড়ো বড়ো সাধু-সন্তদেরই জীবনকথা রচিত হয়। যোগ্য ব্যক্তিত্বের নির্বাচন ও তাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে রূপান্তরিত করা লেখকের অভিরুচি ও সৃজন-শক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং জীবনীও উচ্চস্তরের সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে। তবে জীবনচরিতকারকে সর্বদাই মনে রাখতে হয় যে, ভাবাবেগের আবেশে অথবা অতি মাত্রায় বিনম্রতার ফলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গুণের অতিরঞ্জন অথবা দোষের অনুল্লেখ না ঘটে যায়। জীবনকে দেখা ও বোঝা, নিজের অনুভূতি দিয়ে তাকে জীবন্ত করা এবং লেখনীস্পর্শে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি জীবনীকারের মধ্যে থাকলে— জীবনীগ্রন্থ উপন্যাসের চেয়েও সরস ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

হিন্দী সাহিত্যে জীবনচরিত রচনার প্রয়াস প্রাচীন হলেও গুরুত্বের বিচারে তেমন নয়। গোকুলনাথ গোস্বামী রচিত 'চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা' (১৫৬৮), নাভাদাসের 'ভক্তমাল' (আনুমানিক ১৫৮৫), বাবা বেনীমাধব দাসের 'গোঁসাঈ চরিত্র' (১৬৩০), 'দো সৌ বাওয়ন বৈষ্ণবন কী বার্তা' এবং প্রিয়দাস রচিত 'ভক্ত মাল টীকা' (১৭১২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সব ব্যক্তি, সাধক বা গুরুর মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ও বর্ণনা, সাম্প্রদায়িকতার এবং ভক্তিদ্রাবী চিত্তের উপরে উঠতে পারে নি। প্রথম আধুনিক জীবনী-গ্রন্থরূপে কার্তিকপ্রসাদ খত্রীর

'মীরাবাঈ কা জীবন চরিত্র' (১৮৯৩) উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে বনারসীদাস চতুর্বেদী রচিত 'সত্যনারায়ণ কবিরত্ন' (১৯২৬) ও 'ভারত-ভক্ত এণ্ডরুজ', রামবৃক্ষ বেনীপুরীর 'বিপ্লবী জয়প্রকাশ' ও 'রোজালু কেসমবার্গ' শ্রীমন্‌নারায়ণ রচিত 'সেগাওঁ কা সন্ত' ('বিনোবা ভাবে') প্রভৃতি উত্তম জীবনীগ্রন্থরূপে গণ্য। ব্রজরত্ন দাসের 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' (১৯৩৫) গ্রন্থটি হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন।

প্রাচীন কবিদের জীবনচরিত রচনায় প্রধান অসুবিধা হল—উপকরণ বা সঠিক তথ্যের অভাব। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট জীবনচরিত রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এখনো হচ্ছে। হরিরামচন্দ্র দিবাকর রচিত 'সন্ত তুকারাম' একটি সযত্ন রচিত জীবনীগ্রন্থ। গণেশ-শঙ্কর বিদ্যার্থীর 'বীরকেশরী শিবাজী'—আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসের ফল। রামনরেশ ত্রিপাঠীর 'মালবীয়জীকে সাথ তীস দিন'— মালবীয়জী কথিত তাঁর জীবনবৃত্ত। এই সব প্রয়াসে জীবনচরিত-সাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছে। কারণ হিন্দী সাহিত্যে মহাপুরুষদের জীবনীর তালিকা যেমন বিশাল তেমনি বিচিত্র। ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মহাপুরুষদের জীবন-কথায় এই শাখাটি সমৃদ্ধ। তবে সাহিত্য-সামগ্রী হিসাবে উল্লেখ করা যায়, এমন কৃতি খুবই কম। অধিকাংশ গ্রন্থই নীরস জীবনতথ্যে পূর্ণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চরিত-নায়কদের পরিচয় থাকলেও এবং জীবনীরূপে গণ্য হলেও নির্দ্বিধায় তা সাহিত্যের কোঠায় রাখা যায় না। নায়ক-চরিত্রের প্রভাবপূর্ণ চিত্রণ, ঘটনাক্রমের ঔপন্যাসিক বিন্যাস এবং শিল্পসম্মত ভাষা ও শৈলী প্রভৃতির অভাবে অধিকাংশ প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। তবে প্রতিটি স্তরে অন্তত কয়েকটি গ্রন্থ সার্থকতা লাভ করেছে। এখানে, ঐতিহাসিক জীবনী রূপে যদুনাথ সরকারের 'ভগবান বুদ্ধ' ও জীবনলাল 'প্রেম' লিখিত 'গুরুগোবিন্দ সিংহ'—উল্লেখযোগ্য জীবনীরূপে গণ্য হতে পারে। সাধু-সন্তের জীবনী হিসাবে মন্মথনাথ গুপ্তের 'গুরু নানক', রামনারায়ণ মিশ্রের 'মহাত্মা ঈসা', সুন্দরলালের 'হজরত মোহাম্মদ',

বলদেব উপাধ্যায়ের 'শঙ্করাচার্য'— পঠনীয়। রাজনৈতিক জীবনীরূপে গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওয়াহরলাল প্রভৃতির জীবনী, জীবনীমাত্র, সাহিত্য নয়। তবে মন্মথনাথ গুপ্তের 'চন্দ্রশেখর আজাদ', রামনাথ সুমনের 'মোতিলাল নেহেরু', 'যুগাধার গান্ধীজী', মহাদেব দেশাই লিখিত 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ' (১৯৪৬), জওয়াহরলালের 'রাষ্ট্রপিতা' ও কমলাপতি ত্রিপাঠীর 'যুগপুরুষ' প্রভৃতিতে তথ্য সাহিত্যাস্বাদে স্নিগ্ধ।

অবশ্য কবি ও লেখকদের জীবনচর্যাআশ্রিত জীবনীর অধিকাংশ রচনাই উচ্চস্তরের সার্থক সাহিত্য-কৃতি। প্রামাণিক জীবন-প্রসঙ্গ থাকলেও— এগুলি সার্বিক জীবনী নয়। বিশিষ্ট কবি বা লেখকের ক্ষেত্রে জীবনবৃত্তমূলক প্রামাণিকতার উপর জোর দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে অমৃত রায়ের 'প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী', রামবিলাস শর্মা রচিত 'মহাকবি নিরালা' সার্থক লেখকদের হাতে পড়ে— একাধারে তথ্যপূর্ণ জীবনী ও উপন্যাসসুলভ উপভোগ্যতায় মণ্ডিত। বিভিন্ন দিকের বিচারে এই 'জীবনোপন্যাস' দুইটি অদ্বিতীয় কৃতি-রূপে বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে অজ্ঞেয় কৃত 'শেখর : এক জীবনী' এবং বিষ্ণু প্রভাকরের 'অওয়ারা মসীহা' (শরৎচন্দ্রের অদ্বিতীয় জীবনী ও তার ভাষ্য, ১৯৭৪) গ্রন্থ দুইটির সপ্রশংস উল্লেখ করতে হয়। এ-দুইটিও বিশুদ্ধ জীবনী নয়, সার্থক উপন্যাসের স্বাদে ভরপুর। এরূপ কৃতি অতিশয় বিরল।

জীবনী-সাহিত্যের প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিনন্দন-গ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন-চরিত ও ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্বের অল্পাধিক বিবরণ থাকে। তবে তা থাকে বিচ্ছিন্নভাবে,—কারণ তা এক জনের নয়, অনেকের সমবেত প্রয়াসে রচিত। সুতরাং জীবনীগ্রন্থ রূপেও তার মূল্য অস্বীকার্য নয়। 'সর্দার প্যাটেল অভিনন্দন গ্রন্থ', মথুরার কবি— 'শেঠ কন্হৈয়ালাল অভি-নন্দন গ্রন্থ', 'কাটজূ অভিনন্দন গ্রন্থ', 'নেহেরু অভিনন্দন গ্রন্থ' এবং 'নিরালা অভিনন্দন গ্রন্থ' প্রভৃতির কথা বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ-কয়টির মধ্যে সামগ্রী-সম্পদের বিচারে 'পোদ্দার' ও 'নেহেরুজী'র

'অভিনন্দন গ্রন্থ দুইটি সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য। হিন্দীর আধুনিক কবি 'নিরালা'র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার আকর্ষণে মূল্যবান হয়ে উঠেছে 'নিরালা অভিনন্দন গ্রন্থটি'ও।

আত্মকথার ক্ষেত্রে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্ট কী আত্মকথা' যেমন একটি উপন্যাস, তেমনি জীবনীর ক্ষেত্রে 'অজ্ঞেয়' রচিত 'শেখর এক জীবনী' (প্রথম খণ্ড ১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৪) গ্রন্থটিও প্রকৃতিতে উপন্যাসই। লেখকের মতে এটি 'আত্মানুভূত' জীবনী। বইটির ভূমিকায় অজ্ঞেয় লিখেছেন—

> 'হিন্দীর কম লেখকই একথা জানেন বা মানেন যে, কল্পনা ও অনুভূতি-সামর্থ্য ('সেন্সিবিলিটি') দিয়ে অন্যের জীবনে অনুপ্রবেশ করা এবং তা করতে গিয়ে আত্মঘটিত পূর্ব ধারণা ও সংস্কারকে নিষ্ক্রিয় করা অর্থাৎ পুরোপুরি অব্জেক্টিভ হয়ে ওঠাতেই লেখকের যথার্থ শক্তির পরিচয় নিহিত।··· শেখর নিঃসন্দেহে এক ব্যক্তির অভিন্নতম আত্মদলিল বা 'রেকর্ড অব্ পারসোনাল সাফারিংগ্স', অবশ্য তা ব্যক্তিটির যুগ সংঘর্ষেরও প্রতিবিম্ব।··· আমি স্বয়ং অনুভব করেছি যে—আমি এমন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রগতির দর্শক এবং ইতিহাসকার, যার জীবনে আমার কোনো প্রকারেরই নিয়ন্ত্রণ ছিল না।'[১৩]

সুতরাং অজ্ঞেয়জীর অনুভূতি, কল্পনা এবং সৃজনীপ্রতিভার অতুলনীয় দান— 'শেখর এক জীবনী' গ্রন্থটি, জীবনী নয়, জীবনীশৈলীতে রচিত 'অভিনব উপন্যাস'— বলা যেতে পারে।

সব মিলিয়ে জীবনচরিত বা জীবনী গ্রন্থের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্য বেশ পুষ্ট। কিন্তু সাহিত্যরসে স্নিগ্ধ ও সার্থকতায় মণ্ডিত রচনার সংখ্যা বেশি নেই। তা হলেও এই শাখাটির ভবিষ্যৎ বেশ আশা ও উৎসাহময়। সুতরাং সমৃদ্ধির দিকেই তার অগ্রগতি ঘটবে— সে কথা বলাই বাহুল্য।

আত্মকথা

ব্যক্তিগত জীবন অথবা অত্মচরিতের যথাযথ অথচ রুচিকর সাহিত্যিক রূপায়ণকে অত্মকথা বলা যেতে পারে। 'আত্মচরিত' বা 'আত্মচরিত্র' আত্মকথারই পর্যায়বাচী শব্দ। পরিণত বয়সে অতীতের স্মৃতিনির্ভর বিগত জীবনের উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণই আত্মকথা বা আত্মচরিত। তার রূপায়ণ কল্পনা-ঋদ্ধ। উত্তরপুরুষের জন্য অতীতের কৃতিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ঐশ্বর্য সঞ্চয়নই আত্মকথা রচনার উদ্দেশ্য। ইতিহাস বা উপন্যাস রচনা অপেক্ষা আত্মকথা রচনা বেশ দুষ্কর। এখানে ব্যক্তির তথ্যভিত্তিক জীবনবৃত্তকে সার্থক ও সরস সাহিত্যিকরূপ দিতে হয়। আত্মকথা রচয়িতাকে সর্বদাই মনে রাখতে হয়—ভাবাবেশের আবেগে, অথবা অতিমাত্রায় বিনম্রতার ফলে নিজের দুর্বলতায় অতিরঞ্জন অথবা আত্ম-আস্বাদনের প্ররোচনায় আত্মপ্রশংসার অত্যাচার না ঘটে যায়। সোজা কথায় আত্মপ্রশস্তি, অপরের নিন্দা ও স্তুতি প্রভৃতি থেকে লেখককে সর্বৈব মুক্ত ও সতর্ক থাকতে হয়। হিন্দী সাহিত্যে প্রথম আত্মকথা রচনায় প্রয়াস দেখা যায় বনারসীদাস জৈনের (১৫৮৬) 'অর্ধকথানক'— নামক ছন্দোবদ্ধ রচনায়। বনারসীদাস সেখানে বাস্তবতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি সজাগতা দেখিয়েছেন। নিজ দোষ-ত্রুটির কথাও অবলীলাক্রমে বর্ণনা করেছেন। লেখক তাঁর জীবনের ৫৫ বছরের (১৬৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত), কথা বর্ণনা করেছেন দেখা যায়। হিন্দী সাহিত্যে তো বটেই সম্ভবত বিশ্বের সাহিত্যেও এইটিই প্রথম আত্মচরিত গ্রন্থ।

বর্তমান যুগের হিন্দী আত্মকথা শাখার উপাদান প্রধানত রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্যের জগৎ থেকেই আহৃত হয়। অর্থাৎ আত্মকথাকার-গণ প্রধানত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক— এই তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহরলাল, সুভাষচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ— প্রমুখের নাম আসে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছাড়া অন্যদের আত্ম-কৃতি অন্য ভাষা থেকে হিন্দীতে অনূদিত। গান্ধীজীর 'আত্মকথা' (১৯২৭), নেতাজীর 'তরুণ কে স্বপ্ন' (১৯৩৫), জওয়াহরলালের 'মেরী কহানী' (১৯৩৬), রাধাকৃষ্ণের 'সত্য কী খোজ' (১৯৪৮) প্রভৃতির সুন্দর অনুবাদ হিন্দীর আত্মকথা শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'আত্মকথা' (১৯৪৭) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবাহী।

সামাজিক ক্ষেত্রে ভবানীদয়াল সন্ন্যাসীর 'প্রবাসীর আত্মকথা' (১৯৪৭), সত্যানন্দ পরিব্রাজকের 'স্বতন্ত্রতা কী খোজ মেঁ' এবং বিয়োগী হরিজীর—'মেরা জীবন প্রবাহ' (১৯৪৮) শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী। সাহিত্যিক আত্মকথা হিসাবে শ্যামসুন্দর দাসের 'মেরী আত্মকহানী' (১৯৪১), সিয়ারামশরণ গুপ্তের 'ঝূঠ সচ' (১৯৩৯), রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'মেরী জীবনযাত্রা' (১৯৫৬), যশপালের 'সিংহাবলোকন' (১৯৫২), শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদীর 'পরিব্রাজক কী প্রজা' (১৯৫২), শেঠ গোবিন্দ দাসের 'আত্মনিরীক্ষণ' (১৯৫৮), পদুমলাল পুন্নালাল বক্সীর 'মেরী অপনী কথা' (১৯৫৮), চতুরসেন শাস্ত্রীর 'আত্মকহানী' (১৯৬৩), পাণ্ডেয় বেচন শর্মা 'উগ্র'-এর 'অপনী খবর' প্রভৃতি বিশেষ মূল্যবান সাহিত্য-কৃতি। রাহুলজীর আত্মকথায় তাঁর বিপ্লবী যাযাবরী এবং বিদ্যাব্যসনী বৃত্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। নির্ভীক-উদারচেতা ব্যক্তিত্বের আত্মবোধ অতি সুন্দর ও সুললিত শৈলীতে উপস্থাপিত। সাম্যবাদী ও সমাজবাদী যশপালের 'সিংহাবলোকন'ও অনুরূপ কারণে মনোগ্রাহী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি মূল্যবান আত্মকথা জাতীয় রচনা হল— প্রেমচাঁদের 'জীবনসার' (প্রেমোপহার, ১৯৬৩) যদিও লেখাটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহলেও তার গুরুত্ব কম নয়।

এই সব গ্রন্থে লেখকজীবনের বিভিন্ন দিকের ও ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্ট কী আত্মকথা' গ্রন্থটি। দ্বিবেদীজী বাণভট্টের বকলমে স্বীয় মনোভঙ্গিতে বাণভট্টের আত্মকথা লিখেছেন। হিন্দী সাহিত্যের এই বিচিত্র স্বাদের আত্মজীবনী-পুস্তকটি প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক বাংলায় (১৯৫৮) এবং উপেন্দ্রকুমার দাস কর্তৃক ওড়িয়াতে (১৯৬২) অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

সংস্মরণ বা স্মৃতিকথা, জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর স্বরূপ ও নিদর্শন নিয়ে কিছু কথা বলা হল। তাতে অনেক প্রধান-অপ্রধান গ্রন্থ ও লেখক বাদ পড়েছেন। কারণ জ্ঞান ও স্থানের সীমাবদ্ধতা। আসলে এ তো বাঙালি পাঠকের কাছে হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা মাত্র তুলে ধরার প্রয়াস। অবশ্য সমসাময়িক কালে সাহিত্যের এই শাখাকয়টিতে বেশ সমৃদ্ধি এসেছে। ব্যাপকভাবে ঘটেছে স্বীকৃতি। ১৯৩২ সালে প্রেমচাঁদ সম্পাদিত 'হংস' সাহিত্য পত্রটির একটি 'সংস্মরণ অঙ্ক' বা 'স্মৃতিকথা সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। তার বিজ্ঞাপনে 'আত্মকথা' সংখ্যার উল্লেখ থাকলেও 'স্মৃতিকথা' সংখ্যা রূপেই তা প্রকাশিত হয়। অতঃপর প্রেমচাঁদ ও নন্দদুলারে বাজপেয়ীর মধ্যে 'আত্মকথা'র প্রসঙ্গ নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়। বাজপেয়ীজী 'আত্মকথা' লেখা ও প্রকাশের বিরোধী ছিলেন। চার বছর ধরে এই বিবাদ চলেছিল। পরবর্তীকালে সম্ভবত এই বিবাদের ফলস্বরূপ স্মৃতিকথা, আত্মকথা এবং জীবনী সাহিত্যের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হয় এবং শাখা-তিনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা আগেই বলেছি— আত্মকথা ও স্মৃতিকথাকে পুরোপুরি পৃথক করা যায় না। একটির প্রসঙ্গে অন্যটির অবতারণা অনিবার্য। কারণ, এরা পরস্পার পরস্পরকে রসদ জোগায়। আবার এই দুইটির সাহায্য ছাড়া জীবনচরিত বা জীবনী-সাহিত্যও লেখা সম্ভব নয়। কারণ জীবনীর উপকরণের উৎস প্রধানত ওই 'স্মৃতিচারণ' এবং 'আত্মকথা'ই। একই ভাব বা বিষয় লেখকের ব্যক্তিত্ব, অভিরুচি ও অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কারণে তিনটি রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায়— আত্মকথা, স্মৃতিচারণ ও জীবনী-সাহিত্য যেন সাহিত্যের একই বৃন্তে তিনটি ফুল।

পত্রসাহিত্য

পত্রের সহজ প্রাণশক্তি তার সত্যে নিহিত। আবার সহজ প্রাণশক্তি-সম্পন্ন পত্র যখন সাহিত্যগুণমণ্ডিত হয় তখন তা লেখক ও প্রাপকের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং স্থায়ী সম্পদ হয়ে ওঠে। দেশের পরিস্থিতি, প্রয়োজন, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তির যে অলক্ষ যোগ থাকে, লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির মাধ্যমে তাও অনেক সময় পত্রে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অনাবশ্যক মনে হলেও পত্রে নিহিত সহজ সত্যই লেখকের মহৎ শক্তির পরিচায়ক। সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পত্রে সাহিত্যরস আস্বাদ্য হয়ে ওঠা সহজ। বিশিষ্ট শৈলী, সম্প্রেষণক্ষমতা, অনুভূতির সত্যতা ও গভীরতা এবং ভাষা—সবকিছুতেই লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তির মহত্ত্বই তার পত্রকে গুরুত্ব দান করে। ব্যক্তিগত পত্রই সাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃতি পায়। অনুভূতির সত্য ও গভীরতাই পত্রকে অসাধারণ ও মর্মস্পর্শী করে তোলে।

প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যে সাহিত্যিক বা অন্য মহাপুরুষদের পত্রলেখন, সংকলন ও সংরক্ষণের রীতি ছিল। মহাকবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শাকুন্তলে' পত্রের উল্লেখ আছে— 'লেখ' রূপে। পত্রবাহকের জন্য 'লেখ হারক' শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং হৃদয়ের গভীরগহন, যথার্থ ও সুকুমার অনুভূতির বাহন 'লেখ' বা পত্রের সাহিত্যরূপে স্বীকৃতি পেতে বাধা নেই।[১৪] তবে আধুনিক যুগে মহৎ ব্যক্তিত্বের পত্রাদির সংকলন ও প্রকাশ-আদির প্রবণতা পাশ্চাত্যপ্রভাবিত। এই সব পত্র লেখকের অন্তর্জগৎ, দেশ-কাল ও পরিস্থিতির যথার্থ ছবি তুলে ধরে। কোনো কবি বা সাহিত্যকারের কৃতির সার্বিক মূল্যায়নেও এইসব পত্র পরম সহায়ক। রচনা ও শৈলীর রহস্যের ব্যাখ্যা মেলে কারও কারও পত্রে।

হিন্দীতে সম্ভবত দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) পত্র-সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা হয় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে। সংকলক মুন্সীরামজী দয়ানন্দ সরস্বতীকে লেখা অন্যের পত্রও সংকলন করেছিলেন। তাঁর পত্রের দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে 'ঋষি দয়ানন্দ কা পত্রব্যবহার' নামে। অতঃপর প্রকাশিত হয় 'পত্রাঞ্জলি' (১৯২২)। তাতে সমসাময়িক অন্যান্য মহাপুরুষের পত্রও সংগৃহীত ছিল। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ পত্রাবলী ও সুভাষচন্দ্র পত্রাবলীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জওয়াহরলাল নেহেরুর পত্রের অনুবাদ 'পিতা কে পত্র-পুত্রী কে নাম' (১৯৩১) প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ঔপন্যাসিক প্রেমচাঁদ। এই সময় থেকে হিন্দী সাহিত্যে 'পত্র-সাহিত্য' রচনা, সংকলন ও মুদ্রণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ধীরেন্দ্রবর্মার 'য়ুরোপ কে পত্র', চন্দ্রশেখরের 'স্ত্রী কে পত্র' ভদন্ত আনন্দ কৌসল্যায়নের 'ভিক্ষু কে পত্র' (দুই খণ্ড, ১৯৪০), 'প্রেমচন্দ্র কে পত্র' (১৯৪৮), 'বিবেকানন্দ কে পত্র' (১৯৪৯), 'সত্যভক্ত স্বামী কে অনমোল পত্র' (১৯৫০), সূর্যবলী সিংহের 'মনোহর পত্র' (১৯৫২), ব্রজমোহন বর্মার 'লণ্ডন কে পত্র' (১৯৫৪) কিশোরীদাস বাজপেয়ীর (১৮৯৮-১৯৮১) 'সাহিত্যিকোঁ কে পত্র' (১৯৫৮) প্রভৃতি হল বিচিত্র-বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে লেখা পত্রের সংগ্রহ। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত পেশবা তথা অন্যান্য রাজা ও ইংরেজ শাসকদের লিখিত পত্র-আদির (১৭৯৩-১৮১৪) 'প্রাচীন হিন্দীপত্র সংগ্রহ' নামে প্রকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস, ব্যক্তি ও ভাষার বিচারে এই সংকলনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

'পত্র ব্যবহার মালা'য় গান্ধীজী, বিনোবা ভাবে এবং জমনালাল বজাজের পত্রাবলী পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। 'পদ্মসিংহ শর্মাকে পত্র', 'দ্বিবেদী পত্রাবলী' (১৯৫৪), 'দ্বিবেদী যুগ কে সাহিত্যকারোঁ কে কুছ পত্র' (১৯৫৮), 'সাহিত্যিকোঁ কে পত্র' (১৯৫৮), 'আচার্য দ্বিবেদী ঔর উনকে সঙ্গী সাথী' (১৯৬৫) প্রভৃতি সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। 'চিট্‌ঠী পত্রী' ও 'কলম কা সিপাহী' গ্রন্থে প্রেমচাঁদের বহু

পত্র সংকলিত। ১৯৬০ সালে 'কুছ পুরানী চিট্‌ঠিয়াঁ' নামে জওয়াহরলালের 'এ বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটার্‌স্'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালেই প্রকাশিত হয় বিয়োগীহরির সম্পাদনায় 'বড়োঁ কে প্রেরণাদায়ক পত্র'। সুমিত্রানন্দন পন্তের 'পত্রসংকলন'ও মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বাপু কে পত্র', 'বিনোবা কে পত্র', 'শরৎ পত্রাবলী', 'শ্রীঅরবিন্দ কে পত্র' 'মিত্র কে নাম পত্র' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'পত্রাবলী' (অরবিন্দ ঘোষ), 'গালিব কে পত্র'— প্রভৃতিও অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাবে হিন্দী সাহিত্যের পত্র-শাখা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নির্বাচিত পত্র-সংকলনের অনুবাদের দ্বারাও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

পত্রসাহিত্য প্রাচীন বস্তু হলেও হিন্দীতে তার আধুনিক রূপটিই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। পত্র-রচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পৃহনীয় কলাশিল্প। তার প্রভাব ও উপযোগিতা যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। বিশ্বের বহু মনীষী পত্রের সাহায্যে অনেকের জীবনধারা বদলে দিয়েছেন। মহাত্মাগান্ধী, জওয়াহরলাল নেহেরু, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালবীয়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, টলস্টয়, রমাঁ-রোলাঁ, প্রেমচাঁদ প্রমুখ এই স্তরের পত্রলেখক ছিলেন। এই পত্রসাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে হিন্দী জগতের মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী, পদ্মসিংহ শর্মা ও প্রেমচাঁদের নাম সকলের আগে স্মরণীয়। তাঁরা পত্রসাহিত্যের স্বরূপ ও উপযোগিতা প্রদর্শন করে পত্রসাহিত্য পঠনে ও সৃজনে— অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই বর্তমানে হিন্দী পত্রসাহিত্য শাখাটি বেশ সমৃদ্ধ বলা যায়।

পত্রলেখা-বিদ্যা নিয়ে বিদেশে ও এদেশে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দীতে— বনারসীদাস চতুর্বেদী ও হরিশঙ্কর শর্মা রচিত— 'পত্রলেখন-কলা' এবং যজ্ঞদত্ত শর্মার 'আদর্শপত্র লেখন' প্রভৃতি এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পত্রে অভিব্যক্ত ঘনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা, অনৌপচারিকতা এবং ব্যক্তিগত কতিপয় বিশেষ গুণের জন্য লেখকের অনুভূতিতে যে সারল্য, গভীরতা, বক্তব্যে বাস্তবতা এবং প্রত্যক্ষতা এসে যায়— তাতে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক পত্রাকারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতিও লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধরূপে 'শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা', কবিতারূপে 'টূটা হার' (১৯২৭) ও 'শকুন্তলা কা পত্রলেখন', কাব্য-রূপে মৈথিলী শরণের 'পত্রাবলী', পত্রশৈলীতে লেখা প্রেমচাঁদের ছোটো গল্প এবং বেচন শর্মা 'উগ্রে'র— 'চন্দ হসীনোঁ কে খতূত' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। জার্মান কথাসাহিত্যিক স্টিফেন জ্বিগের পত্রশৈলীতে লেখা একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের হিন্দীতে দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে—'অপরিচিতা' ও 'এক অনজান ঔরত কা পত্র' নামে। ইংরেজিতে এই জাতীয় উপন্যাসকে 'এপিস্টো-লেরি নভেল' বলা হয়। সাধারণ গল্প ও উপন্যাসেও মার্মিকতা আনবার উদ্দেশ্যে পত্রের অবতারণা করা হয়ে থাকে। আত্মসমর্পণের সহজ মাধ্যম রূপে পত্রের সার্থকতা কম নয়। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তাঁর নাটিকা 'শ্রীচন্দ্রাবলী'তে এই উদ্দেশ্যে চন্দ্রাবলীর দ্বারা কৃষ্ণের কাছে পত্র লিখিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, নাটিকার পত্রে 'সমর্পণে' ভারতেন্দু আরাধ্য দেবের কাছে যেন নিজেকেই সমর্পণ করেছেন। হৃদয়ের এই ছোঁয়াটুকুতে অপূর্ব বিশিষ্টতা এসে গেছে। সাহিত্যে পত্রের সার্থকতা এখানেই। আর এই বিশিষ্টতাই পত্রকে সাহিত্যপদবাচ্য করে তুলেছে।

দৈনিকী বা ডায়েরি সাহিত্য

ব্যক্তি যখন প্রতিদিনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে জীবনকে খণ্ডিত করেও ভাবের আবেশে সম্পূর্ণ করে তুলে তার মনোসৃষ্টি ও অন্তর্দর্শনকে যথাসম্ভব নিরলংকার শিল্পরূপে উপস্থাপিত করে, তখনই তার রচনা ডায়েরি বা দৈনিকীর সীমা অতিক্রম করে সাহিত্যের সহজ-সরল নতুন শাখায় রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তির মহত্ত্ব, গুরুত্ব ও ব্যক্তিত্বের জন্য তার সাধনা যখন জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়, তখনই তার 'দৈনিকী' সাহিত্য-পদবাচ্য হয়। প্রায় ৩০-৩৫ বছর ধরে এই শাখাটি হিন্দী সাহিত্যে উত্তরোত্তর বিকশিত ও জনপ্রিয় হয়ে চলেছে। মূলে পাশ্চাত্য হলেও শাখাটি যেন ভারতীয় হয়ে উঠেছে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ডায়েরি লেখার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকৃতি পায় এদেশে। ডায়েরিতে ব্যক্তি স্বীয় জীবনের সিংহাবলোকন করে বাঞ্ছিত পথে চলার পথনির্দেশ করে, ভাবুক কবি, সাহিত্যিক বা চিন্তা-শীল ব্যক্তি তাতে আত্মসমর্পন করে, ইতিহাসকার বা জীবনীলেখক সমসাময়িক ঘটনার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা-ভাষ্য প্রভৃতি প্রতিদিন লিখে রাখে। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বস্তু না হলেও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা, অনুভূতির তীব্রতা, বর্ণনার প্রত্যক্ষতা ও সজীবতা প্রভৃতি কারণে দৈনিকী বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাধাচরণ গোস্বামী লিখিত দৈনিকীই সম্ভবত প্রথম মুদ্রিত হিন্দী ডায়েরি। ১৮৭২ বা ১৮৭৬ সালের লিখিত তাঁর ডায়েরি পাটনার চৈতন্য পুস্তকালয়ে সুরক্ষিত রয়েছে। বর্তমান শতকের মৈথিলীশরণ গুপ্ত, মাখনলাল চতুর্বেদী, সুন্দরলাল ত্রিপাঠী, ধীরেন্দ্র বর্মা প্রমুখের ডায়েরি বা তার অংশবিশেষের উল্লেখ অবশ্যই করা দরকার। ডায়েরির গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত স্মরণীয়, তিনি লিখেছেন— 'ডায়েরির কথা বিচার করলে দেখতে পাই, আমার জন্য তা অমূল্য সম্পদ। যে সত্যের আরাধনা করে, তার পক্ষে

ডায়েরি পাহারাদারের কাজ করে, কারণ তাতে সত্যই লিখতে হয়। যদি আলস্য করে থাকি তো না লিখে ছুটি নেই, কাজ করে থাকি তবু লিখেই ছুটি পাই।... ডায়েরি রাখার অভ্যাসই আমাদের অনেক দোষ থেকে রক্ষা করে'। (হরিজন বন্ধু, ২০ অক্টোবর ১৯২০)। গান্ধীজীর অভিমত অনুসারে ডায়েরি সাহিত্যকেই 'বাস্তব সাহিত্য' বলা সমীচীন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্যের ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য থেকে ভারতীয় ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য বহুলাংশে ভিন্ন। গান্ধীজীর অনুপ্রাণিত ডায়েরি লিখিয়েদের মধ্যে মহাদেব দেশাই, জমনালাল বজাজ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, মনুবহন গান্ধী, সুশীলা নায়ার, নরদেব শাস্ত্রী প্রমুখের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল—সাহিত্যের অন্যবিধ রচনাকেও ডায়েরি শিরোনামে চিহ্নিত করা হয়েছে হিন্দী সাহিত্যে। এক্ষেত্রে হিন্দীর কয়েকটি উপন্যাস, ছোটো গল্প, স্মৃতিচারণ, সংবাদীসাহিত্য ও আত্মকথার প্রসঙ্গ আসতে পারে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভ্রমণকাহিনী, 'যাত্রা কে পন্নে', ইলাচন্দ্র যোশীর 'মেরী ডায়েরি কে নীরস পৃষ্ঠ', ড. দেবরাজ উপাধ্যায়ের উপন্যাস— 'অজয় কী ডায়েরি' (১৯৬০), সজ্জন সিংহের ভ্রমণ কথা— 'লদ্দাখ যাত্রা কী ডায়েরি', রাওয়ীর চরিত কথা— 'এক বুকসেলর কী ডায়েরি' এবং জগদীশ জৈন কৃত 'রিপোর্তাজ' বা সংবাদী সাহিত্য— 'পিকিং কী ডায়েরি' প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে; 'রাজ্যপাল কী ডায়েরি' (১৯৬০) গ্রন্থে প্রত্যেকটি ভাষণের বর্ষ, মাস ও তিথি উল্লেখ করে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ভি. ভি. গিরির ভাষণ সংকলিত।

হিন্দী ডায়েরি সাহিত্যের তিনটি রূপ দেখা যায়—

ক. নিয়মিত দৈনিকী বা 'রেগুলার ডায়েরি'—এই শ্রেণীর দৈনিকীতে লেখক ভালোমন্দ মিশিয়ে জীবনের দিনগুলির ঘটনার বর্ণনা লিখে রাখেন। এই ধরনের ডায়েরি-সাহিত্য গান্ধী যুগের দান। যা বিষয় ও যাথার্থ্যের বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধী,

মহাদেব দেশাঈ, জমুনালাল বজাজ, মনুবহন গান্ধী প্রমুখের লেখা ডায়েরি এই পর্যায়ের।

খ. ডায়েরি দৈনিকতার প্রতি বিশ্বস্ত না হয়েও লেখন-কালের যাথার্থ্য নির্দেশক। এতে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি-প্রতিক্রিয়া ও বিচার-বিশ্লেষণের অভিব্যক্তির সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাস ও জীবনের সমীক্ষা করে থাকেন। ধীরেন্দ্র বর্মার 'মেরী কালিজ কী ডায়েরি', বাল্মীকি চৌধুরীর 'রাষ্ট্রপতিভবন কী ডায়েরি' এবং অ্যালেন ক্যাম্পবেলের— 'ভারতবিভাজন কী কহানী'— এই বর্গের সামগ্রী।

গ. ব্যক্তিগত নিবিড়তামূলক প্রবন্ধধর্মী ডায়েরি— এতে লেখকের ঔৎসুক্য আত্মকথাধর্মী হয়ে থাকে। লেখকের জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের মর্মগ্রাহী প্রসঙ্গ, বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনা, তাঁর অতীত ও বর্তমান অনুভূতি, মনোবিশ্লেষণ ও চিন্তন-মনন সবই বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের রূপ পায়। সুন্দরলাল ত্রিপাঠীর 'দৈনন্দিনী', গজাজন মুক্তিবোধের 'এক সাহিত্যিক কী ডায়েরি'— প্রভৃতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিরূপে মান্য। এই ধরনের ডায়েরি-সাহিত্যের প্রগতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

হিন্দীর 'দৈনন্দিনী'র সৃজন কাল ও পরিমাণের বিচারে বিপুল। তেমনি আছে তার আকৃতি-প্রকৃতি ও শৈলীগত বৈচিত্র্য। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিকে স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী প্রকাশের স্বাধীনতা থাকায়, তা রুচিকর-রম্যরচনাধর্মী বিষয় হয়ে ওঠে, তাই দৈনন্দিনী বা দৈনিকী পড়ার ও লেখার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রেখাচিত্র

গল্প ও প্রবন্ধের মধ্যবর্তী গদ্য-রচনা হল রেখাচিত্র। তাই গল্প ও প্রবন্ধের অল্প-স্বল্প বৈশিষ্ট্যও তাতে থাকে। সহজ সরল অথচ তীব্র ভাষায় অভিজ্ঞতার বর্ণনা, যাতে কল্পনার অবকাশ কম, তাই রেখাচিত্র। বলা চলে ছোটো ছোটো বাক্যে, স্বল্পপরিসরে তীব্র ও মর্মস্পর্শী অভিব্যঞ্জনার রূপায়ণই রেখাচিত্র। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে রেখাচিত্র ভারতীয় সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তি বা ঘটনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে তার চিত্রণ করতে হয়। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, ঘটনা, দৃশ্য বা উপাদানের এমন চিত্রণ হবে, যাতে তার বাহ্য বৈশিষ্ট্য আকর্ষক হয়ে ফুটে উঠবে আর তাতে নিহিত থাকবে আন্তরিক স্বাতন্ত্র্যও। য়ুরোপে যান্ত্রিক-ক্রান্তির যুগে এবং ভারতীয় ভাষায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই নতুন সাহিত্যরূপটির প্রচলন ঘটে।

রেখাচিত্রের প্রকৃতির সঙ্গে স্মৃতিচারণ, সংবাদীসাহিত্য, গল্প ও প্রবন্ধ প্রভৃতির সঙ্গে সাম্য আছে। লেখক নিজের মন ও রুচি অনুযায়ী বিষয় ও শৈলী বেছে নিতে পারেন, গড়ে নিতে পারেন তার রূপ। বিষয়, স্বরূপ ও লেখন-শৈলীর বিচারে রেখাচিত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— মনোবৈজ্ঞানিক রেখাচিত্র, ঐতিহাসিক রেখাচিত্র, ঘটনাপ্রধান রেখাচিত্র, পরিবেশপ্রধান রেখাচিত্র, প্রভাববাদী, ব্যঙ্গপ্রধান, ব্যক্তিপ্রধান এবং আত্মমূলক রেখাচিত্র। এই প্রসঙ্গে 'হংস' পত্রিকার 'রেখাচিত্রাঙ্ক' (১৯৩৯) বা রেখাচিত্র সংখ্যা এবং 'মধুকর' পত্রিকার 'রেখাচিত্রাঙ্ক' (১৯৪৬)— দুইটির গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার করতে হয়। তখন ওই দুই পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভারতে 'রেখাচিত্রে'র প্রতি অজ্ঞতা ও অনাকর্ষণ প্রভৃতির কথা বলে ধীরে ধীরে তাকে বিকশিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য লেখকদের প্রতি আবেদন জানানো হয়। সে আবেদন ও প্রয়াস যে সার্থক হয়েছে— সে কথা বলাই বাহুল্য।

হিন্দীর প্রারম্ভিক রেখাচিত্রকার বনারসীদাস চতুর্বেদী ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই রেখাচিত্র রচনা শুরু করেন। তবে ১৯৩২ সাল থেকে তার বলিষ্ঠ প্রকাশ শুরু হয়। 'এমর্সন' (১৯৩২-৩৫), 'পতিব্রতা জয়িনী' (১৯৩৫), 'ফক্কড় খোরো' (১৯৩৫) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখনীয় কৃতি। রেখাচিত্র লিখে অন্য যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরাম শর্মা (১৮৯৫-১৯৬৭), রামবৃক্ষ বেনীপুরী (১৯০০-১৯৬৮), ও মহাদেবী বর্মা (১৯০৭-১৯৮৭) প্রমুখ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের ছাড়াও বিনয়মোহন শর্মা (১৯০৫), সত্যবতী মল্লিক (১৯০৭), প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত (১৯০৮), দেবেন্দ্র সত্যার্থী (১৯০৮), রামধারী সিংহ দিনকর (১৯০৮-১৯৭৫), উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক (১৯১০), ভগবৎশরণ উপাধ্যায় (১৯১০), বিষ্ণু প্রভাকর (১৯১২), রামবিলাস শর্মা (১৯১২), ড. নগেন্দ্র (১৯১২), প্রেম নারায়ণ টণ্ডন (১৯১৫), জগদীশচন্দ্র মাথুর (১৯১৭), প্রভাকর মাচওয়ে (১৯১৭), মহেন্দ্র ভটনাগর (১৯২৬), রাজকুমার ভ্রমর প্রভৃতিও এই ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার— আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল সাহিত্যিকই বহু-বিচিত্র প্রকারের রেখাচিত্র রচনায় অভিরুচি দেখিয়েছেন। রেখাচিত্র-রচয়িতার সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তার স্তরও বেশ উন্নত হয়েছে। শ্রীরাম শর্মার 'বোলতী প্রতিমা' (১৯৩৭) একটি অনবদ্য সৃষ্টি। মহাদেবী বর্মার 'অতীতকে চলচ্চিত্র' (১৯৪১), কন্হৈয়ালাল মিশ্রের 'জিন্দগী মুস্করাঈ' (১৯৫৩), রামধারী সিংহ দিনকরের 'রাহুল' (১৯৩৯) এবং 'মামা বরেরকর' (১৯৫৩) প্রভৃতি হিন্দীর সার্থক রেখাচিত্রের কয়েকটি। হিন্দী সাহিত্যে এমন লেখক কমই আছেন যাঁরা 'রেখাচিত্র' লেখেন নি। সুতরাং এই শাখাটির পরিপুষ্টির কথা সহজেই অনুমেয়। তবে সব রচনা যে কালজয়ী নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সংবাদীসাহিত্য

হিন্দী সাহিত্যে 'রিপোর্তাজ' বা সংবাদীসাহিত্যের সংযোজন ঘটেছে আধুনিক যুগে। ইংরেজি 'রিপোর্ট' শব্দের ফরাসী প্রতিশব্দ 'রিপোর্তাজ', যাতে কোনো ঘটনার যথাযথ বর্ণনা লেখকের সাহিত্যরুচিতে লালিত্যমণ্ডিত হয়ে আকর্ষণীয় ও সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সংবাদের শিল্পিত ও সাহিত্যিক রূপই— রিপোর্তাজ, যাকে আমরা 'সংবাদীসাহিত্য'ও বলতে পারি। লেখকের কল্পনা, শিল্পচেতনা ও প্রতিভাস্পর্শে সংবাদই সংবাদীসাহিত্য হয়ে ওঠে। তবে কল্পনাসর্বস্ব ভিত্তিহীন সংবাদ রিপোর্তাজ নয়। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের কোনো সময় য়ুরোপে এই সাহিত্যের উদ্ভব। বর্ণনীয় ঘটনা বা বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান-আশ্রিত সহজ, সরল ও গ্রাহ্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং স্থান ও পাত্রের যথার্থ চিত্রণই— সার্থক সংবাদীসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। সংবাদীসাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝে নিয়ে হিন্দীতে প্রথম তার শাস্ত্রীয় রূপ নির্দেশ করেন শিবদান সিংহ চৌহান ১৯৪১ সালে। তাঁর মতে— আধুনিক জীবনের নবীন ও দ্রুতগতিশীল বাস্তবিকতায় হস্তক্ষেপের জন্য যে-সকল অভিনব কৌশল প্রবর্তিত বা গৃহীত হয়েছে— সংবাদীসাহিত্য বা রিপোর্তাজ তার একটি। সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ রূপবিধান রূপে এটি স্বীকৃতি পেতে পারে। সংবাদীসাহিত্যের সূচনা ঘটে হিন্দীতে 'হংস' পত্রিকায় সর্বপ্রথম। ১৯৪৪ সাল থেকে এই সাহিত্য শাখাটি হংস পত্রিকায় 'সমাচার ঔর বিচার' নামে স্থায়ী স্তম্ভের রূপ নেয়। ক্রমে ক্রমে তার প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পায়। লেখক ও পাঠক উভয়ে এই নবীন সাহিত্য-শাখাটির প্রতি আকৃষ্ট হন। শিবদান সিংহ চৌহানের রচনা 'লক্ষ্মীপুরা' (রূপাভ পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৩৮) হিন্দী রিপোর্তাজের প্রথম খসড়া রূপে বিবেচ্য। রাঁগেয় রাঘব, প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, রামনারায়ণ উপাধ্যায়, ভগবৎ-

শরণ উপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রামকুমার বর্মা, জগদীশচন্দ্র জৈন, অমৃতলাল নাগর, ফণীশ্বরনাথ 'রেণু', পতুমলাল পুন্নালাল বক্শী, উপেন্দ্র-নাথ অশ্‌ক, প্রভাকর মাচওয়ে, লক্ষ্মীচন্দ্র জৈন, কামতাপ্রসাদ সিংহ, ভদন্তআনন্দ কৌশল্যায়ন, অমৃত রায়, ঠাকুরপ্রসাদ সিংহ, শিবসাগর মিশ্র এবং ওমপ্রকাশ শর্মা প্রমুখ সাহিত্যিকারও সংবাদীসাহিত্য শাখাটিকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যে সব পত্র-পত্রিকায় সংবাদীসাহিত্য স্বীকৃতি পেয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে— তার মধ্যে 'হংস' পত্রিকার কথা তো বলাই হয়েছে। তা ছাড়াও 'নয়াপথ', 'জ্ঞানোদয়', 'কল্পনা', 'মাধ্যম' ও 'লহর'— প্রভৃতি পত্রের কথাও উল্লেখযোগ্য।

'সংবাদীসাহিত্যে'র লেখক নিজেও বর্ণিত ঘটনার অংশবিশেষ ও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। তাই তার যথার্থ বিচার ও চিত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। ঘটনার শিল্পসম্মত, চিত্রময় বিবরণ-প্রস্তুত করাই তাঁর কাজ। তাতে শব্দের সুতোয় ঘটনাপরম্পরাকে গেঁথে রূপায়িত করা হয় সংবাদীসাহিত্য। আধুনিক হিন্দী প্রবন্ধশাখায় যে কয়টি নবীন দিক ফুটে উঠেছে— 'সংবাদীসাহিত্য' তার অন্যতম। যুগধর্মী সাহিত্যরূপে এই শাখাটির প্রচার-প্রসারও বেশ জোর কদমে চলেছে।

রেখাচিত্র, সংস্মরণ প্রভৃতির তুলনায় ভেঁট-বার্তা-সাহিত্য শাখাটি হিন্দীতে নবীনতম সংযোজন। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই এটিও গৃহীত। অতি আধুনিক হলেও এই শাখাটি নিয়ে হিন্দীতে গভীরভাবে চিন্তন-মনন ও সৃজন শুরু হয়েছে। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এর সূচনা ও অভিবৃদ্ধি। আজও পত্র-পত্রিকাতেই ভেঁটবার্তা প্রকাশিত হয়। পরে তা সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য রেডিওতেও ভেঁটবার্তা বা সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

বনারসীদাস চতুর্বেদী তাঁর সম্পাদিত হিন্দী 'বিশাল ভারত' পত্রিকার (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) পৃষ্ঠাতেই প্রথম ইণ্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে মুদ্রিত হয় 'রত্নাকরজী সে সাক্ষাৎকার'। ১৯৩২-এর জানুয়ারিতে বের হয় 'প্রেমচন্দজী কে সাথ দো-দিন'—ঐ বিশাল ভারতেই। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর সংখ্যায় 'কবূতর' শীর্ষক একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এটিই সাংবাদিকদের প্রথম সাক্ষাৎকার— লেখক শ্রীরাম শর্মা। ড. সত্যেন্দ্র সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় ভেঁটবার্তার সাহিত্যিক রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ১৯৪১-এর মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা সাধনাতে কবি ও লেখকদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

সাধারণত লেখক ও সাহিত্যিকদের কাছে এক-প্রস্থ প্রশ্নাবলী পাঠিয়ে উত্তর চাওয়া হয় অথবা স্বয়ং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং স্বর্গত ব্যক্তিদের সঙ্গে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার প্রস্তুত করা হয়— এই তিন ভাবে সাক্ষাৎকার সাহিত্য রচিত হয়। তবে দ্বিতীয় প্রণালীটিই হিন্দীতে সমধিক গৃহীত। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হিন্দী-সাক্ষাৎকার সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ বেণীমাধব শর্মার 'কবিদর্শন'। হরিঔধ, মৈথিলীশরণ গুপ্ত প্রভৃতি কবির সঙ্গে গৃহীত সাক্ষাৎকার এ-গ্রন্থে বর্ণিত। সর্বাধিক

লোকপ্রিয় সাক্ষাৎকার গ্রন্থ হল— পদ্মসিংহ শর্মা 'কমলেশ' রচিত 'মৈঁ ইন সে মিলা' (দুই খণ্ড, ১৯৫২)। তাতে সে যুগের হিন্দী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ (১২+১০) বাইশ জন লেখকের সাক্ষাৎকার মুদ্রিত। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র সত্যার্থীর 'কলা কে হস্তাক্ষর', রামধারী সিংহ দিনকরের 'বট-পীপল' প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সারিকা (১৯৬৩-৬৫), ধর্মযুগ (১৯৬৫), মাধ্যম (১৯৬৬) এবং সঙ্গীত প্রভৃতি পত্রিকায় বরাবর ভেঁটবার্তা বা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়ে আসছে। এইভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মারফত এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করার কাজে যাঁরা ব্রতী রয়েছেন, বিষয়বস্তু, শিল্প ও শৈলীর বিচারে নবীনতা ও বিশিষ্টতা আনতে প্রয়াসী হয়েছেন— প্রেম কপূর, মনোহরশ্যাম যোশী ও শৈলেশ মটিয়ানী প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম। এই নবীন ধারাটিও সহজ-সাবলীল প্রবাহের গতিপথ লাভ করে স্বচ্ছন্দচিত্তে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই চলার মধ্যেই তার প্রাণের পরিচয় নিহিত।

হিন্দীর প্রবন্ধসাহিত্য শাখাটি সাধারণভাবে বিষয়ের ব্যাপ্তি, চিন্তন-মননের গভীরতা, প্রকাশভঙ্গির বিবিধতা, ব্যক্তিত্বের অজস্রতা এবং নানা বৈচিত্র্যে সুসমৃদ্ধ। অতি সাম্প্রতিক কালে রচনার বিবিধতা ও বৈচিত্র্যের পরিমাণবৃদ্ধি যেমন ঘটছে চিন্তার অগভীরতাও তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মানুষের মন ও রুচিই সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখে, এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এই মন ও রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করে কাল বা সময়। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক এই কালই। তাই কালের বিচারে যা টিকবে— তাই যথার্থ ও শাশ্বত সাহিত্য। হিন্দী প্রবন্ধ শাখায় যা কিছু রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে— তা নিয়ে আলোচনা ও গৌরববোধের অবকাশ অবশ্যই আছে। তবে কালের বিচারে এই অভিনব সৃষ্টির কতটুকু স্থায়িত্ব লাভ করবে, তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

উল্লেখপঞ্জী

১. 'রাজা ভোজ কা সপনা'— রাজা শিবপ্রসাদ এবং 'এক অদ্ভুত অপূর্ব স্বপ্ন'— বাবু তোতারাম-রচিত। রচনা দুইটি গল্পাকারে হলেও প্রবন্ধধর্মী। তাই প্রবন্ধের ভাষা প্রয়োগের বিচারে এই দুইটি উল্লেখযোগ্য।
দ্রষ্টব্য—রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (বি. সং ২০২৯), পৃ. ২৯৮ এবং ৩১৪।

২. মারাঠীতে যথার্থ নিবন্ধ-সাহিত্যের সূচনা চিপলুণকর থেকেই। মারাঠী সাহিত্যের ইতিহাসকার গোডেবোলে তাঁকে হিন্দী সাহিত্যের ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও শ্রদ্ধারাম ফিল্লৌরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।
দ্রষ্টব্য—'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস', না. প্র. স. কাশী, খণ্ড-১৩ (বি. সং ২০২২), পৃ. ১০২।

৩. দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের 'হিন্দী গদ্যসাহিত্যের সূচনা' অংশের 'বালমুকুন্দ গুপ্ত' পর্যায়, পৃ. ২১৬।

৪. রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্য তত্ত্ব' বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধের সঙ্গে জৈনেন্দ্রপ্রসাদের এই প্রবন্ধটির বক্তব্যের সাম্য লক্ষণীয়। স্মরণীয়— রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' ১৯২৯ ও 'সাহিত্যের পথে' ১৯৩৬ সালে হিন্দীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

৫. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য। গ্রন্থটির ভূমিকায় দ্বিবেদীজী লিখেছেন—

> "ইন পংক্তিয়োঁ কে লেখক কো লগভগ বারহ বর্ষ তক উনকে [রবীন্দ্রনাথকে] নিকট সম্পর্ক মেঁ রহনে কা অবসর মিলা থা। উনকা জীবন বহুত হী সংযমিত ঔর প্রেরণাদায়ক থা। উনকে নিকট জানেওয়ালে কো সদা য়হ অনুভব হোতা থা কি

ওয়হ পহলে সে অধিক পরিষ্কৃত ঔর অধিক বড়া হো কর লৌট রহা হৈ। ... সদা উনসে নয়ী প্রেরণা ঔর নয়া সন্দেশ মিলতা থা। .. ওয়ে সচ্চে অর্থো মেঁ 'গুরু' থে।"

—লেখক কা বক্তব্য, পৃ. ১

৬. দ্রষ্টব্য—হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্র' (১৯৬৩) গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ কী হিন্দী সেবা', 'রবীন্দ্রনাথ ঔর আধুনিক হিন্দী সাহিত্য', 'রবীন্দ্রনাথ ঔর হিন্দী সাহিত্য' ও 'শান্তিনিকেতন কী স্মৃতিয়াঁ' এবং বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রতত্ত্বের ভাষ্যকার হাজারী-প্রসাদ', ('রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১, পৃ. ৬২-৭৩) প্রভৃতি প্রবন্ধ।

৭. দ্রষ্টব্য—'হিন্দী সমাচার পত্রোঁ কী প্রগতি'— হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, খণ্ড-১৩, না. প্র. স. কাশী (২০২২ বি.), পৃ. ১৫২-২০০।

৮. গ্রন্থটি সে যুগে বহুপঠিত হয়ে 'শোকাশ্রুপ্লুত' গদ্যকাব্যরূপে খ্যাতি লাভ করে। ভাষার আবেগময়তা, করুণরসের উচ্ছ্বাস, জীবনের প্রতি অনাসক্তি প্রভৃতির অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি কাব্যরসসিক্ত নাট-কীয় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থে। অচিরে তা প্রতিবেশী সাহিত্যেও অনূদিত, পঠিত, গৃহীত ও অনুকৃত হয়।

৯. দ্রষ্টব্য লেখকের— 'বাংলা সমালোচনা' প্রবন্ধ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮৬, পৃ. ৫৯-৬৬।

১০. এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য লেখকের—'সূরপদ রত্নাবলী' (১৯৮৪) গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে— 'সূর-পদাবলীতে জাতীয় সংহতির সুর', 'সূরদাস ও বাঙালি বৈষ্ণব কবির রচনায় বাৎসল্য' এবং 'চণ্ডীদাস ও সূরদাস'— শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ, পৃ. ১৫৩-২২২।

১১. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ কয়টির মধ্যে 'সাহিত্য' (১৯০৭) ও 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬)— হিন্দীতে অনুবাদ করেন— 'বংশীধর বিদ্যালংকার' (সাহিত্য, ১৯২৯, হিন্দীগ্রন্থ

রত্নাকর, বোম্বাই) এবং ধন্যকুমার জৈন ('সাহিত্য কে পথ পর', ১৯৩৬, রবীন্দ্র সাহিত্য মন্দির, কলকাতা)।

১২. দ্রষ্টব্য—ড. কিশোরীলাল গুপ্ত রচিত 'হিন্দী সাহিত্য কে ইতিহাসোঁ কা ইতিহাস' (১৯৭৮) গ্রন্থের 'হিন্দী সাহিত্য কে বিবিধ প্রকার কে ইতিহাস'-অধ্যায়, পৃ. ১৮০-১৯৪।

কৌতূহলী পাঠকের সুবিধার্থে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি ইংরেজি বইয়ের নাম দেওয়া গেল—

1. The Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan (1889).
—Sir George A. Grierson.
2. A Sketch of Hindi Literature (1918).
—Edwin Graves.
3. A History of Hindi Literature (1920).
—Frank E. Key.
4. Hindi Literature (1953).
—Dr. Ram Awadh Dwivedi.
5. A Critical Survey of Hindi Literature (1966).
—Dr. Ram Awadh Dwivedi.

১৩. দ্রষ্টব্য—'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' খণ্ড-১৪, (সং ২০২৭), না. প্র. স. কাশী, 'সংস্মরণ, আত্মকথা এবং জীবনী', পর্যায়, পৃ. ৪৮০-৯৫।

১৪. 'পত্র' অর্থে 'লেখ' শব্দটির প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ করার মতো। তা ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অভিরুচি ও অনুভূতির প্রকাশক। এই দৃষ্টিতে ইংরেজি Personal Essay বা 'ব্যক্তিগত নিবন্ধ'-এর সঙ্গে তার সাধর্ম্য লক্ষণীয়। 'লেখ' শব্দটি 'ব্যক্তিগত নিবন্ধ' থেকে সাধারণ নিবন্ধের পর্যায়বাচী হয়ে উঠেছে। আজকাল অর্থ প্রসারের ফলে—'লেখ' বা 'লেখা' যে কোনো রকমের 'প্রবন্ধ' বোঝায়।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক হিন্দীকাব্য

(১৮৫০-১৯৮০)

সুদীর্ঘ কাল ধরে হিন্দী কবিতার বাহন ছিল ব্রজভাষা। এমন-কি ব্রজভাষা গদ্য ও খড়ীবোলী বা খড়ী হিন্দী গদ্যের প্রবর্তনকাল পর্যন্ত কবিতার ক্ষেত্রে সেই ভক্তিকাল ও রীতিকালের প্রথাই অনুসৃত হয়ে এসেছে। ভক্তিভাবের ভজন, রাজ-রাজড়ার ঐতিহাসিক চরিত গাথা, কাব্যশাস্ত্র ও নায়ক-নায়িকা ভেদ নিয়ে রচিত গ্রন্থ তথা শৃঙ্গার ও বীর রসের কবিত্ত, সবৈয়া এবং দোহা প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের রচনা ক্রমান্বয়ে হয়েছে। এই কাব্য-সৃজন-ক্রিয়া নগরের সীমা পার হয়ে গ্রামেও বিস্তার লাভ করেছে। ব্রজভাষায় কাব্য-রচনার প্রয়াস গুজরাট থেকে বিহার এবং কুমায়ুন-গাঢ়োয়াল থেকে দক্ষিণ ভারতের সীমা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই প্রাচীন প্রথায় নবীনতার জন্য স্থান ছিল না বললেই হয়। কবিদের রচনায় ভাব-ভাষা ও ছন্দের গতানুগতিক অনুকৃতি বা অনুসৃতিই প্রবল ছিল। শব্দের অর্থগাম্ভীর্য ও ব্যঞ্জনার প্রতি তেমন লক্ষ ছিল না। শব্দালঙ্কার আশ্রিত বাহ্যাড়ম্বরেই ছিল সমধিক প্রীতি ও তৃপ্তি।

হিন্দী সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে আধুনিকতার পূর্বাভাস সূচিত হলেও কাব্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন-প্রথাই প্রচলিত ছিল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। যে সব কবি এই প্রাচীন কাব্যধারাকে ধরে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি সেবক, মহারাজ রঘুরাজ সিংহ, রঘুনাথ দাস, 'রামসনেহী', ললিত কিশোরী, রাজা লক্ষ্মণ সিংহ, লছিরাম (ব্রহ্মভট্ট), গোবিন্দ গিল্লাভাঈ এবং নবনীত চৌবে প্রমুখ ছিলেন প্রধান। এই সব কবিদের বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দুই-এক কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

সেবক কবি (১৮১৫-১৮৭৫)—ব্রজভাষার খ্যাতনামা কবি সেবক 'রাগবিলাস' নামে নায়িকাভেদের বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নখশিখ বিষয়ক গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বরওয়ৈ ও সবৈয়া-ছন্দের রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি 'অসনী'র ঠাকুর-কবির (পৃ. ১৭২) পৌত্র ছিলেন।

মহারাজ রঘুরাজ সিংহ (১৮২৩-১৮৭৯)—রঘুরাজ সিংহ ভক্তিমূলক ও শৃঙ্গার বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'রামস্বয়ম্বর' (১৮৬৯) বর্ণনাত্মক প্রবন্ধকাব্যটি খুবই জনপ্রিয়। তাতে নানা ছন্দে রাম-সীতার বিবাহ সবিস্তারে বর্ণিত। তিনি 'রুক্মিণী পরিণয়', 'আনন্দাম্বুনিধি' ও 'রামাষ্টয়াম' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেন।

সরদার কবি (কবিতাকাল ১৮৪৫-১৮৮৩)— একজন কুশলী ও সাহিত্যমর্মজ্ঞ কবি ছিলেন সরদারজী। সাহিত্য-সৃজন ও প্রাচীন সাহিত্যের টীকা-ভাষ্য রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি 'সাহিত্যসরসী', 'বাগ্‌বিলাস', 'ষট্‌ঋতু', 'হনুমৎভূষণ', 'তুলসীভূষণ', 'শৃঙ্গার সংগ্রহ', 'রামরত্নাকর', 'সাহিত্যসুধাকর' ও 'রামলীলাপ্রকাশ' প্রভৃতি ভক্তচিত্তমনোহারী কাব্যগ্রন্থ এবং 'কবিপ্রিয়া', 'রসিকপ্রিয়া', 'সূর কে দৃষ্টিকূট' ও 'বিহারী সতসঈ' বিষয়ক উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

বাবা রঘুনাথদাস 'রামসনেহী' (১৮১৬-১৮৮২)—অযোধ্যার সাধক কবি রঘুনাথদাস তাঁর সমসাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ মহাত্মারূপে স্বীকৃত। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত তাঁর 'বিশ্রামসাগর' গ্রন্থে বহু পুরাণ কাহিনী বর্ণিত। ভক্তজনের কাছে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত।

ললিত কিশোরী (কবিতাকাল ১৮৫৮-১৮৭৫)—প্রকৃত নাম সাহ কুন্দন লাল। লাখনাউয়ের সম্ভ্রান্ত বৈশ্য পরিবারের সন্তান। বিরক্ত হয়ে বৃন্দাবনে জীবন-যাপন করেন। বৃন্দাবনের 'সাহজীর মন্দির' তাঁরই নির্মিত। তিনি ভক্তি ও প্রেম বিষয়ক বহু পদ ও গজল রচনা করেন।

রাজা লক্ষ্মণ সিংহ (১৮৩৯-১৮৯৬)—গদ্যকাররূপে যথাস্থানে (পৃ. ১৯৯-২০০) তাঁর বিষয় আলোচিত হয়েছে। ব্রজভাষার মধুর ও সরস কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মিষ্ট-মধুর ব্রজভাষায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন। 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত' ও 'রঘুবংশ' প্রভৃতির মধ্যে মেঘদূতের অনুবাদটি অনবদ্য। তিনি সবৈয়া, দোহা ও চৌপাঈ-এর প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তবে সবৈয়া লেখাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল সমধিক।

লছিরাম 'ব্রজভট্ট' (১৮৪১-)—বস্তী জেলার অমোঢ়ার সন্তান লছিরাম। বহু রাজা ও গুণজ্ঞের কাছে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। সেই সব গুণগ্রাহীদের প্রত্যেকের নামেই তিনি কাব্য লিখেছেন। 'মানসিংহাষ্টক', 'প্রতাপরত্নাকর', 'প্রেম-রত্নাকর', 'লক্ষ্মীশ্বর রত্নাকর', 'রাবণেশ্বর কল্পতরু' ও 'কমলানন্দন কল্পতরু'—প্রভৃতি গ্রন্থ তার সাক্ষ্য বহন করে। বিভিন্ন রস নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। পাদ বা পংক্তি পূরণে তিনি ছিলেন সে যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রজভাষায় প্রাচীন প্রথার কবি হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অধিকাংশ কাব্য আজও অপ্রকাশিত।

রসিকেশ (১৮৪৪-)—বৈরাগ্য জীবনের নাম জানকীপ্রসাদ। রীতি, ভক্তি ও সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তিনি ২৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'রামরসায়ন' 'কালসুধাকর', 'বিরহদিবাকর', 'সুযশকদম' ও 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দ গিল্লাভাঈ (১৮৪৮-১৯২৬)—গুজরাটি কবি। ভাবনগর রাজ্যের সিহোরে তাঁর জন্ম। গুজরাটিভাষী কাব্যরসিক গিল্লাভাঈ ব্রজভাষাতেও উৎকৃষ্ট কবিতা লিখতেন। তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ— 'নীতিবিনোদ', 'শৃঙ্গার সরোজিনী', 'ষট্‌ঋতু', 'পাওয়স পয়োনিধি', 'সমস্যাপূর্তি প্রদীপ', 'বক্রোক্তি বিনোদ', 'শ্লেষচন্দ্রিকা', 'প্রারব্ধ পচাশা' এবং 'প্রবীণ সাগর'। তাঁর ২১৪টি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নবনীত চৌবে (১৮৫৮-১৯৩২)—প্রাচীন প্রথার আধুনিক কবিদের মধ্যে মথুরা নিবাসী চৌবেজীর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ভারতেন্দুর সমসাময়িক হলেও স্বতন্ত্র ভাবভঙ্গির মানুষ ছিলেন। ব্রজভাষায় উচ্চমানের কবিতা লিখতেন।

ব্রজভাষা ও রাজস্থানী— দুই ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন এমন কবির সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের মধ্যে কমজী দধি-বাড়িয়া, সূরজমল, সরূপদাস, নটনাগর, গণেশপুরী, মুরারিদাস, উমরদাস, বখ্‌তাওয়র বালাবখ্‌স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সব কবির রচনায় একপ্রকার উৎকর্ষ থাকলেও তাতে সাহিত্যে গতিবেগ আসে নি। সুতরাং আধুনিকতার স্পর্শ তখনও এই সব কবি-চিত্তে লাগেনি বলা চলে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন সূচিত হয়। আধুনিকতার স্পর্শ লাগল মানুষের চিন্তন-মনন, গ্রহণ ও সৃজনে— নতুন করে। রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ চিন্তাশীল দেশপ্রাণ মহাপুরুষদের প্রয়াসে সমাজসংস্কার ও রাজনীতিবিষয়ক পরিবর্তনের চেতনা জেগে উঠেছিল কিছুকাল পূর্বেই। তবে হিন্দী সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তার অনুপ্রবেশ ঘটলেও কাব্যে তা ছিল অস্পষ্ট। এই সময় আবির্ভাব ঘটে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের (১৮৫০-১৮৮৫) তিনি ঘোষণা করেন— 'আপন ভাষার উন্নতিই সকল উন্নতির মূল'। কিন্তু কাব্যের বিষয় ও ভাবের পরিবর্তন ঘটলেও মাধ্যম সেই ব্রজ-ভাষাই থেকে গেল। দীর্ঘদিন ধরে বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যবহৃত হওয়ায় তার শিকড় এমন গভীরে পৌঁছেছিল এবং এমনভাবে রস সংগ্রহ করে পুষ্টি লাভ করেছিল যে, তাকে উপড়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে আধুনিক মন, ভাব ও বিষয়ের সংস্পর্শে তার আসন টলে উঠল। এ যুগের বেশ কিছু সংখ্যক কবি ব্রজভাষা ও খড়ীবোলী দুটিতেই কবিতা লিখতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়

'হরিঔধ' এবং শ্রীধর পাঠকের কৃতিত্ব সর্বাধিক। পরবর্তীকালে নিজ-নিজ অভিরুচি অনুসারে পৃথক-পৃথক কাব্যরচনার ক্ষেত্র নির্বাচন করেন তাঁরা।

হিন্দী কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগেই। হিন্দী কাব্যাকাশে নবেন্দু-রূপে উদিত হয়ে তিনি উদ্ভাসিত করে তুললেন চারিদিক। তাঁর মনের গঠনে একদিকে ছিল প্রাচীন উপকরণ অন্যদিকে ছিল আধুনিক চিন্তা ও অনুভূতি। তিনি ছিলেন প্রাণ-মন-চোখ-কান খুলে রাখার পক্ষপাতী। তাই তাঁর কাব্যের ভাষা ও কাঠামো প্রাচীন হলেও নবীন যুগের নব ভাবের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিল না। নব-যুগের অনুকূল ভাষা গড়ে তুলতে তিনি প্রয়াসী হন। ভাষা থেকে প্রাচীনতার খোলস ও বন্ধন খসতে শুরু হল, প্রতিবেশী ভাষার আধুনিক রূপের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।[১] প্রতিবেশী ও সাধারণ কথ্যভাষার শব্দগ্রহণ শুরু হল। ভাষা জনগণের কাছাকাছি এল। এবার সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুতির সম্ভাবনা দেখা দিল। এইভাবে নিঃশব্দে ভারতেন্দু প্রাচীন অলঙ্কার ও নায়িকাভেদের দুর্গ থেকে হিন্দী কবিতাকে মুক্ত করে যুগোপযোগী সমাজ-সংস্কার ও দেশপ্রেমের আধারে তাকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হলেন। তাঁর নাটকে ('নীলদেবী' ও 'ভারত-দুর্দশা') ও নাটকে ধৃত কবিতায় দেশবাসীর করুণ আর্তি, বিলাপ এবং অবদমিত মনোবাঞ্ছা সরব হয়ে উঠল। প্রকৃতিচিত্রণেও তিনি যুগের প্রয়োজন এবং জনগণের মানসিকতাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূলে প্রধানত মানবপ্রেম এবং স্বদেশ-প্রেমই সক্রিয়। তাই তাঁর কবিতায় স্বাভাবিক প্রকৃতি অপেক্ষা মানবকৃত নগরসভ্যতার অট্টালিকাময়, উদ্যানময় রূপ কোনোক্রমেই লঘু হয় নি। তিনিই আবার কৃষ্ণভক্তরূপে বলেছেন— 'ব্রজের লতা-পাতা কর গো আমায়'। অন্যদিকে মেঘ ও ঋতুচক্রের রূপ বর্ণনাতেও তিনি কুশলতা দেখিয়েছেন।

ভারতেন্দুর রাষ্ট্র-চিন্তাও অভিনবতামণ্ডিত। তিনি ঈশ্বরভক্ত, প্রকৃতিপ্রেমিক হয়েও মুখ্যত মানবপ্রেমিকই। তাই সমস্ত ভারতবাসী—

হিন্দু-মুসলমান, খ্রীস্টান, সবাইকে 'ভারত-সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দী, হিন্দু ও হিন্দুস্তানের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তাঁর হৃদয়ের উদারতায় ভারতের ভাষা, ভারতীয় জাতি ও ভারতদেশ বিষয়ক চিন্তন-মনন, অতিমাত্রায় ভাস্বর। তাঁর জাতীয়তায় কোনো-প্রকার অনুদারতা ছিল না।

অবশ্য বাঙালি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) মতোই দেশভক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজভক্তিও কম ছিল না। দেশে ইংরেজ শাসন আপাতভাবে সুব্যবস্থিত হলে দেশের ও জাতির উন্নতির বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন ভারতেন্দু। কাবুল, মিশর প্রভৃতি দেশে ইংরেজের সাফল্যে তিনি আনন্দপ্রকাশ করে কবিতা লিখেছিলেন। কারণ তাতে ভারতীয় সৈন্যদের গৌরববৃদ্ধি হয়েছিল। তবে যেখানে ইংরেজের ব্যবস্থা ও আচরণ দেশের ধন ও জনের ক্ষতির কারণ হয়েছে, উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়েছে, সেখানে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভারতের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে দেখে কবির পীড়িতহৃদয় বলে উঠল—

> অঙ্গরেজ রাজ সুখ সাজ সজে সব ভারী—
> পৈ ধন বিদেশ চলি জাত অহৈ অতিখারী।
> —ইংরেজরাজ সুখের সাজ দেখায় মনোহারী।
> কিন্তু, দেশের ধন বিদেশ যায়— অসঙ্গত ভারি।

ভারতেন্দুর দেশভক্তি ও রাজভক্তি দুই-ই অকৃত্রিম ছিল। তিনি উর্দু সাহিত্যেরও ভক্ত ছিলেন। উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা, মারাঠী ও গুজরাটি ভাষাতেও তিনি কবিতা লিখতেন।[২] সংস্কৃত এবং এই সব ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। এই সব সাহিত্যে প্রতিফলিত সূক্ষ্ম-বেদনা ও অনুভূতি ভারতেন্দুর রচনাতেও মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনা মর্মগ্রাহী ও রসবাহী। সব মিলিয়ে ভারতেন্দু প্রেমের কবি। এই প্রেমই দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত। তাঁর শৃঙ্গাররসের বর্ণনাও বড়োই সরস এবং মর্মস্পর্শী। যেমন—

পিয় প্যারে তিহারে নিহারে বিনা।
তুখিয়া অঁখিয়াঁ নহিঁ মানতি হৈঁ ॥
—হে প্রিয়, তোমারে নেহারে বিনা,
দুঃখী নয়নে বোধ মানে না ॥

ভারতেন্দুর শৃঙ্গারবিষয়ক রচনা তাঁর 'প্রেমমাধুরী', 'প্রেমফুলওয়ারী', 'প্রেমমালিকা' ও 'প্রেম-প্রলাপ' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত।

বল্লভ সম্প্রদায়ের নানা শাখা-প্রশাখা থাকলেও ভক্ত ভারতেন্দুর চক্ষে সব 'এক' ছিল। বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকলেও কোনো সম্প্রদায়কেই তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না। জৈন দেবদেবীর স্তবও তিনি রচনা করেছেন। বৈষ্ণবদের মতো একমাত্র জগৎকেই তিনি সত্য বলে মনে করতেন। মায়াবাদের ফাঁদে তিনি পা দেন নি। সংক্ষেপে বলা যায় ভক্তিকাল ও রীতিকালীন ভাব-ভাবনার সঙ্গে নব-যুগের নূতন ভাবনা— দেশভক্তি ও সমাজসংস্কারের সহ-অবস্থান লক্ষিত হয় ভারতেন্দুর মধ্যে। তিনি আধুনিককে গ্রহণ করেছেন কিন্তু প্রাচীনকেও ত্যাগ করেন নি। তাই তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি। তাঁর কাব্যের আধুনিকতার তিনটি বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে হিন্দী কাব্যকে প্রভাবিত করেছে। তা হল— সাহিত্যের ভাষাব সঙ্গে জনগণের ভাষার যোগ; প্রেমের বেদনা ও আর্তি; দেশপ্রেম—সমাজসংস্কার ও ধার্মিক সহিষ্ণুতা।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে কবি-সাহিত্যিকমণ্ডলী, তার সদস্যগণ নানাভাবে ভারতেন্দু কর্তৃক উৎসাহিত হতেন। সমস্যাপূর্তি বা পাদপূরণ নিয়ে গঠিত কবিসমাজে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট কবিতাও রচিত হত। অম্বিকাদত্ত ব্যাস (১৮৫৮-১৯০০); প্রতাপনারায়ণ মিশ্র (১৮৫৬-১৮৯৪); উপাধ্যায় বদরীনারায়ণ (১৮৫৫-১৯১৩); ঠাকুর জগমোহন সিংহ (১৮৫৭-১৮৯৯); বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৪৪-১৯১৪); লালা শ্রীনিবাস দাস (১৮৫১-১৮৮৭); সুধাকর দ্বিবেদী (১৮৫০-১৯১১); রাধাচরণ গোস্বামী (১৮৬৮-১৯২৫); রাধাকৃষ্ণ দাস (১৮৬৫-১৯০৭) প্রমুখ ছিলেন ভারতেন্দুমণ্ডলের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সম্ভবত ভারতেন্দুর প্রেরণা ও আনুকূল্যে তাঁরা সবাই বাংলা

শিখেছিলেন ও বাংলা থেকে অনুবাদ করতেন। তাঁদের রচনায় বাংলার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।

ভারতেন্দু যুগের কাব্যে একদিকে প্রাচীন কাব্যধারার প্রতি মোহ, অপরদিকে আধুনিকতার প্রতি সচেতনতা, দুই-ই লক্ষিত হয়। সাধারণ-ভাবে সে যুগের কাব্যে অলঙ্কার-প্রীতি, সমস্যা-পূরণ, ধাঁধা, চিত্রবন্ধ, রঙ্গ-রহস্য, ভক্তি, প্রেম ও স্বদেশ-চেতনাই প্রকট।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও নবীন-জীবন পদ্ধতি প্রতিফলিত সে যুগের কাব্যে। সর্বোপরি জাতি, সম্প্রদায় ও ঐতিহ্যভাবনাকে অতিক্রম করে তা রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ বা জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার প্রতি বহমান।

নবযুগের প্রারম্ভিক ক্ষণের কবি হিসাবে অম্বিকাদত্ত ব্যাস ও রামকৃষ্ণ বর্মার প্রয়াসে কাশীতে একটি কবিসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাস কবি বিহারীর বিষয়ে 'কুণ্ডলিয়াঁ' রচনা করেন। গ্রন্থটি বৃহদায়তন। তিনি খড়ী হিন্দীতেও কবিতা লিখতেন। রাধাকৃষ্ণ দাসও প্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন। তিনি রহিমের দোহার বিষয়ে 'কুণ্ডলিয়াঁ' রচনা করেন। বদরীনারায়ণ চৌধুরী 'প্রেমঘন' দেশপ্রেম ও হিন্দী-প্রচার-প্রসার বিষয়ে কবিতা লিখতেন। সে যুগের জাতীয় ভাব-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। 'প্রেমঘন-সর্বস্ব' (১৯৩৯) নামে তাঁর কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা-রচনায় স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন ঠাকুর জগমোহন সিংহ। শৃঙ্গার এবং স্বদেশ-প্রেম ও প্রকৃতি-প্রেম ছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। তিনি প্রকৃতি-চিত্রণের নতুন প্রথার প্রবর্তক। তাঁর শৃঙ্গার বিষয়ক পদ বেশ সরস ও উপভোগ্য। 'প্রেম সম্পত্তিলতা', 'শ্যামলতা', 'শ্যামসরোজিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর শৃঙ্গার বিষয়ক পদগুলি সংকলিত। তিনি 'মেঘদূতে'র অনুবাদও করেন।

লালা সীতারাম (১৮৫৮-১৯৩৬)—সরকারী চাকুরে হয়েও তিনি হিন্দীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 'ভূপ'— ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ' ও 'মেঘদূত'—অনুবাদ করেন। ভাষার শুদ্ধতা ও অনুবাদের উৎকর্ষ তাঁর গ্রন্থগুলিকে জনপ্রিয় করেছে। হিন্দী সাহিত্যের

ইতিহাসে মিশ্রবন্ধুদের নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ব্রজভাষায় ও খড়ীবোলীতে কবিতা লিখেছেন। যুগোপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন আবার ভাবাত্মক কবিতাও রচনা করেছেন। সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদও করেছেন।

জগন্নাথ দাস 'রত্নাকর' (১৮৬৬-১৯৩২)—জগন্নাথ দাস ভারতেন্দু যুগেই ব্রজভাষায় কবিতা লেখা শুরু করেন। আধুনিক যুগে অর্থাৎ বিংশ শতকেও তাঁর সেই প্রবণতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অন্তত দশটি আখ্যানকাব্য রচনা করেন। 'হরিশ্চন্দ্র', 'গঙ্গাবতরণ', 'গঙ্গালহরী', 'উদ্ধব শতক' ও 'কল-কাশী'— প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতি। তার মধ্যে 'উদ্ধব-শতক' ও 'গঙ্গাবতরণ' বিশেষভাবে জনপ্রিয়। উদ্ধব শতক— ভাবপ্রধান ও গঙ্গাবতরণ আখ্যানমূলক। প্রাচীনতা রক্ষা করেও তিনি উদ্ধব শতকে নবীনতার স্পর্শ দিয়েছেন। যুগপৎ গোপবালা ও কৃষ্ণের বেদনা মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে। তাতে ভক্তিকালের ভাবের সঙ্গে রীতিকালের অলঙ্করণও সমন্বিত। গঙ্গাবতরণেও পরিবর্তন সুস্পষ্ট। শৃঙ্গার, বীর, হাস্য ও ভয়ানক রসের চিত্রণ হয়েছে কাব্যটিতে। কল্পনা ও ভাষার গুণে আখ্যানটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তিনি সংস্কৃতনিষ্ঠ ভাষার মধ্যেও বাক্‌ধারাসুলভ বাক্যাংশাদির প্রয়োগে শব্দ-শক্তির সুন্দর উপযোগ করেছেন। শব্দ-সৌন্দর্য ও অর্থ-সৌন্দর্যের মনোরম সমন্বয় তাঁর ভাষার একটি বিশিষ্ট ধর্ম। প্রয়োজনে ওজঃপূর্ণ ভাষাও তিনি ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ কবি পোপের 'এসে অন ক্রিটি-সিজ্‌ম' (Essay on Criticism)-এর সুন্দর পদ্যানুবাদ করেছেন। পোপের কাব্যভাবকে তিনি ভারতীয়তা দানের সার্থক প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর রচনাসংগ্রহ 'রত্নাকর' (না. প্র. স.) থেকে কয়েকটি পংক্তি দেওয়া হল—

কাহু দূত কৈধোঁ ব্রহ্মদূত হৈঁ পধারে আপ,
ধারে প্রণ ফেরন কৌ মতি ব্রজওয়ারী কী।
কহৈ রতনাকর পৈ প্রীতি-রীতি জানত না,
ঠানত অনীতি অনিনীতি লে অনারী কী॥

মান্যো হম, কাহু ব্রহ্ম এক হী, কহ্যৌ জে তুম,
তৌ হূ হমৈঁ ভাবতি ন ভাবনা অন্যারী কী।
জৈহেঁ বনি বিগরি ন বারিধিতা বারিধি কী,
বূঁদতা বিলৈহৈঁ বূঁদ বিবস বেচারী কী।।

—উদ্ধব-কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর গোপবালাদের বোঝালেন—'জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে মিশে সমুদ্র হয়ে যায়, জীবও তেমনি ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে ব্রহ্ম হয়ে যায়।' তাঁর এই সান্ত্বনা-যুক্তির উত্তরে গোপবালারা বললো—'জলবিন্দু সাগরে মিশুক বা না মিশুক, তাতে সাগরের কিছু যায়-আসে না, কিন্তু বিন্দু-বেচারা তার অস্তিত্ব হারায়। অস্তিত্ব খুইয়ে সাগর হয়ে লাভ কি? যখন সে লাভের প্রাপকই আর রইল না।'

ব্রজভাষার কাব্য 'উদ্‌ধবশতক', 'শতক' ও 'সতসঈ' ধারার পরিপোষক। গোপবালারা জ্ঞানমার্গের খণ্ডন ও যুক্তিবাদের সমর্থন করেছে। তাতেই রয়েছে আধুনিকতার স্পর্শ।

রায় দেবীপ্রসাদ 'পূর্ণ' (১৮৬৬-১৯১৪)—যুগোপযোগী দেশ-ভক্তি ও নবীন ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটেছে কবি দেবীপ্রসাদের প্রাচীন ভঙ্গির কবিতায়। তাই তাঁর রচনা প্রাচীন হিন্দী কবিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঋতু বর্ণনাতেও কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'রসিক বাটিকা' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাতে কবিতার পাদপূরণ এবং প্রাচীন ভঙ্গির কবিতারই প্রাধান্য ছিল। তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করেন 'ধারাধর ধাবন' নামে। এই অনুবাদকৃতিতে তাঁর রচনার সরসতা ও লালিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।—

নব কলিত কেসর-বলিত হরিত সুপীত নীপ নিহারি কৈ।
করি অসন দল কঁদলীন জো, কলিয়াহিঁ প্রথম কছার পৈ।।
হে ঘন! বিপিনথল অমল পরিমল পায় ভূতল কী ভলী।
মধুকর মতঙ্গ কুরঙ্গ বৃন্দ জনায়হৈঁ তেরী গলী।।

—মেঘের জলস্পর্শে কদম্বের নবোদগত কেশরের সবুজ ও পাংশু বর্ণের শোভা দর্শন করে, আর্দ্রভূমিতে ভুঁইচাঁপার কলি উদ্‌গত হলে—

চারিদিক মধুর সৌরভে পরিপূর্ণ হবে। গরমে ক্লান্ত হরিণদল মেঘের জলবিন্দুতে শীতল হয়ে কদম্ব বনের শোভা উপভোগ করতে করতে ভুঁই চাঁপার কুঁড়ি চর্বণ করবে আর মাটির সোঁদা গন্ধে পাগল হয়ে তোমার পথে ছোটাছুটি করবে।

সত্যনারায়ণ 'কবিরত্ন' (১৮৮৪-১৯১৮)—ব্রজভাষার মাধুর্যে কবিরত্নের কবিতা পরিপূর্ণ। তাই 'ব্রজকোকিল' নামে তিনি অভিহিত হতেন। প্রেম ও শৃঙ্গার বিষয়ক কবিতায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় তাঁর হৃদয়োল্লাস প্রতিফলিত। রাষ্ট্রচেতনার প্রকাশও ঘটেছে তাঁর কবিতায়। 'ভ্রমর-দূত'— কাব্যে তিনি দেশের দুরবস্থার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মা যশোদা ভ্রমরকে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন।—

টিম টিমাতি জাতীয় জ্যোতি জো দীপশিখা-সী।
লগত বাহিরী ব্যারি বুঝন চাহত অবলা-সী॥
শেষ ন রহ্যো সনেহ কো, কাহূ হিয় মেঁ লেস।
কাসোঁ কহিবে গেহ কো দেসহি মেঁ পরদেস॥

—মিট্ মিট্ করে জাতীয় জ্যোতিটি প্রদীপ শিখার মতো,
বাইরের হাওয়া লেগে, বুঝি নেভে, হায় অবলার মতো।
স্নেহ হল শেষ, কারো হৃদয়েই রইল না তার লেশ,
ঘরের কথাটি বলি কারে হায়, দেশই যে হল বিদেশ॥

কোনো কোনো রচনায় রূপক-ছলে তিনি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। 'হৃদয়-তরঙ্গে' তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'উত্তর-রামচরিত' ও 'মালতী মাধব'— ভবভূতির এই নাটক দুইটি 'কবিরত্ন' হিন্দীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদে কবির স্বকীয়তার ছাপও সুস্পষ্ট।

রামচন্দ্র শুক্ল (১৮৮৪-১৯৪০)—গদ্যকার ও সমালোচকরূপে অগ্রগণ্য শুক্লজী ব্রজভাষায় কবিতা লেখাতেও পারঙ্গম ছিলেন। এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' (Light of Asia) গ্রন্থের অনুসরণে

তিনি ব্রজভাষাতে 'বুদ্ধচরিত' প্রবন্ধকাব্য রচনা করেন। প্রকৃতির উপাসক কবি প্রকৃতিকে মানুষের সহচরী বলে মনে করতেন। তাঁর ভাষা প্রাচীন হলেও জীবন্ত। খড়ীবোলীতেও তিনি কবিতা লিখেছেন। 'মনোহর ছটা', 'আমন্ত্রণ', 'মধুস্রোত', 'প্রকৃতি-প্রবোধ' এবং 'হৃদয় কা মধুর ভাব' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। রামচন্দ্র শুক্লের জ্যোৎস্না রাতের একটি বর্ণনা—

> অমরাইন মেঁ ধঁসি অমিয়ন কো দরসাবতি বিলগাঈ।
> সীকন মেঁ গুছি ঘূলি রহীঁ জো মন্দ ঝকোরণ পাঈ॥
> চূওয়ত মধূক পরসি ভূ জৌঁ লৌঁ 'টপ' 'টপ' শব্দ সুনাওয়ৈঁ।
> তাকে প্রথম পলক ভারত ভর মেঁ নিজ ঝলক দিখাওয়ৈঁ॥

> —আমের বনে ছড়িয়ে পড়ে, মধুর করে সুধার ধন,
> বোলের গোছা দুলছে সুখে মন্দমৃদু দেয় পবন।
> মহুয়া চুয়ে পড়ছে ভুঁয়ে 'টপ টপ' ধ্বনি প্রাণ মাতায়,
> এক পলকে রূপ ঝলকে ভারতজুড়ে তাই দেখায়।

শ্রীবিয়োগীহরি (১৮৯৬-১৯৮৮)—প্রকৃত নাম হরিপ্রসাদ দ্বিবেদী। ছেলেবেলা থেকেই কাব্যানুরাগী ছিলেন। প্রেমকেই তিনি কবিতার বিষয়রূপে বেছে নেন। পরে রাষ্ট্র-ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কাব্যে। গুরুর বিয়োগে তিনি বিয়োগীহরি' নাম গ্রহণ করেন। 'প্রেমশতক', 'প্রেমপথিক', 'প্রেমাঞ্জলি', 'প্রেম-পরিষদ' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর বৈষ্ণবমনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'চরখা-স্তোত্র', 'মহাত্মা গান্ধীজী কা আদর্শ', 'চরখে কী গূঁজ', 'অসহযোগ' এবং 'বীণা' প্রভৃতি কাব্যে তাঁর দেশভক্তি ও গান্ধী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় রয়েছে। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর যুবকদের প্রতি কবির ভক্তি ও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এই বীরদের তিনি শূরবীর, দয়াবীর, সত্যবীর, ধর্মবীর, দানবীর, বিরহবীর এবং প্রকৃতিবীর— এই সাতভাগে ভাগ করেছেন। এক-একশো করে দোহায় তিনি তাদের প্রকৃতি চিত্রণ করেছেন। সাতশো দোহার এই

গ্রন্থটি 'বীর সতসঈ' (১৯২৭) নামে পরিচিত। কবি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্রজভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'বীর সতসঈ' থেকে কয়েকটি পংক্তি—

পাওয়স হী মেঁ ধনুষ অব, নদী তীর হী তীর।
রোদন হী মেঁ লাল দৃগ, নবরসহী মেঁ বীর॥
জোরি নাওয়েঁ সঙ্গ সিংহপদ করত সিংহ বদনাম।
হৈব হো কৈসে সিংহ তুম করি শৃগাল কে কাম॥
য়া তেরী তরবার মেঁ নহিঁ কায়র অব আব।
দিল হূঁ তেরো বুঝি গয়ো, ওয়ামেঁ নেক ন তাব॥

—বর্ষা ছাড়া ধনুঃ কোথা, নদী ছাড়া তীর,
কান্না ছাড়া রক্তচক্ষু, নবরসে বীর।
সিংহে করো বদনাম, নামে জুড়ে 'সিংহ'
শৃগালের কাজ করে, হতে চাও সিংহ!
কায়র! তোমার অসি হয়ে গেছে ভোঁতা
মৃত দেহে বয় কভু সদিচ্ছার সোঁতা!

দুলারেলালজী ভার্গব (১৮৯৫-১৯৭৫)—বিহারীলালের দোহার আধুনিক ভক্ত এবং অনুসারী কবিদের মধ্যে দুলারেলাল ভার্গবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বল্পপরিসর দোহায়— স্নিগ্ধরসের সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট এবং সার্থক প্রকাশে তিনি দক্ষ ছিলেন। প্রাচীন কাব্যকৃতিতে দেশভক্তি, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, রাষ্ট্রীয়-আন্দোলন প্রভৃতি আধুনিক বিষয় প্রকাশের অপূর্ব কৌশল ছিল তাঁর। এ যেন তাঁর ব্রজভাষার পুনরুদ্ধার-প্রয়াস। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের নাম 'দুলারে দোহাবলী' (১৯৩৪)।

ব্রজভাষায় অন্য যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামনাথ শুক্ল জ্যোতিষী (১৮৭৪-১৯৪৩), নাথুরাম শঙ্কর শর্মা (১৮৫৯-১৯৩২), কিশোরীদাস বাজপেয়ী (১৮৯৮-১৯৮১), লালা ভগবান দীন (১৮৬৯-১৯৩০), গয়াপ্রসাদ শুক্ল 'সনেহী' (১৮৮৩-১৯৭২) প্রমুখের নাম স্মরণীয়। হরদয়াল সিংহজীর (১৮৯৩-) 'দৈত্যবংশ' কাব্যে রঘুবংশের অনুসরণে

দৈত্যরাজদের বর্ণনা দেওয়া আছে। 'দৈত্যবংশ' নিয়ে কাব্য রচনার প্রবণতা এ-যুগের চিন্তন-স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। কবি 'বচনেশ' মিশ্র (১৮৭৫-১৯৫৯) রচিত 'শবরী' কাব্যটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ দত্তজীর 'ব্রজবাণী'ও একটি উৎকৃষ্ট কাব্যকৃতি।

আধুনিক বিষয় নিয়ে ব্রজভাষায় কাব্যচর্চার কেন্দ্র হিসাবে 'কানপুর' এবং 'মথুরা' প্রসিদ্ধ ছিল। কানপুরে নতুন ও পুরাতন উভয় কাব্যধারার চর্চা হত, কিন্তু 'মথুরায়' হত প্রাচীন কাব্যচর্চাই। প্রাচীন ব্রজভাষাও প্রারম্ভিক আধুনিক খড়ীবোলীর কয়েকজন কাব্যকারের কথা অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হল। এবার খড়ীবোলী-কাব্যচর্চার ইতিহাস আলোচনার পূর্বে স্মরণ করা ভালো যে, নামদেব, কবীর, খুসরো, রহিম, ভূষণ ও 'গঙ্গ' প্রমুখ কয়েকজন কবির রচনায় খড়ীবোলীর আভাস লক্ষিত হয়েছে। আধুনিককালের প্রারম্ভে এসে দেখা গেল উর্দু ছন্দে পারসি পদাবলী এবং গজল রচনার প্রক্ষিপ্ত প্রয়াসও কেউ কেউ করেছেন। কেউ কেউ খড়ীহিন্দীতে দোহা লিখেছেন আর কৃষ্ণভক্ত-গণ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদও রচনা করেছেন। নাগরীদাস, কুন্দনলাল, ললিত কিশোরী এবং ললিতমাধুরী কেবল ব্রজভাষাতেই নয় খড়ী-বোলীতেও পদ লিখেছেন। অতঃপর আসে 'লাবনীবাজ'দের কাল। লাবনীর ভাষা খড়ীবোলী-ই। তুকনগিরি গোসাঁঈ এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর দুই শিষ্য 'বিশালগিরি' ও 'দেবী সিংহ'—লাবনীবাজ বা লাবনীয়াল (কবিয়াল-এর মতো?) রূপে সুপ্রসিদ্ধ। কাশীগিরি, যাঁর উপনাম ছিল 'বনারসী', লাবনীয়ালরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ভারতেন্দু এবং তাঁর মণ্ডলের কোনো কোনো কবিও লাবনী লিখতেন। অনেকে খড়ীবোলীতে অন্য কবিতাও লিখতেন। খড়ীবোলীতে প্রথম কবিতা রচনা করেন সম্ভবত ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রই। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি খড়ীহিন্দীতে তিনটি কবিতা রচনা করেন। 'দশরথ বিলাপ' তার একটি। মতান্তরে শিবপ্রসাদ 'সিতারে হিন্দ' খড়ীবোলীর প্রথম কবি।[৩]

কবি শ্রীধর পাঠক ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে খড়ীবোলীতে 'একান্তবাসী যোগী' (গোল্ড স্মিথের 'হারমিট' কবিতাটির অনুসরণে) রচনা

করেন। ভাষা কথ্য-অনুসারী। উত্তর ভারতের সংলাপের ভাষারূপে খড়ীবোলী এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতঃপর শুরু হল খড়ীবোলীকে কবিতার ভাষারূপেও গ্রহণ করার আন্দোলন। গদ্যের ভাষারূপে খড়ীবোলী স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু কবিতার ভাষা সেই ব্রজভাষাই থেকে গেছে। গদ্য ও পদ্যের বাহন যথাক্রমে খড়ীবোলী ও ব্রজভাষা—ভাষার এই বৈষম্য আর মনঃপূত হচ্ছিল না। মুজফ্‌ফরপুরের বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ খত্রী এই খড়ীবোলী-আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'খড়ীবোলী আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। কবিতার বাহনরূপে খড়ীবোলীকে স্বীকৃতি দানের ব্রত উদ্‌যাপিত হল। গড়ে উঠল একটি দল। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলন চারিদিকে। কয়েকজন কবিও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁরা খড়ীবোলীতে কবিতা লিখে একদিকে যেমন নানা যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করেছিলেন অপরদিকে তেমনি খড়ীবোলীর শক্তি, সৌন্দর্য ও মাধুরীর নিদর্শনও তুলে ধরেছিলেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে। অবশ্য কোনো-কোনো কবি সাহিত্যিক তার বিরোধিতাও করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে কবিতায় খড়ীবোলীর প্রয়োগ অবাধ হয়ে ওঠে। শ্রীধর পাঠক, দেবীপ্রসাদ 'পূর্ণ', নাথুরাম শঙ্কর শর্মা— প্রমুখ কবিরা বলিষ্ঠতার সঙ্গে খড়ীবোলী গ্রহণ করেন। শ্রীধর পাঠককেই কবিতায় খড়ীবোলীর প্রথম সার্থক প্রয়োগকর্তা রূপে গণ্য করা যায়। কেবল তাই নয়, প্রকৃত 'স্বচ্ছন্দতাবাদ' (Romanticism)ও তাঁর রচনাতেই প্রথম প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি প্রকৃতিকে প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের ধরাবাঁধা গণ্ডিতে না রেখে আপন-চোখে দেখেছেন এবং আপন শক্তিতে অনুভব করেছেন। 'গুণবন্ত হেমন্ত' কবিতায় তিনি গ্রামের নানাপ্রকার কৃষি-পণ্যের দিকে পাঠকের ধ্যান আকর্ষণ করেছেন। তাঁর এই সব কবিতায় প্রকৃতির যথার্থ রূপ বিধৃত। হিন্দী সাহিত্যে এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। খড়ীবোলী-কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পাঠকজী লয়ের আরোহণ ও অবরোহণের নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন রাগরাগিণী যোগে গাওয়া

ও লয়সহযোগে কবিতা-পাঠ যে দুই পৃথক বস্তু— তা তিনি বোঝাতে চাইলেন। লাবনীর লয়ে যেমন তিনি 'একান্তবাসী যোগী' লিখলেন, তেমনি 'সাধুক্কড়ি ঢঙে' 'জগৎ-সচাঈ-সার' এবং সংস্কৃত ছন্দ, শব্দ ও ভাবের অনুসরণে 'স্বর্গীয় বীণা' রচনা করেন। স্বর্গীয় বীণাতে বিশ্ব ও তার সৃষ্টিরহস্যলীলার সাংগীতিক সংকেত দিয়েছেন। যার নির্দেশে বিশ্ব নৃত্যশীল বা গতিশীল। এই স্বাচ্ছন্দ্যবাদ পুরোপুরী ভারতীয় এবং আধুনিক। তবে পরবর্তীকালে এর অনুসৃতি ঘটে নি। মহাবীর-প্রসাদ দ্বিবেদীর ব্যক্তিত্ব হিন্দী কাব্যজগৎকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গদ্যের মতোই খড়ীবোলী-কবিতার স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক রূপেও তিনি সম্মানিত।

প্রারম্ভিক যুগে খড়ীবোলী কবিতার ছন্দ-নির্বাচনও একটি কঠিন কাজ ছিল। ব্রজভাষার কমনীয় কবিতার ছন্দ খড়ীবোলীর উপযুক্ত নয় বলে সংস্কার ছিল। সুতরাং খড়ীবোলী-কবিদের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল— উর্দু ছন্দ ও শৈলীর অনুকরণ, কারণ ক্রিয়া রূপের বিচারে উর্দুর সঙ্গে খড়ীবোলীর সাম্য ছিল। কিন্তু উর্দু ছন্দ আরবি-পারসি ছন্দেরই নামান্তর, সুতরাং হিন্দীর পুরোপুরি অনুকূল নয়। দ্বিতীয় শৈলী লাবনী এবং তৃতীয়টি সংস্কৃতের। লাবনী লোকসাহিত্যের গীতিমূর্ছনাময় রচনার একটি জনপ্রিয় রূপ। এই গেয় রচনা বা লোক-গীতির মধ্যেই খেয়াল বা 'খ্যাল' এবং 'কজলী' বা 'কজরী' (বর্ষাকালে গেয় লোকগীত) প্রভৃতিকে গণ্য করা চলে। লাবনীতে স্থায়ীর পর অন্তরার চারটি ভিন্নমিলের পংক্তি এবং পঞ্চমটি স্থায়ীর সঙ্গে স-মিল প্রকৃতির হয় এবং স্থায়ী বা তার অংশবিশেষের আবর্তন ঘটে। সংস্কৃত শৈলীতে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দাবলী এবং সংস্কৃতবৃত্তের প্রয়োগ ঘটে। এই তিনটি প্রথাই গৃহীত হল— কবিদের শক্তি, অভিরুচি এবং পাঠকদের অনুরাগ অনুসারে। তবে লাবনী ও সংস্কৃতবৃত্ত শৈলীর ব্যবহারই বেশি। তাসা জাতীয় 'ডফ্' বা 'চঙ্গ' নামক বাদ্যযন্ত্রের তালসংযোগে গীত লাবনী-রীতিটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। সংস্কৃত রীতিতে মিল বা তুকের

ব্যবহার না থাকায়— কবিদের মিলের জন্য ভাবের খর্বতা সাধন করতে হত না। শব্দের ভাঙচুরও করতে হয় নি। সমাস ও তৎসম শব্দ ব্যবহারের সুযোগ ছিল বেশি। এবার খড়ীহিন্দীর কবিদের প্রসঙ্গে আসা যাক।—

মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী (১৮৬৬-১৯৩৮)—কবিতা ও কবিস্রষ্টা দ্বিবেদীজী খড়ীবোলীকে গড়ে-পিটে সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। সরস্বতী পত্রিকা-সম্পাদনকালে তিনি খড়ী-বোলীতে কবিতা লিখতে উৎসাহ দিতেন। কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে অন্যান্য ভাষার অনুসরণে আধুনিক ছন্দ-প্রয়োগের বিরোধীও ছিলেন না।[8] ভাষা ও ছন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় তাঁর কবিতা অনেকটা লাবণ্যহীন গদ্যাত্মক হয়ে উঠত। বাংলা ছন্দের প্রয়োগও তাঁর কবিতায় লক্ষিত হয়। লাক্ষণিকতা, চিত্রময়তা এবং রসস্নিগ্ধ বক্রতা তাঁর কবিতায় কম। 'বালবিধবা বিলাপ' তাঁর একটি মর্মস্পর্শী রচনা। বিধবার এমন করুণ আত্মবিবরণ হিন্দী সাহিত্যে আর নেই। স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতাও তিনি লিখেছেন।—

> হিন্দুমুসলমান ঈসাঈ, যশ গাওয়েঁ সব ভাঈ ভাঈ,
> সবকে সব তেরে শৈদাঈ, ফূলো ফলো স্বদেশ।
>
> —দ্বিবেদী কাব্যমালা, পৃ. ৪৫৩

> —হিন্দু-মুসলিম খ্রীস্টান, সবে মিলি গায় গান,
> সকলে তোমারি সন্তান, সমৃদ্ধ হও স্বদেশ।

কবিতায় ছন্দ প্রয়োগ বিষয়ে কয়েকটি উপদেশ ও নির্দেশমূলক প্রবন্ধ লিখে দ্বিবেদীজী আধুনিক ছন্দপ্রয়োগ বিষয়ক সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছিলেন। তাই অনুপ্রাণিত কবির দল ভাব, ভাষা ও ছন্দের জন্য মুক্তকণ্ঠে দ্বিবেদীজীর ঋণ স্বীকার করেছেন।

> করতে তুলসীদাস ভী কৈসে মানস-নাদ ?
> মহাবীর কা যদি উন্হে মিলতা নহীঁ প্রসাদ ॥

—কেমনে হতো তুলসীদাসের শোভন মানস-নাদ!
যদি তিনি না-ই পেতেন মহাবীর প্রসাদ।

মধ্যযুগের সন্তকবি তুলসীদাসের প্রেরণা-গুরু 'মহাবীরে'র সঙ্গে আধুনিক হিন্দী কবিদের প্রেরণা-গুরু মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিবেদীজী বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'কুমার-সম্ভবসার' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর অনুবাদ উচ্চমানের এবং মূলের সঙ্গে সংগতিসূচক। তাঁর কবিতা-সংগ্রহ 'সুমন', 'দ্বিবেদী কাব্যমালা' ও 'দেবীস্তুতিশতক' নামে প্রকাশিত। দ্বিবেদীজীর প্রভাব ও উৎসাহদানে প্রবুদ্ধ কবিদের মধ্যে মৈথিলীশরণ গুপ্ত, রামচরিত উপাধ্যায়, লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীধর পাঠক (১৮৫৯-১৯২৮)—ব্রজভাষার কবি পাঠকজী খড়ীবোলীতে কবিতা রচনা শুরু করে তার সম্ভাব্য সমৃদ্ধির জন্য বহু চেষ্টাচরিত্র করেন। সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের গভীর অধ্যেতা পাঠকজীর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। ওই-সব সাহিত্যের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য ও সম্পদে হিন্দী কাব্যকে সমৃদ্ধ করার মানসে তিনি প্রথমে অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোল্ডস্মিথের 'হারমিট' (Hermit)-এর অনুবাদ 'একান্তবাসী যোগী'র প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। খড়ীবোলীর এই অনুবাদ লাবনীর ঢঙে রচিত। খড়ীবোলীর তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ হল—গোল্ডস্মিথের ইট্রাভেলারের (The Traveller) অনুবাদ 'শ্রান্ত পথিক'। আবার ডেজার্টেড ভিলেজ (Deserted Village)-এর অনুবাদ 'উজড় গাঁও' লিখেছেন ব্রজভাষায়। খড়ীবোলীর কবিতায় মধুর ও কোমল পদবিন্যাসে কবির ভাবুকতা, সুরুচি এবং কাব্য-সুষমা-বোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। ছন্দ-প্রয়োগ, পদ-বিন্যাস, বাক্য-সংযোজন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তিনি 'অতুকান্ত' (অমিত্রাক্ষর) বা অমিল প্রবহমান বন্ধের কবিতাও লিখেছেন। তাঁর প্রকৃতির-রূপমুগ্ধতার পরিচয় রয়েছে 'কাশ্মীর সুষমা' গ্রন্থে। 'ভারতগীত' প্রভৃতি গ্রন্থে স্বদেশ-চেতনা, সংস্কারধর্মিতা এবং 'গোখলে প্রশস্তি' রয়েছে। শ্রীধর পাঠক কিভাবে ধাপে ধাপে খড়ী-

বোলীতে শক্তি, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি এনেছেন— তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর খড়ীবোলী কবিতার দৃষ্টান্ত—

ইস পর্বত কী রম্যতটী মেঁ, মৈঁ স্বচ্ছন্দ বিচরতা হূঁ,
পরমেশ্বর কী দয়া দেখকে পশুহিংসা সে ডরতা হূঁ।
গিরিবর, উপর কী হরিয়ালী ঝরণা জল নির্দোষ,
কন্দমূল, ফলফূল, ইন্হীঁ সে করূঁ ক্ষুধা সন্তোষ।
উসীভাঁতি সাংসারিক মৈত্রী কেবল এক কহানী হৈ,
নামমাত্র সে অধিক আজতক, নহীঁ কিসী নে জানী হৈ।
জবতক ধন-সম্পদাপ্রতিষ্ঠা অথবা যশ-বিখ্যাতি,
তবতক সভী মিত্র, শুভচিন্তক, নিজকুল বান্ধব জ্ঞাতি।

—একান্তবাসী যোগী।

—এই পর্বতের রম্যতটে আমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি। পরমেশ্বরের দয়া দেখে পশু-হিংসায় ভয় পাই। পর্বতের শ্যামলিমা, ঝর্নার জল, কন্দমূল ও ফুলে-ফলেই আমার পরম তৃপ্তি। সাংসারিক মৈত্রী কেবল কথার কথাই মনে হয়। কারণ, আজ পর্যন্ত, তার নামমাত্র পরিচয়ই পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যতক্ষণ— ধন-মান যশ আছে, ততক্ষণই সবাই পরম আপন। তার পরে কেউ কারও নয়!

লাবনীর শৈলীতে রচিত খড়ীবোলীর এই কাব্যরূপটি সুন্দর ও সার্থক। অতুকান্ত বা অমিল প্রবহমান বন্ধের কয়েকটি পংক্তি—

বিজন বনপ্রান্ত থা; প্রকৃতি মুখ শান্ত থা,
অটন কা সময় থা, রজনি কা উদয় থা।
প্রসব কে কাল কী, লালিমা মেঁ লসা
বাল-শশি ব্যোম কী ওর থা আ রহা।
সদ্য-উৎফুল্ল-অরবিন্দ-নভনীল সুবি—
শাল নভবক্ষ পর জা রহা থা চঢ়া।
দিব্য দিগ্ নারি কী গোদ কা লালসা
থা প্রখর ভূখ কী বাসনা সে প্রহিত।

—সান্ধ্য অটন

—শান্ত প্রকৃতির কোলে বিজন বনের প্রান্তে সান্ধ্য ভ্রমণকাল সমুপস্থিত। প্রসবকালের লালিমায় উদ্ভাসিত 'বাল-শশী' মধ্যাকাশের দিকে গতি-শীল। 'সদ্য উৎফুল্ল অরবিন্দ নভনীল' অনন্ত আকাশের বুকে এগিয়ে চলেছে। যেন দিব্য দিগঙ্গনার কোলের শিশুর মতো তীব্র ক্ষুধার বাসনায় সে আতুর ও চঞ্চল।

হিন্দীর কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এটিই প্রথম সার্থক রচনা। হিন্দীর সবৈয়া ছন্দে কবি খড়ীবোলীর সহজ রূপটি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

নাথুরামশঙ্কর শর্মা (১৮৫৯-১৯৩১)—শর্মাজী ব্রজভাষা ও খড়ী-বোলীতে কবিতা লিখতেন। আর্য-সমাজভুক্ত হওয়ায় তাঁর রচনায় উপদেশ ও ব্যঙ্গের সুর সুস্পষ্ট। তবে ভাষার উপর কর্তৃত্ব থাকায় কবিতা কখনও গতিহীন বা বিরক্তিকর মনে হয় না। তিনি ভক্তি, শৃঙ্গার, স্বদেশপ্রেম, ভাষা-প্রেম এবং সংস্কারধর্মী বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর সমগ্র রচনা 'শঙ্করসর্বস্ব' নামে প্রকাশিত। 'গর্ভরণ্ডা-রহস্য'—আখ্যান কাব্যে তিনি বিধবার দুর্দশা এবং মন্দিরে দেবমূর্তির আড়ালে অনুষ্ঠিত অনাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নতুন-ফ্যাশনে প্রলুব্ধ ও মদোন্মত্তদের প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করে বলেছেন—

ঈস গিরিজা কো ছোড় য়ীশু গিরিজা মেঁ জায়,
শঙ্কর সলোনে মৈন মিস্টর কহাওয়েঁগে।
বূট, পতলূন, কোট, কম্ফর-টোপী ডাট
জাকট কী পাকট মেঁ ওয়াচ লটকাওয়েঁগে।
ঘূমেঁগে ঘমণ্ডী বনে রণ্ডী কা পকড় হাথ
পিয়েঁগে বরণ্ডী মীট হোটল মেঁ খাওয়েঁগে।
ফারসী কো ছার-সী উড়ায় ইংগরেজী পঢ়
মানো দেবনাগরী কা নাম হী মিটাওয়েঁগে॥

—ঈশের মন্দির ছেড়ে যিশুর গিরিজা গিয়ে,
শংকর, নব যুবকের 'ম্যান মিস্টার' হবে পরিচয়।

সুট-বুট কোট-প্যাণ্ট মাফ্‌লার ও টুপি-হ্যাট
জ্যাকেটের পকেটে ওয়াচ শোভা পাবে সাতিশয় ॥
বেড়াবে দেমাক্‌ ভরে, বেশ্যাদের হাত ধরে
ব্রাণ্ডি ও মিট খাবে হোটেলে অকুতোভয়।
পারসি নস্যাৎ করে শিখবে ইংরেজি সব,
দেবনাগরীর লোপ ঘটাবে সুনিশ্চয় ॥

এই ধরনের কবিতা পড়তে পড়তে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমধর্মী বাংলা কবিতার কথা সহজেই মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুরূপ বিদ্রূপাত্মক-রচনার কথা।

অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় 'হরিঔধ' (১৮৬৫-১৯৪৭)—ব্রজভাষা কবিতায় নৈপুণ্য দেখালেও খড়ীবোলীর দিকেই হরিঔধজীর ঝোঁক বেশি ছিল। প্রথম দিকে তিনি উর্দু 'বহরে' খড়ীবোলী কবিতা লিখতেন। কারণ তখন খড়ীবোলীর বাহনরূপে উর্দু ছন্দ প্রয়োগের প্রবণতা বেশ প্রবল ছিল। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকই সে জাতের কবিতা পড়ত আর কবির জনপ্রিয়তা বাড়ত। কিন্তু রচনারীতি ও পড়ার ভঙ্গিতে কবিতা হিন্দী না হয়ে উর্দুই হয়ে উঠত। সুতরাং সাধারণভাবে এই প্রবণতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, উর্দু ছন্দ ও মিল-আধিক্যের প্রবণতা থেকে কবিতাকে বাঁচাবার জন্য সংস্কৃত বৃত্তের আশ্রয় গ্রহণই সমীচীন মনে হল। মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর প্রেরণায় কাজটি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয়তা বোধ ও স্বামী দয়ানন্দের প্রভাবে সংস্কৃতের প্রচার বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ-প্রবণতাও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু হিন্দীর পক্ষে তা অনুকূল বা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। ভাবের বিচারে রচনা যাই হোক, ভাষা ও ছন্দের বিচারে প্রায় সংস্কৃত হয়ে উঠত। তা সত্ত্বেও তার আকর্ষণ কমে নি। উপাধ্যায়জী এই সংস্কৃতানুসারী শৈলী গ্রহণ করেন। রচনা করেন 'প্রিয়প্রবাস' (১৯১৪) কাব্য। এই কাব্যটিই হরিঔধজীর প্রধান সাহিত্যকৃতি। তাতে মাঝে-মধ্যে ক্রিয়ার হিন্দী রূপ থাকলেও সংস্কৃতেরই প্রাধান্য চোখে পড়ে। যদিও তার গতিভঙ্গি অনেকটা হিন্দীর মতো। হিন্দীতে সার্থকভাবে সংস্কৃত-

বৃত্তের ব্যবহার করেও কবি তাঁর রচনাকে কোমলকান্ত পদাবলীর মাধুরীমণ্ডিত করে তুলেছেন।

'প্রিয়প্রবাসে' করুণ, বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার এবং বাৎসল্য রসের বিরহ-দীর্ণ দিকটি সুন্দরভাবে প্রতিভাত। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ জাতির জনপ্রিয় নেতারূপে চিত্রিত। কৃষ্ণভক্তিশাখা নব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। লীলা ও বিলাস অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্যজ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনার দিকেই কবির আগ্রহ অধিক। বীরত্বের ব্যঞ্জনাও কিছুটা আছে। আর রাধা দুঃখীজনের জন্যে আর্দ্র-হৃদয় ও সেবাভাবের প্রতিমূর্তি রূপে চিত্রিত। ব্যক্তি ও ব্যষ্টির সীমা অতিক্রম করে প্রেম, বিশ্বজনীনতায় পর্যবসিত। রাধার কৃষ্ণপ্রেম বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত।—

> পাঈ জাতীঁ বিবিধ জিতনী বস্তু হৈঁ জো সবোঁ মেঁ।
> মৈঁ প্যারে কো অমিত-রঙ্গ ঔ রূপ মেঁ দেখতী হূঁ॥
> তো মৈঁ কৈসে ন উন সবকো প্যার জীসে করূঁগী।
> য়োঁ হৈ মেরে হৃদয় তল মেঁ বিশ্ব কা প্রেম জাগা॥

—সকল মানুষে যত বৈচিত্র্য ও বিবিধতা আছে—সে-সব কিছুর মধ্যেই অমিত রং ও রূপে আমি আমার প্রিয়কে দর্শন করি। সুতরাং সে সবকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালো না বেসে পারি না। আমার হৃদয়ের গভীরে এমনি বিশ্বপ্রেম জেগেছে!

অযোধ্যাসিংহ তাঁর যুগের প্রতিনিধি কবি। সে কালের সাহিত্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পারম্পর্য স্ব-স্ব রূপে তাঁর কাব্যে উপস্থিত। যুগের সংস্কারবাদী চেতনা দেশ, জাতি ও মানবপ্রেমের রূপ পেয়েছে তাঁর রচনায়। 'প্রিয়প্রবাস' ও 'বৈদেহী বনবাস'— প্রবন্ধকাব্য দুইটি তার সাক্ষ্য বহন করে। প্রিয়প্রবাসে দৃশ্যমান প্রকৃতির রূপ বর্ণনা, ঋতু ও সন্ধ্যার বর্ণনা, অলঙ্কার ও ছন্দ প্রয়োগ প্রভৃতি অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বৈদেহী বনবাসেও আধুনিকতার স্পর্শ সুস্পষ্ট। গান্ধীবাদের প্রভাবে হৃদয় পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষণীয়। কবি সীতাকে তাঁর অপবাদের কথা জানিয়ে প্রজারঞ্জনের

উদ্দেশ্যে প্রসন্নচিত্তে স্বেচ্ছায় বনবাস-গমনে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। এতে আধুনিক নারীর সম্মান সমৃদ্ধি ঘটেছে।

'প্রিয়প্রবাস' খড়ীবোলীর প্রথম মহাকাব্য রূপে গৃহীত। সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের ব্যবহার ও সমসাময়িক যুগ-চেতনার অনুরূপ সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির স্বার্থ বিসর্জন-প্রেরণাও লক্ষিতব্য কাব্যটিতে।

প্রিয়প্রবাসে সংস্কৃতবৃত্তে ভাবের প্রবাহ আনার প্রয়াস সার্থক হয় নি। কিন্তু বৈদেহী বনবাসে হিন্দী ছন্দের প্রয়োগ পরীক্ষায় কবি অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছেন। তাঁর এই সব প্রয়াসের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন মধুসূদন দত্তের বাংলা রচনা থেকে।[৫] সহজ সরল হিন্দীতেও তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। খড়ীবোলীর বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়োগের পরীক্ষায় তিনি অক্লান্ত ছিলেন। 'রসকলস' (ব্রজভাষায়), 'পদ্যপ্রসূন', 'চোখেচৌপদে', 'প্রেমপুণ্যোপহার', 'কাব্যোপবন', 'প্রেমপ্রপঞ্চ', 'পারিজাত', 'প্রেমাম্বুপ্রবাহ', 'কল্পলতা', 'ঋতুমুকুর' এবং 'বোলচাল' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও কবিতাসংগ্রহ। প্রিয়-প্রবাস থেকে কয়েকটি পংক্তি—

ধীরে, ধীরে দিন গত হুয়া ; পদ্মিনীনাথ ডূবে।
আঈ দোষা, ফির গত হুঈ, দূসরা বার আয়া॥
য়োঁহী বীতি বিপুল ঘটিকা ঔ কঈ বার বীতে।
আয়া কোঈ ন মধুপুর সে ঔ ন গোপাল আয়ে॥

—পথ চেয়ে চেয়ে গেল কেটে দিন আর রাত সুবিশাল।
হায়! এলো না তো কেউ মধুপুর থেকে এলেন কৈ গোপাল!

খড়ী হিন্দী যে বেশ সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সরল কথ্য খড়ী হিন্দীর একটি চতুষ্পদী উদ্‌ধৃত করে প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।—

সংকটোঁ কী তব করে পরওয়াহ ক্যা?
হাথ ঝণ্ডা জব সুধারোঁ কা লিয়া।

তব ভলা ওয়হ মূসলোঁ সে ক্যা ডরে ;
জব কিসী নে ওঁখলী মেঁ সির দিয়া ॥

—ব্রত নিল যে সংস্কারের বিপদের তার ভাবনা কি !
উদুখলে মাথা দিলে মুষলপাতের গণনা কি !

মৈথিলীশরণ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৬৪)—আলোচ্য যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। বিষয়-চয়ন, হৃদয়গ্রাহী প্রকাশভঙ্গি, ভাষার মাধুর্য, ছন্দ ও অলঙ্কারের শিল্পসম্মত প্রয়োগ, সংগীত-সুষমার-সুকুমার প্রবাহ এবং উদার-আত্মভোলা-সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্যকে সকলের জনপ্রিয় করে তোলে। খড়ী হিন্দীর প্রয়োগে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আসলে তিনি খড়ীবোলীর ধাতটি ধরে ফেলেছিলেন ; তাতে 'বাংলার কোমলকান্ত পদাবলী'র মাধুরী ও সুষমার সংযোগ ঘটিয়ে অভিনবতা ও সার্থকতা দান করেন। প্রথম-দিকে মহাবীর প্রসাদের প্রেরণায় সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ শুরু করলেও 'হরিগীতিকা' প্রভৃতি মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগই তাঁর কাব্যকে সার্থকতা দান করে। এই সব ছন্দের সহজ সরল প্রয়োগে মৈথিলী-শরণ অদ্বিতীয়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্য 'রঙ্গ মেঁ ভঙ্গ' প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানকাব্যে চিতোর ও বুঁদির রাজ-পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবৃত। অতঃপর তাঁর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়-আশ্রিত প্রবন্ধকাব্য পর পর প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথমদিকের জনচিত্ত-আন্দোলনকারী কাব্য হল 'ভারত-ভারতী' (১৯১২)। তাতে ভারতীয়দের অতীত ও বর্তমান অবস্থার পার্থক্য এমন দরদ ও সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। কবির স্বদেশপ্রেমের স্বরূপটি প্রথম মেলে এই ভারত-ভারতীতেই। গুপ্তকবির শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রকাশিত হয় বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশকে (১৯৫৭)। সুতরাং প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে তিনি তাঁর প্রতিভার অকৃপণ দানে হিন্দীভারতী ও জনচিত্ত-রুচির অনলস সেবা করেছেন। যুগমানস ও রাষ্ট্র-ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে

কাব্যভাব ও কাব্যপ্রণালীর পরিবর্তন ও রূপায়ণে তিনি অতুলনীয়। এই বিবেচনায় হিন্দীভাষী জনগণের সুযোগ্য প্রতিনিধি মৈথিলীশরণ। রাজনৈতিক আন্দোলন যে বন্ধুর পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে তার প্রকৃতি, ব্যাবহারিকতা ও প্রয়োজনের সুন্দর আভাস পাওয়া যায় তাঁর ভারত-ভারতীর পরবর্তী কাব্যনিচয়ে। সত্যাগ্রহ, অহিংসা, মানবতাবাদ, বিশ্ব-প্রেম, চাষী-মজুর শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও প্রেমের সংযত, সংগত প্রতিফলন ঘটেছে মৈথিলীশরণ গুপ্তের কাব্যে। তাঁর রচনায় প্রাচীন ঐতিহ্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্বের সঙ্গে যুগ-প্রয়োজন ও প্রকৃতির সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর মহৎ-উদার কবিহৃদয় একদিকে প্রাচীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে নবীনতার জন্যে উৎসাহ ও সমর্থনে পরিপূর্ণ ছিল। এটাই তাঁর কাব্যের এক বিশেষ দুর্লভ গুণ।

বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ভক্ত-কবি হলেও মৈথিলীশরণের ভক্তি ভগবান অপেক্ষা মানুষের মহত্ত্বের প্রতিই ছিল সমধিক। 'জয়দ্রথবধ' (১৯১০) খণ্ডকাব্যে রাজনৈতিক মতবাদের কাব্যরসসিক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'অনঘ' (১৯২৫) গ্রামসংস্কারের ক্ষেত্রে সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ, সহিষ্ণুতা, দুঃখভোগে সম্মান শ্রদ্ধা ও বীরত্বের পরিচায়ক। 'হিন্দু' (১৯২৭) কাব্যে তিনি সমাজসংস্কারক রূপে উপদেশ দিয়েছেন। 'ঝংকার' (১৯২৯) আধ্যাত্মিক কবিতার সংগ্রহ। তাতে রহস্যবাদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই রহস্যবাদে অস্পষ্টতা কম, ভাবুকতা ও অনুভূতি আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। বৈষ্ণবোচিত ভক্তি-ভাবনার প্রকাশ থাকলেও কোনো-কোনো কবিতা কিয়ৎ পরিমাণে 'ছায়াবাদ' অভিধায় বিশেষিত হতে পারে। মৈথিলীশরণ গুপ্তের কবিপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয় তাঁর 'সাকেত' (১৯৩১) ও 'যশোধরা' (১৯৩২) কাব্য দুইটিতে। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' ঊর্মিলা এবং লক্ষ্মণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'সাকেত' অর্থাৎ অযোধ্যাই কাব্য-কাহিনীর কেন্দ্রস্থল। রামবিবাহের পূর্বের ঘটনা স্মৃতিরূপে ঊর্মিলার বিরহগানে বর্ণিত। বনবাসের পরবর্তী ঘটনা কতক হনুমানের মুখে

এবং কতকটা বশিষ্ঠ মুনির যোগবলে বর্ণিত ও রূপায়িত। বর্ণ্য ঘটনার কেন্দ্রস্থল সাকেত এবং নায়িকা উর্মিলা। উর্মিলার অলক্ষে নীরব ত্যাগস্বীকারের প্রতি সকল পাত্রপাত্রীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব নির্দেশ করেছেন। ভ্রাতৃ-সেবার্থ গার্হস্থ্যত্যাগ ও পত্নীত্যাগে, লক্ষ্মণের চরিত্র উজ্জ্বলতর হয়েছে। বীরব্রতধারী লক্ষ্মণ সেবাধর্মের অনুরোধে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন। কি অপূর্ব ত্যাগস্বীকার! রামচরিত্রও পার্থিব-মহিমামণ্ডিত। মানব কল্যাণ-সাধনই রামের পরম পবিত্র কর্তব্য। পৃথিবীর দুঃস্থ-তাপিতদের জন্যই রামাবতার। তিনি স্বর্গের কথা বলতে আসেন নি, এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করে তুলতে অবতরিত হয়েছেন। যারা বিবশ, বিকল, বলহীন, দীন, তাপিত ও অভিশপ্ত— তাদের জন্যই তাঁর আগমন।—

> 'মৈঁ আয়া উনকে হেতু কি জো তাপিত হৈঁ,
> জো বিবশ, বিকল, বলহীন, দীন শাপিত হৈঁ।
> সন্দেশ য়হাঁ মৈঁ নহীঁ স্বর্গকা লায়া,
> ইস ভূতলকোহী স্বর্গ বনানে আয়া।'

আর্যসংস্কৃতির অগ্রদূত রাম আরও বলেন—

> 'মৈঁ আর্যোঁ কা আদর্শ বতানে আয়া।'
> —ব্যাখ্যা করতে এসেছি আমি আর্যের আদর্শ।

কেবল উর্মিলা, লক্ষ্মণ ও রাম চরিত্রেই নয়, মৈথিলীশরণ কৈকেয়ী, মন্থরা প্রভৃতি সকল চরিত্রকেই নবযুগোপযোগী বিশিষ্টতা এবং মহত্ত্বদান করেছেন। 'সাকেত' আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের আখ্যানকাব্যের একটি বড়ো অভাব পূরণ করেছে। গান্ধীবাদের সহজ-সরল অনুস্মৃতি ও ব্যাখ্যা লক্ষিত হয় কাব্যটিতে। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ পাঠ করে কবি উর্মিলা চরিত্রটির ত্যাগ ও গুরুত্ব-মহত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য সাকেত কাব্য-রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[৬]

'যশোধরা' কাব্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে ভগবান বুদ্ধের জীবন-চরিতের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাত্র-পাত্রীর জীবন ও জীবন-দর্শনের সুন্দর ও উচ্চ স্তরের

ভাবরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন মৈথিলীশরণ। এই খণ্ডকাব্যে সিদ্ধার্থের নিঃশব্দ গৃহত্যাগ-কেন্দ্রিত কাহিনী বর্ণিত। ভারতীয় নারীর প্রকৃত ত্যাগের স্বরূপ এবং আদর্শ এ-কাব্যে চিত্রিত। বাৎসল্যরসে সিক্ত হৃদয়ের ঐশ্বর্য এবং স্বামী-বিয়োগক্লিষ্ট জীবনের করুণ, অসহায় বিশুষ্কতা কবি মাত্র দুটি পংক্তিতে এমন অনুপম করে ব্যক্ত করেছেন যা বিশ্ব-নারীর জীবনবোধের পরিচয়দানে প্রবাদ-বচনের পর্যায়ভুক্ত।—

অবলা জীবন, হায়। তুম্‌হারী য়হী কহানী—
আঁচল মেঁ হৈ দূধ ঔর আঁখোঁ মেঁ পানী॥

—অবলা জীবন হায়! তোমার সম্বল,
আঁচলেতে দুধ আর নয়নেতে জল।

যশোধরার জীবন-সার যেন এই দুই-পংক্তিতে অতি চমৎকার ভাবে অনুকরণীয় ভঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে যশোধরার দুঃখ নেই, দুঃখ তাঁকে না জানিয়ে চলে যাওয়ায়। এখানেই আধুনিক নারীর অস্তিত্বব্যঞ্জক সম্মানবোধ আহত হয়েছে। যশোধরা বলছেন—

সখি, অগর ওয়ে মুঝসে কহ কর জাতে,
কহ, তো ক্যা, মুঝকো ওয়ে অপনী পথ-বাধাহী পাতে।

—সখি, যদি তিনি আমায় জানিয়ে যেতেন,
তবে কি, আমাকে পথের বাধাই পেতেন!

'সাকেত'-'যশোধরা'-ধারার শেষ কাব্য 'বিষ্ণুপ্রিয়া' (১৯৫৭)। নারীর নিরুপায় করুণমূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠেছে চৈতন্য পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতর কণ্ঠে—

তুম মুঝকো ছোড়ো, মৈঁ তুমকো ছোড়ূঁ, কহো কহাঁসে?
সব কুছ ছোড় য়হাঁ আঈ হূঁ, জাউঁ কহাঁ য়হাঁসে?

—তুমি আমায় ছাড়বে ছাড়ো,
কেমন করে ছাড়ি আমি?
সব ছেড়ে তো তোমায় পেলাম
এবার কোথায় যাব স্বামী?

'দ্বাপর' (১৯৩৬), 'সিদ্ধরাজ' (১৯৩৬), 'নহুষ' (১৯৪০) এবং 'কাবা ও কর্বলা' (১৯৪২)— কাব্য কয়টিও উল্লেখযোগ্য। 'কাবা ও কর্বলা'য় ইসলাম ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন-প্রয়াস লক্ষণীয়। কবির মতে— মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সংবৃদ্ধি পরম আবশ্যক। কাব্যটিতে করুণার মাত্রা বেশি। হুসেন শত্রুদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

ভলে মানুষোঁ। শুনোঁ। বৈর মুঝসে হৈ তুম কো,
কুম্হলানে দো ন ইস নবী কে নবল কুসুমকো।
নিজ হিংসা কো লো, হুসেন কা মাংস খিলাও
মেরে রুধির পিপাসু! ইসে তো নীর পিলাও॥

—ভালো মানুষেরা শোনো— শত্রুতা আমার সনে,
শুকুতে দিওনা নবীর নবীন এ-কুসুম ধনে।
নিজ হিংসায় হোসেনের প্রাণে তৃপ্ত কর,
রুধির পিপাসু! পূতজলে তার তৃষ্ণা হর॥

জাতিধর্ম ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে যে জাতীয়তা বা স্বদেশপ্রেম— মৈথিলী-শরণ তারই কবি।

'দ্বাপর' উপদেশাত্মক উদ্দেশ্যমূলক কাব্যকৃতি। তাই প্রকৃত কাব্য-শিল্পের সাবলীল পরিচয় তাতে নেই। তবে কাব্যটি পাঠকের মনে শক্তি ও স্ফূর্তি জাগায়। কবির সংস্কার ও বিচার-স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় দ্বাপরে। 'সিদ্ধরাজ' গ্রন্থে, প্রাচীন কাহিনীর আশ্রয়ে কবি যুগোপযোগী বীরত্বব্যঞ্জক উদ্দীপনভাবের চিত্রণ করেছেন। 'নহুষ' গ্রন্থে মানবগৌরবের পরিচয় এবং পতন-অভ্যুদয়সূচক পরিস্থিতির মোকাবিলার প্রেরণা-বাণী রয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার মনোরম দিশা-নির্দেশ করেছেন কবি এই ভাবে—

চলনা মুঝে হৈ, বস অন্ততক চলনা।
গিরনা হী মুখ্য নহীঁ, মুখ্য হৈ সঁভলনা॥

ফিরভী উঠূঁগা ঔর বঢ় কে রহূঁগা মৈঁ,
নর হূঁ, পুরুষ হূঁ, চঢ় কে রহূঁগা মৈঁ ॥

—চলতে আমায় হবেই, আমি শেষ পর্যন্ত যাবো,
পড়ে যাওয়া লক্ষ্য নয়, নিজেকে সাম্‌লাবো।
পড়লে, উঠে এগিয়ে যাবো, হবো নাকো ভ্রান্ত,
নর আমি, পুরুষ আমি, পৌছে হবো ক্ষান্ত।

মৈথিলীশরণ বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক এবং শ্রদ্ধাশীল বোদ্ধা ছিলেন। তিনি মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা', 'মেঘনাদ বধ' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র হিন্দী অনুবাদ করেন যথাক্রমে ১৯১৫ এবং ১৯২৭ (দুইটিই) খ্রীস্টাব্দে, পনেরো মাত্রার অমিল-প্রবহমান হিন্দী পয়ার বা অমিত্রাক্ষর সৃষ্টি করে। অবশ্য ব্রজাঙ্গনার ছন্দ স্বতন্ত্র। তিনি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৯১৫) এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' (১৯৬৪) কাব্যও অনুবাদ করেন। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' (১৯১৫), 'দূত ঘটোৎকচ' (১৯৫৬), 'মধ্যম ব্যায়োগ' (১৯৫৬), 'প্রতিমা' (১৯৬৪), 'অভিষেক' (১৯৬৪), 'উরুভঙ্গ' (১৯৬৪) ও 'অবিমারক' (১৯৬৪) প্রভৃতি সংস্কৃত থেকে এবং পারসি-ইংরেজি থেকে ওমরখৈয়ামের (১৯৩১) তিনি হিন্দী অনুবাদ করেন। সুতরাং অনুবাদের মাধ্যমেও তিনি হিন্দী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। মৈথিলীশরণের অন্যান্য রচনা—'বিপথগা', 'কুণালগীত', 'অর্জন ঔর বিসর্জন', 'তিলোত্তমা', 'চন্দ্রহাস', 'শকুন্তলা', 'কিসান-পত্রাবলী', 'বৈতালিক', 'স্বদেশ-সঙ্গীত', 'বিশ্ববেদনা', 'শক্তি', 'গুরু তেগবহাদুর', 'প্রদক্ষিণা', 'অঞ্জলি' ও 'অর্ঘ্য'। মৈথিলীশরণ তাঁর বিপুল সাহিত্য-সম্ভারে কেবল হিন্দী ভারতীরই নয়, ভারতভারতীরও অর্ঘ্য সাজিয়েছেন। সংহতি এনেছেন কাজে, চিন্তায় ও সাহিত্যে।

স্বদেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম-জাগরণ প্রয়াসী হয়ে অন্য যাঁরা কলম ধারণ করেছেন— তাঁদের কবিতা মৈথিলীশরণ গুপ্তের

সমধর্মী কবিতার পর্যায়ভুক্ত। মৈথিলীশরণ রাষ্ট্রীয় কবি রূপে অভিহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁরাও রাষ্ট্রীয় কবিরূপে বিবেচ্য।

কবি গয়াপ্রসাদ 'সনেহী', লালা ভগবানদীন, মাখনলাল চতুর্বেদী, বালকৃষ্ণ শর্মা 'নবীন', রামনরেশ ত্রিপাঠী, সুভদ্রাকুমারী চৌহান—প্রমুখ কবি এই শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ তাঁদের রচনাও স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় ভরপুর।

গয়াপ্রসাদ শুক্ল 'সনেহী' (১৮৮৩-১৯৭২)—১৯২৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত 'সুকবি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গয়াপ্রসাদ 'সনেহী'। উর্দু ও হিন্দীতে কবিতা রচনা করেছেন। ব্যক্তিগত তরল অনুভূতি এবং সমসাময়িকতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের মনে তিনি কাব্যপ্রেম সঞ্চারিত করেন। পাঠক-মনে রাষ্ট্রচেতনা জেগেছে। দেশের দলিত, শোষিত ও নির্ধন শ্রেণীর প্রতি কবির সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রেম পচ্চীসী' (১৯০৫), 'কুসুমাঞ্জলি', 'কৃষক-ক্রন্দন', 'ত্রিশূল তরঙ্গ', 'মানস-তরঙ্গ' ও 'করুণ ভারতী' গয়াপ্রসাদের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। কৃষক ক্রন্দনে কাহিনী তেমন না থাকলেও সাধারণভাবে কৃষকদের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। দুঃখকষ্টে ভরা জীবনে অতিষ্ঠ অসহায় কৃষক মেঘের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—

> চলে আও অয়ে বাদলোঁ! আও, আও।
> তুম্হী আকে দো-চার আঁসূ বহাও,
> দুখী হৈঁ তুম্হারে কৃষক, দুখ বঁটাও,
> ন কুছ বন পড়ে তো বিজলিয়াঁ গিরাও,
> ন রোয়েঁগে হম, ধজ্জিয়াঁ তুম উড়ো দো,
> কিসী ভাঁতি আপত্তি সে তো ছুড়া দো!

> —চলে এসো ওগো মেঘ! সজল ঘন কালো,
> তুমিই এসে দু-চার ফোঁটা চোখের জল ঢালো।

পরম দুঃখী তোমার চাষী, দুঃখভাগী হও ;
আর কিছু না পারো যদি, বাজই ফেলে দাও।
ধ্বংস ভ্রংশ করে দাও— কাঁদবো নাকো ভাই !
যেমনেই হোক বিপদ থেকে বাঁচতে মোরা চাই।

ব্যক্তিগত অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই কয় পংক্তিতে—

তূ হৈ গগন বিস্তীর্ণ তো মৈঁ এক তারা ক্ষুদ্র হূঁ।
তূ হৈ মহাসাগর অগম, মৈঁ এক ধারা ক্ষুদ্র হূঁ॥
তূ হৈ মহানদতুল্য তো মৈঁ এক বূঁদ সমান হূঁ।
তূ হৈ মনোহর গীত তো মৈঁ এক উসকী তান হূঁ॥

—অনন্ত গগন যে তুমি, আমি ক্ষুদ্র তারা,
অগম মহাসাগর তুমি, আমি ক্ষুদ্র ধারা।
মহানদী তুমি, আমি যে বিন্দুর সমান,
মনোহর সংগীত যে তুমি, আমি তারই তান।

স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির অঙ্গাঙ্গী মধুর অপরিহার্য এবং যথোচিত সম্পর্কটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এখানে।

লালা ভগবান দীন 'দীন' (১৮৬৬-১৯৩০)—স্বদেশভক্ত বীরদের চরিত্র নিয়ে 'দীন' কবিখড়ীবোলীতে ওজঃপূর্ণ ও অনুপ্রেরক কবিতা লিখতেন। ব্রজভাষাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'বীর বালক', 'বীর ছত্রাণী', 'বীর পঞ্চরত্ন', 'নবীন বীণ' ও 'দীন'— তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ।

মাখনলাল চতুর্বেদী (১৮৮৯-১৯৬৮)—রাষ্ট্র-ভক্তি ও ভগবৎ-ভক্তির যুগপৎ অভিব্যক্তি ঘটেছে মাখনলাল চতুর্বেদীর কাব্যে। পত্রকার রূপেও তিনি সুপরিচিত। তবে রাষ্ট্র-প্রেমই তাঁর ভাবুকচিত্তের অনেকখানি অধিকার করেছিল। স্বাধীনতার মহাযুদ্ধে কবি নিজেও একজন সৈনিক। তাঁর নিজের ভাষায়—

সির পর প্রলয়, নেত্র মেঁ **মস্তী** মুট্‌ঠী মেঁ মনচাহী।
লক্ষ্যমাত্র মেরা প্রিয়তম হৈ, মৈঁ হূঁ এক সিপাহী॥

—মাথায় প্রলয় চোখে নেশা, স্বেচ্ছায় চলি দৈনিক,
প্রিয়তমই লক্ষ্য আমার, আমি যে এক সৈনিক।

এই আত্মোৎসর্গের ভাবনাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কবিচিত্ত আগ্নেয়গিরির উদ্গারের মতো প্রচণ্ড শক্তি, আতুরতা ও ভাবুকতা নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে প্রৌঢ় বয়সের কবিতাতেও—

দ্বার বলিকা খোল চল ভূডোল কর দে
এক হিমগিরি এক সির কা মোল কর দে।
মসল কর, অপনী ইয়াদোঁ সী উঠাকর
দো হথেলী হৈঁ কি পৃথ্বী গোল কর দে॥

—অগ্নি লাভার স্রাবে ভূমিকম্প আনো,
হিমগিরি তরে মাথার মূল্য হানো।
স্মৃতির মতো তুলে দু-হাতে সরা
দলে দুমড়ে গোল করে দাও ধরা।

একদিকে চিত্তশক্তির এই দুর্দমনীয় প্রকাশ আর অন্য দিকে ভগবৎ-ভক্ত কবিমনের সাবলীল গান চিরন্তন আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় বিস্ময়কর ভাবে—

তুম রহো ন মেরে গীতোঁ মেঁ, তো গীত রহেঁ কিসমেঁ বোলো?
তুম রহো ন মেরে প্রাণোঁ মেঁ, তো প্রাণ কহেঁ কিসকো বোলো?
মেরী কসকোঁ মেঁ কসক-কসক, মেরী খাতির বনবাস করো।
মেরে গীতোঁ কে রাজা! তুম, মেরে গীতোঁ মেঁ বাস করো॥

—তুমি বিনে মোর গান, গান থাকে কিসে?
তুমি বিনে মোর প্রাণ, প্রাণ বলি কিসে?
বনবাস করো মোর ব্যথার ভিয়ানে
আমার গানের রাজা; বাস করো গানে।

'হিম কিরীটিনী' (১৯৪২), 'হিমতরঙ্গিণী' (১৯৪৭), 'মাতা' (১৯৫১), 'যুগচরণ' (১৯৫৬), 'সমর্পণ' (১৯৫৬), 'বেণু লো গূঁজে ধরা' (১৯৬০)

এবং 'মরণ-জ্বার' (১৯৬৩) প্রভৃতি কাব্য এবং 'সাহিত্যদেবতা' (১৯৪৩) গগ্ত-কাব্যের রচয়িতা চতুর্বেদীজী 'কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধ' (১৯১৮) নাটক, এবং 'বনবাসী' ও 'কলা কা অনুবাদ' (১৯৫৪) গল্পসংগ্রহও লিখেছেন। 'প্রভা', 'প্রতাপ' এবং 'কর্মবীর' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। স্বদেশপ্রেমী ভক্ত কবিকে জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। বারো-তেরোবার কারাবরণও করতে হয়েছে। তবে তাতে তাঁর স্বদেশপ্রেম উত্তরোত্তর বলিষ্ঠই হয়েছে। ভাষা প্রয়োগে চতুর্বেদীজী অতিশয় উদার ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস ও পদ্য-যোজনায় তিনি স্বচ্ছন্দমতি ছিলেন। বাক্যবিন্যাসের বিশেষ কৌশলের গুণে তাঁর রচনা-মাধুরীতে পাঠকচিত্তের আকর্ষণ ও মনোহারিতা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, তাঁর রচনায় সহজ সরল ভাষা মানুষের মুখের, ভাব তাদের মনের এবং সুর তাদের গানের। তাই তাঁর ভাবনাসিক্ত-কোমল-মধুর কবিতা পাঠকমনে সহজেই দাগ কাটে।

বালকৃষ্ণ শর্মা 'নবীন' (১৮৯৭-১৯৬০)—নবীন কবির রচনায় যুগ-প্রবৃত্তির দুই প্রকার অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। একদিকে আছে রূপ ও প্রেমের প্রতি অনুরাগ, অপরদিকে প্রবল রাষ্ট্র-ভাবনা ও সমসাময়িক সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের প্রতি ঘোর অসন্তোষ; আর এই অসন্তোষের ফলে বেজে উঠেছে বিদ্রোহাত্মক সুর। স্বদেশপ্রেমমূলক রচনাতেই তাঁর কবিশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হওয়ায় জনচিত্তের বেদনামিশ্রিত অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করেছে 'নবীন' কবির 'পরাজয় গীত' কবিতায়। কবিতাটির প্রারম্ভিক চারটি পংক্তি এইরূপ—

> আজ খড়্গ কী ধার কুণ্ঠিতা হৈ, খালী তূণীর হুআ।
> বিজয়-পতাকা ঝুকী হুঈ হৈ, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট য়হ তীর হুআ॥
> বঢ়তী হুঈ কতার ফৌজ কী সহসা অস্ত-ব্যস্ত হুঈ।
> ত্রস্ত হুঈ ভাবোঁ কী গরিমা, মহিমা সব সন্ন্যস্ত হুঈ॥

—খড়্গের ধার কুণ্ঠিত আজ তূণীর হয়েছে রিক্ত,
বিজয়-পতাকা অবনত হায়! তীর যে লক্ষ্যভ্রষ্ট।
চলমান ওই ফৌজের সারি সহসা অস্ত-ব্যস্ত,
ত্রস্ত হয়েছে ভাবের গরিমা, মহিমা যে সন্ন্যস্ত।

কবির 'বিপ্লবগান' কবিতাতেও উগ্রতা সুস্পষ্ট। মাঝে-মাঝে কবি নীতি ও সদাচারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, মনে হয়। আধুনিক স্বাতন্ত্র্য বোধের পরিচায়ক এই প্রবৃত্তির চিত্র পাওয়া যায় তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতায়। বিপ্লব গান-এর ছয়টি পংক্তি—

কবি কুছ অয়েসী তান শুনাও জিসসে উথল-পুথল মচ জায়ে।
এক হিলোর ইধর সে আয়ে এক হিলোর উধর সে আয়ে॥
প্রাণোঁ কে লালে পড় জায়েঁ ত্রাহি-ত্রাহি রব নভমেঁ ছায়ে।
নাশ ঔর সত্যানাশোঁকা, ধুআঁধার জগ মেঁ ছা জায়ে॥
বরসে আগ জলদ জল জায়েঁ, ভস্মসাৎ ভূধর হো জায়েঁ
পাপ-পুণ্য সদসৎ ভাবোঁ কী ধূল উড়-উঠে দায়েঁ-বায়েঁ॥

—শোনাও এমন গান কবি যাতে তাণ্ডব দেখা দেয়
বিপরীত মুখী ঢেউয়ের তোড়ে 'ত্রাহি-ত্রাহি' পড়ে যায়।
নাশের-নেশায় মেঘের আগুনে ছারখার হোক ধরা,
ভালো-মন্দের ভাবের ধুলোয় ঢেকে যাক্ সব ত্বরা।

অসহ্য-অসংগত মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখামাত্র কবির ক্রোধ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। 'জূঠে পত্তে' কবিতাটিতে তার অগ্নিস্বাক্ষর বিদ্যমান। পরবর্তী প্রগতিবাদী কাব্যধারায় কবিতাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তার থেকে দুইটি পংক্তি—

লপক চাটতে জূঠে পত্তে জিস দিন দেখা মৈনেঁ নর কো।
উসদিন সোচা কোঁ্যা ন লগা দূঁ আজ আগ ইস দুনিয়া ভর কো॥

—যেদিন প্রথম চোখে দেখি— এঁঠো-পাতা চাটছে নর,
স্থির করে নিই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি চর-অচর॥

বালকৃষ্ণ শর্মার তিনটি কাব্যসংগ্রহ— 'কুঙ্কুম', 'অপলক' (১৯৫৩) ও 'ক্বাসি' (১৯৫৩)। সব কাব্যেই কবি সহজ-সরল ভাষা এবং সুবোধ শৈলী ব্যবহার করেছেন। তবে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের তাপ তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই সঞ্চারিত।

রামনরেশ ত্রিপাঠী (১৮৮৯-১৯৬২)—সংস্কৃত পদাবলীর সৌন্দর্যস্নিগ্ধ সহজ-সুবোধ্য ভাষায় জনচিত্তরঞ্জনক্ষম ও স্বচ্ছন্দতাবাদী কবিতা লিখে ত্রিপাঠীজী খ্যাতিলাভ করেছেন। এই স্বদেশভক্ত কবিকে ১৯২১ সন থেকে আঠারো মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ত্রিপাঠীজী স্বদেশপ্রেমাশ্রিত তিনটি খণ্ড কাব্য—'মিলন' (১৯১৯), 'পথিক' (১৯২০) ও 'স্বপ্ন' (১৯৩৩) রচনা করেন। কাব্য তিনটিতে প্রকৃতির রূপকে কবি কল্পনায় মধুর ও সমৃদ্ধ করে এমনভাবে ধ্বনিবদ্ধ করেছেন যে, পাঠকের মন আপনা-আপনি তাতে বিমুগ্ধ হয়ে ওঠে। তাতে কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক হৃদয়গ্রাহী রূপে চিত্রিত। স্বদেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ ও রসময় প্রকাশ সহজেই পাঠকের মন কেড়ে নেয়। লক্ষণীয় বিষয় হল— কবির ভাবনায় সাধারণ প্রেম প্রকৃতিপ্রেমে, প্রকৃতিপ্রেম স্বদেশপ্রেমে এবং স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত ও গৌরবান্বিত। 'স্বপ্ন' কাব্যটিতে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা, ত্যাগ ও সাফল্য উচ্চাদর্শ ও আশাবাদের রঙে চিত্রিত। তিনি ১৯২৫ সন থেকে 'কবিকৌমুদী', 'উদ্যোগ' এবং 'বানর' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'কবিতা-কৌমুদী' নামে সাতভাগে তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রমুখ কবিদের জীবন-তথ্য ও তাঁদের জনপ্রিয় রচনার নির্বাচিত অংশ সংকলিত করেন। কাব্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। গ্রাম্য গীত-সংগ্রহ ও সম্পাদনও ত্রিপাঠীজীর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতি। তাঁর কয়েকটি পংক্তিতে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের বর্ণনা লক্ষণীয়—

রেণু স্বর্ণ-কণ-সদৃশ দেখকর তটপর ললচাতী হৈ।
বড়ী দূর সে চলকর লহরেঁ মৌজ ভরী আতী হৈঁ ॥

চূম-চূম নিজ দেশ-চরণ য়হ নাচ-নাচ গাতী হৈঁ।
য়হ শোভা য়হ হর্ষ কহাঁ আঁখেঁ জগ মেঁ পাতী হৈঁ॥

—তটের সোনার রেণুর আভায় প্রলুব্ধ হয়ে হায়!
বহুদূর থেকে ঢেউয়েরা আসে, মুগ্ধ হতেই চায়!
দেশের চরণ চুমে চুমে তারা পুলকে নাচে ও গায়,
এমন শোভাটি, এই আনন্দ জগতে পাবে কোথায়?

আপদ-বিপদ-বাধাবিঘ্ন-সাধনা মানুষকে সুফল প্রদান করে। তিনি বলেছেন—

বিঘ্ন সমস্ত করেঁ পদ-পদ পর, মেরে আত্ম-তেজ কো জাগ্রত;
নিষ্ফলতা মুঝকো অধিকাধিক করে সচেষ্ট সতর্ক দৃঢ়ব্রত।
পশ্চাতাপ মার্গ দিখলাওয়ে, ভয় রক্‌খে চৌকসী নিরন্তর,
করে নিরাশা ইস জীবন কো, শান্ত-স্বতন্ত্র সরল শুচি সুন্দর॥

—বিঘ্ন করে পদে পদে আত্মতেজ জাগ্রত,
সজাগ সতর্ক করে নিষ্ফলতার দৃঢ়ব্রত।
পশ্চাতাপ পথ দেখায়, ভয় চৌকস নিরন্তর,
নৈরাশ্য জীবনে করে শান্ত শুভ্র ও সুন্দর।

সুভদ্রাকুমারী চৌহান (১৯০৪-১৯৪৭)—এলাহাবাদের স্বদেশপ্রাণ পরিবারের সন্তান সুভদ্রাকুমারীর মানসিক গঠনে রাষ্ট্রচেতনা গভীরভাবে সক্রিয় ছিল। এই চেতনা তাঁর কবিতায় ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। তাঁর কবিতা যদি পাঠকমনে প্রত্যাশিত দেশ-চেতনার সঞ্চার করতে পারে তাহলেই তাঁর প্রয়াস সার্থক হবে, বিশ্বাস করতেন তিনি। এই বিবেচনায় তাঁর 'ঝাঁসী কী রানী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য সার্থকতা ও গুরুত্বের অধিকারী। এটি জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাৎসল্যভাবের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। 'ইসকা রোনা' এবং 'বালিকা কা পরিচয়'— এই জাতীয় সার্থক রচনা। ভাবের মাধুর্য, ভাষার সরলতা এবং শৈলীর আকর্ষণে তাঁর 'মুকুল', 'ত্রিধারা', 'কৌয়ন'

এবং 'সভা কে খেল্' প্রভৃতি কাব্যসংগ্রহ অপূর্ব হয়ে উঠেছে। ভাব-ভাষা ও শৈলীর সুগমতায় সর্বজনহৃদয়জয়ী তাঁর 'ঝাঁসী কী রানী' কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ—

সিংহাসন হিল উঠে রাজবংশোঁ নে ভৃকুটি তানী থী।
বূঢ়ে ভারত মেঁ ভী আঈ ফির সে নঈ জওয়ানী থী॥
গুমী হুঈ আজাদী কী কীমত সবনে পহচানী থী।
দূর ফিরঙ্গী কো করনে কী সবনে মনমেঁ ঠানী থী॥
চমক উঠী সন্-সত্তাওয়ন মেঁ ওয়হ তলবার পুরানী থী।
বুন্দেলে হরবোলোঁ কে মুখ হমনে সুনী কহানী থী॥
খূব লড়ী মর্দানী ওয়হ তো ঝাঁসী ওয়ালী রানী থী॥

—রাজবংশের ভৃকুটির তেজে উঠলো কেঁপে সিংহাসন,
প্রবীণ ভারতে ফিরে এলো পুনঃ চেতনার নবযৌবন ;
হৃত স্বাধীনতার মূল্য লোকে বুঝেছিল জনে জনে,
'বিদেশী তাড়াব'— সংকল্পই ছিল সকলের মনে,
সাতান্নোতে ঝল্‌সে ওঠে পুরাতন তরবারি,
বুন্দেলা-হরবোলার মুখে শোনা গল্পের ঝারি,
প্রবল যুদ্ধ করে ছিল— সে যে ঝাঁসীর লক্ষ্মীনারী।

সুভদ্রাকুমারীর বাৎসল্যরসের দুইটি পংক্তি—

য়ে নন্হে সে ওঁঠ ঔর য়হ লম্বী সী সিসকী দেখো।
য়হ ছোটা সা গলা ঔর য়হ গহরী-সী হিচকী দেখো॥

—লম্বা ফোঁপানো কান্না মানায় অতি ছোটো দুই ঠোঁটে,—
আহা! অতটুকু গলায় কেমন গভীর হিক্কা ওঠে!

'বিখরে মোতী', 'উন্মাদিনী' ও 'সীধে-সাদে চিত্র'— সুভদ্রাকুমারীর গল্পসংগ্রহ।

এই যুগের আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিরূপে— রামচরিত উপাধ্যায়, গিরিধর শর্মা 'নবরত্ন', পণ্ডিত লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয়, পণ্ডিত

রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়, শ্যামনারায়ণ পাণ্ডেয়, গোপালশরণ সিংহ এবং সিয়ারামশরণ গুপ্ত প্রমুখের কথাও স্মরণীয়।

রামচরিত উপাধ্যায় (১৮৭২-১৯৪৩)—সংস্কৃত পণ্ডিত উপাধ্যায়জী দ্বিবেদীজীর 'সরস্বতী' পত্রিকার প্রোৎসাহনে খড়ীবোলীতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। প্রথম যুগে তিনি ব্রজভাষায় লিখতেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'রামচরিত চিন্তামণি' (১৯২০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-কাব্যে কবি রাম কাহিনীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী নব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। 'সূক্তিমুক্তাবলী' ও 'ভারত-ভক্তি' তাঁর কবিতা-সংকলন। তিনি বহু প্রাচীন গ্রন্থের টীকা লিখেছেন। অন্য বিষয়ের কয়েকটি আধুনিক গ্রন্থও রচনা করেন।

গিরিধর শর্মা 'কবিরত্ন' (১৮৮১-১৯৬১)—সংস্কৃত পণ্ডিত শর্মাজী বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। মালব ও রাজপুতানায় তিনি হিন্দীর প্রচার-প্রসারে ব্রতী ছিলেন। তিনি গোল্ড স্মিথের 'হারমিট' কবিতা 'একান্তবাসী যোগী'— নামে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' হিন্দীতে অনুবাদ করেন। 'হিন্দী মাঘ' নামে মাঘের শিশুপাল বধের অনুবাদ করেন। সুতরাং অনুবাদ ও মৌলিক রচনার মাধ্যমে তিনি হিন্দীর সমৃদ্ধিসাধনে প্রয়াসী ছিলেন।

লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয় (১৮৮৬-১৯৫৯)—১৯০৭ সাল থেকেই 'সরস্বতী' তথা অন্য পত্র-পত্রিকায় লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয়ের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। আখ্যানকাব্য ও গীতি-কবিতা-রচয়িতা পাণ্ডেয়জী বাংলা তথা ওড়িয়া ভাষাও জানতেন। 'নীতিকবিতা', 'মেওয়াড় গাথা', 'মৃগী দুখমোচন', 'কবিতা কুসুমমালা', 'পদ্য পুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ ছাড়াও তিনি অন্য গ্রন্থও রচনা করেন। যুগপ্রভাবের ফলে, প্রকৃতি-চিত্রণ ও কাব্যে বিভিন্ন আধুনিক অঙ্গের সমাবেশ প্রভৃতির দিকে তিনি মনোযোগী ছিলেন। বাংলা থেকে অনুবাদ ছাড়াও মধুসূদনের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে হিন্দীতে 'চতুর্দশপদী' নামে সনেট রচনার সূত্রপাত করেন সর্বপ্রথম তিনিই।

রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় (১৮৮৪-১৯৫৮)—পাণ্ডেয়জীর প্রসিদ্ধ কাব্যসংগ্রহ 'পরাগ'। 'দলিতকুসুম', 'বনবিহঙ্গম' ও 'আশ্বাসন' প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনুভূতিজাত ভাব নিয়ে মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর ভাষা সরস ও সুবোধ। খড়ীবোলীতে সংস্কৃত ও হিন্দী ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। বহু হিন্দী পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। প্রারম্ভে ব্রজভাষায় কবিতা লিখতেন। সংস্কৃত ও বাংলা থেকে বহু সাহিত্যগ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন।

শ্যামনারায়ণ পাণ্ডেয় (১৯১০—)—বীররসের নিপুণ কবি শ্যামনারায়ণ প্রাচীন কাহিনীকে যুগোচিত ভাষা দান করেছেন— তাঁর 'ত্রেতা কে দো বীর'(১৯২৮), 'হল্‌দীঘাটী' (১৯৪১) ও 'জৌহর' কাব্যে। 'রিম-ঝিম', 'মাধব' এবং 'আঁসূকে কণ' প্রভৃতি কাব্যে তিনি তাঁর কবিতার সার্থক স্বাক্ষর রেখেছেন। ত্রেতা কে দো বীর কাব্যে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের বীরত্ব বর্ণনায় বিশুদ্ধ সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক মনোভাবের পরিচয় বিধৃত। 'হল্‌দীঘাটী' ও 'জৌহর' কাব্য দুইটিতে রাজপুত জাতির অপূর্ব ত্যাগস্বীকার, আত্মোৎসর্গ এবং জহরব্রতের কাহিনী কবির আধুনিক মনের স্পর্শে ভব্যতা, গরিমা ও গাম্ভীর্যে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বর্ণনা, অস্ত্র সঞ্চালন, যুদ্ধক্ষেত্রে বীর মনের সূক্ষ্ম-আন্দোলন প্রভৃতি কবি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। রাজপুত জাতির বীরত্ব ও ত্যাগ ভারতীয় বীরত্ব ও ত্যাগ রূপে চিত্রিত। ক্ষিপ্র অসি-গতির বর্ণনায় কবির দক্ষতা লক্ষণীয় এই কয় ছত্রে—

> কলকল বহতী থী রণগঙ্গা, অরিদল কো ডূব নহানে কো।
> তলবার বীর কী নাও বনী, চটপট উসপার লগানে কো।।
> বৈরীদল কী ললকার গিরি, ওয়হ নাগিন সী ফুফ্‌কার গিরি।
> থা শোর মৌত সে বঁচো বঁচো, তলবার গিরী, তলবার গিরী।।
> ক্ষণ ইধর গঈ, ক্ষণ উধর গঈ, ক্ষণ চঢ়ী বাঢ় সী উতর গঈ।
> থা প্রলয় চমকতী জিধর গঈ, ক্ষণশোর হোগয়া কিধর গঈ।।

—অরি দলের ডুব-স্নান তরে রণগাঙে বহে ধার
তলোয়ারের নায়ে চেপে বীর যাবে তার পার।
বৈরীদলে দংশিছে যেন নাগ-ফণা টংকার,
'পালাও পালাও, বাঁচো বাঁচো'— তলোয়ার ঝংকার।
ক্ষণে এদিক ক্ষণে সেদিক, ক্ষণে জোয়ার-ভাঁটা!
ক্ষণে প্রলয়নৃত্যে ঝল্‌সে, ওঠে রব ক্ষণে 'কোথা'?

হল্‌দীঘাটী কাব্যে পাণ্ডেয়জীর ওজস্বী প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছে— সে কথা বলাই বাহুল্য। দেশবাসীর মনে এমন উৎসাহ-প্রবাহ-সঞ্চারী কাব্য খড়ীহিন্দীতে আর নেই।

গোপালশরণ সিংহ (১৮৯১-১৯৬০)—প্রথম জীবনে ব্রজভাষায় কবিতা লেখা শুরু করলেও ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি খড়ীহিন্দীতে লিখতে থাকেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মাধবী', 'মানবী' (১৯৩৮), 'সঞ্চিতা', 'জ্যোতিষ্মতী' (১৯৩৮) ও 'কাদম্বিনী' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর রচনায় জীবনের বিভিন্ন দিক বেশ রসসিক্ত হয়ে উদ্‌ভাসিত। নারীজীবনের বিভিন্ন অবস্থা, বেশ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত। তিনি 'অসীম' 'অনন্ত'কে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ছায়াবাদী রহস্যময়তার আভাস এনে দিয়েছেন তাঁর প্রথমদিকের রচনায়। প্রেম-ভাবনার কাব্য 'মাধবী'র ভাষা সরল ও সুবোধ। আবার উচ্চ-ভাব প্রকাশের জন্য কবি অপেক্ষাকৃত গুরু-গম্ভীর ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। কাদম্বিনীতে তাঁর কবিপ্রতিভা আরও পরিস্ফুট। জীবনকে তিনি সুখ-শান্তি ও কলহাস্যময়তায় পরিপূর্ণ দেখতে চেয়েছেন। 'সুযশ' কাব্যে গান্ধীবাদের অনুসরণে সেবা ও কষ্টসহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য বর্ণিত। ফুল ও কুঁড়ির সাহায্যে রূপাশ্রয়িতার সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। ঘৃণার বদলে প্রেম ও ভালোবাসার বাণী ধ্বনিত হয়েছে।—

তুম সুখ সমৃদ্ধি কী ছাঁহ ধরো,
মৈঁ দীন দুখী কী বাঁহ ধরূঁ
তুম ঘৃণা করো মৈ প্যার করূঁ॥

—তুমি সুখ সমৃদ্ধির ছায়ায় যাও,
আমি দীন-দুঃখীদের হাত ধরি,
তুমি ঘৃণা করো, আমি প্রেম বিলোই।

কবিত্ত-সবৈয়া ও শব্দালংকার প্রয়োগেও কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন—

নিত্য নঈ শোভা দিখলাতী ললচাতী ওয়হ
কিসমেঁ সলোনী সুধরাঈ কহো অয়্যেসী হৈ।
কেতকী কী কুন্দ কী কদম্ব কী কথা হৈ কৌন
কল্পলতিকা মেঁ কহাঁ কান্তি উস জৈসী হৈ।
রতি মেঁ রমা মেঁ রমণীয়তা কহাঁ হৈ ওয়ৈসী
কণক-লতা মেঁ কামনীয়তা ন ওয়ৈসী হৈ।
ছহর-ছহর ছহরাতী হৈ ছবীলী ছটা
আহ! ওয়হ সুঘর সজীলী ছবি কৈসী হৈ।

—নিত্য নব শোভা দেখায় ও লোভায় সে,
এমন মাধুরী বল আর কার আছে!
কুন্দ-কদম্ব ও কেতকীর কথা বাদ দাও,
কল্প-লতিকার কান্তিও নিষ্প্রভ তার কাছে।
রতি ও রমার রমণীয়তাও হার মানে,
ম্লান কণকলতার কামনীয়তা তার পাশে।
তন্বীর তনু-তরঙ্গে খেলে মনোহর ছটা
বাহবা কি সুন্দর! সুরম্য ছবি প্রকাশে।

সিয়ারামশরণ গুপ্ত (১৮৯৫-১৯৬৩)—গান্ধীবাদী সিয়ারামশরণ আখ্যানমূলক, বিচারপ্রধান এবং ভাবপ্রধান—নানা রকমের কবিতা রচনা করেছেন। 'মৌর্যবিজয়' (১৯১৪), 'দূর্বাদল', 'অনাথ', 'বিষাদ', 'আর্দ্রা', 'পাথেয়', 'মৃণ্ময়ী', 'বাপু', 'নকুল' (১৯৪৬), 'নোয়াখালী' (১৯৪৬) ও 'আত্মোৎসর্গ' (১৯৪৭) প্রভৃতি কাব্যে বিচিত্র বিষয় ভাব ও আঙ্গিকের কবিতা তিনি লিখেছেন। অনাথ কাব্যে তাঁর হৃদয়ের অবারিত ধারা সহানুভূতি ও দয়া রূপে প্রবাহিত দুঃখিত,

পীড়িত, শোষিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি। ভারতের কৃষক-সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার মর্মবিদারী পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। করুণা-বিগলিত স্বরে কাব্যটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। আর্দ্রায় করুণ রসাত্মক কাহিনীটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিষাদ-এ ভাব-আশ্রিত এবং পাথেয়তে বিবেচনাত্মক কবিতার প্রাধান্য। অপকারীর উপকার করার প্রবৃত্তিমূলক তাঁর কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাপু কাব্যে গান্ধীজীর হৃদয়গ্রাহী ভক্তিপূত চিত্র অঙ্কিত। উন্মুক্ত (১৯৪০) কাব্যে তিনি উপদেশ দিয়েছেন—

হিংসানল সে শান্ত নহীঁ হোতা হিংসানল।···
হিংসা কা হৈ এক অহিংসা হী প্রত্যুত্তর ॥

—হিংসানলে হয় না শান্ত হিংসানল,
হিংসার প্রত্যুত্তর,— অহিংসার জল।

'নোয়াখালী' কাব্যিকায় গান্ধীজীর অনুসরণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—মুসলমান হলেই মানুষ খারাপ হয় না। নোয়াখালীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা থাকলেও কোথাও কটুতা বা অসহিষ্ণুতা নেই।—

য়হ ঘর বুঝী চিতাওঁ সে হৈ—
গাওঁ নহীঁ মরঘট হৈ য়হ,
জীবিত দীখ রহে জো উনকী,
মরণ-বেদনা দুস্‌সহ হৈ ॥

—ঘর নয়, এ তো চিতার ভস্ম!
গ্রাম নয়, এ তো মহাশ্মশান,
জীবিত যাদের ওই দেখা যায়,
ব্যথা দুঃসহ সুম্রিয়মাণ।

অনূপ শর্মা (১৮৯৯-১৯৬০)—আলোচ্য যুগের অধিকাংশ কবির মতো তিনিও ব্রজভাষা থেকে খড়ীহিন্দীতে আসেন। তাঁর কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে ও সহজ-সরল ভাষার প্রবাহে বেশ মনোহারী হয়ে উঠত। জ্ঞানের রাজ্যে হৃদয়ের অনুপ্রবেশ এবং স্বীকৃতি লাভের প্রতি তিনি

সজাগ ছিলেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অনূপ শর্মার মন কল্পনায় ভর দিয়ে বিচরণ করেছে। তাঁর রচনার মধ্যে 'সুনাল', 'সিদ্ধার্থ' (১৯৩৭), 'বর্ধমান', 'সিদ্ধশিলা', 'ফেরি মিলিবৌ' ও 'সুমনাঞ্জলি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণবৃত্ত ও সবৈয়া ছন্দের ব্যবহারে স্বাভাবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন। ভাষা কোথাও সমাসবদ্ধ-সংস্কৃতনিষ্ঠ আবার কোথাও কথ্য বা আটপৌরে। খড়ীবোলীতে কবিত্ত রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—

হোতা নীচ নৃত্য মহা দারুণ দরিদ্রতা কা,
ভূখ সে প্রজা মেঁ এক তড়প সমাঈ হৈ।
পরম প্রচণ্ড পারতন্ত্র্য কে পয়োনিধি কী
বাহর মচাতী হুঈ লহর-সী ধাঈ হৈ॥
ভোঁর মেঁ পড়া হুআ সমাজ কা জহাজ আজ,
ডূবা জো নহীঁ, তো ডূবনে কী ঘড়ী আঈ হৈ।
তোষ গয়া রোষ গয়া জোশ ঔ খরোশ গয়া,
হোশ ক্যোঁ গয়া হৈ, তুম্হেঁ কহাঁ কী নীদ আঈ হৈ॥

—দারুণ দারিদ্র্যের বীভৎস তাণ্ডব নৃত্যে
ক্ষুধার জ্বালায় প্রজার রোষ জেগেছে।
পরম প্রচণ্ড পরতন্ত্র-পয়োনিধির
আনন্দ-ফূর্তির বিষম ঢেউ লেগেছে।
ঘূর্ণিগ্রস্ত হায়! আজ সমাজ-জাহাজখানি,
ডোবেনি যদিও, ডোবার ক্ষণ জেগেছে।
তোষ গেল, রোষ গেল, উদ্যম ও যশ গেল,
জ্ঞানলুপ্ত, হায়! তোমায় এ কি ঘুম পেয়েছে?

এ-যুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্য— মুকুটধর পাণ্ডেয় (১৮৯৫-)— 'উদ্ধার' ও 'আঁসূ'; জগদম্বাপ্রসাদ 'হিতৈষী' (১৮৯৫-১৯৫৬)— 'কল্লোলিনী' ও 'নবোদিতা'; প্রতাপনারায়ণ পুরোহিত— 'নল নরেশ' ও 'কাব্যকানন'; তুলসীরাম শর্মা 'দিনেশ'— 'ভক্তভারতী'

(১৯৩১); গুরু ভক্তসিংহ 'ভক্ত' (১৮৭৩-)— 'সরস স্নুমন', 'কুসুমকুঞ্জ', 'বিক্রমাদিত্য' ও 'নূরজহাঁ' প্রমুখ।

আধুনিক হিন্দীকাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়

কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসেই ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বিশেষ গুরুত্ব ও মহত্ত্ব রয়েছে। এতদিনে হিন্দীর খড়ীবোলিতে কবিতা ক্রমে ক্রমে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। মৈথিলীশরণ গুপ্ত, মুকুটধর পাণ্ডেয় প্রমুখ কবিদের প্রয়াসে হিন্দী কবিতা আরও বেশি কল্পনাময়, চিত্রময় এবং সূক্ষ্ম-অনুভূতিব্যঞ্জক, বিচিত্র রূপ, রং ও আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে উঠল। গীতিকাব্যধর্মী রচনার মাঝে মাঝে রহস্যময়তা উঁকি মেরেছে। এই কবিসম্প্রদায় কাব্যক্ষেত্রের প্রসার, প্রকৃতির সাধারণ ও অসাধারণ বস্তুনিচয়ের সঙ্গে চিরন্তন সম্পর্কের সূক্ষ্ম অনুভূতির শিল্পায়নে সক্রিয় ছিলেন।

ভারতেন্দু যুগেই হিন্দী কবিতার প্রকৃতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়, ভারতেন্দু-উত্তরকালে তা আরও দ্রুত হয়, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে হিন্দী কবি ও পাঠকদের মন স্বচ্ছন্দতা-সন্ধানী হয়ে পড়ে। তার প্রতিফলন ঘটে কবিতাতে। ভাষা, ভাব ও ছন্দের নানাপ্রকার পরিবর্তন দেখা দেয়। যুগের প্রভাবে এই পরিবর্তন অবধারিত ছিল। তবে ইংরেজি, বাংলা ও অন্য সাহিত্যের আধুনিকতার স্পর্শ ও প্রেরণায় তা ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী যুগে বাংলা কবিতার গুরুত্ব ও তার স্বীকৃতি হিন্দী কাব্যানুরাগীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও মানব-প্রীতি বিষয়ক গীতিকবিতার দিকটি ভক্তিপ্রবণ মনের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করল। রহস্যবাদ, প্রতীকবাদ ও চিত্র-কল্প বা ভাষাচিত্রবাদ— কোনো-কোনো হিন্দী কবির কবিসত্তাকে মুগ্ধ, প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত করল। স্বচ্ছন্দ-নবীন কাব্যধারার জন্য রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। অদ্বিতীয় প্রতিভায় সে কাজ তাঁর পক্ষে সহজই হয়েছিল বলতে হয়। কিন্তু নবীন-হিন্দী কবিদের

পক্ষে তা সহজ ছিল না। অথচ সেরূপ ভাষার ছিল নিতান্তই অভাব। তাই কেউ কেউ ভাব ও ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণেও প্রবৃত্ত হলেন। ফলে স্বচ্ছন্দ-ধারার ভাব, ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গি সবই অপরিচিত ঠেকল হিন্দী কাব্যক্ষেত্রে। তাই বহুদিন পর্যন্ত এই নবীন কবিদের নতুন ছায়াবাদী কাব্য, বিশেষ করে তার ভাষা ও ছন্দ ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছিল। বহু কবিকে বহুবার, বহু ক্ষেত্রে নানাভাবে তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে নবীন-কবিগণ দমে যান নি। ভাষাকে প্রয়োজনমতো তাঁরা সংস্কৃত ও অন্যবিধ নানা শব্দে পুষ্ট এবং শব্দকে উপযোগী নবীন অর্থে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুললেন। ভাষা হয়ে উঠতে লাগল ভাবের অনুকূল। অবশ্য প্রথম দিকে তাতে পুরোপুরি সফলতা আসে নি। এসেছে ক্রমে ক্রমে। কিছু কবি পরাজয় স্বীকার করে পথপরিবর্তন করেন। সম্ভবত শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাসের অভাবই তার কারণ। চিত্তের উন্মুক্তিতে কবিতার উদ্‌গম ও পরিবর্তমান মূল্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল নবীন বা ছায়াবাদী কবিতার প্রধান অবলম্বন। সক্ষম-নবীন কবিরা গ্রহণ-শক্তিসম্পন্ন, সামাজিক বৈষম্য ও অসংগতির প্রতি সজাগ তথা আত্মশক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন। কাব্যরূপ ও শৈলীর বিচারে তাঁরা পূর্ববর্তী কবিদের থেকে ভিন্ন গোত্রের ছিলেন। শব্দশিল্প, বাসনাত্মক প্রণয়াবেগ, বেদনা-বিবৃতি, সৌন্দর্য-সম্পাদন, মধুর চর্যা, অতৃপ্তিব্যঞ্জক জীবনের অবসাদ-বিষাদ, নৈরাশ্য এবং তিক্ত জীবনানুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের 'মধুময়' রচনায়। এই পরিমিত ক্ষেত্রের মধ্যেই তাঁরা চিত্র-ভাষা বা রূপকল্পের সানন্দ উপলব্ধিও দান করেছেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো ইংরেজি বাক্য বা বাক্যাংশের অনূদিত প্রয়োগে এবং বাংলা বাক্য বা বাক্যাংশের সহায়তায় শ্রুতিসুখকর নাদ ও শ্রবণমাধুরী আনতে কবিরা সচেষ্ট ছিলেন। এইভাবে যে নবীন কবিতার সুন্দর, সার্থক এবং বলিষ্ঠ আবির্ভাব ঘটল, যাকে রূঢ়ার্থে 'ছায়াবাদ' নামে অভিহিত করা হয়, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে উল্লেখ করা যায়—

১. মানবতাবাদী দৃষ্টির প্রাধান্য।

২. কবির ব্যক্তিগত চিন্তন-মনন ও অনুভূতির কাব্যায়ন।

৩. মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবনচর্যা, ক্রিয়াকলাপ-প্রয়াস এবং আস্থার পরিবর্তিত মূল্যবোধের স্বীকৃতি।

৪. ছন্দ, অলঙ্কার, মিল, লয় ও রস প্রভৃতির ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াস।

৫. সনাতন শাস্ত্রসম্মত সংস্কারের প্রতি অনাস্থা।

৬. পরমারাধ্যের যত্র-তত্র, যে কোনো অবস্থায় পরমাত্মীয়ের মতো উপস্থিতি-অনুভব এবং তাঁকে 'তুম' 'তুম্হারা' রূপে অতি সহজ, সরলভাবে সম্বোধন।

'ছায়াবাদে'র পশ্চাৎপটে রয়েছে একটি গুরুত্ববাহী বিশাল সাংস্কৃতিক প্রবণতা। তার অভিব্যক্তি আধুনিক শিক্ষার ফলে ঘটলেও ভারতীয় ঐতিহ্যসুলভ হৃদয়-ব্যাকুলতায় তা ঋদ্ধ। সার্থক ছায়াবাদী কবির রচনায় অল্পাধিক আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির সুর সুস্পষ্ট। শাস্ত্র ও সমাজের রূঢ়িবাদিতা বা প্রাচীন বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণকারী কবিদের হৃদয়েও ভারতীয় ভাবনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ছায়াবাদের উপকরণ হিসাবে একদিকে পাওয়া যায় অনন্ত, অসীম, অজ্ঞাত প্রিয়তমের প্রতি কবিদের মনের একান্ত ব্যাকুল প্রেমানুভূতির বিবিধ-বিচিত্র অভিব্যক্তি অর্থাৎ 'রহস্যবাদ'। বাংলায় বিশেষ করে রবীন্দ্রকাব্যের এই 'রহস্যবাদ' কখনও 'ছায়াবাদ' রূপে অভিহিত হয়নি। সুতরাং ছায়া বা অস্পষ্টতার মধ্যে কাব্যগুণ, অধ্যাত্মগুণ, আধুনিকতা, মানবিকতা এবং শিল্পময়তার অস্তিত্ব অনুভব করে হিন্দী সমালোচকেরা বিশেষ এক শ্রেণীর কাব্যকে 'ছায়াবাদী' বিশেষণে বিশিষ্ট করেছেন। অপর পক্ষে কাব্যরচনা প্রণালীর বিশিষ্টতা— ছায়াবাদের অন্যতম উপকরণ রূপে গুরুত্ব লাভ করেছে। তাতে প্রস্তুতের স্থলে অপ্রস্তুতের ব্যঞ্জনাগত আভাসই ছায়া রূপে গ্রাহ্য। সে যাই হোক, রহস্যবাদের নামান্তর রূপেই ছায়াবাদ

পরিগণ্য। এই নব কাব্য-আঙ্গিকে যে-কোনো বস্তু বা বিষয়ের বর্ণনা সম্ভব।

হিন্দী কাব্যজগতে প্রকৃত ছায়াবাদী কবিরূপে গণ্য— মহাদেবী বর্মা। অন্যান্য ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে সুমিত্রানন্দন পন্ত, জয়শংকর-প্রসাদ এবং সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' প্রতীকাত্মক' পদ্ধতির অনুসারী। তবে সাধারণভাবে এই কবি চতুষ্টয়ই হিন্দীর মুখ্য ছায়াবাদী কবি রূপে পরিচিত।

আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের মতে হিন্দী কাব্যের ছায়াবাদী প্রকৃতি গড়ে উঠেছে প্রধানত পাঁচটি উপাদানকে আশ্রয় করে।[৭] যেমন—দ্বিবেদী যুগের ইতিবৃত্তমূলক গদ্যাত্মক কাব্যশৈলীর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া; ইংরেজি সাহিত্যের গীতিকবিতার স্বাচ্ছন্দ্য ও আকর্ষণ; ভক্ত কবিদের গেয় রচনা; উর্দূ শায়রীর আকর্ষণ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রধানত 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য কাব্য-কবিতার প্রবল প্রভাব। এসবের ফলে নব-সৃজিত হিন্দী কবিতায় কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা— দুঃখবাদ, মানবগরিমা ও ব্যক্তিবাদ; স্বদেশপ্রেম; বন্ধন-মুক্তি; প্রকৃতির নবরূপায়ণ এবং আত্ম-অভিব্যঞ্জনা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে সবই অভিনব, তা নয়, তবে স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধতা প্রভৃতির যে নব-নব রূপায়ণ বা নবতর ব্যাখ্যা ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীনের নবতর ব্যাখ্যা এবং নবীনের সানন্দ সমাবেশেই আলোচ্য যুগের বিশিষ্ট পরিচয়। এবার বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।—

দুঃখবাদ—দেশের শোচনীয় পরিস্থিতির প্রভাব অথবা জনমনের অতৃপ্ত বাসনার প্রতিফলন, অথবা অতীতের প্রতি মোহভঙ্গের ফলে আত্মতুষ্টির বিপত্তি প্রভৃতি কারণে এ-যুগের সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যে দুঃখ-বাদের প্রবল প্রতিফলন লক্ষিত হয়। এই দুঃখবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'হালাবাদ' বা 'হলাহলবাদ'-এর সূচনা ঘটে। দুঃখের বিস্মরণের জন্য হালাবাদের আশ্রয় গ্রহণ তখন শ্রেয় ও অনিবার্য রূপে

গণ্য হত। দুঃখ ভোলবার জন্যই 'কারণবারী' অথবা 'কালকূট'-এর মৌতাত বা মত্ততার আশ্রয়-গ্রহণ এবং পরিশেষে ধ্বংসাত্মক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। হালাবাদ বিস্মৃতি এবং হলাহলবাদ ভয়ংকর প্রলয় বা বিশ্বনাশ-এর দ্যোতক। সংসারের সঙ্গে সংসারের দুঃখও বিনষ্ট হবে, লুপ্ত হবে। হলাহলেরই জয় হবে।— এই ছিল স্বপ্ন।

ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে প্রসাদ, পন্ত প্রমুখ স্ব-স্ব-কল্পনার সৌন্দর্যে বর্তমান জগতের নিরাশা ভুলতে ও ভোলাতে চাইলেন। প্রসাদজী আহ্বান করলেন বিস্মৃতিকে। অতীত ও ভবিষ্যতের সংগীতমাধুরীতে আত্মমগ্ন হতে চাইলেন। পন্তজীর চোখে সংসারের পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও সরষে সমান সুখের পরপারে আছে প্রকৃত সুখ ও শান্তি। তবে শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতেই তিনি সুখ ও শান্তির সন্ধান পেয়েছেন। সুখ ও দুঃখ তো জীবনের পরস্পর পরিপূরক।— 'সুখ দুখ কে মধুর মিলন মেঁ য়হ জীবন হো পরিপূরণ।' মহাদেবী বর্মার অনুভূতিতে দুঃখ সুখে রূপান্তরিত হয়। তার তপস্যাতেই তিনি মুগ্ধ ও লীন। কিন্তু প্রগতিবাদের যুগে এই দুঃখবাদই চরম সত্য এবং পরম বাস্তবরূপে প্রতিভাত ও গ্রাহ্য। শোষিত, পীড়িত মানুষের করুণ ক্রন্দন এবং মর্মবিদারী হাহাকারে তা পরিপূর্ণ। দুঃখবাদের কল্যাণে ছায়াবাদে 'পলায়নবাদে'র উদ্ভব সুস্পষ্ট। তবে বর্তমানে সে প্রবৃত্তিও লুপ্তপ্রায়। নৈরাশ্যের স্থান এখন আশা-আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ। মনে হয়— 'জগৎ এখন সখি বাঁচিবার মতো।'

মানবমাহাত্ম্য ও ব্যক্তিবাদ—নব যুগে জগৎ-জীবন ও মানুষের মূল্যবোধে 'ক্রান্তি' বা বিপ্লব ঘটে গেছে। এক সময় ধর্ম ও রাজনীতি—(রাজার নীতি বা বিধান) সর্বস্ব ছিল মানুষের জীবন। মানুষ ছিল দলিত, নিষ্পেষিত ও অবহেলিত। কিন্তু এখন সে মানবতাই ধর্ম ও রাজার বিধি-বিধানের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই মানুষ, মানুষের জীবন ও অনুভূতি-আশ্রিত কবিতার প্রকৃতি, বিষয় এবং ভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। রাজা-রাজড়ার জীবন

নিয়ে আর কবিতা লেখা হয় না, লেখা হয় না তাঁদের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যেও। ভগবান মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। ভগবান ও মানুষে আজ তেমন পার্থক্য করা হয় না। তাই এক কালের সমাজের বোঝা বিধবা 'ইষ্টদেব কে মন্দির কী পুজা-সী' কবিতার বিষয় রূপে গৃহীত হয়, 'পেট-পীঠ দোনো মিলকর হৈঁ এক, চল রহা লকুটিয়া টেক;··· মুঁহ ফটী-পুরানী ঝোলী কো ফৈলাতা'—ভিক্ষুকও কাব্যের বিষয় হয়ে ওঠে। লোকে দেবালয়ের বদলে শ্রমিক-মজুরের কর্মভূমিতে দেব-দর্শন করে। প্রাচীন জীবনস্তর আজ তিরস্কৃত। প্রগতিবাদে শোষিত ও পীড়িতজনই পূজা ও কবিতার সামগ্রী।

ব্যক্তিবাদের স্বীকৃতির যুগ এটি। সমাজের অঙ্গ হলেও মানুষ ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে বজায় রেখে সমাজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়। এই ব্যক্তিবাদ-তত্ত্ব কাব্যে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে, এনেছে নবীনত্ব। প্রগতিবাদে ব্যক্তিবাদ ক্রমে ক্রমে সমষ্টি বা সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে উৎসুক। তাই ব্যক্তির মুক্তি অপেক্ষা সমষ্টির উন্নয়নই সমধিক কাম্য এ-যুগে।

স্বদেশপ্রেম—মানবপ্রেমের একটি বিশিষ্ট অথচ স্বাভাবিক পরিণাম স্বদেশপ্রেম। প্রেম আত্মীয় থেকে অনাত্মীয়, স্ব-ঘর থেকে ভিন্‌ঘরে সঞ্চারিত হয়। যা কিছু আমার, যা কিছুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সে-সব কিছুর সঙ্গে আমার মন প্রেমের বাঁধনে বাঁধা। তাই এ-সব-কিছুর পরিণতি স্বদেশপ্রেমে। তবে তা ক্ষুদ্র, সংকুচিত, অনুদার নয়। যুগ-চেতনা ও নবভাবের কল্যাণে রাষ্ট্রীয়-চেতনা আন্তর্রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক চেতনায় পর্যবসিত। স্বাভিমান ও গৌরববোধের ভিত্তিতে তা গঠিত। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গান্ধীবাদ-প্রভাবিত স্বদেশ-প্রেম। পর কে পীড়ন নয়, পরের পীড়ন ও অত্যাচার-সহন ও কষ্টসহিষ্ণুতায় আত্ম-গৌরববোধ জাগায় এই স্বদেশপ্রেম। সুমিত্রানন্দন পন্ত, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' ও জয়শংকরপ্রসাদের কবিতায়— এই স্বদেশপ্রেম উদ্ভাসিত।

বন্ধনমুক্তি—কোনো কোনো ছায়াবাদী কবির কাম্য ছিল মহাপ্রলয়। সুখের জন্য তাঁরা জগৎকেও ধ্বংস করতে পিছ-পা ছিলেন না। জগতের জীবন্ত বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার তাঁদের এই প্রবৃত্তি পলায়নবাদের নামান্তর। তবে কেউ-কেউ সংসারের সুখের জন্য দুঃখকেও স্বীকার করতে চাইলেন। দুঃখের বন্ধনেই সুখের সন্ধান পেলেন। বাইরে থেকে বন্ধনমুক্তি চাইলে বা ঘটলেও অন্তরের বন্ধন অটুট রইল। বন্ধন-ছিন্ন করে নয়, বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আস্বাদন চাইলেন কবি। ধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যের 'মুক্তি' কবিতার বিপ্লবাত্মক আকৃতি। —'তেরী মধুর মুক্তি হী বন্ধন'; 'সহস্র বন্ধনোঁ মেঁ মুক্তি রতি।' ঝংকার কাব্যে মৈথিলীশরণ বন্ধন ও মুক্তির চেয়ে 'সিদ্ধিলাভের উপায়কেই গুরুত্ব দিলেন বেশি— 'সখে, মেরে বন্ধন মত খোল,
সিদ্ধি কা সাধন হী হৈ মোল।'

এই প্রবৃত্তি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছায়াবাদী কবিসম্প্রদায়ই এ-প্রবৃত্তির ধারক এবং বাহক।

প্রকৃতির নবরূপ দর্শন—পূর্বের মতো এযুগে আর প্রকৃতি দূরের বিস্ময়কর শক্তি মাত্র নয়। অবলম্বন রূপে প্রকৃতিকে দেখা ও পাওয়ার প্রয়াস দেখা যায় কবিদের মধ্যে। প্রকৃতিতে মানবিকতার আরোপও লক্ষিত হয়। ভাবপ্রবণতার ফলে জড়প্রকৃতি অনুভূতি ও মানব-স্নেহের কল্যাণে মানুষের আত্মীয় রূপে চিত্রিত হয়। কথাও বলে। এই প্রবৃত্তিই কি ছায়াবাদ? প্রকৃতি-প্রেমের আশ্রয়ে দেশ-প্রেমও জেগে ওঠে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ স্থানগুলির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ—দেশপ্রেমেরই আর এক প্রকাশ। ভারতের গৌরবগাথায়— 'অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল'ও এসে যায়। প্রসাদ, পন্ত ও নিরালার কবিতায় এই প্রবণতা লক্ষিতব্য।

আত্মাভিব্যক্তি—আধুনিক হিন্দী কবিতা বহির্মুখীনতা থেকে অন্তর্মুখী-নতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। বাহ্যিক ঘটনার বর্ণনা অপেক্ষা আন্তরিক অনুভূতি বা মনোভাবেরই অভিব্যঞ্জনা এ-যুগের কাব্যে

সমধিক লক্ষিত হয়। প্রাক্‌-আধুনিক যুগে ভগবান অথবা কাব্যের নায়কের প্রতি কবিরা আত্মসমর্পণ করতেন। কিন্তু সে যুগ আর নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে সবাই সমান। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তাই কবিতা আজ কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্য না হয়ে স্বতন্ত্রভাবমূলক ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন কবিতা, তথাকথিত 'মুক্তক' বা গীতিকবিতা। এই সব পরিবর্তিত অভিব্যক্তির মূলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের নানাপ্রকার অসন্তোষ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলা চলে। বাইরে না পেয়ে, বা পাওয়ার সম্ভাবনা না-দেখে অন্তরেই প্রকৃত সুখ-শান্তির খোঁজও এই প্রবণতার মূলে সক্রিয়। প্রগতিবাদের যুগে এই প্রবণতাও কমে এসেছে।

আধুনিক হিন্দী কবিতার এই প্রবণতা অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববাদ তাকে রীতিকাল থেকে পৃথক করেছে। কারণ রীতিকালে কবিতায় শূন্যস্থান-পূর্তির ক্ষেত্রে আলংকারিকতার প্রাধান্য ছিল। ব্যক্তির স্থান ছিল না। ভক্তিকাল থেকেও এ-যুগের কবিতা পৃথক। কারণ ভক্তিকালে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের অবকাশ থাকলেও নিজের ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাবার অবকাশ কবির ছিল না। তাঁরা ছিলেন ইষ্টদেব-সমর্পিত প্রাণ। ব্যক্তি-সত্তার সম্মান ও স্বীকৃতি বর্তমানকালে যেমন হয়েছে তেমনটি পূর্বে কখনও ঘটে নি। আত্মাভিব্যঞ্জনার এই অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির সাহায্যে জীব ও ঈশ্বর নিয়ে কাব্যে রহস্যবাদের ধ্বনি ঝংকৃত হয়।

আধুনিক কবিতার ভাষা ও ছন্দেও নবীনতা এসেছে। মিলের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস ভারতেন্দু যুগের কোনো কোনো কবির রচনায় দেখা দেয়। এর মূলে সংস্কৃতের মিলহীন কবিতার প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। আবার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-রচনার আকর্ষণও থাকতে পারে। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর হাতে ছন্দ, মিল, চরণগত মাত্রা-সমতা ও সুস্পষ্ট ধ্বন্যাত্মকতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে কবিতা অপরূপ হয়ে উঠতে লাগল। লঘু-গুরু বর্ণক্রম এবং মাত্রাগণনার বন্ধন থেকে মুক্ত হল কবিতা। তার দ্বার হল উন্মোচিত এবং ক্ষেত্র হল

সুবিস্তৃত। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্স এবং বাংলার অমিত্রাক্ষর-মুক্তক হিন্দী কবিতায় ধীরে ধীরে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এই সব অসম মাত্রার, অসম পংক্তির কবিতার চরণে প্রত্যাশিত তাল ও লয়ের সাহায্যে ভাবের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও তা 'রবড় ছন্দ' বা 'কেঁচুয়া ছন্দ' আবার কারো কারো মতে 'ক্যাঙ্গারু ছন্দ' নামে পরিচিত হল। তবে এ-ছন্দের পরিচয় তার নামে নয়, তার গুণে, বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে। তাই ছন্দটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করল এবং তার ব্যঙ্গাত্মক নাম লজ্জায় আত্মগোপন করল। সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পসমন্বিত হয়ে অপূর্বতা দান করল হিন্দী কবিতাকে। হিন্দী জগতে সুন্দর সাহিত্য-সংগীতের অভাব নেই। প্রচলিত লোকগীতিতে সাহিত্যিক প্রাণসত্তার স্পর্শে তার নব-জীবন লাভ ঘটল। সরল সুবোধ হিন্দী-উর্দু মিশ্রিত কথ্যভাষার সাহায্যে কবিতা, ভাব-ভাষা ও ছন্দের বিচারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজে প্রবেশলাভ করেছে। জনগণের ভাবের জনগণের ভাষায় অভি-ব্যক্তি দানের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপমা-রূপক প্রভৃতির প্রয়োগও অভিনবতামণ্ডিত। নতুন প্রকাশভঙ্গি এবং শব্দচিত্রনির্মাণও উচ্চস্তরের শিল্পরূপ লাভ করেছে। ভাষায় নব নব অলংকার এসেছে ইংরেজি ভাষার সাহচর্যের ফলে, তেমনি প্রাচীন অলংকারেরও 'নবায়ন' ঘটেছে। বিশেষণ-বিপর্যয়, মানবীকরণ এবং আরও কয়েকটি অলংকারের ব্যবহারচাতুর্যে সাহিত্যে নবরসতাবিধান ঘটেছে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশ জুড়ে যে চৈতন্যতরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তাতে কবি ও 'সহৃদয়'— উভয় সম্প্রদায়ই বেশ আত্মবিশ্বাসী এবং ভাবগ্রাহী হয়ে ওঠেন। এই যুগের কয়েকজন বিশেষ শক্তিধর প্রতিভাশালী কবি হলেন— ১. জয়শংকরপ্রসাদ, ২. সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' ৩. সুমিত্রা-নন্দন পন্ত এবং ৪. মহাদেবী বর্মা।

এই কবিচতুষ্টয়ের রচনায় চিত্তগত উন্মুক্ততা, ব্যক্তিগত আবেগের অনায়াস অভিব্যক্তি এবং কল্পনার অবিরল প্রবাহে সবেগ ভাবের

প্রাবল্য বিদ্যমান। এ-চারজনই মূলত কবি এবং ছায়াবাদী কবি, কিন্তু প্রকৃতি-বিচারে চারজনই পৃথক। এখন তাঁদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক।

জয়শংকরপ্রসাদ (১৮৮৯-১৯৩৭)—হিন্দীতে ছায়াবাদের সূচনার বহু আগে থেকেই জয়শংকরপ্রসাদ কবিরূপে সুপরিচিত ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ব্রজভাষাতে কবিতা লিখতেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে খড়ীবোলীর দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রথম যুগের 'কাননকুসুম' (১৯১২), 'প্রেমপথিক' (১৯১৩), 'করুণালয়' (১৯১৩), 'মহারাণা কা মহত্ত্ব' (১৯১৪) এবং 'ঝরনা' (১৯১৮) প্রভৃতি কাব্যে অতীতের প্রতি মোহ ও আসক্তি পরিলক্ষিত হয়। অম্বিকাদত্ত ব্যাস, শ্রীধর পাঠক প্রমুখের 'অতুকান্ত' বা অমিত্রাক্ষর রচনার প্রয়াস জয়শংকরপ্রসাদের হাতে এসে 'মহারাণা কা মহত্ত্ব' ও 'প্রেমপথিকে' পূর্ণতা লাভ করে। অতঃপর 'আঁসূ' (১৯২৬) কাব্যে তাঁর আপাত সংকুচিত কবিচিত্ততার কতকটা অস্পষ্ট-রহস্যময় আকর্ষণীয় প্রকাশ ঘটে।

প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্যকে কবি মধুর অনুভবগম্য ও সুখকর করে তুলেছেন। প্রথম দিকে অতীত ভারতের বিষয়ে, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে কাব্যরচনা করলেও তাঁর এই প্রবণতায় যেন কতকটা দ্বিধা ও অস্পষ্টতার ছাপ লক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এই সংকোচের জন্য অস্পষ্টতা তত্ত্বরূপ নেয় কবির চিন্তায় ও মননে। ক্রমে-ক্রমে তাঁর সীমা বা রূপ থেকে আরব্ধ যাত্রা, অসীম বা অরূপে গিয়ে পৌঁছয়।

'ঝরনা' কাব্যের দ্বিতীয় সংকরণেই (১৯২৭) বেশ কয়েকটি কবিতায় রহস্যবাদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আঁসূ (১৯৩১) কাব্যে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে প্রেমোন্মাদের প্রিয়তম মাটিতে নেমে আসেন এবং জ্ঞান ফিরলেই চলে যান। তাই অজ্ঞাত প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অশ্রুপাত ঘটে। 'নিয়তিবাদ' ও 'দুঃখবাদে'র বিষণ্ণ সুর শোনা যায়। অভিব্যঞ্জনা-প্রেমোন্মাদনার বিভূতি এবং মঙ্গলময় প্রভাব সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে

গ্রহণের অদ্ভুত শক্তি-সৌন্দর্য তথা মঙ্গলের সমন্বিত আভাসে সে সুর পরিপূর্ণ। এই চেতনার অনস্তিত্বে তন্দ্রা, স্বপ্ন ও সংজ্ঞাহীনতার চিত্রণ রহস্যবাদের একটি স্বীকৃত রূপ। জয়শংকর প্রসাদের কাব্য-রচনায় এই ধারার অনুসৃতি 'কামায়নী' (১৯৩৫) পর্যন্ত লক্ষিত হয়। কেবল নিজের জন্যই নয়, আলোতে ছট্‌ফট্‌কারী 'চিরদগ্ধ বসুধা'র জন্যও ঘুমের একই ঔষধ আনবার জন্য কবি 'নিশা'কে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

চির দগ্ধ দুখী য়হ বসুধা আলোক মাঁগতী তবভী ;
তুম তুহিন বরস দো কনকন য়হ পগলী শোয়ে অবভী ।।

—চিরদগ্ধ দুঃখী ধরা আলোকরাশি চায় !
তুমি তুহিন কণায় দাও ভাসিয়ে, পাগলি শুয়ে হায়।

কবি সেই মহারাত্রির কল্পনা করছেন যা সৃষ্টি ও প্রলয়ের সন্ধিকাল, যাতে সমগ্র নামরূপের অবসান ঘটে। 'লহর' (১৯৩৩) কাব্যে কবি মানবহৃদয়ের সেই আনন্দ-লহরীর কথা বলেছেন যা নীরস জীবনকে সরস করে তোলে। এখানেও প্রিয়তমের আগমন, লুকোচুরি-খেলা এবং তাঁর জন্য অভিসার প্রভৃতি রহস্যবাদের উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আহৃত। অতীত ও বর্তমানের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে কবির কল্পনা আশ্রয় খুঁজেছে। দেখা যাচ্ছে কবি প্রসাদের রচনায় প্রেমের ব্যথা-বেদনাই সমধিক। সে প্রেম লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে যাত্রা করেছে। 'কানন কুসুম' (১৯১২) তাঁর প্রথম দিকের এই জাতীয় কবিতার সংকলন। 'কামায়নী' (১৯৩৫) কাব্যে জয়শংকরপ্রসাদ একটি গভীর তত্ত্ব বা ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। এ-কাব্যে কবির প্রিয় 'আনন্দে'র প্রতিষ্ঠা হয়েছে দার্শনিকতার কাঠামোতে কল্পনার মধুর রূপ দানে।

কোন্ সে অতীতকালে জলপ্লাবনের পর মনুর মানবী-সৃষ্টির পুনর্বিধানের আখ্যান হল 'কামায়নী' প্রবন্ধ বা আখ্যান-কাব্যটির বিষয়-বস্তু। মনু প্রথমে শ্রদ্ধা এবং পরে ইড়াকে পত্নীরূপে বরণ করেন। এই ভাবে ইড়াকে বন্দিনী বা সর্বৈব অধীন করে রাখার প্রয়াসে দেবতারা মনুর

প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এই রূপকআখ্যানে বিশ্বাসমূলক রাগাত্মিকাবৃত্তি হল শ্রদ্ধা এবং ইড়া ব্যাবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। শ্রদ্ধাকে কবি মৃদুতা, প্রেম ও করুণার জননী এবং প্রকৃত আনন্দলাভের মাধ্যম রূপে চিত্রিত করেছেন। আর নানাপ্রকার শ্রেণীভেদ এবং ব্যবস্থাদির মূল প্রেরণা ও কর্মে নিয়োজিত রাখার শক্তিরূপে শ্রদ্ধা উপস্থাপিত। রূপকের প্রাধান্যের ফলে মনুর চরিত্র কিছুটা নিষ্প্রভ ও চঞ্চল। নারীরই প্রাধান্য বিবৃত। মনু মানবমনের প্রতীক। মঙ্গলময় জ্ঞানের দর্শন করান শ্রদ্ধা। কবির ভাব ভাষার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, বহু সূক্তি ও শব্দচিত্র ফুটে উঠেছে। অমূর্ত, নিরবয়ব বস্তুকেও কবি সুন্দর ও সার্থক-ভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে চিন্তার চিত্রায়ণও উল্লেখযোগ্য। যাই হোক, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সমন্বয় লক্ষিত হয় কামায়নী-কাব্যে। এ বিষয়ে স্বয়ং কবির অভিমত হল—

> 'মনু অর্থাৎ মনের দুই পক্ষ— হৃদয় এবং মস্তিষ্কের সম্পর্ক ক্রমশ শ্রদ্ধা এবং ইড়ার সঙ্গে সহজেই গড়ে ওঠে।'

কামগোত্রজ শ্রদ্ধা বা কামায়নী তাঁর পুত্র মানবকে ইড়ার সঙ্গে বাস করতে আদেশ দিয়ে কাব্যটিতে বলেছেন—

> হে সৌম্য ! ইড়াকা শুচি দুলার, হর লেগা তেরা ব্যথাভার ;
> ওয়হ তর্কময়ী, তূ শ্রদ্ধাময়, তূ মননশীল কর কর্ম-অভয় ॥

> —হে সৌম্য পাবন প্রেম ইড়ার, মেটাবে ব্যথা-তাপ তোমার।
> সে তর্কময়ী, তুমি শ্রদ্ধাময়, কর মননশীল শুভকর্ম-অভয়।

কামায়নী কাব্যের কথাবস্তু পুরোপুরি মানব চেতনায় সংঘটিত। তার আধিভৌতিক বা ঐহিক আশ্রয় বাইরের খোলসের মতো। এই সব কারণে কাব্যটি মানবতার সম্পূর্ণ বিকাশের আভ্যন্তরীণ গাথা হয়ে উঠেছে। কৃতিটিকে সতত বিকাশশীল মানব চেতনার ভাবাত্মক কাব্যও বলা যায়। তার প্রতিটি সর্গই (চিন্তা, আশা, শ্রদ্ধা, কাম, বাসনা, লজ্জা, কর্ম, ঈর্ষ্যা, ইড়া, স্বপ্ন, সংঘর্ষ, নির্বেদ, দর্শন, রহস্য এবং আনন্দ) মানবমনের প্রধান প্রধান প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ রেখেই চিহ্নিত। তাই

বহির্জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনা ও ক্রিয়া ব্যাপারের সন্নিবেশ অপ্রতুল। তার কথাবস্তুর প্রধান উপাদান মনু, প্রলয়, হিমালয়, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আকুলি, কিলাত (অসুর-পুরোহিত), সারস্বত প্রদেশ, ইড়া, মানসরোবর, কৈলাস, ত্রিপুর এবং শিবদর্শন। এ-সবের মধ্যে শ্রদ্ধাই মুখ্য। তাঁর মুখেই কাব্যের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। শ্রদ্ধার সাহায্যেই মনুর চিদ্‌দর্শন ঘটেছে। মনু প্রথমে প্রবৃত্তি মার্গের পথিক ছিলেন, শেষে আধ্যাত্মিক স্তরের আনন্দবাদী হয়ে উঠেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সূচনা 'নির্বেদ' সর্গ থেকে। মনুর আধ্যাত্মিক প্রস্থানের উৎকর্ষের পর্যায় ক্রমেই কামায়নীর রহস্যময় সর্গ অত্যন্ত দার্শনিক হয়ে উঠেছে। শৈব দর্শন-আশ্রিত রূপক-কাব্য কামায়নীতে প্রসাদের প্রতীক-প্রয়োগ খুবই সুন্দর এবং সার্থক। সেগুলি প্রধানত প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্র থেকে আহরিত। এখানে তার থেকে একটি নিদর্শন দেওয়া যাক্। যৌবনের জন্য বসন্ত এবং বয়ঃসন্ধির জন্য 'রজনী'র 'অন্তিম প্রহরে'র যোজনার সার্থকতা দেখুন।—

মধুময় বসন্ত জীবনবন কে
বহ অন্তরিক্ষ কী লহরোঁ মেঁ
কব আয়ে থে তুম চুপকে সে
রজনী কে পিছলে পহরোঁ মেঁ।

—কামায়নী (৭ম সং) পৃ. ৬৩।

—মধু বসন্তের জীবন-বনে
অন্তরীক্ষের ঢেউ হয়ে—
না-জানি কখন গোপনে তুমি
এলে রজনীর শেষ-লয়ে।

ভাব-ভাষা ও ছন্দের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে— প্রসাদ যে অভিনবতার প্রত্যাশী ছিলেন। সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রসাদ কবির ভাষা সংস্কৃত গর্ভিত। তাতে তাঁর কাব্য-ভাষা, গাম্ভীর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত হয়েছে। বাংলা ভাষার কোমলকান্ত-মধুর-গুণ

কবিকে অনুপ্রেরিত করেছিল। তবে প্রতীক ব্যবহারে কোথাও কোথাও তাঁর ভাষা দুরূহ হয়ে পড়েছে। শব্দ-চয়ন, অলংকার যোজনা এবং ছন্দোবিধান সহজ-সুখদ-নবীনতার পরিচায়ক।

কামায়নীতে কবির প্রথম যুগের সলজ্জ-সংকোচভাব কেটে গেছে। বিভিন্ন সর্গে তা গভীর ও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। হৃদয়ের গভীর-চিন্তন-মনন ও অধ্যয়নের অভিব্যক্তি সৌন্দর্য-সুষমায় রহস্যময়তা লাভ করেছে। পার্থিব সৌন্দর্যকে স্বর্গীয় সুষমাদানে কবি যে সুদক্ষ ছিলেন, কামায়নীতে তার সার্থক পরিচয় রয়েছে। এই সব কারণে হিন্দী সাহিত্যে তো বটেই অন্য ভারতীয় সাহিত্যেও কামায়নীর দোসর খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই বিচারে কামায়নী একটি অনন্য কাব্য।

দেখা যাচ্ছে— প্রারম্ভিক যুগে প্রসাদজী ইতিবৃত্তাত্মক কবিতা লিখতেন। পরে 'ঝরনা' প্রভৃতি কাব্যে কবির স্ব-চেতনার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি, প্রগীতাত্মকতা, একাকিত্ব ও অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, সাহচর্যভাব এবং আন্তরিক তন্ময়তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় অতীত ও বর্তমান তাঁর রচনায় যে পরম কাম্য অভিনব অথচ প্রাচীন গুণোপেত অভিব্যক্তি লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে তাঁর ভারতীয় দর্শন, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যাদির পঠন ও অনুশীলন। তাই ঝরনার পর আঁসূ ও লহর প্রভৃতি কাব্যে কবির মনোবৃত্তি স্বচ্ছন্দ ও আত্মসমাহিত এবং তাতে পরিপুষ্টির গভীর রূপ অভিব্যক্ত। আর কামায়নী কাব্যে তো দার্শনিক কবি জয়শংকর-প্রসাদের অতুলনীয় কবিসত্তার পরিচয় বিধৃত।

জয়শংকর প্রসাদের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'প্রেমরাজ্য' (১৯১০), 'ছায়া', 'চিত্রাধার' (১৯১৮), 'প্রতিধ্বনি' (১৯২২), 'আকাশদীপ' (১৯২৯), 'আঁধী' (১৯৩১) ও 'ইন্দ্রজাল' (১৯৩৬)। প্রত্যেকটিতেই জয়শংকরপ্রসাদের স্বকীয়তা ও আধুনিকতার ছাপ রয়েছে।

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' (১৮৯৬-১৯৬১)—জন্মভূমি ও শিক্ষার বিচারে বাঙালি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য ও

ধর্ম-কর্ম সব কিছুরই প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতি অনাগ্রহী ও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। শৈশবের এই অসন্তোষই তাঁকে সাহিত্যে ও সমাজে 'বিদ্রোহী' রূপে পরিচিত করেছে। বাংলার স্বচ্ছন্দতাবাদী ও রহস্য-বাদী কবিতার গভীর অধ্যয়নের ফলে তিনিও অনুরূপ কবিতা রচনা শুরু করেন।[৮] এই সব কারণে হিন্দী কাব্যজগতে তাঁর আবির্ভাব 'ক্রান্তিকারী কবি'-রূপে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মনোভাব এবং পরিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর কবিতা ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। পাঠক, গায়ক বা সমাজ— কারও দিকে না তাকিয়ে তিনি স্বীয় কবিসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাই কদাচিৎ ভাবের কোমলতা ও সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হয় তাঁর রচনায়। তবে ব্যক্তিত্বের দুর্লভ আকর্ষণ তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবে ভূষিত করেছে। তিনি কাব্য ও সংগীতের দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে কাব্যকে সংগীতময় এবং সংগীতকে কাব্যময় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। মধ্যযুগের মানসিকতায় এ-যুগেও ছন্দ এবং কবিতা প্রায় সমার্থকই ছিল। এই মনোবৃত্তিতে সবল আঘাত হেনে নিরালা ছন্দের অতি নিরূপিত উৎকট বন্ধন থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে চাইলেন। ছন্দোবন্ধনের প্রতি তাঁর বিদ্রোহ ধ্বনিত হল। তবে এই বিদ্রোহ ছন্দের বিরুদ্ধে নয়, তার কঠোর বন্ধনের সনাতনতার বিরুদ্ধে, রূঢ়িবাদিতার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিচিত্তে অনুভূত ভাবের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি-দানের মহত্ত্বই তাঁকে বন্ধনমুক্ত ছন্দ বা মুক্তছন্দ অর্থাৎ 'মুক্তক' রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করে। তাঁর কবিতায় চরণের স্বচ্ছন্দবৈষম্য সংস্কারবাদী সমালোচক জগতে 'রবরছন্দ' বা 'কেঁচুআ-ছন্দ' নামে অভিহিত। অমিল কবিতাও তিনি প্রচুর লিখেছেন।[৯] ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রকৃতি-সুলভ সমাসবদ্ধতা, ক্রিয়াপদের কম ব্যবহার, প্রচলিত শব্দের এবং বাংলা শব্দের ভিন্নতর বিশেষ অর্থে প্রয়োগ প্রভৃতি তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে যেমন তৎসম শব্দের প্রাধান্য দেখা যায় তাঁর কোনো কোনো কবিতায় অন্যদিকে তেমনি উর্দু, ইংরেজি-আশ্রিত হিন্দীও তিনি লিখেছেন।[১০]

বুদ্ধি ও হৃদয়ের সুখকর মিলন সাধনে নিরালার দার্শনিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মনের গঠনে—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা কাজ করেছে।[১১] বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি কবিতা তিনি অনুবাদও করেন। তাঁর বেশ কিছু কবিতা দার্শনিক পটভূমিতে লিখিত। তবে ভগবদ্ভক্তি স্বীকার্য হলেও আত্ম-ব্যক্তিত্বের বদলে তা কাম্য নয়। 'পঞ্চবটী' নাট্যকাব্যে 'নিরালা' বলেছেন, 'মুক্তি নাহি জানি আমি, ভক্তি থাকাই ঢের'। নিরালা অদ্বৈতবাদের স্পর্শ দান করেছেন তাঁর কবিতায়। এই দার্শনিকতাই তাঁর রহস্যাত্মক কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—যা সমগোত্রীয় অন্য কবির রচনায় নেই।[১২] নিরালাই হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্বচ্ছন্দতাবাদী কবি। এই প্রসঙ্গে তাঁর পরিমল (১৯৩০) কবিতা সংকলনটির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ-কাব্যে নিরালার বিদ্রোহী স্বরূপটি শান্ত-মধুর হয়ে ধরা দিয়েছে। 'পঞ্চবটী প্রসঙ্গ', 'তুম ঔর মৈঁ', 'জূহী কী কলী' (১৯১৬) প্রভৃতি কবিতায় কবির কল্পনা ও আবেগ যেন পরস্পরের প্রতিযোগী। 'তুলসীদাস' (১৯৩৮), 'রাম কী শক্তিপূজা' (১৯৩৬) এবং 'সরোজস্মৃতি'র (১৯৩৫) মতো কৃতির দ্বিতীয় নিদর্শন কেবল হিন্দী সাহিত্যেই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও পাওয়া সহজ নয়। ভাব, ভাষা ও ছন্দের এমন সার্থক সমন্বয় নিরালার মতো প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব। নিরালার কঠোর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে হৃদয়ে করুণা ও সুখানুভূতির প্রবাহ ছিল। এই প্রবাহপুষ্ট রচনা প্রগতিবাদের সূচক। তাঁর 'বিধবা' কবিতায় বিধবার পবিত্র ও করুণ জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে।—

> ওয়হ ইষ্ট দেব কে মন্দির কী পূজা-সী,
> ওয়হ দীপ-শিখা-সী শান্ত, ভাব মেঁ লীন,
> ওয়হ ক্রূর কাল-তাণ্ডব কী স্মৃতি-রেখা-সী,
> ওয়হ টূটে তরু কী ছুটী-লতা-সী দীন,
> দলিত ভারত কী হী বিধবা হৈ॥

—ইষ্টদেবের মন্দিরে পুজোর মতো, দীন দীপ-শিখার মতো শান্ত ও ভাবে বিভোর, ক্রূর কাল-তাণ্ডবের স্মৃতিরেখার মতো এবং ভেঙে-পড়া গাছের ছিন্ন লতার মতো দীন-দলিত ভারতেরই বিধবা সে।

'ভিক্ষুক' কবিতায় এক ভিখারীর চিত্রও এমনি করুণ ও মর্মস্পর্শী—

ওয়হ আতা—
দো-টূক কলেজে কে করতা পছতাতা, পথপর আতা।
পেট পীঠ দোনোঁ মিলকর হৈঁ এক, চল রহা লকুটিয়া টেক,
মুট্‌ঠীভর দানে কো— ভূখ মিটানে কো
মুঁহ ফটী পুরানী ঝোলী কো ফৈলাতা—
দো-টূক কলেজে কে করতা, পছতাতা পথপর আতা।

—আপসোসে ভরা ফেটে চৌচির বুকে সে কোনো মতে আসে। পিঠে-সাঁটা পেট নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে সে হাঁটে। ক্ষুধার এক মুঠো অন্নের জন্য তার ছেঁড়া থলিটি সে মেলে ধরে।— এই তার নিত্যকার ছবি।

শ্রমজীবীদের জীবন-যন্ত্রণার প্রতিও কবির সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এলাহাবাদের রাস্তায় পাথর ভাঙছে যে স্ত্রীলোকটি তার প্রতি দয়ার্দ্র কবিহৃদয়ে ধ্বনিত হয়—

ওয়হ তোড়তী পৎথর
দেখা উসে মৈঁনে ইলাহাবাদ কে পথ পর।

এই ধরনের কথ্যভাষায় তিনি 'কুকুরমুত্তা (ব্যাঙের ছাতা) কে দলিত শ্রেণীর প্রতীকরূপে তুলে ধরেছেন— আর গোলাপ শোষক বর্গের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত। নিরালার রহস্যময় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এমন কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করছি। উপাস্য ও উপাসক অথবা কবি ও কবিতার রহস্যময় সম্পর্কের চিত্র—

তুম তুঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ ঔর মৈঁ চঞ্চল গতি সুর-সরিতা।
তুম বিমল হৃদয় উচ্ছ্বাস ঔর মেঁ কান্ত-কামিনী কবিতা।

ভাবে-ভাষায় ও প্রত্নকলাবৃত্ত ছন্দের এই পংক্তি দুইটি সহজেই বাংলায় রচিত বলে গৃহীত হতে পারে। যেমন—

তুমি তুঙ্গহিমালয় শৃঙ্গ, আমি চঞ্চল গতি সুর সরিতা।
তুমি বিমল হৃদয়-উচ্ছ্বাস আর আমি কান্ত-কামিনী কবিতা॥

নিরালার মুক্তক কেমন মধুর চিত্রময় ও ধ্বনিঋদ্ধ তা বোঝা যায় এই কয়ছত্রে—

দিবসাবসান কা সময়
মেঘময় আসমান সে উতর রহী হৈ
ওয়হ সন্ধ্যা-সুন্দরী পরী-সী
ধীরে ধীরে ধীরে
মধুর-মধুর হৈঁ উসকে দোনোঁ অধর—
কিন্তু গম্ভীর নহীঁ হৈঁ উনমেঁ হাস-বিলাস
হঁসতা হৈ তো কেবল তারা এক
গূঁথা হুআ উন ঘুঁঘরালে কালে-কালে বালোঁ সে
হৃদয় রাজ্যকী রানী কা ওয়হ করতা হৈ অভিষেক।

—সন্ধ্যাসুন্দরী

—সন্ধ্যাসমাগত। মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে সন্ধ্যাসুন্দরী পরীর মতো ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তার অধর মধুর কিন্তু তাতে গম্ভীর হাস্য-বিলোল নেই। হাসছে কেবল একটি তারা। কালো কোঁকড়ানো চুলে সে গোঁজা,— অভিষেক করছে যেন হৃদয় রাজ্যের রানীর।

শব্দচিত্র-রচনায় নিরালা সুদক্ষ। প্রকৃতি ও মানুষের আঁকা চিত্রে তা প্রমাণিত। 'জুহী কী কলী'তে প্রাকৃতিক শোভার মানবীকরণ ঘটেছে। 'সন্ধ্যাসুন্দরী'তে নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যার মনোরম বর্ণনা চিত্রার্পিত। 'যমুনা' ও 'দিল্লী মেঁ' প্রভৃতি কবিতায় অতীতের স্মৃতি, 'পথিক-পিয়াসী, জগা রহী উস অতীত কে নীরব গান।' 'উদ্বোধন' কবিতায় ওজঃপূর্ণ বাণীতে কবির বর্তমান জগতের প্রাচীন জীর্ণ ব্যবস্থার স্থলে নতুন সুখময় ব্যবস্থার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। নিরালার কাব্যধারায় কোনো বন্ধন বা রূঢ়িতার স্থান নেই। কবি সুমিত্রানন্দন পন্তের ভাষায় নিরালার কবিতার পরিচয় হল—

ছন্দ বন্ধ ধ্রুব তোড়, ফোড় কর পর্বত কারা
অচল রূঢ়িয়োঁ কী, কবি! তেরী কবিতা ধারা।
মুক্ত অবাধ অমন্দ রজত নির্ঝর সী নিঃসৃত,—
গলিত ললিত আলোক-রাশি, চির অকলুষ অবিজিত!

—হে কবি, তোমার কবিতাধারা, ছন্দের বাঁধন ছিঁড়ে, দৃঢ় সংস্কারের পর্বত কারা ভেদ করে, অবাধ, অমন্দ, মুক্ত, অমল রজত নির্ঝরের মতো নিঃসৃত হয়ে গলিত, ললিত আলোকরাশির মতো চির অকলুষ ও অবিজিত ভঙ্গিতে বয়ে চলেছে।

নিরালার কাব্যকৃতি—'অনামিকা' ('প্রাচীন'-১৯২৩; 'নবীন'-১৯৩৭), 'পরিমল' (১৯৩০), 'গীতিকা' (১৯৩৬), 'তুলসীদাস' (১৯৩৮), 'কুকুরমুত্তা' (১৯৪২), 'অণিমা' (১৯৪৩), 'বেলা' (১৯৪৩), 'অপরা' (১৯৪৬), 'নয়েপত্তে' (১৯৪৬), 'অর্চনা' (১৯৫০), 'আরাধনা' (১৯৫৩) এবং 'গীতগুঞ্জ' (১৯৫৮)। নিরালার শেষ পর্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতার সংকলন— 'সান্ধ্যকালীন'-এ (১৯৬৯) মৃত্যুর পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে। বিষয়গত বৈচিত্র্য এবং ভাষার নবীন প্রয়োগের বিচারে কাব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। নিরালার সাহিত্য-প্রতিভার 'কোনো পরিমাপ নাই দেশে-কালে'। মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও নিরালার কবিচিত্ততার কিছু কিছু সাধর্ম্য লক্ষিত হয়।

সুমিত্রানন্দন পন্ত (১৯০০-১৯৭৭)—হিন্দী কাব্যজগতের সৌম্য এবং সুকুমার কবিরূপে মান্য সুমিত্রানন্দন। তাঁর প্রারম্ভিক রচনা সংকলিত হয় 'বীণা' কাব্যে। বীণার কবিতাগুলিতে মানবমনের আদিম ও অকৃত্রিম ঔৎসুক্য এবং কৌতূহল প্রকাশিত। তাই তা প্রকৃত ছায়াবাদী রচনারূপে গণ্য হতে পারে। কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির প্রভাবও লক্ষ করা যায়। কয়েকটি কবিতায় নিসর্গ-সৌন্দর্যের আনন্দ-ময় অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই সৌন্দর্য-আহ্লাদের দ্বারা উদ্‌বেজিত তাঁর কবিকল্পনা আত্মপ্রকাশের বিবিধ-বিচিত্র পথ অনুসন্ধান করে ফিরেছে। বীণার পূর্ববর্তী 'গ্রন্থি' কাব্যে কবি ব্যর্থ প্রেমের চিত্র

এঁকেছেন। গভীর করুণা উৎসারিত হলেও প্রেম হাস্য-বিনোদহীন নয়। সৌন্দর্য ভাবনার অভিব্যক্তি, আশা, উল্লাস, বেদনা, স্মৃতি প্রভৃতির ব্যঞ্জনা কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্ত। অবশ্য সুমিত্রানন্দনের প্রথম মুদ্রিত কাব্য 'উচ্ছ্বাস' (১৯২০)। বলাই বাহুল্য তার রচনা উচ্ছ্বাসে পূর্ণ।

সুমিত্রানন্দনের প্রথম পরিণত কাব্য 'পল্লব' (১৯২৭)। এই গ্রন্থে কবিপ্রতিভার উৎসাহ উদ্দীপনাময় প্রকাশ এবং প্রাচীন কাব্য-প্রণালীর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্য-চিত্রণে সুকোমল শব্দসম্ভারের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করার অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কবি। কবির কাব্যমনোভাব, শব্দ, অর্থ, ধ্বনি ও ছন্দের প্রসঙ্গে সুলিখিত ভূমিকা 'প্রবেশক'টি তাঁর কাব্যকুঞ্জে প্রবেশের চাবিকাঠি। নবযুগের নবকাব্য-পাঠকের উদ্দেশ্যে এটি রচিত। কবির সরলতা ও সততায় শব্দপুঞ্জের অন্তরালবর্তী সহজ সৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের কোমল স্বভাব-কলিকার অকৃত্রিম প্রীতিতে তা স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির বিরাট বিপুল রূপের অন্তর্নিহিত শোভার এমন মনোহর অভিব্যক্তি অন্যত্র দুর্লভ। কোথাও কোথাও সুন্দর আধ্যাত্মিক কল্পনা সার্থক রূপ লাভ করে অনবদ্য হয়ে উঠেছে—

> হাঁ সখি, আও বাঁহ খোল হম লগকর গলে জুড়ালেঁ প্রাণ,
> ফির তুম তম মেঁ, মৈঁ প্রিয়তম মেঁ হোজাওয়েঁ দ্রুত অন্তর্ধান ॥

> —এস সখি কাছে, বাঁধি বাহুপাশে, জড়া-জড়ি করি জুড়াই প্রাণ,
> শেষে তুমি তমে, আমি প্রিয়তমে, হয়ে যাই দ্রুত বিলীয়মান ॥

ছায়াবাদী কবি হলেও পল্লবের কয়েকটি কবিতায় পন্তজী রোমান্টিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'র অন্ত-রালে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী অজ্ঞাত চেতনসত্তাকে 'প্রিয়তম' বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁকে সামনে রেখে অতৃপ্ত বাসনার নানা রূপ কবি তুলে ধরেছেন। 'প্রিয়' ও 'প্রিয়া'র ভেদটুকুও তিনি সহজে

স্বীকার করেছেন। তবে প্রকৃতি ও প্রিয়তমের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রাখেন নি। 'পল্লব', 'উচ্ছ্বাস' ও 'আঁসূতে' প্রকৃতির রূপচিত্রণ অপরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সুখ-দুঃখময় জীবনের একটি যথার্থ ও মর্মগ্রাহী পথে চলার ফলে কল্পনা-ক্রীড়া ও বাক্‌বৈচিত্র্য তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। অবশ্য জগৎ ও জীবনতত্ত্ব অবলীলায় ব্যঞ্জিত হয়েছে—

বিনা দুখ কে সব সুখ নিঃসার, বিনা আঁসূকে জীবন ভার।
দীন দুর্বল হৈ রে সংসার, ইসী সে ক্ষমা, দয়া ঔ প্যার।

—দুঃখ বিনা সব সুখ অসার, অশ্রু বিনা হায় জীবন ভার!
তাই তো চাই প্রেম, দয়া ও ক্ষমা, দীন দুর্বল এই সংসার।

বেদনার আগুনে পুড়েই জীবন স্বর্ণসম দীপ্তি লাভ করে—

বেদনা হী মেঁ তপ কর প্রাণ, দমক দিখলাতে স্বর্ণ হুলাস।

'গুঞ্জন' কাব্যে কবি জীবন ও জগতের আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন— তবে বাস্তবের পথে নয়, কল্পনার সাহায্যে। প্রত্যক্ষের কঠোর বোধ ও বৌদ্ধিক ব্যাপারে অতৃপ্ত ও ক্লান্ত কবি রহস্যের ছায়ায় যেন বিশ্রাম খুঁজছেন। সৃষ্টির কোমল সুষমা দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ বা সার্থক করার মধ্যেই যেন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছেন। কারণ তা হল— 'নিখিল ছবি কী ছবি' অর্থাৎ নিখিলের ছবির ছবি। এরই মধ্যে তো প্রকৃত আনন্দ। মুক্তির ক্ষণটি মধুময় হলেও মুক্তির বন্ধন বেশ কঠোর।—

হৈ সহজ মুক্তি কা মধুক্ষণ, পর কঠিন মুক্তি কা বন্ধন।

পন্তকবির প্রতিভার সার্থকতা সংযত ব্যঞ্জনার সাহায্যে এখানে প্রতিফলিত। আরাধ্য দেবকে তিনি এত সহজ, সুলভ অথচ অনুভব-গভীর করে তুলেছেন যাতে মনে হয় কবি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে সংলাপে মগ্ন—

তুম মেরে মনকে মানব, মেরে গানোঁ কে গানে,
মেরে মানস কে স্পন্দন, প্রাণোঁ কে চির পহিচানে॥

—তুমি আমার মনের মানুষ, তুমি আমার গানের গান,
আমার হৃদ্‌স্পন্দন তুমি, পরিচিত চির আপন প্রাণ।

'যুগান্ত' কাব্যে কবি দেশের সেকালের জীবন-বীণার মিষ্টি-মধুর প্রতিধ্বনি শুনিয়েছেন। পরিবর্তনের প্রতি আকর্ষণ, শ্রমজীবীদের জীবনের চিত্র, তর্কাতীত শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস অভিব্যক্ত কাব্যখানিতে। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিও অর্পিত। বাইরের সৌন্দর্যের অভাব কবি অন্তরের সৌন্দর্য-সুষমা দিয়ে পূরণ করতে চান।—

জগজীবনমেঁ জো চিরমহান সৌন্দর্যপূর্ণ ঔ সত্য-প্রাণ।
মৈঁ উসকা প্রেমী বনূঁ নাথ, জিসমেঁ মানব হিত হো সমান॥

—সংসারে যা সুউন্নত সুন্দর ও সত্যপ্রাণ,
কর পূজারী প্রভু, যাতে নিহিত মানব-সুকল্যাণ।

বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যবোধও প্রকাশিত তাঁর কবিতায়। জগজীবনের জ্বালার অংশভাগী হতে বলেছেন কবি।—

বিশ্ববেদনা মেঁ তপ প্রতিপল, জগজীবন কী জ্বালা মেঁ জল॥

—বিশ্বপীড়ায় তপো প্রতিপল, জীবন-জ্বালায় দহো অনুপল॥

পরিবর্তনবাদী কবির মনোভাবের সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলী ও রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তনবাদিতার স্বরসাম্য লক্ষিত হয়। যা প্রাচীন, জীর্ণ ও জর্জর, তা নবজীবনের সৌন্দর্য-শোভার উপযুক্ত নয়, তা যুগধর্মের বাধা-বিঘ্ন স্বরূপ। নির্মমতার সঙ্গে কবি তার বিলুপ্তি চান—

দ্রুত ঝরো জগৎ কে জীর্ণ পত্র! হে স্রস্ত, ধ্বস্ত, হে শুষ্ক জীর্ণ!
হিম, তাপ, পীত, মধু, বাত, ভীত, তুম বীতরাগ, জড় পুরা চীন।

'যুগবাণী' কাব্যে সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন স্তরের জীর্ণ-যন্ত্রণাকাতর রূপ তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন এবং সমাজবাদ ও গান্ধীবাদ প্রভৃতির প্রভাব-জাত সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন কবি। গীতিময় ব্যক্তিত্ব সুমিত্রানন্দন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কবিঋণ স্বীকার করে 'কবিকৃতি'র সোদেশ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম

দিকে তাঁর কলাকৃতি উদ্দেশ্যমূলক, দ্বিতীয় স্তরে ভাবের কোমলতা ও মোহের চারুতার আকর্ষণ ; তৃতীয় স্তরে কবিতা যেন গৈরিক-বসনা সন্ন্যাসিনী, শান্ত ও উদাত্ত, বিবেচনার গভীরতা ও পবিত্রতা-মণ্ডিত। কিন্তু কবির ব্যক্তিসত্তা সর্বদাই সজাগ। সৌন্দর্যমহিমার চিত্রীকবি যেন নির্বিকার দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তবে তিনি দুঃখবাদী কবিরূপেও চিহ্নিত হতে চান, তাই বলতে পেরেছেন—

বিয়োগী হোগা পহিলা কবি, আহ সে উপজা হোগা গান,
উমড় কর আঁখোঁ সে চুপচাপ, বহী হোগী কবিতা অনজান ॥

—হয় তো বিরহী ছিল সেই আদি কবি, দুঃখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল গান।
নীরবে উপ্‌চে পড়ি নয়নের বারি, সঞ্চারিত করেছিল কবিতার প্রাণ ॥

মানববাদ ও সাম্যবাদের কবি পন্তজী 'বাহ্য নহীঁ, আন্তরিক সাম্য' চান। তিনি 'মানব, তুম সব সে সুন্দরতম' বলেই ক্ষান্ত হননি, ভালো মন্দ, কদাকার কুৎসিৎ পচা-গলা, আবর্জনা— সব নিয়ে 'ইস ধরতী কে রোম রোম মেঁ ভরী সহজ সুন্দরতা'—পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। নারী স্বাতন্ত্র্যের শ্লোগানও তিনি দিয়েছেন—

মুক্ত করো নারী কো মানব, চির বন্দিনী নারী কো,
যুগ যুগ কী বর্বর কারা সে— জননী সখী প্যারী কো ॥

—মুক্তি প্রদানো নারীকে মানব, চিরবন্দিনী মহিষী কে,
বর্বরতার যুগ-কারা থেকে— জননী, সখী ও প্রেয়সীকে।

পন্তজীর ভাষা মধুর। সাহিত্য ও সংগীতের সংযোগ সাধিত হয়েছে তাঁর রচনায়। 'ব্রজভাষার মতো খড়ীবোলীতে মধুরতা ও কোমলতা আনা সম্ভব নয়',— এই অভিযোগ সুমিত্রানন্দন অমূলক প্রমাণ করেছেন। গীতিধর্মী গদ্যেও তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর রচনাতে মাধুরী ও সুষমার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষিত হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রে'র ভাব-শিষ্য বলে মনে করতেন।[১৩]

পন্তকবির ছায়াবাদী যুগের কাব্যকৃতি হিসাবে—'উচ্ছ্বাস' (১৯২০), 'গ্রন্থি' (১৯২০), 'বীণা' (১৯২৭), 'পল্লব' (১৯২৭), 'গুঞ্জন' (১৯৩২)

এবং পরবর্তীকালে— 'যুগান্ত' (১৯৩৭), 'যুগবাণী' (১৯৩৯), 'গ্রাম্যা' (১৯৪০), 'পল্লবিনী' (১৯৪০), 'স্বর্ণধূলি' (১৯৪৭), 'স্বর্ণকিরণ' (১৯৪৭), 'মধুজ্বাল' (১৯৪৮) 'শিল্পী' (১৯৫২), 'অতিমা' (১৯৫৫), 'সৌবর্ণ' (১৯৫৭), 'বাণী' (১৯৫৮). 'চিদম্বরা' (১৯৫৮), 'রশ্মিবন্ধ' (১৯৫৯), 'কলা ঔর বূঢ়াচাঁদ' (১৯৫৯), 'অভিষেকতা' (১৯৬০), 'হরী বাঁসুরী সুনহরী টের' (১৯৬৩), 'লোকায়তন', 'কিরণবীণা' (১৯৬৭), 'পৌ ফটনে সে পহলে' (১৯৬৭) প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। 'চিদম্বরা' কাব্যের জন্য পন্তজী জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

মহাদেবী বর্মা (১৯০৭-১৯৮৭)—সসঙ্কোচ সংবেদনশীল কবি মহাদেবী বর্মার অনুভূতি তাঁর গীতিকাব্যে অপরূপ সংগীত মাধুরী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি যথার্থই রহস্যবাদী কবি। তাঁর কবিতায় প্রিয়তম 'চিরন্তন' ও 'অসীম' রূপে অত্যন্ত কোমল, মোহন ও উৎসুক প্রণয়ীর মতো চিত্রিত। সমগ্র প্রকৃতিই প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় সতত সজাগ ও সাগ্রহ। আধুনিক যুগের 'মীরা' অজ্ঞাত প্রিয়তমের জন্য হৃদয়ে যে বেদনার শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন তার থেকেই তাঁর প্রেম উৎসারিত। বিরহ ও দুঃখই তাঁর পরম কাম্য। মিলন-সুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ ও অনাকাঙ্ক্ষিত।— 'মিলন কা মত নাম লে, মৈঁ বিরহ মেঁ চির হূঁ।' তাঁর হৃদয়-বেদনার সূক্ষ্ম-অনুভূতিময় প্রকাশ লোকোত্তরতায় পৌঁছেছে। তাঁর অন্তরের শূন্যতা অবলীলাক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে— সকলের হয়ে পড়েছে। মানুষ, মানুষের দুঃখ এমনকি তার লঘুতা পর্যন্ত সবই তাঁর বিচারে মহৎ। তিনি তাতেই গৌরব খুঁজে পান। 'বিন্দুতেই সিন্ধু' অর্থাৎ ক্ষুদ্রের মধ্যেই তিনি অসীমের দর্শন লাভ করেন। দুইয়েরই গৌরব সমান। সসীম ও অসীমের ভেদরেখা তিনি স্বীকার করেন না।—

বিশ্ব মেঁ ওয়হ কৌন সীমাহীন হৈ,
হো ন জিসকা খোজ সীমা মেঁ মিলা?
ক্যোঁ রহোগে ক্ষুদ্র প্রাণোঁ মেঁ নহীঁ
ক্যা তুম্হীঁ সর্বেশ এক মহান হো?

—সীমায় মেলেনি যার খোঁজ,
কে সে বিশ্বে সীমাহীন প্রাণ ?
রবেনা ক্ষুদ্র প্রাণে কেন গো ?
তুমিই একা সর্বেশ মহান ?

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও মহাদেবীর দর্শন-চিন্তাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। তবে তাঁর দুঃখবাদ বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদ থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে অমরত্ব জীবনের উদ্দেশ্যকে খর্ব করে, মৃত্যুতেই জীবনের চরম প্রকাশ—

অমরতা হৈ জীবন কা হ্রাস,
মৃত্যু জীবন কা চরম প্রকাশ।

প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, রশ্মিও আলোর সম্পর্কের মতোই অভিন্ন ; আবার মেঘও বিদ্যুতের মতো ভিন্ন—

মৈঁ তুমসে হূঁ এক, এক হৈ জৈসে রশ্মি প্রকাশ।
মৈঁ তুম সে হূঁ ভিন্ন, ভিন্ন জ্যোঁ ঘন সে তড়িত বিলাস ॥

দুঃখ লাভেও কবিচিত্ত ধন্য। কারণ দুঃখ যে প্রিয়তমের দান। দুঃখের উপাসিকা কবি নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ ও ক্ষয় করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান— 'প্রাণোঁ কা দীপ জলা কর, করতী রহতী দীওয়ালী'। তাঁর 'নীরজা' ও 'সান্ধ্য-গীত' গ্রন্থদ্বয়ে কবিতা এবং সংগীতের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তাতে তীব্র বেদনার প্রকাশও লক্ষণীয়—

দেব অব বরদান কৈসা !···
ইন্দ্র ধনু সে নিত সজী-সী,
বিদ্যু-হীরক সে জড়ী-সী
মৈঁ ভরী বদলী রহূঁ—
চিরমুক্তি কা সম্মান কৈসা ?
যুগ যুগান্তর কী পথিক মৈঁ ছূ কভী লূঁ ছাঁহ তেরী ;
লে ফিরূঁ সুধি-দীপ-সী ফির রাহ মৈঁ অপনী অঁধেরী ;

লৌটতা লঘু, পল ন দেখা,
নিত নয়ে ক্ষণ-রূপরেখা,
চির বটোহী মৈঁ, মুঝে
চির-পঙ্গুতা কা দান কৈসা!

—প্রভু! এ কেমন বরদান!
নিত্য রামধনু শাড়ির বাহার
চপলা-হীরক জড়ি-পাড় যার,
আমি যে 'ভরা বাদর'—
এই চির মুক্তির মান?
যুগ যুগান্তের পথিক আমি, ছুঁতে পাব কভু রথ তোমার,
তাই জ্ঞান-দীপ নিয়ে ঘুরে ফিরি যে, আঁধারে বিলীন পথ আমার।
লঘু-পল পুনঃ দিল না দেখা,
নিত্য নব ক্ষণে রূপ ও রেখা,
চির পথিক আমি, আমায়—
এ-কি চির পঙ্গুতা দান?

মাঝে মাঝে মহাদেবী বিরোধার্থক বাক্যও ব্যবহার করেছেন—

'তরী কো লে জাও মঁঝধার, ডূব করহী জাওগে পার।'

—তরী নিয়ে যাও মাঝ নীরে, ডুবে গিয়েই যাবে তীরে।

মহাদেবীর তৎসম শব্দ-প্রধান ভাষা বেশ সহজ ও মধুর। ভাবের উপযুক্ত বাহক। ছায়াবাদের সৌকুমার্য পুরোপুরি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কোমলতা-জ্ঞাপক ভাষাও তারই অনুগামী। বিরহ ও দুঃখের অনুভূতি এমন সুকোমল ও মার্জিত যে, তা সহজেই পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়। কবি বিরহের আরাধনায় বিরহময় হয়ে বিরহেই সুখ-সিদ্ধি লাভ করেন— 'হো গয়ী আরাধ্যময় মৈঁ বিরহকী আরাধনা সে।' জীবন ও জগতে আবদ্ধ থাকাই শ্রেয়— মুক্তি তিনি চান না—

তম নে বর্তী কো জানা হৈ,
বর্তী নে য়হ স্নেহ, স্নেহ নে রজ কা অঞ্চল পহচানা হৈ,
চির বন্ধন মেঁ বাঁধ মুঝে ঘুলনে কা বর দে জানা।

—আঁধার চিনেছে সলতে,
সলতে জানে স্নেহ, স্নেহ চিনেছে রজের আঁচল খানি,
চিরবন্ধনে বেঁধে আমায়, দিও সাধনার বরদান।

তাঁর 'দীপশিখা' কাব্যের শিখা— করুণ মধুর তাপ এবং স্নিগ্ধ কোমল আলো দান করে কাব্যরসপিপাসু সাত্ত্বিক জন-মানসকে।

মহাদেবী বর্মার কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি যেমন তীব্র, তেমনই মর্মগ্রাহী। পাঠকচিত্তে তা সহজেই সঞ্চারিত হয়। হারানো-প্রাপ্তির প্রত্যাশাবোধের আনন্দে পরিবেশটি স্নিগ্ধমুখর হয়ে ওঠে। তিনি একজন চিত্রশিল্পীও। তাঁর রচনায় কাব্য-সংগীত ও চিত্রের সমন্বয় লক্ষণীয়। তাঁর রচিত কাব্য-সংগীতগুলির মধ্যে 'নীহার' (১৯৩০), 'রশ্মি' (১৯৩২), 'নীরজা' (১৯৩৫), 'সান্ধ্যসংগীত' (১৯৩৬), 'য়ামা' (১৯৪০), 'দীপশিখা' (১৯৪২), 'ক্ষণদা' (১৯৫৬) ও 'সন্ধিনী' (১৯৬৪) প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'সপ্তপর্ণা'—সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ হলেও একটি উল্লেখযোগ্য কৃতি।

মহাদেবী একজন চিত্রশিল্পীও— সে কথা আমরা জানি। তাই তাঁর কবিতায় অনায়াস চিত্রধর্মিতা এবং বর্ণবিন্যাসের উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চিত্রকলার অনুভূতি, ধর্মীয় চেতনা ও চাক্ষুস বিম্ববিধানে রঙের শিল্প-সম্মত সমন্বিত প্রয়োগে বিচিত্র হয়ে উঠেছে কবিতা। তাঁর রচনা থেকে একটি সন্ধ্যা ও একটি প্রভাতের চিত্র দেখা যাক্—

(সন্ধ্যা)

গুলালোঁ সে রবি কা পথ লীপ
জলা পশ্চিম মেঁ পহলা দীপ

বিহঁসতী সন্ধ্যা ভরী সুহাগ
দৃগোঁ সে ঝরতা স্বপ্নপরাগ।

—আবিরে লেপি রবির পথ
পশ্চিমে জ্বেলে প্রথম দীপ—
সোহাগ ভরে সন্ধ্যা হাঁসে
রেণু-ঝরা চোখে স্বপ্ন-টীপ।

(প্রভাত)

স্মিত লে প্রভাত আতা নিত
দীপক দে সন্ধ্যা জাতী
দিন ঢলতা সোনা বরসা
নিশি মোতী দে মুস্কাতী।

—স্মিত হাসি নিয়ে প্রভাত আসে
দীপ শিখা হাতে সন্ধ্যা,
বেলা গড়ালে সোনালি বৃষ্টি,
মুক্তোয় নিশি গন্ধা।

লক্ষ করলেই বোঝা যায় এখানে আবির, সোহাগ, সোনা, মোতি প্রভৃতির বিন্যাসে রঙের সূক্ষ্ম বোধময়তার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে শুভ্র-শ্বেত রঙের প্রতি মহাদেবীর আকর্ষণ ছিল সমধিক। তাই পূজার প্রস্তুতির মুহূর্তে তাঁর একান্ত বাসনা ধ্বনিত হয়—

পাটল কে সুরভিত রঙ্গো সে রঁগ দে
হিমসা উজ্জ্বল দুকূল,
গুঁথ দে রসনা মেঁ অলিগুঞ্জন সে
পূরিত ঝরতে বকুল ফূল।

—পাটল সুবাস রঙে রাঙিয়ে দে
হিম শুভ্র উজ্জ্বল দুকূল।
রসনায় গেঁথে দে অলি রবে ভরা
ঝরছে স্নিগ্ধ বকুল ফুল।

বলতে কি মহাদেবী বর্মার সৌন্দর্যানুভূতি অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম, তাই তাঁর কবিতায় সাত্ত্বিক রোমান্সের আস্বাদন মেলে।

ছায়াবাদী কবিদের কল্যাণে খড়ীবোলী বা হিন্দী ভাষা সংগীতের স্পর্শে এসে মধুর ও কোমল হয়েছে। অবশেষে সংগীতের বাহন হয়ে উঠেছে। করুণ, কোমল ও পরুষভাবের গীত রচনা শুরু হল খড়ী-হিন্দীতে। আধুনিক কালে এই প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০৩ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমাকে হিন্দী সাহিত্যে সাধারণ-ভাবে 'ছায়াবাদী যুগ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই কাল পরিধিতে আরও কয়েকজন কবি হিন্দী কাব্যশাখাকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ছায়াবাদী কবিতা বেশ বলিষ্ঠ ও পরিণত হয়ে উঠলেও ১৯৩০-এর পর ছায়াবাদী কবিতার তেমন উৎকর্ষ আর চোখে পড়ে না। নানা কারণে তা সম্ভবও ছিল না। ছায়াবাদী যুগের আরও কয়েকজন কবি।—

ভগবতীচরণ বর্মা (১৯০৩-১৯৮১) ভাবুকতা উল্লাস ও আস্থার কবি ভগবতীচরণ বর্মা কতকটা বেপরোয়াভাবে প্রেম এবং যৌবনতরঙ্গের গান গেয়েছেন। তত্ত্বহীন সুন্দরের উপাসক কবি অসংকুচিত চিত্তে আত্মকেন্দ্রিক ভাবুকতায় পাঠকবর্গকে সহজেই আকৃষ্ট করেছেন। 'মধুকণ' (১৯৩৮) 'প্রেম-সংগীত' ও 'মানব'প্রভৃতি কবিতা সংগ্রহে, দুঃখবাদ, প্রেমানুভূতি এবং প্রগতিবাদের প্রতি কবিমনের স্বতন্ত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। দুঃখবাদের মধ্যেই তিনি সুখ ও শান্তির আভাস লক্ষ করেছেন—

> ইস দুখ মেঁ পাওগে সুখ কী ধুঁধলী এক নিশানী।
> আহোঁ কে জলতে শোলোঁ মেঁ তুম্‌হে মিলেগা পানী॥
>
> —দুঃখের মাঝে পাবে সুখের ঝাপ্‌সা ক্ষীণ রেখা,
> মনের বোবা জ্বালায় দেবে শান্তিবারি দেখা।

নিরাশা ও অতৃপ্তি থাকলেও জীবনের পথে কবি থামতে ও ঠকতে রাজি নন—

লেকর অতৃপ্ত তৃষ্ণা কো, আয়া হূঁ মৈঁ দীওয়ানা,
সীখা হী নহী য়হাঁ হৈ, থক জানা য়া ছক জানা ॥

কবির প্রেমে পার্থিবতার মাত্রা বেশি। প্রেমের মাধুর্যে তিনি সমস্ত কিছু ভুলে যেতে চান। সে প্রেম শাশ্বত না ক্ষণিক সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কঠোর বাস্তবতা তাঁকে 'রো রো কর হঁসনা' শিখিয়েছে— প্রগতিবাদের ভাবধারায় তিনি 'ভৈঁসাগাড়ী' (মষের গাড়ি) কবিতায় গাঁয়ের যে করুণ চিত্র এঁকেছেন— তা সত্যই মর্মস্পর্শী।—

চরমর চরমর চূঁ চরর মরর জা রহী চলী ভৈঁসাগাড়ী।
উস ওর ক্ষিতিজ সে কুছ আগে কুছ পাঁচ কোস কী দূরী পর।
ভূ কী ছাতী পর ফোড়োঁ-সে, হৈঁ উঠে হুয়ে কুছ কচ্চে ঘর।
নর পশু বন কর পিস রহে জহাঁ, নারিয়াঁ জন রহী হৈঁ গুলাম।
পৈদা হোনা ফির মর জানা, বস ইন লোগোঁ কা এক কাম ॥

—'খচর-মচর' স্বরে সাঁতরে চলেছে ওই মষের গাড়ি,
দিগন্তের ওই দিকে ওই ক্রোস পাঁচেকের পাড়ি—
মাটির বুকে ফোড়ার মতো দাঁড়িয়ে কুঁড়ে ঘর ক'টি।
খাটছে মানুষ পশুর মতো, নারী যেখানে জনে গোলাম,
জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ— এতেই মেটে সাধ তামাম।

ভগবতীচরণ বর্মার কাব্য-ভাষায় মাধুর্য অপেক্ষা ওজনের মাত্রা বেশি। অন্য ভাষার বাক্‌ভঙ্গি ও বিশিষ্টার্থক শব্দ সমষ্টির অনুবাদও তিনি প্রয়োজন-মতো ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের দিকেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

রামকুমার বর্মা (১৯০৫-)—নাট্যকার ও আলোচক রামকুমার বর্মার খ্যাতি কবিরূপেই সমধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যকৃতি হল— 'চিত্তৌড় কী চিতা', 'অভিশাপ', 'নির্ণয়', 'অঞ্জলি' (১৯৩০), 'রূপরাশি' (১৯৩২), 'চিত্ররেখা' (১৯৩৫) এবং 'চন্দ্রকিরণ' (১৯৩৬) প্রভৃতি। রূপ-রাশি কল্পনাপ্রধান ও চিত্ররেখা অনুভূতি প্রধান কাব্যগ্রন্থ। অন্যগুলিতে অনুভূতি ও করুণার প্রাধান্য রয়েছে। দুঃখবাদী কবিদের অন্যতম

বর্মাজী ক্ষণিক সুখের মধ্যেও দুঃখের, প্রভাতের মধ্যেও সন্ধ্যার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন। নিরাশা-ব্যঞ্জক কবিতাতেও তিনি প্রিয়তমের গোপন অভিসার দেখতে পান। প্রারম্ভিক রচনা সাধারণ স্তরের হলেও ক্রমে ক্রমে তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটেছে। 'অঞ্জলি' কাব্যের ভাবুকতা 'রূপরাশি'তে কল্পনায় ও 'চিত্ররেখা'তে বেদনা-বিবৃতি, রহস্য-ময়তা এবং উৎকট রূপ-লিপ্সায় রূপান্তরিত। 'চিত্ররেখা' বর্মাজীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি। তাতে করুণাস্নিগ্ধ সুষমার আকর্ষণ বিধৃত। চিরন্তন নারী ও পুরুষের আধ্যাত্মিক বিরহও তাতে আছে। কবির ভাষায় তা 'মহামিলন'—

দেব! মৈঁ অবভী হূঁ অজ্ঞাত।
এক স্বপ্ন বন গঈ তুম্হারে প্রেম মিলন কী রাত।

—প্রভু! আজিও অজানা আমি!
তোমার প্রেমের মিলনরাতি, স্বপনই রইল স্বামী।

'হিমহাস' (১৯৪২) গদ্যকাব্যে কবি কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

মোহনলাল মহতো 'বিয়োগী' (১৮৯৯-)—রহস্যবাদী হিন্দী কবিদের একজন মোহনলাল মহতো 'সোহম্'-এ বিশ্বাসী হলেও দ্বৈতবাদীদের মতো ভগবানকে 'প্রিয়তম' রূপেই গ্রহণ করেন। প্রকৃত ভক্তের মতো প্রিয়তমের নিষ্ঠুরতা এবং নির্দয়তা তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। কবি দুঃখ-কষ্টময় জর্জর জীবনের বিষামৃত পানে ধন্য মনে করেন নিজেকে।—

তেরে অধরামৃত সা প্যালা য়হ হোঠোঁ সে লগা রহে।
পীনে কা অনুরাগ 'বিয়োগী' প্রবল রূপ সে জগা রহে।
ইতনা ঢলে কি সারে জগ কো— মদিরা কা প্যালা দেখূঁ।
অপনে মেঁ মৈঁ তুম্হেঁ ঔর তুম মেঁ, মৈঁ অপনে কো দেখূঁ।

—তোমার অধরামৃতের পেয়ালা লেগে থাক মোর ঠোঁটে,
পানের প্রবল অনুরাগ যেন শিথিল না হয় মোটে।

মৌতাতে যেন সারা দুনিয়াটা মদের পেয়ালা দেখি,
আমাতে তোমায়, তোমাতে আমায়— সহজেই যেন পেখি।

বিয়োগীজীর দুইটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'নির্মাল্য' (১৯২৫) ও 'একতারা' (১৯২৭)।

জনার্দনপ্রসাদ ঝা 'দ্বিজ' (১৯০৪-১৯৬৪)—ভাবুক কবি 'দ্বিজ' দীন ও করুণভাবে প্রার্থনা-সংগীত গান করতেন। প্রিয়তমের বিরহে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে ইচ্ছুক কবি 'অন্তর্জ্বালাকে' অমর 'শান্তি কী জননী' রূপে সম্বোধন করে তাঁকে দগ্ধ করে ভস্মে রূপান্তরিত করতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। ফলে প্রিয়তম এসে তাঁকে নয়, যেন তাঁর দেহের ভস্মাবশেষই দেখতে পান।—

হাঁ খুব জলা দে,
রহ ন জায় অস্তিত্ব ঔর জব ওয়ে আওয়েঁ···
কেবল বিভূতি পাওয়েঁ।

এই অংশটির সঙ্গে বাঙালি কবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র তুলনীয় কয়েকটি পংক্তি—

হায় রে তখন মনে পড়িবে তোমার!
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি···
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায়।

দ্বিজ কবির উল্লেখযোগ্য দুইটি কাব্যগ্রন্থ 'অনুভূতি' (১৯৩৩) এবং 'অন্তর্ধ্বনি'।

রামধারী সিংহ 'দিনকর' (১৯০৮-১৯৭৪)—বিহারের স্বনামধন্য কবি 'দিনকর'জী হিন্দী সাহিত্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও কবিমানসিকতার জন্য খ্যাত। একক, অদ্বিতীয়, জীবন ও যৌবনের আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের মোহন সংগীতের সুষমা তাঁকে আকৃষ্ট-মুগ্ধ ও উৎসাহী করলেও অভিভূত করতে পারে নি। সুউচ্চ কল্পনা ও প্রতিকূলতাকে অনুকূল করার অদম্য

উদ্যম এবং সামাজিক চেতনার তীব্রতাই কবি দিনকরের প্রধান পরিচয়। তবে তাঁর ভাবুকতা ও উল্লাসের অন্তরালে সামাজিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষারই প্রাধান্য। সামাজিক বিষমতায় আহত কবির মন কল্পনাকে যেন বার বার বলছে— আর 'হেথা নয়, অন্য কোথা··· অন্য কোনো খানে' চলো। কিন্তু স্ব-দেশ-স্ব-ভুঁই ছাড়া কি সহজ কথা। সৌন্দর্য পিপাসু কবির মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরের রূপ তো আবরণ মাত্র, হৃদয়ের ভাষা যে অন্য। সেখানে সামাজিক চেতনাই সবল ও সবেগ। তাই বাইরের প্রেম-সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং অন্তরের বৈষম্য ও ক্লিষ্টতায় পীড়িত কবির চিত্তভাব অদ্ভুত প্রবাহ লাভ করেছে। যা অন্যত্র দুর্লভ। তাই তিনি ছায়াবাদী ও প্রগতিবাদী কবিগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী সংযোগ সেতু-স্বরূপ। তবে তিনি ছায়াবাদী কম প্রগতিবাদী বেশি। তাঁর সমাজবাদ রাষ্ট্রবাদেরই নামান্তর। আবার মানব আত্মার মুক্তিতেই উল্লাস ও আনন্দের যথার্থ প্রাপ্তি সম্ভব— বলে তাঁর বিশ্বাস। তাঁর কাব্যস্রোত মানবমঙ্গলের উজ্জ্বল দীপশিখায় সুস্নিগ্ধ-মধুর ও সার্থক। তাঁর প্রত্যাশা— অনুর্বর হৃদয়ভূমি স্নিগ্ধ-মধুর কাব্যবারি সিঞ্চনে উর্বর হয়ে উঠবে। এখানেই রামধারী সিংহ 'দিনকরের' বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য।

'কস্মৈ দেবায়' কবিতায় তিনি ভারতীয় সভ্যতার নিদারুণ মর্ম-স্পর্শী চিত্র এঁকেছেন। তাতে জমিদার ও ধনিক শ্রেণী একদিকে আর কৃষক ও গরীব শ্রেণী অন্যদিকে— 'ধনের বদলে জীবন ও জীবনের বদলে ধন'— এই জুয়াখেলার চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি বৈষম্য ও অমানবিকতার নগ্নতা তুলে ধরেছেন।—

> সির ধুন ধুন সভ্যতা সুন্দরী রোতী হৈ বেবস নিজ রথমেঁ—
> হায়! দনুজ কিস ওর মুঝে লে খীচঁ রহে শোণিত কে পথ মেঁ।···
> বিদ্যুৎ কী ইস চকাচৌধ মেঁ দেখ, দীপ কী লৌ রোতী হৈ,
> অরী; হৃদয় কো থাম, মহলকে লিয়ে ঝোঁপড়ী বলি হোতী হৈ॥
> দেখ— কলেজা ফাড় কৃষক দে রহে হৃদয় শোণিত কী ধারেঁ।
> বনতী হী উনপর জাতী হৈঁ বৈভব কী উঁচী দীওয়ারেঁ॥

—শিরে কর হানি, সভ্যতা রানী কাঁদিছে বিবশ আপন রথে,
'দমুজেরা হায়, টেনে নিয়ে যায়—আমায় কোথায় শোণিত-পথে!'
বিদ্যুতের এই চোখ ধাঁধানিতে প্রদীপের আলো কেঁদে ভাসায়,—
সংযত হও, মহল বানাতে কুঁড়েঘরগুলি ভাঙছে হায়!
কৃষকেরা দেখ— বুকচিরে ঢালে হৃদয়-শোষণ-শোণিত ধারা,
তারই উপরে ক্রমে খাড়া হয় নিলাজ ধনের উচ্চ-কারা।

দেশ ও সমাজের জন্য কবি আপাত রম্য কল্পনার স্বর্গ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নন। তিনি আশাবাদী, তাই জনগণের শঙ্খে ধ্বনি তুলে ঘোষণা করেন— 'জাগরুক কী জয় নিশ্চিত হৈ, হার চুকে সোনেওয়ালে'। অর্থাৎ— জাগ্রতের জয় সুনিশ্চিত। নিদ্রিতরা হেরে গেছে। 'রসবন্তী' (১৯৪০) কাব্যে জীবনের কোমলস্নিগ্ধ স্পর্শে উদ্‌ভাসিত নারীর বিভিন্ন রূপ অপূর্ব ও সুন্দরভাবে অঙ্কিত। তবে বিরোধের অন্তর্জ্বালার অস্তিত্ব সদা-সর্বদা অনুভূত হয়। 'কুরুক্ষেত্র' (১৯৪৬) কাব্যে চিরন্তন সমস্যার যুগোচিত সমাধান বা যুদ্ধের মীমাংসার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সম্রাট অশোকের মতো যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য মর্মাহত, আত্মশক্তির নির্ভরতায় শ্রদ্ধাশীল। তাই যথার্থ শান্তি ও সুখের জন্য প্রত্যাশা ও জীবনচর্যায় সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন—

ন্যায়োচিত সুখ সুলভ নহীঁ জবতক মানব মানব কো,
চৈন কহাঁ ধরতী পর তবতক, শান্তি কহাঁ ইস ভব কো।

—ন্যায়োচিত সুখ না হয় সুলভ যতদিন জনে জনে,
স্বস্তি কোথায় এই ধরাধামে শান্তি কোথায় মনে!

বিশ্বমানব-মৈত্রীও কবির অনুভূতির রাজ্য বিশ্বকে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দিতে চায়। পৃথিবীই হয়ে উঠবে স্বর্গতুল্য। তাই কবি চাঁদকে সম্বোধন করে বলেছেন— দেবেন্দ্রকে সংবাদ দাও, মানুষ এবার স্বর্গের দিকে পা বাড়িয়েছে।

স্বর্গকে সম্রাট কো জাকর খবর কর দে,
রোজহী আকাশ চঢ়তে জা রহে হৈঁ ওয়ে,

রোকিয়ে জৈসে বনে ইন স্বপ্নওয়ালোঁ কো,
স্বর্গ কী হী ওর বঢ়তে আ রহে হৈঁ ওয়ে।

মানুষের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আস্থা ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশা পোষণ করেন কবি, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি নিষ্কর্ম তপস্যার চেয়ে সহিংস বীরত্বের পক্ষপাতী—

ছীনতা হো স্বত্ব কোঈ, ঔর তূ
ত্যাগ-তপ সে কাম লে য়হ পাপ হৈ,
পুণ্য হৈ বিচ্ছিন্ন কর দেনা উসে,—
বঢ় রহা তেরী তরফ জো হাথ হো॥

—স্বত্বখানি নিচ্ছে কেড়ে যখন কেউ,
ত্যাগ ও তপে তুষ্ট থাকা পাপ।
পুণ্য হবে ছিন্ন করে দিলে তখন—
হাতখানি, যে মানে না তার মাপ।

গান্ধীবাদী কবির অন্তরাত্মার জ্যোতি এই সাম্য ও সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে উদ্দেশ্যের নির্মলতা ও অন্তরের শুভ্রতাকে আশ্রয় করে। বলেছেন—

'আত্মা কী য়হ জ্যোতি, ফূটতী সদা-বিমল অন্তর সে'।

কাব্যের এইসব বৈশিষ্ট্য ও অম্লান আকর্ষণের সক্রিয়তা রামধারী সিংহ 'দিনকরে'র কাব্য ভাবনার বিশিষ্টতা নির্দেশ করছে আর অঙ্গুলি সংকেত করছে তাঁর জনপ্রিয়তার দিকে।

প্রেম ও কামের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রস্ফুটিত, চিন্তা-প্রধান, বিশ্লেষণ-মূলক কাব্য 'উর্বশী'তে পুরুরবা ও উর্বশী সনাতন নর ও নারীর প্রতীক রূপে উপস্থাপিত। কাব্যটির ঐতিহাসিক মহত্ত্ব রয়েছে হিন্দী কাব্য সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত, 'উর্বশী'-কবিতার অনুপ্রেরণা রয়েছে— 'দিনকরে'র এই উর্বশী কাব্যটির মূলে। তাঁর দুইটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ সংগ্রহ— 'সীপী ঔর শংখ' এবং 'আত্মা কী আঁখেঁ'। দিনকরের বিশিষ্ট কাব্য-প্রাণতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত তাঁর বিচিত্র কাব্যসম্ভারে।

কবি দিনকরের কাব্যকৃতি—'রেণুকা' (১৯৩৫), 'হুঙ্কার' (১৯৩৮), 'দ্বন্দ্বগীত' (১৯৩৯), 'রসবন্তী' (১৯৪০), 'কুরুক্ষেত্র' (১৯৪৬), 'ইতিহাসকে আঁসূ' (১৯৫১), 'রশ্মি রথী' (১৯৫২), 'নীল কুসুম' (১৯৫৪), 'চক্রবাল' (১৯৫৬), 'উর্বশী' (১৯৬০), 'পরশু রাম কী প্রতীক্ষা' (১৯৬৩), 'কোয়লা ও কবিত্ব', 'মৃত্তিতিলিকা' (১৯৬৪) প্রভৃতি।

হরিবংশ রায় 'বচ্চন' (১৯০৭-)—মাটির পৃথিবীতে মাটির শরীর ও মনকে সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত করার জন্য প্রাণ খুলে গান গেয়েছেন কবি বচ্চন। তাঁর কবিতার সরলতা সহজেই সহৃদয় পাঠকের মন কেড়ে নেয়। সরল ভাষা ও সহজ ভঙ্গিমায় প্রেম-প্রধান ভাবকে কবি সংগীতময় করে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। 'নিশা-নিমন্ত্রণ' (১৯৩৮) কাব্যে তাঁর অনুভূতির তীব্রতা ও ভাবের গভীরতা অপূর্ব ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় ক্ষণিক-মৌতাতের আমেজ অনেকের উপহাসের বস্তু হয়ে ওঠে আর তা 'হালাবাদ' নামে পরিচিত হয়। সমসাময়িক মিথ্যা-আধ্যাত্মিকতার তীব্র প্রতিবাদের একটি প্রতীক হল এই 'হালাবাদ'। এটাকে সহজে 'চার্বাক-বাদ' বা 'পাশ্চাত্যইজম্' বলা চলে।[১৪]

এই সময় রহস্যবাদী ও ছায়াবাদী বিশিষ্টতার সমান্তরাল অপর একটি ভাবধারা প্রবাহিত হয়, যা স্পষ্টত উর্দু-পারসি-কাব্যপ্রভাবে পুষ্ট। এই ভাবধারা 'হালা-প্যালা, মধুশালা-মধুবালা-মদিরা-মদিরালয়' প্রভৃতি প্রতীকে সমৃদ্ধ। হালাবাদের প্রবর্তক কবি বচ্চনের জীবনদর্শন বহু পূর্বেই নতুন খাতে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তার আবার বদল ঘটেছে। এখন তাঁর কাছে জীবন আর কর্ম নয়, তা 'চিন্তন'; আর কাব্য নয়, তা 'দর্শন' হয়ে উঠেছে।—

জীবন কর্ম নহীঁ হৈ অব চিন্তন হৈ,
কাব্য নহীঁ হৈ অব দর্শন হৈ॥

—জীবন কর্ম নয়, পরিপূর্ণ চিন্তন,
আর তো কাব্য নয়, জীবনের দর্শন।

কবি পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে জীবনকে এবং জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলেন। তাই তাঁর কাব্যধারায় বেশ কয়েকটি বাঁক চোখে পড়ে।

বচ্চনজীর কাব্যগ্রন্থ : 'নিশা নিমন্ত্রণ' (১৯৩৮), 'একান্ত সংগীত' (১৯৩৯), 'আকুল-অন্তর' (১৯৪৩), 'সতরঙ্গিনী' (১৯৪৫), 'বঙ্গাল কা অকাল' (১৯৪৬), 'সূত কী মালা' (১৯৪৮), 'মিলনয়ামিনী' (১৯৫০), 'প্রণয় পত্রিকা' (১৯৫৫), 'ধার কে ইধর-উধর' (১৯৫৭), 'আরতী ঔর অঙ্গারে' (১৯৫৮), 'বুদ্ধ ঔর নাচঘর' (১৯৫৮), 'জনগীতা' (অনুবাদ ১৯৫৮), 'ত্রিভঙ্গিমা' (১৯৬১), 'চার খেমে চৌঁসঠ খূঁটে' (১৯৬২), 'দো চট্টানেঁ' (১৯৬৫), 'মরকত দ্বীপ কা স্বর (১৯৬৫), 'নাগর গীতা' (১৯৬৬), 'বহুত দিন বীতে' (১৯৬৭) এবং 'কটতী প্রতিমাওঁ কী আওয়াজ' (১৯৬৮) প্রভৃতি।

'বঙ্গাল কা অকাল' একটি দীর্ঘ কবিতা। তাতে ১৯৪৩ সালের বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা এবং তার ফলে কবিমনে জাত প্রতিক্রিয়ার বলিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন কবি। সমিল হলেও কবিতাটি মাঝে মাঝে অবলীলাক্রমে অমিল হয়ে পড়েছে। অবশ্য তাতে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হয় নি।

গুরুভক্ত সিংহ 'ভক্ত' (১৮৭৩-)—'ভক্ত' কবি সহজ-সরল-সরস খড়ীবোলীতে কবিতা রচনা করেন। তাতে ব্রজভাষার মাধুর্য এনে তিনি সে যুগের বিচারে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। প্রকৃতি বর্ণনাতেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'সরস সুমন' (১৯২৫), 'কুসুম কুঞ্জ' (১৯২৭) 'বিক্রমাদিত্য' ও 'নূরজাহান' (১৯৩৫) তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য। নূরজাহান উৎকৃষ্ট রচনা। কাহিনী পরিচিত ও ঘটনাবহুল হওয়া সত্ত্বেও পাত্র-চয়ন, পুনঃ-নির্মাণ ও ক্রম-বিকাশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কবির সরলতা ও ভাবুকতার প্রকাশ ঘটেছে। ভাবুকতার অভিব্যক্তি আবার দুই

প্রকারের— নাটকীয়তায় ও প্রকৃতি বর্ণনায়। নাটকীয়তার সমাবেশ সুন্দর ও রসময় হয়েছে[১০]—

বঢ়তী হুঈ তড়প কর বোলী, 'ঠহর !
কৌন ? ক্যোঁ আয়া ?
কর দূঁগী তলবার পার মৈঁ পগ জো এক বঢ়ায়া।'

—সম্মুখে এসে গর্জে উঠলো— 'কে তুমি ? থামো। কি ঠারিয়েছো ?
হবে তলোয়ার এ ফোঁড়-ও ফোঁড়, এক পা-ও যদি বাড়িয়েছো।'

প্রকৃতি বর্ণনাতেও ভাবুকতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। ভাষা প্রাঞ্জল, স্থানীয় কথ্য ভাষার শব্দ ও উর্দু শব্দের ব্যবহার সাবলীল। প্রবাদ ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার, গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, শহুরে শিষ্টাচারের প্রতি বিরক্তি, এমন কি গান্ধীজীর অহিংসা নীতির তুলনায় দুষ্টের দমনের জন্য বলপ্রয়োগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় তাঁর কাব্যে।

শ্রীনরেন্দ্র শর্মা (১৯১২-)—শৃঙ্গার ও প্রগতিবাদ উভয় প্রকারের কবিতা রচয়িতা নরেন্দ্রজীর 'শূল-ফূল' ও 'কর্ণফূল' (১৯৩৯ সালে একত্রে 'প্রভাত ফেরী' নামে প্রকাশিত), 'প্রবাসী কে গীত' (১৯৩৯), 'পলাশ বন' (১৯৪০), 'মিট্টী ঔর ফূল' (১৯৪২), 'কামিনী' (১৯৪২), 'অগ্নিশস্য' (১৯৫১) এবং 'কদলীবন' (১৯৫৩) প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা-সংকলন প্রকাশিত। শৃঙ্গার আশ্রিত কবিতায় কোথাও অত্যধিক নৈরাশ্য আবার কোথাও মধুর-কোমল স্মৃতির চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রগতিবাদী কবিরূপে তিনি সমাজবাদী জীবন দর্শনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তবে তাঁর এই সমর্থন বেশ সংযত ও সঙ্গতি-পূর্ণ। প্রকৃতির সৌম্যরূপ দেখে কবির মন আবেগে বলে ওঠে—

'মধুময় স্বরসে সিঞ্চিত মধুবন, সুরভিত নীম, নবদলদল পীপল'।

আবার প্রকৃতির উগ্ররূপ দর্শনেও তিনি আনন্দ পান। 'পলাশবন' কাব্যের প্রেম-পীড়ার সঙ্গে প্রকৃতির রূপ চিত্রণে তিনি হৃদয়ের জ্বালার রঙ ব্যবহার করেছেন— পলাশের 'লালিমা' ক্রান্তির প্রতীক—

লো ডাল-ডাল সে উঠী লপট, লো ডালডাল ফূলে পলাশ।
য়হ হৈ বসন্ত কী আগ, লগাদে আগ জিসে ছূলে পলাশ॥

—ডালে ডালে দেখ পলাশের শিখা লেলিহান চারিদিক,
বসন্ত-অনলে পোড়ে যে প্রণয়ী, ছুঁলেই পলাশ-পিক।

রামেশ্বরপ্রসাদ শুক্ল 'অঞ্চল' (১৯১৫-)—শৃঙ্গার রসের কবি 'অঞ্চলে'র মানবপ্রেম তাঁকে প্রবল প্রগতিবাদীও করে তুলেছে। তাঁর প্রগতিশীল ভাবনার ঝড়ের আবেগ পাঠকের মনকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দেয়। ছায়াবাদ-উত্তর পর্বের কবি হলেও সূক্ষ্ম কল্পনা এবং আত্ম-সংযমের বদলে স্থূল মাংসলতা এবং স্পষ্টবাদিতাই প্রকট তাঁর রচনায়। তবে তাতে অবিকৃত সৌজন্য সর্বদাই সুরক্ষিত। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর শৃঙ্গার বিষয়ক কবিতা যথার্থ মনোভাবের দ্যোতনা বহন করে অপূর্ব শিল্প হয়ে উঠেছে।—

কিসী কে রূপ কী আসক্তি জীবন সে নহীঁ জাতী।
নহীঁ জাতী কিসী কী য়াদ প্রাণোঁ সে নহীঁ জাতী॥
কভী জুড় যায় শারদ স্বপ্ন টূটা জো লড়কপন মেঁ।
কভী বিছুড়া হুআ সাথী কহীঁ মিল জায় জীবন মেঁ॥
নিরাশা সে ভরে দিল কী য়হী আশা নহীঁ জাতী॥

—কারো রূপের আসক্তি থাকে সমস্ত জীবন
কোনো কোনো স্মৃতি ভরে রাখে প্রাণ-মন।
শৈশব স্বপন খানি হয়তো পূরিবে,
হারানো সুহৃদ্বর হয় তো ফিরিবে—
নিরাশায় ঠাঁসা মনের এ আশা তো যায় না।

'অঞ্চল' জীর মতে— তৃষ্ণাই জীবনের সত্য— 'চির তৃষ্ণায় তৃষিত থাকাই মানবত্তার বাণী!'—

চির তৃষ্ণা মেঁ প্যাসে রহনা
মানবতা কা সন্দেশ য়হী॥

শোষিত-পীড়িত মানবতার যে চিত্র শুক্ল কবি এঁকেছেন তা যেমন করুণ তেমনি জ্বালাকর। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির দর্শনই বদলে গেছে। কৃষক জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত পরিণতির জন্য কবি ভগবানকেই দায়ী করেছেন—

উপর বহুত দুর রহতা হৈ শায়দ আত্মপ্রবঞ্চক এক।
জিসকে প্রাণোঁ মেঁ বিস্মৃতি হৈ উর মেঁ সুখশ্রীকা অতিরেক॥
জিসকা লে-লে নাম য়ুগোঁ সে মাংস লুটাতে তুম রোয়ে।
কিন্তু ন চেতা জো নিশি-নিশি ভর জব কি ক্ষুধাতুর তুম সোয়ে॥
আজ অস্ত হো জায় ওয়হী অভিশাপ অস্ত রৌরব পোষক।
অরে ওয়হী দুর্দান্ত মহা উন্মত্ত হড়্ডিয়োঁ কা শোষক॥

—অনেক উপরে থাকে বুঝি কোনো আত্মপ্রবঞ্চক,
প্রাণে যার বিস্মৃতি আর বুকে সুখশ্রী-অতিরেক।
যুগ যুগ ধরে যার নাম গেয়ে আত্মক্ষয়ে যে কাঁদলে,
তবু আমলই দিল না, কত রাত তুমি ক্ষুধার জ্বালায় সাধলে।
ধ্বংস হোক সে অভিশাপকারী রৌরব পোষকের,
দুর্দম মহা উন্মত সেই যে অস্থি শোষকের।

'অঞ্চল'জীর ভাষায় উর্দুর মিশ্রণ থাকলেও তা বেশ সবল ও প্রাঞ্জল। 'মধুলিকা' (১৯৩৮), 'অপরাজিতা' (১৯৩৯), 'কিরণবেলা', 'করীল', 'লালচুনর' (১৯৪৪), 'বর্ষাত কে বাদল' (১৯৫৪), 'বিরাম চিহ্ন' (১৯৫৭) এবং 'যাযাবরী' (১৯৬৪) প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

উদয়শংকর ভট্ট (১৮৯৮-১৯৬৬)—জীবনের বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে অভিব্যক্তি প্রদানে প্রয়াসী ভট্টকবি প্রাক্-ছায়াবাদ, ছায়াবাদ এবং প্রগতিবাদ— তিন যুগ ধরে কবিতা রচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর সাহিত্য-সাধনা দীর্ঘস্থায়ী। নাট্যকার এবং উপন্যাসকার রূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর রচনায় যুগপ্রবৃত্তি সমুচিত সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রারম্ভিক যুগে তাঁর কবিতায়

সমসাময়িক দেশ-সমাজ ও মানুষের জীবনের গভীর অব্যক্ত বিষাদ, কল্পনার আধিক্য ও ভাবুকতা দেখা দিলেও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রচেতনা এবং প্রগতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং 'উদ্বাস্তু' সমস্যা নিয়েও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনামূলক একটি গানের দুইটি পংক্তি—

গরজে বাদল সে আজাদী, বিজলী মেঁ স্বর আজাদী কা।
হম আজাদী কে দীওয়ানে পরতন্ত্র রহেঁগে কভী নহীঁ ॥

—মেঘ গর্জনে স্বরাজের সুর, বিদ্যুতে সুর স্বাধীনতার,
মুক্তি-পাগল আমরা রে ভাই, থাকবো না দাস অধীনতার।

শ্রমিক জীবনের মর্মস্পর্শী সমরূপতা প্রকাশক তাঁর কয়েকটি ছত্র—

মেরী বরসাতেঁ আঁসূ রে মেরা বসন্ত পীলা শরীর।
গরমী ঝরনোঁ-সা স্বেদ-স্রোত মেরে সাথী দুখদর্দ পীর ॥
দিন উনকো, মুঝকো রাত মিলী, শ্রম মুঝে, উন্হেঁ আরাম মিলা।
বলিকে দেনে কো প্রাণ মিলে, হণ্টর কো সুখা চাম মিলা ॥

—বর্ষা আমার চোখের জল, বসন্ত হায় কমলা রোগ,
ঝর্ণা, গ্রীষ্ম স্বেদের স্রোত, সঙ্গী দুঃখ যাতনা ভোগ।
রাত্রি আমার, দিবস তাঁর, শ্রম আমারই স্বস্তি তাঁর,
বলির জন্য প্রাণ পেয়েছি, শুকনো চাম চাবুকের তাঁর।

যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবির ভাবাত্মক একাত্মতা ঘটেছে তারা কোনো দেশ-কাল ও জাতির সীমায় আবদ্ধ নয়। ভট্টজীর রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে 'তক্ষশিলা', 'রাকা' (১৯৩৫), 'বিসর্জন' (১৯৩৯), 'মানসী' (১৯৩৯), 'অমৃত ঔর বিষ', 'যুগদীপ', 'যথার্থ ঔর কল্পনা', 'একলা চলো রে', 'বিজয়', 'অন্তর্দর্শন-তীন চিত্র' ও 'পূর্বাপর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'একলা চলো রে'-কাব্যে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ প্রেরণা কাজ করেছে— সে কথা বলাই বাহুল্য।

সোহনলাল দ্বিবেদী (১৯০৫-)—প্রসাদ যুগে গান্ধীজী ও গান্ধী-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত কবিদের অন্যতম সোহনলাল দ্বিবেদী। এই

প্রভাব বিচার-নির্ভর ততটা নয়, যতটা আবেগ-নির্ভর। তাই গান্ধী-বাদের চারণ 'কবি' রূপেও তাঁর উল্লেখ হয়ে থাকে। প্রথমদিকে শিশু-উপযোগী কবিতা রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে রাষ্ট্রবাদী কবি-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রকাশও দ্বিবিধ— আধুনিক রাষ্ট্র চেতনামূলক কবিতায় এবং ভারতের অতীত ঐতিহ্যের মহিমাদ্যোতক প্রবন্ধকাব্যে। তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে— 'পূজাগীত', 'বিষপান', 'সেবাগ্রাম', 'প্রভাতী', 'ভৈরবী' (১৯৪১), 'কুণাল' (১৯৪২), 'চিত্রা' (১৯৪২), 'যুগাধার' (১৯৪৪), 'বাসন্তী' (১৯৫১) ও 'বাসবদত্তা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গান্ধীদর্শনে কৃষকই রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। দ্বিবেদীজী সেই কৃষক-শক্তির গুণগানে মুখর। তাঁর কবিতা বা গানের ভাষা যেমন সহজ তেমনি ওজোময়। অহিংসা-নীতি প্রভাবিত তাঁর একটি অভিযান-সংগীত—

> ন হাথ এক শস্ত্র হো, ন হাথ এক অস্ত্র হো।
> ন অন্ন নীর বস্ত্র হো, হটো নহীঁ ডঁটো ওয়হীঁ ॥
> বঢ়ে চলো বঢ়ে চলো ॥
> রহেঁ সমক্ষ হিম শিখর তুম্হারা প্রণ উঠে নিখর।
> ভলেহী জায়ে তন বিখর, রুকো নহীঁ, রুকো নহীঁ ॥
> বঢ়ে চলো, বঢ়ে চলো ॥

> —না-আছে হাতে শস্ত্র, না-আছে হাতে অস্ত্র
> নেই অন্নজল-বস্ত্র, নড়োনা, থাকো দৃঢ় অচল।
> চলরে চলরে চল ॥
> সামনে পেয়ে হিম-শিখর— পণ তোমার হোক প্রখর,
> যাক না দেহ হয়ে নিথর— তবু না-থেমে রও সচল—
> চলরে চলরে চল ॥

এই সন্দর্ভে রবীন্দ্রনাথের 'চলো যাই, চলো যাই' এবং নজরুলের 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' প্রভৃতি অভিযান-সংগীত স্মরণীয়।

গোপাল সিংহ 'নেপালী' (১৯০২-১৯৬৩)—'নেপালী' কবি মুখ্যত গীতিকার রূপে পরিচিত। আন্তরিক ও অকুণ্ঠ প্রকৃতি-প্রীতির সুমধুর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। প্রগতিশীলতার প্রতি সমর্থনও রয়েছে তাঁর কাব্যনিচয়ে। 'উমঙ্গ' (১৯৩৪), 'পঞ্ছী' (১৯৩৪), 'পঞ্চমী', 'রাগিনী' ও 'নবীন'— এই পাঁচটি তাঁর কাব্য সংগ্রহ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবির রচনা থেকে কয়েকটি পংক্তি—

বকুল-মুকুল গন্ধ অন্ধ কুঞ্জ কুঞ্জ ডোলে,
অরুণ-তরুণ কিরণ সঙ্গ তিমির পুঞ্জ ডোলে।
মধুপ মুগ্ধ ঝূম রহে ফুল্ল কুসুম চুম রহে,
করমেঁ মধুপাত্র লিয়ে দ্বার দ্বার ঘূম রহে,
বিহঁস রহী নব কলিকা দ্বার বন্দ খোলে ॥

—বকুল-মুকুল গন্ধ অন্ধ কুঞ্জে-কুঞ্জে ভাসে,
অরুণ-তরুণ কিরণ সঙ্গে তিমির পুঞ্জ হাসে।
মুগ্ধ মধুপ মত্ত, ফুল্ল কুসুমে চুম্বি যায়,
মধুর পাত্র হস্তে প্রেমিক ঘোরে দ্বারে দ্বারে তায়,
নবীন কলিকা খোলে দৃগ দ্বার মন্দ মধুর লাসে ॥

এইরূপ বর্ণনার একটি স্বাভাবিক আবেদন আছে পাঠক এবং শ্রোতার কাছে— সে-কথা অবশ্য স্বীকার্য।

আরসীপ্রসাদ সিংহ (১৯১১-)—বিহারের (খগড়িয়া) কবি আরসী-প্রসাদ অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও মনোগ্রাহী কবিতা রচনার শক্তি রাখেন। ছোটো গল্প লিখলেও মুখ্যত তিনি কবি। 'কলাপী' (১৯৩৮), 'সঞ্চয়িতা' (১৯৪২), 'জীবন ঔর যৌবন' (১৯৩৪), 'নঈ দিশা' (১৯৪৪), 'পাঞ্চজন্য' (১৯৪৫), 'কলেজে কে টুকড়ে', 'আজকল' ও 'চন্দামামা' প্রভৃতি সিংহজীর জনপ্রিয় কাব্যকৃতি। ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্য থাকলেও নারী ও সামাজিক জীবনের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ লক্ষিত হয়। তীব্র প্রণয়ানুভূতি, সরল অভিব্যক্তি এবং ভাষার প্রবাহ—

এই তিনের সমন্বয়ে আরসীপ্রসাদের রচনা সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির মাধ্যমে কবি তাঁর অনুভূতির সহজ অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন।—

গিরতে তরুসে পত্র, তুম্হারী ব্যাকুলতা মুঝকো ন সতাতী।
হঁস হঁস কর বসন্ত রহ জাতা, সিসক সিসক বর্ষা রহজাতী॥

—ঝরা পাতা! হায়! তোমার আকুলি হৃদয়ে কাটে না দাগ!
হাসে বসন্ত! ফুঁপিয়েই সারা বর্ষার অনুরাগ।

তুচ্ছ বিষয়ও তাঁর মনের স্পর্শে বেশ মহনীয় হয়ে ওঠে—

মৈঁ তো তুঝে ভূল ভী জাউঁ;
পর, খয়াল আ হী জাতা হৈ।

—আমি তো তোমায় বেশ ভুলে যাই,
তবু স্মৃতি এসে কড়া নাড়ে।

জানকীবল্লভ শাস্ত্রী (১৯১৬)—প্রধানত গীতিকার হলেও শাস্ত্রীজী 'রূপ-অরূপ' (১৯৪০), 'তীর তরঙ্গ' (১৯৪৪), 'শিপ্রা' (১৯৪৫), 'মেঘ-গীত' (১৯৫০), 'অবন্তিকা' (১৯৫৩) এবং 'সঞ্জীবনী' (১৯৬৪) প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় কাব্যকৃতি। তিনি প্রধানত গীতিকাব্য রচনা করেছেন। তবে তা তীব্র অনুভূতি, আত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি, সংগীতময়তা এবং প্রাঞ্জলতায় শিল্প হয়ে উঠেছে। তাতে ইতিহাস যেমন এসেছে তেমনি বৈজ্ঞানিক যুগের কঠোরতার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। সুতরাং হৃদয়ানুভূতি ও বুদ্ধির যুগপৎ ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়। 'রাধা' শাস্ত্রীজীর মহাকাব্য গুণোপেত রচনা। তার থেকে কয়েকটি পংক্তি—

প্যার! ভাবুকতা ভরা উদ্‌গার হৈ,
পর য়হী জীবন? য়হী সংসার হৈ?
প্রেম কা পাথেয়! ক্যা উদ্দেশ্য হৈ?
পথিক রে, জানা তুঝে কিস দেশ হৈ?

—প্রেম হল— ভাবুকতায় ভরা উদ্‌গার!
কিন্তু এই কি জীবন? এই কি সংসার?

প্রেমের পাথেয়। উদ্দেশ্য কি তার ?
পথিক। বলনা কোন্ দেশে যাবে আর ?

শিবমঙ্গল সিংহ 'সুমন' (১৯১৬-)—'জীবন কে গান' (১৯৪০), 'প্রলয় সৃজন' (১৯৪৪), 'হিল্লোল' (১৯৪৬), 'বিন্ধ্যহিমালয়', 'পর আঁখেঁ নহীঁ ভরী' ও 'বিশ্বাস বঢ়তা হী গয়া' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যসংগ্রহে শিবমঙ্গল সিংহ অভিনব স্বাদ এনেছেন। 'সুমন' কবির রোমান্টিক-চিত্ততা এবং প্রগতি-মনস্কতার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। তিনি একদিকে যেমন অসফল প্রেমের ব্যথা ও নিরাশা ব্যক্ত করেছেন, অপরদিকে তেমনি প্রগতিবাদের বিকাশের পথরেখার সঙ্কেতও দিয়েছেন। তাঁর প্রেম-গীতিতে কোমল-সৌম্য-সুকুমার প্রেমানুভূতির প্রকাশ লক্ষিত হয়—

কই দিনোঁ সে দেখ রহা হূঁ,
তুম উদাস হো,
আঁখেঁ সজল, বিনত সহমী-সী
খোঈ-খোঈ দৃষ্টি দূর কী
ভূলা ভূলা-সা অপনাপন,
মনভী বড়ী বিচিত্র বস্তু হৈ,
কভী পহুঁচ কে বাহর হো জাতা
লহরাতা ;
বেবস উড্ডীন পতঙ্গ কী ছিনী ডোর-সা
ঔর হাথ মেঁ রহ জাতী হৈ
উলঝী গুত্থী।

—কয়েকদিন ধরে দেখছি, তুমি বেশ উদাস হয়ে পড়েছো। তোমার সজল চোখে নম্রতা সংকোচ ও দূরে হারানো দৃষ্টি। আত্মভোলার অবস্থা। মন একটি বিচিত্র বস্তু। কখনো বা হাতের মুঠোর বাইরে গিয়ে সুতো কাটা ঘুড়ির মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাসতে থাকে। হাতে থেকে যায় জড়ানো সুতোর বাণ্ডিল।

শিবমঙ্গল সিংহ 'সুমনে'র প্রগতিবাদী কবিতাও প্রায় অনুরূপই—

যুগোঁ কী সড়ী রূঢ়িয়োঁ কো কুচলতী
জহর কী লহর-সী লহরতী মচলতী
অঁধেরী নিশা মেঁ মশালোঁ-সী জলতী
চলী জা রহী হৈ বঢ়ী লাল সেনা।
সমাজী বিষমতা কী নীবেঁ মিটাতী
গরীবোঁ কী দুনিয়া মেঁ জীবন জগাতী
অমীরোঁ কী সোনে কী লংকা জলাতী
চলী জা রহী হৈ বঢ়ী লাল সেনা॥

—কত যুগের বস্তা পচা সংস্কার দলে,
বিষ-তরঙ্গের মতো নেচে ছলে-বলে,
রাতের আঁধারে মশালের মতো জ্বলে—
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লাল সেনা।
সামাজিক বিষমতার ভিত খুঁড়ে খুঁড়ে,
সবহারাদের সংসারে নবজীবন জুড়ে,
ধনীর সোনার লংকা ছারখার করে—
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লাল সেনা।

ছায়াবাদ ও প্রগতিবাদসহ পরবর্তী যুগেও যাঁরা কবিতা লিখে ভাব, ভাষা ও শিল্পের বিচারে নবীনতা এনেছেন বা নবীনত্বের আভাস দিয়েছেন তাঁদের মধ্যেকার আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির কাব্যকৃতিসহ নামোল্লেখ করা যাচ্ছে। এই কবিদের অধিকাংশই গল্প, উপন্যাস, নাটক-প্রহসন, আলোচনা-সমালোচনা এবং গুরুগম্ভীর ও ললিত প্রবন্ধও রচনা করেছেন। তাই অন্যত্র তাঁদের সম্পর্কে বিষয় ও সৃজনধর্মিতার গুরুত্ব অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে।

হরিকৃষ্ণ প্রেমী (১৯০৮)—'সরকার তুম্হারী আঁখোঁ মেঁ' (১৯৩০), 'জাদুগরনী', 'অনন্ত কে পথ পর'; 'স্বর্ণবিহান' ও 'অগ্নিগান'।

হংসকুমার তিওয়ারী (১৯১৮-১৯৮০)—'অনাগত', 'রিমঝিম' ও 'সঞ্চরণ'।

গোপালদাস সকসেনা 'নীরজ' (১৯২৬-)—'দো-গীত', 'বিভাবরী', 'প্রাণগীত', 'দর্দ দিয়া হৈ' ও 'বদরা বরসা গয়ো'।

প্রভাকর মাচওয়ে (১৯১৭-)—'তারসপ্তকে' ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত।

সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন 'অজ্ঞেয়' (১৯১১-১৯৮৭)—'হরীঘাস পর ক্ষণভর' (১৯১৯), 'ভগ্নদূত' (১৯৩৩), 'ইত্যলম' (১৯৪৬), 'চিন্তা', 'বাওরা অহেরী', 'ইন্দ্রধনু', 'রোঁদে হুয়ে য়ে' (১৯৫৭), 'অরী ও করুণা প্রভাময়' (১৯৫৯), 'আঁগন কে পার দ্বার' (১৯৬১) এবং 'মহাবৃক্ষ কে নীচে' (১৯৭৭)। 'শরণার্থী' গল্পের বইয়েও কবিতা সংকলিত। প্রগতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন।

ধর্মবীর ভারতী (১৯২৬-)—প্রগতিবাদের সমর্থক। 'অন্ধাযুগ' ও 'ঠণ্ডা লোহা' (১৯৫২)।

নরেশ মেহতা (১৯২৪-)—'দূসরা তার সপ্তকে'র কবি। 'বনপাখী সুনো', 'বোলনে দো চীড় কো' এবং 'মেরা সমর্পিত একান্ত'।

শমশের বহাদুর (১৯১১-)—'কুছ কবিতায়েঁ' (১৯৫৯), 'বাত বোলেগী, হম নহীঁ' এবং 'উদিতা'।

কেদারনাথ অগ্রওয়াল (১৯১০-)—'নীদ কে বাদল' এবং 'যুগ কী গঙ্গা'।

নাগার্জুন (১৯১১-)—'যুগধারা' (১৯৫৩); 'সতরঙ্গে পংখো ওয়ালী' (১৯৫৯)।

ত্রিলোচন শাস্ত্রী (১৯১৭)—প্রগতিশীল লেখক। 'ধরতী'।

ভবানীপ্রসাদ মিশ্র (১৯১৩-)—'গীতফরোস' এবং 'চকিত হৈ দুঃখ'।

গজানন মুক্তিবোধ (১৯১৭-১৯৬৪)—'তার সপ্তকে'র কবি; 'চাঁদ কা মুঁহ টেঢ়া হৈ' (১৯৬৫), 'ভূরী ভূরী খাক ধূল'; 'মুক্তিবোধ রচনাবলী' ১ম ও ২য় খণ্ড (কবিতা ১৯৮০)।

ভারত ভূষণ অগ্রওয়াল (১৯১৯-১৯৭৫)—'ছবি কে বন্ধন', 'জাগতে রহো', 'মুক্তিমার্গ' (১৯৪৭), 'ও অপ্রস্তুত মন' (১৯৫৮), 'কাগজ কে ফুল' (১৯৬৩) এবং 'অনুপস্থিত লোগ' (১৯৬৫)।

রাঁগেয় রাঘব (১৯২৩-১৯৬২)—'অজেয় খণ্ডহর' (১৯৪৪), 'পিঘলতে পত্থর' (১৯৪৬) ও 'মেধাবী' (১৯৪৭)।

বলদেবপ্রসাদ মিশ্র (১৮৯৮-)—'সাকেত সন্ত'।

দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্র (১৯০১-)—'কৃষ্ণায়ণ'।

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক (১৯১০-)—'দীপ জলেগা', 'বরগদ কী বেটী' এবং 'চাঁদনী রাত ঔর অজগর'।

ডা. সুধীন্দ্র (১৯১৬-)—'শংখনাদ', 'প্রলয়বীণা', 'জৌহর' এবং 'অমৃত লেখা'।

গোপালপ্রসাদ ব্যাস (১৯১৩-)—হাস্যরসিক কবি। 'নয়া রোজগার' ও 'অজী সুনো'।

শান্তি মেহরোত্রা (১৯২৬-)—'নিষ্কৃতি', 'মরীচিকা', 'পগধ্বনি', 'রেখা', 'পঞ্চপ্রদীপ', 'বিদা' ও 'চাণক্য'।

গিরিজাকুমার মাথুর (১৯১১)—'মঞ্জীর', 'নাশ ঔর নির্মাণ' এবং 'ধূপকে ধান'।

আধুনিক হিন্দীকাব্যের তৃতীয় পর্যায়

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যদি হিন্দী কবিতায় 'ছায়াবাদ-রহস্যবাদে'র যুগ রূপে চিহ্নিত হয়, তবে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সময়কে উত্তর ছায়াবাদী যুগের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রূপে অভিহিত করা যায়। এই সময় ছায়াবাদী কবিতা উৎকর্ষের সীমা পার হয়ে ক্রমে হ্রাসোন্মুখী হয়ে এসেছে। তার ধার ভার ও আকর্ষণ আর আগের মতো নেই। ছায়াবাদী কবিদের কেউ কেউ পথ ও মত পরিবর্তন করেছেন। যাঁরা তা করেননি তাঁদের মতে ও রচনায় শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। সুতরাং এ-অধ্যায়ে ছায়াবাদের শিথিল সম্ভাবনাময় কবিতা এবং নতুন বিষয় ও ভাবভূমি নিয়ে রচিত কবিতার দুইটি ধারা দৃষ্ট হয়। ইতো মধ্যে হিন্দী

কাব্য সাহিত্যের বিভিন্ন যুগজ প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। বেশ কয়েকটি 'ইজ্‌ম্' বা 'বাদ' দেখা দিয়েছে। জীবনবোধ ও বস্তু এবং শিল্পের মূল্যবোধ নিয়ে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। কোনো ধারায় ব্যক্তিগত অনুভূতির ঘনত্ব বেশি, কোনোটিতে সামাজিক অনুভূতির স্ফীতি। কোনোটিতে রোমান্টিকতার প্রাধান্য তো কোনোটিতে বৌদ্ধিক যাথার্থ্যের। এইসব প্রবৃত্তির প্রকাশক কাব্যগুলিকে আমরা অন্তত পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করতে পারি।— রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির ধারা, উত্তর ছায়াবাদী ধারা, বৈয়ক্তিক (প্রগীত) কাব্য ধারা, প্রগতিবাদী কাব্যধারা এবং প্রয়োগবাদী নবকবিতার ধারা। প্রথম দুইটি ধারায় তেমন অভিনবতা কিছু নেই। কারণ, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির ধারা ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগ থেকে শুরু হয়ে দ্বিবেদীকাল ও ছায়াবাদীকাল পার হয়ে সমকালীন প্রশ্ন, খবর ও মানসিকতার সাযুজ্যে উদারতর এবং বৈবিধ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তর ছায়াবাদী কাব্যধারা ও ছায়াবাদের যুগেই পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তবে পারম্পর্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে এযুগেও তা প্রবাহিত ছিল। শেষ তিনটি ধারা আলোচ্যযুগের নব-সংযোজন বলা চলে। সমাজ, রাষ্ট্র ও যুগচেতনার উর্বরতায় এই ধারাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বিকাশ লাভ করেছে— সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রাসঙ্গিকভাবে আধুনিক হিন্দী কাব্যধারার আলোচনা প্রসঙ্গে শিশুদের উপযোগী 'বালকাব্য'; সাধারণভাবে 'হাস্যরসাত্মক কাব্য' এবং 'অনুবাদ কাব্য' বিষয়েও কিছু বলা দরকার। বিস্তৃত আলোচনায় না-গিয়ে প্রত্যেক বিভাগ নিয়ে দুই-চার কথা বলে নেওয়া গেল।

বালকাব্য

ছায়াবাদ যুগেই শিশু ও কিশোরদের জন্য সরস, মনোরঞ্জনকারী অথচ শিক্ষাপ্রদ কবিতা ও কাব্য রচনার প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'শিশু', 'বালসখা', 'খিলৌনা', 'বালক', 'বানর' ও 'বালবিনোদ' প্রভৃতি

পত্রিকার দান এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়। বালকাব্য রচয়িতা কবিদের মধ্যে 'হরিঔধ' ('বালবিলাস' ১৯২৫ ও 'বালবিভব' ১৯২৮), রামনরেশ ত্রিপাঠী, গিরিজাদত্ত শুক্ল, সোহনলাল দ্বিবেদী, সুভদ্রাকুমারী চৌহান, শ্রীনাথ সিংহ, ব্যথিত হৃদয়, শ্যামনারায়ণ পাণ্ডেয় ও আরসিপ্রসাদ সিংহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই কবি সম্প্রদায় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক, আখ্যান, লোক-কাহিনী ও পরী-কাহিনী প্রভৃতি নিয়ে শিশুর উপযোগী কাব্য রচনা করেছেন। শিশুর প্রত্যাশিত বিকাশের কথা মনে রেখে তাঁরা প্রকৃতি, নীতি, ভক্তি, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ-বিচিত্র কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতি হল— শিবদুলারে ত্রিপাঠীর 'নূতন ছাত্রশিক্ষণ' (১৯১৮), রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়ের 'বালশিক্ষা' (১৯১৯); রামলোচন শর্মার 'মোদক' (১৯২৬) এবং চন্দ্রবন্ধু কৃত 'বালসুধার' (১৯৩৫)। এ-গুলিতে নীতিমূলক, শিক্ষাপ্রদ কবিতা সংকলিত। এইসব সংকলন শিশুমনের উপযোগী সরস ও আকর্ষণীয়। শিশুদের জন্য ভক্তিমূলক কবিতাও লিখেছেন কোনো কোনো কবি। এ-প্রসঙ্গে কামতাপ্রসাদ বর্মার 'বালবিনয়মাল' (২য় সং ১৯৩২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পশু-পক্ষী নিয়েও কবিতা লেখা হয়েছে। ভূপনারায়ণ দীক্ষিতের 'খিলওয়াড়' (১৯২৯) এইরূপ একটি কৃতি। কবিদের মধ্যে বিবিধ বিষয় নিয়ে নানা রকমের বালোপযোগী কবিতা রচনার প্রবণতাই সমধিক। গণেশ রাম মিশ্রের 'খেল কে তানে' (১৯৩১), রামেশ্বর 'করুণ'-এর 'বালগোপাল' (১৯৩৬) প্রভৃতি রচনায়— ঋতুবর্ণন, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জাগরণ, নৈতিক মানদণ্ড প্রভৃতির চিত্র সরল ও ব্যাবহারিক ভাষায় মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। দেবীদত্ত শুক্লের 'বাল কবিতামাল' (১৯২৯) ও 'বাল কথামঞ্জরী' (১৯৩১); সুদর্শনাচার্যের 'চুন্নু মুন্নু' (১৯৩২), লক্ষ্মীদত্ত চতুর্বেদীর 'ভৈঁসা সিংহ' (১৯৩৩) এবং দেবীদয়াল চতুর্বেদীর 'বিজলী' (১৯৩৭)— প্রভৃতি কৃতিতে ছন্দোবদ্ধ কবিতায় পুরাণ, ইতিহাস এবং অন্য উৎসজাত কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর জীবনকথা সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উপহার দেওয়া

হয়েছে— শিশু ও কিশোর সম্প্রদায়কে। রামনরেশ ত্রিপাঠীর শিশু-কবিতায় যুগপৎ রাষ্ট্রীয় চেতনা ও লোকজীবন তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যা-ভূষণ 'বিভু', স্বর্ণসহোদর ও জ্যোতিপ্রসাদ মিশ্র 'নির্মল' প্রমুখের রচনায় বিচিত্র অনুভূতি, পারিবারিক স্নেহ, হাস্যরস ও অবিশ্বাস্য-অদ্ভুত তত্ত্বের সমাবেশ লক্ষিত হয়। এ-সব ছাড়া খেলনা নিয়েও নানাপ্রকার আনন্দ-দায়ক কবিতা রচনার প্রয়াস দেখা যায়। বিমুগ্ধ চিত্তে পরম আনন্দে সম-বেত কণ্ঠে শিশুরা গাইতে পারে এমন সমবেত সংগীত বা বৃন্দগানও লেখা হয়েছে প্রচুর। সোজা কথায় হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে রুচিকর, কৌতূহল-বর্ধক, সরল মনোরঞ্জক বালসাহিত্য রচনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাই বালসাহিত্যের পরিমাণ ও মান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তবে দুঃখে ভরা, করুণ ও মর্মস্পর্শী ভাবের সঙ্গে শিশুদের পরিচিতি এবং শিশুমনের গঠনে তার ভূমিকাকে হিন্দী জগতে তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় না। তাই হিন্দী শিশুসাহিত্যে করুণ রসাত্মক কাহিনী-কবিতা এক প্রকার দুর্লভ।

হাস্যরসাত্মক কাব্য

ভারতেন্দু যুগে স্বয়ং ভারতেন্দু ও প্রতাপনারায়ণ মিশ্র এবং দ্বিবেদী যুগে বালমুকুন্দ গুপ্ত যে হাস্যরস-স্নিগ্ধ ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতাধারার সূচনা করেন, কখনো ক্ষীণ কখনো বা প্রবল রূপে তা আজও বহমান। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরীপ্রসাদ শর্মা, হরিঔধ, উগ্র, হরিশংকর শর্মা, বেঢ়ব বনারসী, বেধড়ক বনারসী এবং কান্তানাথ পাণ্ডেয় 'চোঁচ' প্রমুখের হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবিতা-কৃতির কথা স্মরণীয়। ঈশ্বরীপ্রসাদের 'চনা-চবেনা' (১৯২৪) একটি উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ। তাতে সমাজ, রাজনীতি, গার্হস্থ্য জীবন এবং সাহিত্য প্রভৃতির সমসাময়িক প্রবৃত্তি নিয়ে হাস্যরসে স্নিগ্ধ পঁয়তাল্লিশটি শিষ্ট ও রুচিশীল কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতা খড়ীবোলীর হলেও 'কলিযুগী কর্ণ', 'সরস্বতী পূজা',

'লঠশিরোমণি'— প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা ব্রজভাষায় লেখা। হরিঔধজীর 'চোখে চৌপদে' (১৯২৪) শিক্ষাপ্রদ ব্যঙ্গকাব্য। পাণ্ডেয় বেচন শর্মা 'উগ্র'-এর 'আজ', 'ভূত' এবং 'মতওয়ালা' পত্রিকায় অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক সামাজিক কুপ্রথার প্রতি নিষ্ঠুর প্রহার হেনেছেন কবি। তিনি কয়েকটি প্যারোডি বা 'বিড়ম্বন কাব্য'ও রচনা করেছেন। বেঢব বনারসীর ব্যঙ্গোক্তিতে বিষয় বৈবিধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কুশলতা ও শব্দাবলীর সমৃদ্ধিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবি প্রেমের 'ভালূরামছালূরাম সংবাদ'-এ (১৯২৯) তর্ক-বিতর্ক আশ্রিত সংলাপ শৈলীতে শিক্ষাপ্রদ ব্যঙ্গপ্রস্তুত করা হয়েছে। শিবরত্ন শুক্লের 'পরিহাসপ্রমোদ' (১৯৩০) গ্রন্থে খড়ী-বোলী, ব্রজভাষা এবং বৈসওয়াড়ী-ভাষায় শিক্ষাপ্রদ পরিহাস সংকলিত। সমসাময়িক আচার-আচরণে বিদেশী প্রভাবের প্রতি সরস কটাক্ষ করা হয়েছে। এই জাতীয় আর একটি গ্রন্থ হল— কান্তারাম পাণ্ডেয় 'চোঁচ'-এর 'চোঁচ-চালীসা' (১৯৩২)। তাঁর 'মহাকবি সাঁড়' ও 'পানী পাঁড়ে'ও এই জাতীয় অম্ল-মধুর রসের কাব্যকৃতি। 'পোলপ্রকাশক' ছদ্মনামে রচিত 'চটশালা' (১৯৩৭) কাব্যটিও হাস্যরসে স্নিগ্ধ। এটি ছায়াবাদী-রচনা পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করে লেখা। 'ছায়াপথ' জ্বালারাম নাগরের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতি। তা ছাড়া অন্য কবিতার সঙ্গে হাস্যব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা রয়েছে এমন কাব্যগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। যেমন প্রতাপনারায়ণ পুরোহিতের 'কাব্য কানন' (১৯৩২), কৃষ্ণানন্দ পাঠকের 'প্রপঞ্চ প্রকাশ' (১৯৩৩), বলভদ্র দীক্ষিতের 'চকল্লস' (১৯৩৩), কিশোরী দাস বাজপেয়ীর 'তরঙ্গিণী' (১৯৩৬) প্রভৃতিতে এমন কবিতা আছে যাতে কবি-কল্পনা, সামাজিক বিধিবিধান, সমসাময়িক প্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে হাস্যরসের মাধ্যমে। একদল হাস্যরসিক কবি প্যারোডি রচনা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। মনোরঞ্জনের 'গুন গুন' কাব্যটি মৈথিলীশরণ গুপ্তের 'জয়দ্রথবধ' এবং 'ভারতভারতী' কাব্যদুইটির অংশ বিশেষের প্যারোডি। ভৈয়াজী বনারসী (মোহনলাল গুপ্ত) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা রকমের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা

লিখে পাঠক সম্প্রদায়কে চমকিত ও হর্ষিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে লালা ভগবান দীন, শ্রীনাথ সিংহ, জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদী এবং ভগবতী-প্রসাদ বাজপেয়ীর নামও হাস্যরসের কবিরূপে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দীতে হাস্যরস নিয়ে গবেষণাও হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেক প্রতিভাশালী হিন্দী কবি সূক্ষ্মতর হাস্যরসের সৃষ্টিতে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাস্যরস ক্রমশ উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য সমসাময়িক বস্তু, ঘটনা এবং ভাবের প্রতি অধিক নির্ভরতার ফলে অধিকাংশ রচনা খুবই সাধারণ স্তরের। প্রথমে শাসক ইংরেজ এবং তাদের বিধিব্যবস্থা ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য, আর এখন লক্ষ্য আমাদেরই সরকার। সুতরাং এই জাতীয় রচনার আবেদন শাশ্বত বা চিরন্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। তা সত্ত্বেও হিন্দীর হাস্যরসের কাব্যে বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণের অভাব নেই। একদিকে যেমন সূক্ষ্ম ও তরল মানসিকতার প্রতিফলনে, অন্যদিকে তেমনি শব্দ-প্রয়োগচাতুর্য ও উক্তি চমৎকারিত্বের সাহায্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করে বৌদ্ধিক হাস্যরস সৃজনের প্রয়াস লক্ষিত হয়। ব্যঙ্গ-কবিরা অসামাজিক আলম্বনের তিরস্কার করে-কুরীতি ও কুপ্রথার প্রতি তীব্র-প্রহার হেনে চলেছেন। দেশনেতা ও সাহিত্যিকের ক্রিয়াকলাপ এবং প্রতিদিনের ঘটনা ও জীবনের অসঙ্গতি— সব কিছুর দিকে কবিদের দৃষ্টি সজাগ ও সক্রিয়। তাঁদের রচনায় বিরোধাভাস, ব্যাজস্তুতি, অসঙ্গতি প্রভৃতি বহু অলংকারের প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবহার দেখা যায়। ভাষা ও ছন্দের বিচারে তাঁদের কৃতি সহজেই মন কেড়ে নেয়।

অনুবাদ কাব্য

হিন্দী কাব্যশাখায় অনূদিত সামগ্রীর বেশ সহজ ও স্বাভাবিক স্বীকৃতি লক্ষিত হয়। এই প্রবণতা যেমন প্রাচীন তেমনই সুফলপ্রসূ। রূপান্তর, সমশ্লোকী-অনুবাদ এবং স্বতন্ত্রভাবে ভাবানুবাদ— এই তিনপ্রকারে

বিভিন্ন ভাষা থেকে কাব্য সামগ্রী হিন্দীতে গৃহীত হয়েছে। প্রধানত সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে অনুবাদই বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। তবে বাংলা, পারসি প্রভৃতি অন্য ভাষা থেকেও কাব্যের অনুবাদ হয়েছে। সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদে দুইটি ক্রম পরিলক্ষিত হয়— ধার্মিক-নৈতিক কাব্য এবং ললিত কাব্য। অনুবাদকলা এবং সাহিত্য-শিল্পের বিচারে প্রথম বর্গের অনুবাদ তেমন আকর্ষণীয় না-হলেও বিষয়ের বিচারে যুগমনোবৃত্তির পরিচায়ক। রঘুনন্দনপ্রসাদ শুক্ল গীতার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সহজ ভাষায় 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' (১৯২২) অনুবাদ করেন। শৈবধর্ম প্রচারের জন্য 'শিবলীলামৃত' (১৯২৫) অনুবাদ করেন বাসুদেব হরলাল ব্যাস। অনুবাদের ছন্দ 'চৌপাঈ' ও ভাষা 'ব্রজভাষা'। এই শ্রেণীর আর একটি রচনা হল 'শ্যামায়ন' (১৯২৬)। মথুরাপ্রসাদ 'মথুরেশ' শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণজন্ম'— অংশটুকুর অনুবাদ করেছেন। গোবিন্দ কবির অনুরূপ অনুবাদকৃতি— 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম' (১৯২৬)। রাধারমণ শর্মার 'মূল রামায়ণ' (১৯৩৪), স্বতন্ত্রভঙ্গিতে অনূদিত গ্রন্থ। মোহনলাল মিশ্রের 'মোহনগীতা' (১৯৩৬), দেবীদত্ত শুক্লের 'দুর্গা সপ্তশতী' (১৯৩৮), দীনানাথ 'অশংকে'র 'মণিরত্নমালা' (১৯৩৩) ও 'চারুচর্যা' (১৯৩৩) (যথাক্রমে শংকরাচার্যের 'প্রশ্নোত্তরী' এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'চারুচর্যা'র) প্রভৃতি অনুবাদ কর্মও উল্লেখযোগ্য।

ললিত কাব্য বা যথার্থ কাব্য অর্থাৎ রসস্নিগ্ধ রচনার অনুবাদের পরিমাণই বেশি। এই প্রসঙ্গে রামযশ সিংহের 'ভোজ প্রবন্ধে'র অনুবাদ (১৯২২ ও ১৯৩০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ বেশ সহজ-সরল ও স্বচ্ছ। গিরিধর শর্মা 'নবরত্নে'র 'পদ্যরত্নপ্রভা' (১৯২৩), পণ্ডিত জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাসে'র 'অন্যোক্তিবিলাস'— অংশটির সার্থক অনুবাদ। কেশবপ্রসাদ মিশ্র 'মেঘদূত' (১৯২৩) অনুবাদ করেন। শিবদত্ত ত্রিপাঠী কৃত কবি ময়ূরের 'সূর্যশতকে'র অনুবাদ (১৯৩২) ছায়ানুসারী ও ক্লিষ্ট। লালজী মিশ্রের জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাসে'র অনুবাদ 'লালবিলাস' (১৯৩২) সাধারণ স্তরের কৃতি। হৃষীকেশ

চতুর্বেদী 'সমশ্লোকী মেঘদূত' (১৯৩৩) ও রামপ্রসাদ সারস্বত 'রঘুবংশ' (১৯৩৫) অনুবাদ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতি হল—অক্ষয়বট মিশ্রের জগন্নাথ কৃত 'গঙ্গালহরী'র অনুবাদ(১৯৩৮)।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদের পরিমাণ বিপুল। মাঝে মধ্যে তার পরিচয় পেয়েছি যথাস্থানে। এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করে নিরস্ত হওয়া গেল।

ইংরেজি থেকে অনূদিত কাব্যরাশির পরিমাণও বেশ উল্লেখ-যোগ্য। তাও আমরা জানি এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র শুক্লের এডউইন আর্নল্ড রচিত 'লাইট অব্ এশিয়া'র অনুবাদ 'বুদ্ধচরিত' (১৯২২) উল্লেখযোগ্য। কবি নগেন্দ্র কৃত গোল্ডস্মিথের 'দি ট্রাভেলর'-এর অনুবাদ 'ভ্রান্ত পথিক' (১৯৩২), শ্রীধর পাঠকের 'শ্রান্ত-পথিক' ও 'একান্তবাসী যোগী'র কথাও স্মরণীয়। গিরিধর শর্মা 'নবরত্ন' গোল্ডস্মিথের 'হার্মিটে'র অনুবাদ করেন 'যোগী' (১৯৩৫) নামে। মিল্টনের 'কোমাসে'র অনুবাদ করেন রামনারায়ণ মিশ্র 'কামুক' (১৯৩৮) নামে। অনুবাদের শৈলী কাব্য-নাটকের।

বাংলা থেকে হিন্দীতে কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম হল— কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। তিনি 'বিরহিণী ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৫), 'পলাসী কা যুদ্ধ' (১৯২০), 'বীরাঙ্গনা' (১৯২৭), 'মেঘনাদ বধ' (১৯২৭) এবং 'বৃত্রসংহার' (১৯৬৪) অনুবাদ করেন। সে কথা যথাস্থানে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে যে-সব কবি বাংলা থেকে কাব্য অনুবাদে আগ্রহী হয়েছেন— তাঁরা প্রায় সবাই মৈথিলীশরণ গুপ্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবি গিরিধর শর্মা 'নবরত্ন' রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির ১০৩টি কবিতা অনুবাদ করেন 'গীতাঞ্জলি' (১৯২৪) নামে।

রাশিয়ান, ফরাসী এবং পারসি প্রভৃতি ভাষার কাব্যও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। তবে মূল ভাষা থেকে নয়, ইংরেজি থেকে। রাশিয়ান গল্পের অনুসরণে রঘুনন্দনপ্রসাদ শুক্ল রচনা করেন 'স্বতন্ত্রতা পর বীর বলিদান' (১৯২৬) কাব্য, কবি বিদ্যাভূষণ 'বিভু' ফিরদৌসীর পারসি গ্রন্থ 'শাহ-

নামা'র অংশবিশেষের অনুবাদ করেছেন 'সুহরাব ঔর রুস্তম' (১৯২৩) নামে। ফরাসী কবি পল রিচার্ডের রচনার ইংরেজি অনুবাদ 'টু ইণ্ডিয়া : দি মেসেজ অব্ দি হিমালয়ঁজ'-এর হিন্দী অনুবাদ করেছেন হরিশরণ শ্রীবাস্তব 'মরাল'— 'হিমগিরি সন্দেশ' (১৯২৫) নামে। মৈথিলী-শরণ গুপ্তের 'রুবাইয়াত উমর খৈয়্যাম' (১৯৩১) অনুবাদের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সুমিত্রানন্দন পন্তের 'মধুজ্বাল'ও (১৯৪৬) অনুরূপ অনুবাদ কৃতি। অন্য কবিগণ ওমর খৈয়্যামের ফিট্‌জেরাল্ড কৃত ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নিয়ে অনুবাদ করেছেন। কেশব-প্রসাদ পাঠকের 'রুবাইয়াত উমর খৈয়্যাম' (১৯৩২), হরিবংশ রায় 'বচ্চনে'র 'খৈয়্যাম কী মধুশালা' (১৯৩৫), রঘুবংশ লাল গুপ্তের 'উমর খৈয়্যাম কী রুবাইয়াঁ' (১৯৩৮)—প্রভৃতি অনুবাদ এই শ্রেণীর। এগুলির মধ্যে 'বচ্চনে'র (৭৫টি রুবাইয়ের) অনুবাদ-ই উচ্চস্তরের এবং সর্বাধিক জনপ্রিয়। যদিও তিনি ভাবানুবাদ-ই করেছেন। গিরিধর শর্মা 'নবরত্ন' বলদেবপ্রসাদ মিশ্র এবং গয়াপ্রসাদ গুপ্ত প্রমুখও ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদে প্রয়াসী হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে খৈয়্যামের অনুবাদে হিন্দী কবিদের আগ্রহ সমধিক। শেখসাদী কৃত 'করীমা' কাব্যের অনুবাদ করেন উর্দু কবি ইকবাল বর্মা 'সেহর' 'হিন্দী করীমা' (১৯৩৭) নামে। তাতে ভক্তি-নীতিমূলক ভাবের প্রতি ঝোঁক বেশি। এই জাতীয় অনুবাদ আরও অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে। হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ শাখার কাব্যকৃতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়—মৌলিক রচনার মতোই কাব্যানুবাদের মাধ্যমেও হিন্দী কাব্য সমৃদ্ধির দিকে প্রাগ্রসর।

কেবল কাব্যই নয়, হিন্দী সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগেই ভারতীয় তথা বহির্ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের প্রয়াস নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। তাতে নবীন ও বিচিত্র সাহিত্যকৃতিতে হিন্দী সাহিত্য-ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে তেমনি আবার অনুরূপ নবসৃজনের প্রেরণা ও তাগিদও অনুভূত হচ্ছে। নবসৃজনও ঘটছে। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষার শব্দসম্ভার, প্রকাশ শক্তি এবং গঠন-পারিপাট্যও পরিপুষ্ট,

শোভনও উন্নত হয়ে উঠছে। হিন্দী সাহিত্যের উদার মানসিকতা এবং আত্মোৎকর্ষলাভের অনলস প্রয়াস এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখের বিষয়। আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি।—

রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও প্রেম-মূলক কবিতার বিষয়ে নতুন করে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও নিরালার— তুলসীদাস, অণিমা, অর্চনা, আরাধনা; সুমিত্রানন্দন পন্তের স্বর্ণকিরণ, স্বর্ণধূলি, মধুজ্বাল, যুগপথ, উত্তরা, রজতশিখর ও শিল্পী; মহাদেবী বর্মার দীপশিখা; সুমিত্রাকুমারী সিন্‌হার বিহাগ, আশাপর্ব, পন্থিনী ও বোলেঁ। কে দেবতা; জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর— রূপ-অরূপ, শিপ্রা, মেঘগীত ও অবন্তিকা প্রভৃতি কাব্য ছায়াবাদোত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য কাব্যরূপেও পরিগণ্য। 'তুলসীদাস' বিষয়ের বিচারে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক হলেও প্রকৃতিতে ছায়াবাদী। পন্তজীর এ-যুগের কাব্যকৃতি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তবে পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ের জন্য তাতে এক-প্রকার আকৃতি প্রতিফলিত। তাই মূল সুর ছায়াবাদী হলেও বিষয়ের বিচারে তা ভিন্নধর্মী বলা চলে।

রোমান্টিক ধারার এমন বহু কাব্য আছে যা ছায়াবাদ থেকে ভিন্ন এবং যুগোচিত প্রবণতার সূচক। এই নব-প্রবণতা-আশ্রিত কাব্যকে প্রগীত বা গীতিকাব্য বলা চলে। যুগমানসের সঙ্গে তার যোগ অবশ্য স্বীকার্য। এ-যুগের যুব সম্প্রদায় দ্বিধাহীন চিত্তে তীব্র স্বাচ্ছন্দ্যের গভীর সংবেদন গাইতে ও শোনাতে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁদের কবিতায় এই আকুলতার সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে। আত্মানুভূতির ও অভিব্যক্তির সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, সংকোচ, আতঙ্ক প্রভৃতি অগ্রাহ্য করে যুগচিত্তের ক্লান্তি, উদাসীনতা, হতাশা, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণা, উল্লাস এবং অস্বীকৃতি প্রভৃতি মুখর হয়ে উঠেছে এ-যুগের কাব্যে। মূলে রোমান্টিক হওয়ায় যুগচিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংযোগে তার সুরে নতুন স্বাদ এসে গেছে। এই শক্তি ও স্বাদ কাব্য-শিল্পমণ্ডিত হয়ে অপূর্বতা লাভ করেছে। ব্যক্তির তীব্র রোমান্টিক চেতনা এবং আবেগ

তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি লাভ করে সুন্দর সতেজ 'গীত' হয়ে উঠেছে। ছায়াবাদী কৃতি সামগ্রিক উপলব্ধির কাব্য হলেও পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তিবাদী কবিতা সামগ্রিকতার বিচারে ছায়াবাদ অপেক্ষা বেশি সহজ, সাধারণ ও লৌকিক। কিন্তু এই ব্যক্তিবাদী রচনার সীমা ক্ষুদ্র, তাই তার স্থায়িত্ব ও সৌকর্য তেমন উল্লেখের দাবি রাখে না। হরিবংশ রায় বচ্চন, দিনকর, নরেন্দ্র শর্মা, রামেশ্বর শুক্ল 'অঞ্চল' আরসীপ্রসাদ, শম্ভুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ 'নেপালী' কেদারনাথ অগ্রওয়াল, শিবমঙ্গল সিংহ 'সুমন', গিরিজাকুমার মাথুর এবং ভারতভূষণ অগ্রওয়াল প্রমুখ কবির রচনায় ব্যক্তিবাদী কাব্যধারার পরিচয় মেলে।

ছায়াবাদী যুগের পর হিন্দী কাব্য সাহিত্যে যে যুগের আবির্ভাব ঘটল—তা যথার্থবাদের বিবেচনা-নিঃসৃত একটি বিশিষ্ট রূপ, যার অভিধা—'প্রগতিবাদ'। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলন পৃথিবীকে যখন মথিত করতে লেগেছে সেই সময় অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল 'আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল লেখক সংঘে'র প্রথম অধিবেশন। প্রসিদ্ধ ইংরেজি সাহিত্যিক, উপন্যাসকার ই. এম. ফর্স্টার ছিলেন সভাপতি। সমাজবাদী শক্তির প্রসার এবং প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতাই ছিল সংঘের একমাত্র লক্ষ্য। এই সংঘের অনুপ্রেরণায় লণ্ডনে ১৯৩৫ সালেই ডঃ মুল্করাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জাহীর ও ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ ভারতীয় লেখকদের প্রয়াসে 'প্রগতিশীল (ভারতীয়) লেখক সংঘ' স্থাপিত হল। সংঘের প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৬ সালে লাখনাউতে। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন যথাক্রমে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় ও ১৯৪২ সালে দিল্লীতে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশন বোম্বাইতে যথাক্রমে ১৯৪৩ ও ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ অধিবেশনটি হয় ১৯৫৩ সালে আবার দিল্লীতে। এইটাই সংঘের শেষ অধিবেশন।

১৯৩৬ সালে হিন্দী উপন্যাসকার প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে ভারতীয় প্রগতিশীল লেখকদের যে অধিবেশনটি হয় তার ফলস্বরূপ সৃষ্টিমূলক ও

আলোচনাত্মক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিবাদের প্রচার ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি পায়। প্রগতিবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—সামাজিক যথার্থবাদের ভিত্তিতে সমাজচিত্তে-সামূহিক চেতনার নবজাগরণ যা ছায়াবাদ-যুগে নিস্তেজ-প্রায় হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদী বিচারধারার সাহিত্যিক পরিণতি রূপেও অনেকে প্রগতিবাদকে সমর্থন জানালেন। সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়—বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক চেতনার জাগরণ ঘটানোই প্রগতিবাদী লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল। 'আমাদের সমাজ যে নূতন রূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বেগ সঞ্চার করা— এই হল আমাদের নব্য লেখকদের কর্তব্য' (নয়া সাহিত্য, ১৯৫১)। আলোচ্য যুগে প্রগতিবাদ একটি শক্তিশালী ধারা ছিল। তার বিকাশে রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মন্মথনাথ গুপ্ত, রাঁগেয় রাঘব, যশপাল এবং রামবিলাস শর্মা প্রমুখ লেখক আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দেন। সিদ্ধান্তের বিচারে প্রগতিশীলতাই সাহিত্যের প্রথম সর্তরূপে গৃহীত হল। তবে সাধারণভাবে জনমানসে চেতনা সঞ্চারের দ্যোতনাই ছিল প্রগতির নিহিত-অর্থ। স্মরণীয়—১৯৩৬ সালের পর শ্রেণী-সংগ্রাম, মানবতাবাদ ও ব্যক্তিগত উদ্‌যোগের উদ্‌ঘোষরূপে হিন্দীসাহিত্যে যে প্রগতি লক্ষিত হয়, তার পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল— প্রসাদ, নিরালা, পন্ত এবং মহাদেবী বর্মার কোনো কোনো রচনায়। প্রসাদজীর 'আঁসূ' (১৯২৫) কাব্যের দ্বিতীয়ার্ধে বৈষম্য ও বেদনা, মহাদেবীর রচনায় কারুণ্যাশ্রিত মনোভাব এক অর্থে মানবতাবাদীই। নিরালার 'ভিক্ষুক' (১৯২১) যাথার্থ্য বা বাস্তবতা চিত্রণের প্রবৃত্তির পরিচায়ক। তাঁর 'বাদল রাগে' (১৯২০) শ্রেণী-সংঘর্ষের সংকেত মেলে। আরও মেলে ধনিক শ্রেণীর শোষণ-পীড়ন ও অত্যাচারের কথা। 'যুগান্ত' কাব্যে (১৯৩৭) পন্ত কবি বিপ্লবের কথা বলেছেন আর শ্রমিকের মর্মস্পর্শী করুণ চিত্র এঁকেছেন। সুতরাং প্রগতিশীল হিন্দী সাহিত্যের বীজ ছায়াবাদী কবি চতুষ্টয়ের রচনাতেই উপ্ত ছিল বলা যায়।

পন্তকবির 'যুগবাণী' ও 'গ্রাম্যা', 'নিরালা'র 'কুকুরমুত্তা', কেদারনাথ অগ্রওয়ালের 'যুগগাথা', নাগার্জ্জুনের 'যুগধারা', ত্রিলোচন কবির 'ধরতী', শিবমঙ্গল সিংহ 'সুমনে'র 'জীবন কে গান' ও 'প্রলয়সৃজন', রাঁগেয় রাঘবের 'অজেয় খণ্ডহর', 'পিঘলতে পত্থর' ও 'মেধাবী' এবং ভারতভূষণ অগ্র-ওয়ালের 'মুক্তিমার্গ' ও 'জাগতে রহো', প্রমুখ কাব্যে প্রগতিধারার সৃজন, পোষণ ও প্রবাহ সুস্পষ্ট। তাছাড়াও নরেন্দ্র শর্মা, 'অঞ্চল', আরসীপ্রসাদ এবং শম্ভুনাথ প্রমুখের বহু কবিতা এই ধারাকে পুষ্ট ও সজীব করেছে। প্রগতিবাদ সাহিত্যের বক্তব্য, দৃষ্টিকোণ, সৌন্দর্যবোধ এবং অভি-ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবুও ধারাটি অন্যান্য ধারার তুলনায় অপরিণত ও দুর্বল। অস্পৃশ্য, শ্রমিক এবং 'কৃষাণের জীবনের সরিক' না হয়েই কবিরা কল্পনা নির্ভর অনুভূতির সাহায্যে যে প্রগতিবাদী সাহিত্যের অট্টালিকা নির্মাণ করলেন— গোড়ায় গলদের ফলে তা সুন্দর, সার্থক ও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারে নি, অভিজ্ঞতাহীন আত্মপ্রচারে পর্যবসিত হয়েছে। অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে শিল্পায়িত ভঙ্গি, চিত্রময়তা ও বিম্বকতা পরিহার করে নেহাত বর্ণনা ও কথনকে আশ্রয় করায় কাব্যোৎকর্ষের বিচারে প্রগতিবাদী কাব্য প্রত্যাশিত উন্নত মানকে স্পর্শ করতে পারে নি।

প্রগতিবাদী ও ব্যক্তিবাদী কাব্যধারার কৃতিপ্রবাহে কিছু এমন কবিতাও পাওয়া গেল যা 'প্রয়োগবাদী' ধারা নামে অভিহিত হল। প্রগতিবাদী ও ব্যক্তিবাদী ধারার কবিতা রচনা শুরু হয় ১৯৩৫ সাল থেকে সুস্পষ্টভাবে। প্রয়োগবাদী কবিতার সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৩ সালে। তবু এই ধারা-তিনটি এক সঙ্গেই প্রবাহিত হয়েছে— বেশ কিছুদিন। 'প্রয়োগবাদী রচনারূপে চিহ্নিত হল সেই সব কবিতা যা নতুন মূল্য ও সংবেদনশীলতা-আশ্রিত শিল্প-চমৎকারিতা নিয়ে ১৯৪৩ সালে 'তারসপ্তক' কবিতা সংকলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রগতিশীল কবিতার সঙ্গেই বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়ে 'নঈ কবিতা'তে পর্যবসিত হয়। 'প্রয়োগবাদ' নামটি ব্যঙ্গাত্মক।

'তারসপ্তক'-এর তিন অংকেরই (১৯৪৩, ১৯৫১ এবং ১৯৫৯-এ প্রকাশিত) সম্পাদক 'অজ্ঞেয়'। তিনি 'প্রয়োগ' প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাও করেছেন দ্বিতীয় 'তারসপ্তক'-এর ভূমিকায়। হ্রাসোন্মুখ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজজীবনের তত্ত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে প্রয়োগবাদী কবিতায়, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কবিরা নিজের দুঃখ-কষ্টের অভিব্যক্তিতে নিজের মতোই মধ্যবর্গের দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণার করুণ অনুভূতিকে বাণীরূপ প্রদান করেছেন। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষণিক অনুভূতি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুচ্ছ-অনুভূতি এবং বিভিন্ন সময়ের মনোস্থিতি নিয়ে তীব্রভাবাত্মক ছোটো ছোটো কবিতা লিখেছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব নয়, অভিব্যক্তির সততাই মূল কথা। লঘু মানবতাকে তার সমস্ত দীনতা-হীনতা-ক্ষীণতা ও মহত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করে প্রয়োগবাদী কবিরা সহানুভূতি প্রকাশের নব-পন্থা নির্দেশ করেছেন। মানুষ তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-দুর্বলতা এবং মহত্ত্বের মাঝখানে 'যথার্থ' ও 'প্রকৃত' রূপে বিদ্যমান। সুতরাং যথার্থ মানবের স্বরূপ সৃষ্টির জন্য তার জটিল পরিবেশের চিত্রণও শিল্পীর ধর্ম। 'অজ্ঞেয়' সম্পাদিত তারসপ্তক (১ম ও ২য়) কবিতা সংকলন এবং 'ইত্যলম', 'হরীঘাস পর ক্ষণভর' কাব্য; গিরিজাকুমার মাথুরের 'মঞ্জীর', 'নাশ ঔর নির্মাণ', ধর্মবীর ভারতীর 'ঠণ্ডা লোহা' প্রভৃতি প্রয়োগবাদী ধারার উল্লেখযোগ্য কাব্যকৃতি।

'প্রয়োগবাদী' কবিতার ব্যক্তি যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। যথার্থবাদী এবং বৌদ্ধিক হবার ফলে সে স্বীয় যৌন এবং অন্যবিধ কুণ্ঠাকে সাহসের সঙ্গে চিত্রিত করতে এগিয়ে এসেছে। পরিবেশ বিরহিততার অভিজ্ঞতা তীব্র হয়েও গতিশীল ও জীবন্ত হতে পারে নি। বুদ্ধিবাদিতায় আক্রান্ত তার ভাববোধ তার প্রকাশকে সংকুচিত করে ছেড়েছে। অতিমাত্রায় বুদ্ধি-নির্ভরতার ফলে ভাষা ও ভাবে একপ্রকার কৃত্রিমতা এসে গেছে। যার জন্য প্রয়োগবাদী কবিতা দীর্ঘজীবী হতে পারে নি। সহজেই পরবর্তী স্তরের 'নঈ কবিতা'র (১৯৫৩-৫৪) কাছে আত্মসমর্পণে সে বাধ্য হয়েছে।

নঈ কবিতাও তার পূর্ববর্তী কাব্যধারার মতো হিন্দীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি-জাত। বরং বলা যায় প্রয়োগবাদী কবিতার মতোই একটি সম-সাময়িক বিশ্বাস, দৃষ্টিকোণ এবং পরিস্থিতির ফসল— নঈ কবিতা। চিন্তন বা বৌদ্ধিক ক্রিয়া আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা। প্রগতিবাদ ও প্রয়োগবাদ দুই-ধারাই 'নয়ী কবিতা'য় সমন্বিত হয়েছে বলা চলে। কারণ তাতে শিল্প ও জীবন দুই-ই স্বীকৃত। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের সমগ্র পরিবেশ অঙ্কনের প্রয়াসও এখানে লক্ষিত হয়। সকলের হৃদয়ের বাস্তবিক ও মানবিক স্তরটিকে উন্মুক্ত-উদার করার চেতনা রয়েছে নঈ কবিতায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নীরবে প্রয়োগবাদের সমাপ্তি ঘোষিত হল। প্রগতিবাদীধারার রেশ তখনো হয় তো মিলিয়ে যায় নি— প্রগতিবাদ ও প্রয়োগবাদের পার্থক্য অনেকটা কমে এল— সেই সমতলে রচিত হল নঈ কবিতা। প্রয়োগ বাদের রচনা-প্রক্রিয়ার শিল্প ও যথার্থবাদ সবই তার আছে। তারই সঙ্গে যুগোচিত নবীন চেতনা, জাগরূকতা এবং প্রতিটি ক্ষণের সত্যতা নঈ কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। লঘু মানবতা অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবহেলিত মানুষের যাতনা ও অনুভূতির প্রামাণিকতা হল নঈ কবিতার মূলভিত্তি। যথার্থ পরিবেশ, মূল্যমানের পরীক্ষা, লোকসম্পৃক্তি ও বিশ্ববোধ—প্রভৃতি নঈ কবিতার বিশিষ্টতার পরিচায়ক। অজ্ঞেয়, গিরিজাকুমার মাথুর, গজানন মুক্তিবোধ, ভবানীপ্রসাদ মিশ্র, শমশের বাহাদুর সিংহ, নরেশ মেহতা, ধর্মবীর ভারতী প্রমুখ কবি নঈ কবিতাকে সুন্দর সার্থক ও গতিশীল করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'নয়ী কবিতা'র ধারাটি ক্ষীণ হলেও রূপান্তরে ও প্রকারান্তরে আজও বহমান।

নঈ কবিতার পরবর্তী স্তরে হিন্দী কাব্য জগতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি নব-নবতর প্রবৃত্তিসূচক শ্লোগান শোনা গেছে যা অন্যত্র দুর্লভ। কবিতা নিয়ে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলন। বলাই বাহুল্য সব আন্দোলন তেমন স্থায়ী হয় নি। তাই ফলশ্রুতিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু ধারাটির বৈচিত্র্য এবং বিবিধতা বিশেষভাবে

লক্ষণীয়। অনেক সময় দেখা গেছে একই কবি বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আবার একই ধরনের কবিতা বিভিন্ন নামের শাখায় গৃহীত। সোজা কথায়— নির্বাধ নামবৈচিত্র্য থাকলেও কবিতার রূপ, গুণ ও আবেদন প্রায় একই। সুতরাং কবিদের এই সশক্ত অহংবোধক প্রয়াস যেমন কৃত্রিম তেমনি লঘুতাবোধক।

বিচিত্র শোনালেও প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ প্রকারের নামে সাম্প্রতিক এবং অতি-সাম্প্রতিক হিন্দী কবিতার গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন—সনাতন সূর্যোদয়ী কবিতা, অপরংপরাবাদী কবিতা, অন্যথাবাদী কবিতা, সীমান্তক কবিতা, যুযুৎসাবাদী কবিতা, অস্বীকৃত কবিতা, অ-কবিতা, সকবিতা, অভিনব কবিতা, অধুনাতন কবিতা, নূতন কবিতা, নাটকীয় কবিতা. অ্যান্টি কবিতা, নির্দিশায়ামী কবিতা, লিপ্সাদলমোত কবিতা, অ্যাবসর্ড কবিতা, গীত কবিতা, নবপ্রগতিবাদী কবিতা, সাম্প্রতিক কবিতা, বীট কবিতা, ঠোস কবিতা, বিদ্রোহী কবিতা, ক্ষুৎকাতর কবিতা, সমাহারাত্মক কবিতা, কবীরপন্থী কবিতা, উৎকবিতা, বিকবিতা, বোধকবিতা, দ্বীপান্তর কবিতা, অতিকবিতা, টটকী কবিতা, তাজী কবিতা, প্রতিবদ্ধ কবিতা, অগলী কবিতা, শুদ্ধ কবিতা, নঙ্গী কবিতা, স্বস্থ কবিতা, গলত কবিতা, সহী কবিতা, প্রাপ্ত কবিতা, সহজ কবিতা, নবগীত, অ-গীত এবং অ্যান্টিগীত প্রভৃতি।[১৬]

বলাই বাহুল্য অধিকাংশ নামই অর্থহীন। কবিতার পূর্বে কত রকমের বিশেষণ বসানো যায় এবং তার গঠনে কতদূর অভিনবতা আনা যায়, তা সে যে স্তরেরই হোক, যেন তারই প্রতিযোগিতার ফল এই নামাবলী। কয়েকটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।—

সনাতন সূর্যোদয়ী কবিতা—১৯৬২, মার্চ সংখ্যা 'ভারতী' (হিন্দী) পত্রিকায় বীরেন্দ্রকুমার জৈন (১৯১৬) এই কবিতাধারার প্রসঙ্গ ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন— 'ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, সীমা থেকে অসীমে নিয়ে যেতে সক্ষম, সীমাতে অসীমের লীলা দেখাতে সক্ষম— আগামীকালের অনিবার্য সনাতন সূর্যোদয়ী নতুন কবিতার দ্বার উন্মুক্ত হল।'

কিন্তু ১৯৬৫ সালে সূর্যোদয়ী কবিতার অবসান ঘটল এবং 'নূতন কবিতা'র সুর শোনা গেল 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই।

যুযুৎসাবাদী কবিতা—১৯৬৬ অগস্টে 'যুযুৎসা' পত্রিকায় শ্রীশলভ শ্রীরামসিংহ 'যুযুৎসাবাদী' কবিতার প্রবর্তন করেন। আদিম যুযুৎসাই সমস্ত সাহিত্যসৃজনের মূল বলে তিনি মনে করেন। বিমল পাণ্ডেয়, রামেশ্বর দত্ত মানব, ওম্‌প্রভাকর এবং বজরঙ্গ বিশ্নোঈ প্রমুখ তাঁর সমর্থক।

একই সালে 'উৎকর্ষ' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় শ্রীরাম শুক্ল 'অস্বীকৃত' কবিতার প্রচলন করেন। অস্বীকৃত কবিতা আসলে যৌন-বিকৃতির কবিতা। আবার পূর্বকথিত 'অকবিতার সূত্র ধরে' ড. শ্যাম পরমার (১৯২৪-১৯৭৭) ঘোষণা করলেন— অন্তর্বিরোধের অন্বেষক কবিতার নাম 'অকবিতা'। ১৯৬৫ সালে 'অকবিতা' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গিরিজাকুমার মাথুর, প্রভাকর মাচওয়ে, ভারতভূষণ অগ্রওয়াল 'বিমল' ও 'অতুল' প্রমুখের উল্লেখ ছিল। এই ক্ষেত্রে শ্যাম পরমারের 'অকবিতা ঔর কলা সৌন্দর্য' গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বীট কবিতা—আমেরিকার বিটনিক প্রভাবে প্রভাকর মাচওয়ে, বাংলার প্রভাবে রাজকমল চৌধুরী (ক্ষুধার্ত প্রজন্মের প্রভাব) এবং গিন্সবার্গের প্রভাবে ত্রিলোচন ও শমশের বাহাদুর সিংহ বীট কবিতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন। 'কৃতি' ও 'অভিব্যক্তি' পত্রিকাদ্বয়ে মাচওয়েজীর মনোভাব ঘোষিত হয়। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'বিদ্রোহী পীঢ়ী'র (বিদ্রোহী প্রজন্ম) কবিদের রচনাতেও বীটকবিতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাজী কবিতা—এই জাতীয় কবিতার প্রবর্তক লক্ষ্মীকান্ত বর্মা দীর্ঘদিন ধরে নঈ কবিতার প্রবর্তকরূপে পরিচিত ছিলেন। পরে 'তর-তাজা' ভাব ও প্রকাশভঙ্গির প্রবর্তনায় তাজী কবিতার আন্দোলন শুরু করেন। কেবলমাত্র নতুনত্বের আকর্ষণেই তাঁর এই প্রয়াস। তবে অল্পদিনেই তাজী কবিতা বাসি হয়ে পড়ে।

প্রতিবদ্ধ কবিতা—ড. পরমানন্দ শ্রীবাস্তব প্রতিবদ্ধ কবিতার ধ্বজাবাহী। তাঁর মতে— বর্তমান যুগে প্রতিবদ্ধকতা বা সংঘর্ষ ছাড়া কবিতা হতে পারে না। এই সংঘর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ভাষা। যারা প্রতিবদ্ধকতা অস্বীকার করে তারা সংঘর্ষের ভাণমাত্র করে, সংঘর্ষ করে না। তাই তাদের এবং প্রতিবদ্ধকদের স্বরূপগত পার্থক্য সুস্পষ্ট করা এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য। তবে এ-আন্দোলনও ক্ষণজীবীই প্রমাণিত হয়।

সহজ কবিতা—সহজ কবিতার সূত্রধর ড. রবীন্দ্রভ্রমর। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকদের মধ্যে— আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নন্দদুলারে বাজপেয়ী, শ্রীঅজ্ঞেয়, দিনকর, ড. নগেন্দ্র, ড. দেবরাজ, ড. ইন্দ্রনাথ মদান, প্রভাকর মাচওয়ে, রামদরশ মিশ্র, শ্যাম পরমার, শ্রীরাজকমল চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন। ১৯৬৭ সালে সহজ কবিতার প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।— ১৯৬০-এর পর থেকেই হিন্দী কবিতা নানা ভ্রান্ত ও বাঁকা পথে ভ্রমণ করে নিজের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং তার লক্ষ্য বা মঞ্জিল খুঁজে বের করা প্রয়োজন। ১৯৬৮-তে সহজ কবিতা নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। তাতে সহজ কবিতার আকৃতি-প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ক আলোচনাও ছিল। সহজ কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছিল— 'যা যথার্থ অনুভূতি সংবেগের সঙ্গে বাণীর মূর্ত মাধ্যমে জন্ম নেয়, তাই সহজ— 'সহজায়তে ইতি সহজঃ'।... অনুভূতি প্রত্যক্ষ ও প্রামাণিক হলে অভিব্যক্তি অকৃত্রিম এবং অজটিল হবে।... সহজের দাবি ব্যষ্টিমূলক হয়েও সমাজসাপেক্ষ।' ড. ভ্রমর আরও বলেছেন— 'নিজের যুগের জীবন এবং সৃজনাত্মক দায়িত্বের সঙ্গে সহজ কবিতা সম্পূর্ণ প্রতিবদ্ধ। তার মূলে সহজ সম্পূর্ণ জীবনের প্রতীতি এবং সহজ সুগঠিত শিল্পের মাধ্যমে অনুসন্ধানের একটি যথার্থ প্রয়াস নিহিত।' (সহজ কবিতা পৃ. ৮) নানা কারণে এই আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে স্বাভাবিক পথেই অগ্রসর হয়েছে— বলা যায়।

নবগীত—১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুজফ্‌ফরপুর থেকে প্রকাশিত 'গীতাঙ্গিনী' পত্রিকায় 'নবগীতে'র স্লোগান উচ্চারিত হয়। তার সঙ্গেই নবগীত সংকলিতও হয়। নঈ কবিতার একটি বিশেষ শিল্পরূপ

হিসাবে নবগীত গ্রাহ্য। এই ধারাটি এখন প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। হিন্দী সাহিত্যে 'গীত' পৃথক থাকলেও কবিতাও একপ্রকার গীতই। বর্তমান শতকের ছয়ের দশকে দেখা দেয় 'নয়ী কবিতা'র আন্দোলন— তার প্রতিষ্ঠালাভও ঘটে। তাতেই অনুপ্রেরিত হয়ে, একদল কবি 'নবগীত' আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের প্রত্যাশা— নঈ কবিতার মতো 'নবগীত'ও স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে। হয়েছেও। নবগীতের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়— ১৯৬৪ সালে কবিতা পত্রিকায়। সম্পাদক : ওমপ্রকাশ। আর রবীন্দ্রভ্রমর, রামদরশ মিশ্র, রমেশ কুন্তল প্রমুখ নবগীতের প্রবক্তারূপে পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। প্রায় পঞ্চাশ জন খ্যাত-অখ্যাত কবির রচনা তাতে সংকলিত। নিরালা এবং অজ্ঞেয়-র রচনাও তাতে স্থান পেয়েছে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় ও গানে— 'নিরালা' এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। তাই নঈ কবিতা বা নবগীতে নিরালা থাকবেনই। নঈ কবিতা ও নবগীত রচয়িতাদের ওপর নিরালার স্পষ্ট প্রভাব থাকায় তিনি সকলের কাব্যগুরু ও গীতগুরুরূপে পূজ্য। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে 'নবগীত' বেশ সুন্দর, সার্থক এবং পরিণত রূপ লাভ করেছে। নবগীতের কবি এবং 'নবগীত সংকলন'-গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন কাব্যধারার কবিতার পরিচয়বাহী কয়েকটি ছোটো ছোটো দৃষ্টান্ত—

বৈয়ক্তিক বা প্রগীত কবিতা—

ক. কিতনী রাতোঁ কো মন মেরা,
চাহা, করদূঁ চীখ সবেরা,
পর মৈঁনে অপনী পীড়া কো চুপচাপ অশ্রুকণোঁ মেঁ ঘোলা—
মধ্য নিশা মেঁ পঞ্ছী বোলা।

—বচ্চন : একান্ত গীত।

—কত রাত্রে চাইল মন,
চীৎকার করে ভোর ডাকি,
মনের পীড়ায় অশ্রু ঝরে,
মাঝরাতেই ডাকে পাখি।

খ. বিশ্ব মেঁ অপবাদ হূঁ উপহাস হূঁ নিষ্ঠুর সময় কা,
হথকড়ী বেড়ী বনাদীঁ নিয়তি নে সব কামনায়েঁ।
দীন বন্দী হূঁ, সুমুখি, পর ভৃকুটি সঞ্চালন করো তো,
তোড় সকতাহূঁ নিমিষ মেঁ বিশ্ব কী সব শৃঙ্খলায়েঁ।
—নরেন্দ্র শর্মা (১৯১৩) : প্রবাস কে গীত।

—বিশ্বের আমি অপবাদ উপহাস নিষ্ঠুর কালের
হাত কড়া বেড়ি কামনার যত নিয়তি গুণে সুফল,
হলেও বন্দী-দীন, সুমুখির ভ্রূকুটি সঞ্চালনে—
নিমেষে ভাঙতে পারি বিশ্বের সমস্ত শৃঙ্খল।

প্রগতিবাদী কবিতা—

ক. অন্তর্মুখ অদ্বৈত পড়াথা
যুগ যুগ সে নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ,
জগমেঁ উসে প্রতিষ্ঠিত করণে দিয়া
সাম্য নে বস্তু বিধান।
—সুমিত্রানন্দন পন্ত :

—অন্তর্মুখ-অদ্বৈত ছিল
কতযুগ ধরে নিষ্ক্রিয়-নিষ্প্রাণ,
সংসারে তার সুপ্রতিষ্ঠায়
সাম্য এনেছে আজ বস্তু বিধান।

খ. তাক রহে হো গগন ? মৃত্যু নীলিমা গগন।
নিস্পন্দ শূন্য, নির্জন, নিঃস্বন
দেখো ভূকো, স্বর্গিক ভূকো।
মানব-পুষ্প-প্রসূ কো।
—সুমিত্রানন্দন পন্ত :

—দেখছ গগন ? মৃত্যু নীলিম গগন !
নিস্পন্দ, শূন্য, নির্জন, নিঃস্বন।

দেখ ধরাতলে, স্বর্গিক ভূকে,
মানব-পুষ্প-প্রসূকে।

প্রয়োগবাদী কবিতা—

ক. আহ্ মেরা শ্বাস হৈ উত্তপ্ত
ধমনিয়োঁ মেঁ উমড় আঈ হৈ লহূকী ধার
প্যার হৈ অভিশপ্ত
তুম কহাঁ হো নারি ?

—অজ্ঞেয়

—হায় ! আমার প্রশ্বাস উত্তপ্ত,
ধমনীতে রক্ত খেলে জোয়ারী,
প্রেম হল অভিশপ্ত,
তুমি কোথা, ওগো নারী ?

খ. ইন ফীরোজী হোঠোঁ পর বরবাদ
মেরী জিন্দগী।
তুম্হারে স্পর্শ কী বাদল ঘুলী কচনার নরমাঈ।
তুম্হারে বক্ষ কী জাদু ভরী মদহোস গরমাঈ।
তুম্হারী চিতওয়নোঁ মেঁ নরগিসোঁ কী পাত শরমাঈ।
কিসী ভী মোল পর মৈঁ আজ অপনে কো লুটা সকতা।
সিখানে কো কহা মুঝসে প্রণয় কে দেবতাওঁ নে।
তুম্হেঁ, আদিম গুণাহোঁ কা অজব-সা ইন্দ্র-ধনুষী স্বাদ।
মেরী জিন্দগী বরবাদ।

—ধর্মবীর ভারতী

—এই ফিরোজী ঠোঁটের জন্য বরবাদ
আমার জীবন।
তোমার ছোঁয়ার মেঘে ভেজা কচি মসৃণতা,
তোমার বুকের যাদুভরা মত্ত উষ্ণতা,
তোমার চিত্তে নার্গিস-পাতার নরম লাজ—

যে-কোনো মূল্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি আজ।
প্রণয়-শেখাতে বলেছে আমায় রতিদেব বিনিখাদ,
আদিম দোষের আজব-রকম ইন্দ্র-ধনুষী-স্বাদ।
আমার জীবন বরবাদ।

নঈ কবিতা—

ক. দুঃখ সব কো মাঁজতা হৈ
ঔর
চাহে স্বয়ং সব কো মুক্তি দেনা ওয়হ ন জানে, কিন্তু
জিন কো মাঁজতা হৈ
উন্হেঁ য়হ সীখ দেতা হৈ কি সব কো মুক্ত রখেঁ।
—অজ্ঞেয়

—দুঃখ সবাইকে ঘষে-মাঝে
আর
নিজে সবাইকে সে মুক্তি দিতে নাইবা জানলো, কিন্তু
যাকে ঘষে-মাজে
তাকে শেখায়— সবাইকে মুক্ত রাখতে।

খ. আও ইস ঝীল কো অমর কর দেঁ
ছূকর নহীঁ
কিনারে বৈঠকর ভী নহীঁ
এক সঙ্গ ঝাঁক ইস দর্পণ মেঁ
অপনে কো দে দেঁ হম
ইস জল কো
জো সময় হৈ।
—নরেশ মেহতা (১৯২১-)

—এসো এই হ্রদটিকে অমর করি—
ছুঁয়ে নয়,
তীরে বসেও নয়

একসঙ্গে উঁকি মেরে এই দর্পণে
নিজেদের দিয়ে দেই আমরা
এই জল কে
যা সময়ই।

গ. এক শূন্য হৈ
মেরে হৃদয় কে বীচ
জো মুঝে মুঝ তক পহুঁচাতা হৈ।

—কুওঁর নারায়ণ সিংহ (১৯২৭-)

—এক ধরনের শূন্যতা আছে
আমার হৃদয়ের মধ্যে,
যা আমাকে পৌঁছে দেয় আমার কাছ পর্যন্ত।

প্রয়োগবাদী ও নঈ কবিতা আকৃতিতে ছোটো, চরণ অ-সমান, ভাব-যতি রাখার প্রবণতা কম। ক্ষণিক অনুভূতির সংবেগমণ্ডিত এবং সংকুচিত। তাই খণ্ডিত সংশ্লিষ্ট বিম্ব প্রযুক্ত। সুনিয়মিত ও সুস্থির ছন্দের সাহায্যে এই সংবেগের প্রকাশ দুরূহ। ফলে খণ্ডিত লয়ের ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। ছন্দ হয়ে উঠেছে গদ্যাত্মক। পরে একদল কবির কবিতায় ছন্দের অস্তিত্ব প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ছন্দোহীন কবিতাও লেখা হচ্ছে। তবে তা কবিতা কি না— তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে বাংলার মতোই।

অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে অশোক বাজপেয়ী (১৯৪১), শ্রীকান্ত বর্মা (১৯৩১-), দুষ্যন্তকুমার (১৯৩৩-১৯৭৫) রাজকমল চৌধুরী (১৯২৯), জগদীশ চতুর্বেদী (১৯২৪) ও ধুমিল (১৯৩৬-১৯৭৫) প্রমুখ কবিতা-আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রীকান্ত বর্মা তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করে সেই কবিদের সারিতে অর্থাৎ অ-কবিতার স্রষ্টারূপে পরিচিত হতে চান। রাজকমল চৌধুরী ঘোর ব্যক্তিবাদী কবি। তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবন তার সংকট, অনাস্থা, সন্ত্রাস এবং ব্যর্থতাবোধ নিয়ে উপস্থিত। যৌনকুণ্ঠাগ্রস্ত কবির কবিতা

যেন ব্যাধি পীড়াগ্রস্ত, অসুস্থ। জগদীশ চতুর্বেদী নেতিবাদী কবি। কোনো কিছুতেই তাঁর যেন আস্থা নেই। আধুনিক সমাজের বিড়ম্বনা ও বীভৎস যৌনাচার স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। সামাজিক পরিবর্তনের আশঙ্কায় ধুমিলের কবিতায় কোথাও উগ্র বিয়োগ আবার কোথাও প্রাণহীন নিরাশা ব্যক্ত। অন্তঃবিরোধগ্রস্ত চেতনার দুঃসহ প্রকাশ। এইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আধুনিক হিন্দী কবিতার ধারা এমন খাদে যা ততখানি গভীর নয় যতটা প্রশস্ত। অবশ্য গভীরতা আছে এমন কবিও আছেন দুই একজন। তবে এ-যুগের কবি হয়েও তাঁরা যেন পূর্বযুগের। এই শ্রেণীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ত্রিলোকীনাথ ব্রজবাল।

ত্রিলোকীনাথ ব্রজবাল (১৯৩২)—মথুরানিবাসী ব্রজভাষী কবি ব্রজবাল খড়ীহিন্দীতেই কাব্যরচনা করেছেন। সংগীত চিত্রকলা এবং ভারতীয় দর্শনের ছাত্র, ত্রিলোকীনাথের রচনায় সহজেই একপ্রকার বিশিষ্টতা ও উজ্জ্বলতা অনুভূত হয়। তাঁর প্রকাশিত আটটি কাব্য হল— 'মীত মেরে, গীত তেরে' (১৯৬০); 'একডাল তীনফূল' (১৯৬১); 'অপরিভাষিত সত্যাংশ' (১৯৬৪); 'পাথেয়' (১৯৬৮), 'ইন্দু এক, বিন্দু দো' (১৯৬৯); 'মেরে গীত তেরে' (১৯৭৮); 'গেয়া' (১৯৭৯) এবং 'কল্পনা কে চিত্র' (১৯৮০)। 'ইন্দু এক, বিন্দু দো' ('একে ইন্দু, দুয়ে বিন্দু', নামে বাংলায় অনূদিত, ১৯৮২) নবকাব্যের রচনাগুলি ভারতীয়-দর্শন ও লোকজীবনের যথোচিত সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। রূপকধর্মী 'কাব্য-কণিকা'গুলি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাই কাব্যটি গুজরাটি, নেপালী, মারাঠী, কন্নড়, তেলেগু, বাংলা, পাঞ্জাবী, উর্দু, ওড়িয়া এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তার থেকেই কবির গভীর কাব্য-অনুভূতি এবং লোকরঞ্জনক্ষম রচনাশক্তির পরিচয় মেলে।

গদ্যকাব্য

গদ্যকাব্য নামে চিহ্নিত হিন্দীসাহিত্যের বিভাগটি সাম্প্রতিক কালে বিশেষ প্রচার-প্রসার লাভ করলেও হিন্দীতে তার ধারনা প্রাচীন কালেও

ছিল বলা যায়। পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস ঊনবিংশ শতকেই 'গদ্যকাব্য মীমাংসা' (১৮৯৭) গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তা প্রাচীন সংস্কৃত-পন্থানুসারী গ্রন্থ। আধুনিক অর্থে প্রচলিত হিন্দীর গদ্যকাব্য রচনার প্রয়াস বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের পর দেখা দেয়। তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভাষা গদ্যই। গদ্যেই তিনি পদ্যের রস পরিবেশন করে বিশ্বকে চমৎকৃত করেন। এই গীতাঞ্জলির গদ্যই তাঁকে বাংলায় গদ্যকাব্য রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনুপ্রেরিত করে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি গদ্যকাব্য রচনা ও প্রকাশ করেন ১৯৩২ সালে ('পুনশ্চ')। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গদ্য হিন্দী কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অনুপ্রেরিত করে হিন্দী গদ্য-কবিতা বা গদ্যকাব্য রচনার দিকে। সে প্রয়াস দেখা দিতে বিলম্ব হয়নি। গীতাঞ্জলির আদর্শ সামনে থাকায় হিন্দী গদ্যকাব্যকারগণ বিষয় হিসাবে প্রেম, ঈশ্বরভক্তি, রাষ্ট্রভক্তি, ইতিহাস, প্রকৃতি প্রভৃতি বেছে নেন। প্রেম আবার মৌলিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যোন্মুখ এবং ভক্তি-মূলক। প্রেম-প্রকৃতি নিয়েই অধিকাংশ হিন্দী গদ্যকাব্য রচিত। তবে এগুলিকে ভাবাত্মক-প্রবন্ধ-নিবন্ধ বললেও বলা চলে। ভাবালুতা বা ভাবুকতা অর্থাৎ কাব্যময়তার জন্য এগুলিকে গদ্যকাব্য বলা হয়।

হিন্দী গদ্যকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে রায়কৃষ্ণ দাস (১৮৯২-১৯৮০) মাখনলাল চতুর্বেদী (১৮৮৯-১৯৬৮), বিয়োগী হরি (১৮৯৬), চতুর সেন শাস্ত্রী (১৮৯১-১৯৬০), প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত (১৯০৮-১৯৭০) এবং রামপ্রসাদ বিদ্যার্থী (১৯১১) প্রমুখের রচনা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।

গীতাঞ্জলির রহস্যাত্মক ভাব ও গদ্যের কাব্যসুলভ প্রয়োগে আকৃষ্ট হয়ে রায়কৃষ্ণ দাস 'সাধনা' (৫ম, ১৯১৯) রচনা করেন। দীর্ঘ গদ্যকাব্যের বদলে 'স্ফুট' (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) গদ্যগীত রচনার সূত্রপাত এই সাধনা কাব্যেই। হিন্দীর অধিকাংশ গদ্যকাব্যে এই প্রণালীই গৃহীত। 'ছায়া-পথ' ও 'প্রবাল' রায়কৃষ্ণ দাসের অন্য দুইটি গদ্যকাব্য। 'অধখিলে

ফূল' (কেদার, ১৯১০), 'বিভাবরী' (নারায়ণদত্ত বহুগুণা, ১৯০৬), 'চরণামৃত' (দ্বারিকাধীশ মিহির), 'পূজা' (রামপ্রসাদ বিদ্যার্থী, ১৯১১), 'চিত্রপট' (শান্তিপ্রসাদ বর্মা, ১৯১০), 'বেদনা' (ভঁবরলাল সিংঘী), 'মণিমালা' (নোখেলাল শর্মা), 'নিশীথ' (ব্রহ্মদেব শর্মা), 'অনমন' (দিনেশ নন্দিনী, ১৯১৫), 'জীবন কা সপনা' (রামেশ্বরী গোয়েল)—প্রভৃতি কৃতি আধুনিক হিন্দী গদ্যকাব্যের ধারাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে তেজনারায়ণ 'কাক' (১৯১৪), 'দেবদূত বিদ্যার্থী' (১৯০৩), 'কেশবলাল ঝা' (১৮৯১), জগদীশ ঝা, রঘুবরনারায়ণ সিংহ বিদ্যাভার্গব, স্নেহলতা শর্মা, মহাবীরশরণ অগ্রওয়াল (১৯২৮) প্রমুখের গদ্যকাব্যেও 'সাধনা'র অনুস্মৃতি লক্ষিত হয়।

হিন্দী গদ্যকাব্যে ভক্তি ভাবনার প্রবর্তন এবং প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রী বিয়োগী হরি। বৈষ্ণব ও সন্ত মতানুসারী সাহিত্যিক বিয়োগী হরির কাব্যে কৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের সুরই প্রধান। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'তরঙ্গিণী' (১৯২০), 'অন্তর্নাদ' (১৯২৬), 'প্রার্থনা' (১৯২৯), 'ভাবনা' ও 'ঠণ্ডে ছীঁটে' প্রভৃতি রচনার উল্লেখ করা যায়। তবে গান্ধীবাদী কবির রচনায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং আত্মোৎসর্গ-ভাবনা, সর্ব ধর্ম সমন্বয়, মানবতার পূজা এবং হরিজনোদ্ধার প্রভৃতির সমর্থন, ব্যাখ্যা ও গুরুত্বের প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর 'শ্রদ্ধাকণ' গ্রন্থটি গান্ধীজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লৌকিক প্রেমের গদ্যকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীরাজনারায়ণ মেহরোত্রা 'রজনীশ' ('আরাধনা'), শ্রীবিশ্বম্ভর মানব ('অভাব'), শ্রীরাবী ('শুভ্রা'), বালকৃষ্ণ বলদুবা ('অপনে গীত'), মহাবীরপ্রসাদ দধীচি ('যৌবনতরঙ্গ'), শকুন্তলা 'রেণু', স্নেহলতা শর্মা, দিনেশ নন্দিনী ('শবনম্', 'মৌক্তিক মাল', 'বংশীরব', 'দুপহরিয়াকে ফূল' ও 'স্পন্দন') প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কাব্যটিতে পবিত্র প্রেম মাঝে মাঝে স্থূল দেহস্পর্শে নিষ্প্রভ। এই প্রসঙ্গে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর অনুসরণে ব্রজনন্দন সহায়ের 'সৌন্দর্যোপাসক', রাজা রাধিকারমণ প্রসাদ সিংহের

'নবজীবন' বা 'প্রেম লহরী', মোহনলাল মহতোর 'ধুঁধলে চিত্র', লক্ষ্মী-নারায়ণ সুধাংশুর 'বিয়োগ' ও হৃদয়নারায়ণ পাণ্ডেয় 'হৃদয়েশ' কৃত 'মনোব্যথা' প্রভৃতি কাব্যের কথা স্মরণীয়।

রাষ্ট্র-চিন্তামূলক গদ্যকাব্যরূপে মহত্বপূর্ণ কৃতি হল মাখনলাল চতুর্বেদীর 'সাহিত্য-দেবতা'। তাতে রাষ্ট্রই কবির আরাধ্য দেবতা। তারই চরণে তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। চতুর সেন শাস্ত্রীও এই শ্রেণীর লেখক। তাঁর 'মরীলাখ কী হায়' ও 'জওয়াহর' রচনা দুইটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'তরলাগ্নি' কাব্যটিও এই জাতীয় রচনা। বিয়োগী হরির কয়েকটি কাব্যও এই শ্রেণীর। ব্রহ্মদেব শর্মার 'আঁসূ ভরী ধরতী' ও হরিমোহনলাল শ্রীবাস্তবের 'ভারতভক্তি' এই পর্যায়ের সার্থক কৃতি। দেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ বিপ্লব-বিদ্রোহ, মহাপুরুষ-বন্দনা এবং অতীতের ঐতিহ্যের গৌরবগাথা তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থ দুইটিতে।

ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গদ্যকাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ড. রঘুবীর সিংহ (১৯০৮)। তাঁর 'শেষস্মৃতিয়াঁ' (১৯৩৯, ৫ম) একটি সার্থক কৃতি। মোঘল যুগের সৌধের আশ্রয়ে স্বীয় ভাবুকতার স্রোতকে গতিশীল করে তিনি অতীতকে সামনে এনে দিয়েছেন। যেন পাষাণের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন সঞ্চার করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের সৌন্দর্য ও অনুপমতার কথা স্মরণীয়।

প্রকৃতি-সৌন্দর্যাশ্রিত গদ্যকাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় রামকুমার বর্মার 'হিমহাস'। তাতে কাশ্মীরের রূপমাধুরী অপরূপ হয়ে উঠেছে। রামনারায়ণ সিংহের 'মিলন পথপর' রচনাটিও সমধর্মী। তাতে নদ-নদী, প্রভাত-সন্ধ্যা, পশু-পক্ষীর বিষয় নিয়ে হৃদয়-হারী গদ্যগীত রচিত ও সন্নিবেশিত।

স্ফুট-গদ্যকাররূপে বহু কবির বহু রচনার কথা উল্লেখ করা যায়। এই ধরনের কাব্য রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র (১৯২২) কথা স্মরণ করায়। মনোবৃত্তিমূলক রচনা হিসাবে চতুর সেন শাস্ত্রীর 'অন্তস্তল'

সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। এই প্রসঙ্গে মোম্মডের 'প্রেমলহরী' ও শিব-পূজনের 'প্রেমকলী' গদ্যকাব্যও উল্লেখযোগ্য। তথ্যপ্রধান গদ্যকাব্য-রূপে তেজনারায়ণ 'কাকে'র 'নির্ঝর ঔর নির্মাণ', রাজেন্দ্র সিংহের 'সৌনকেশ্বর', বৈকুণ্ঠনাথ মেহরোত্রার 'উঁচে নীচে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। সদ্‌গুরুশরণ অবস্থীর 'ভ্রমিত পথিক' গ্রন্থটিতে ভ্রমণ বৃত্তান্তকে কাব্যময় রূপ দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ট্রেওয়র্ডস্'-এর অনুবাদ থেকে হিন্দীতে 'সূক্তিপ্রধান' রচনার উদ্ভব। শ্রীরামচন্দ্র টণ্ডন ১৯৩১ সালে 'কলরব' নামে 'স্ট্রেওয়র্ডসে'র অনুবাদ করেন। মাখনলাল চতুর্বেদী, শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় ('মনন', 'বুদবুদ'), বিয়োগী হরি ('ঠণ্ডে ছীঁটে') প্রমুখ এই ধারার প্রধান লেখক।

হিন্দীগদ্যকাব্য রচয়িতারূপে বেশ কয়েকজন মহিলা কবিও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দিনেশ নন্দিনী চৌরড্যার (১৯১৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ কয়েকটি গদ্যকাব্য রচনা করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'শারদীয়া' (১৯৩৯), 'দুপহরিয়া কে ফূল' (১৯৪২), 'বংশীরব' (১৯৪৫), 'উন্মন' (১৯৪৫) ও 'স্পন্দন' (১৯৪৯)। এইসব রচনায় নারী-মনের মিলন-বিচ্ছেদময় প্রেম-ভাবনার সহজ ও সুললিত রূপায়ণ ঘটেছে। তাতে অধ্যাত্ম-ভাবনার সুরও অনুরণিত।

শ্রীমতী তারা পাণ্ডেয়ের গদ্যকবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮০)। কাব্যটির ভূমিকা (আশীর্বাদ) লিখেছেন কবি রায়কৃষ্ণ দাস। কবিতাগুলি আসলে গদ্যগীত। এগুলি যেন কবির হৃদয় সংগীতের অবাধ প্রকাশ।

এই ক্ষেত্রে আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন— কৃষ্ণা মা (১৯৩৯)। মথুরার সাধিকা কৃষ্ণা ব্রজবাল ভক্ত মহলে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণা মা' নামেই পরিচিত। আধুনিক হিন্দীতে সগুণ কৃষ্ণভক্তির প্রথম গদ্যকাব্য রচনার শ্রেয় তাঁরই। তাঁর তিনটি গদ্যকাব্য হল—

'আস্থা', 'শ্রীযুগলপদবন্দন' এবং 'আত্মজা' (১৯৮৩)। 'শ্রীযুগলপদবন্দন' কাব্যটিতে ভক্তচিত্তের আকূতি অনবদ্য হয়ে বেজে উঠেছে। কাব্যটি উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত ও সম্মানিত। 'আত্মজা'তে ভক্ত-হৃদয়ের আত্মসমর্পণের ভাব সুললিত ও মনোহর হয়ে রূপ লাভ করেছে। 'কৃষ্ণা মা'র অন্যান্য রচনা হল—'অর্চন' (পদ-সংগ্রহ), 'আরাধন' (পদ-সংগ্রহ) এবং 'চিন্তন' (চিন্তা ও বিচার)।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুপ্রেরণায় হিন্দী গদ্যকাব্যের সূচনা হলেও ক্রমে ক্রমে তা আপন শৈলী ও ঐতিহ্য তৈরি করে নিয়েছে।[১৭] এই সাহিত্য শাখাটি জনগণের সমর্থন ও উৎসাহ আশানুরূপ লাভ করতে পারে নি। তবু সুকোমল, সুকুমার এই শাখাটি ক্রমে ক্রমে গৌরবের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিষয় বৈচিত্র্যের আশ্রয়ে নব নব সৃজন ও পঠন-পাঠন তার সাখ্য বহন করে।

হিন্দী গদ্যকাব্য রচনার প্রয়াসে হিন্দী গদ্যে একপ্রকার অভিনব, সুমধুর ধ্বনি-প্রবাহযুক্ত ভাববাহী ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে গদ্যের কাঠিন্য এবং পদ্যের পেলব-মসৃণতা থেকে অনেকটা মুক্ত রূপের সমন্বয়ে এই ভাষাটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই ভাষারও বিভিন্ন রূপ দেখা দিয়েছে। কারো কারো গদ্যকাব্যের ভাষা সহজ-সরল অনাড়ম্বর। আবার কারো বা তৎসম শব্দ ও অনুপ্রাস-উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকারে সুসজ্জিত। আবার কেউবা আরবি-পারসি ও দেশী শব্দের সঙ্গে তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করে ভাষাকে করেছেন ইস্পাতের মতো শক্ত ও নমনীয়। তাতে হিন্দী ভাষার ভাবপ্রকাশের শক্তি-সামর্থ্য, সৌন্দর্য ও উপযোগিতা নতুন করে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হয়েছে।

সব দিকের বিচারে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস যেমন বিশাল তার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিশিষ্টতা ও আকর্ষণ নিয়ে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই অগ্রসরমানতার মধ্যেই তার প্রাণশক্তি নিহিত। এই প্রাণশক্তির উৎস হিন্দীভাষী জনগণ

ও হিন্দী সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়ের কৌতূহলী উদার গ্রহণ, মনন ও উৎপাদন বা সৃজন-সক্ষম মনোভূমি। এই মনোভূমির নির্মিতিতে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের যোগদানও স্মরণীয়। তাই সকলের সহযোগে তার পুষ্টি ও উৎকর্ষ-বিধান বেশ ত্বরিত ও আশাপ্রদ গতিতে রূপায়িত হয়ে চলেছে। নব-নব শাখা-প্রশাখার সংযোজনও ঘটছে। দেশের প্রয়োজন, মানুষের রুচি এবং যুগের প্রভাবে আজ যা কিছু দেখা যাচ্ছে— তার অনেকটাই হয়তো প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা-চ্যুত হয়ে খসে পড়বে— হারিয়ে যাবে। যা থাকবে তাই আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের পরম সম্পদ রূপে বিবেচিত হবে। সে সম্পদও কম গৌরব ও গর্বের হবে না। তবে তা নিয়ে আজ শেষ কথা বলা অনধিকার চর্চামাত্র। তা সমীচীনও নয়। সে ভার রইল সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক কালের হাতে।

উল্লেখপঞ্জী

১. হিন্দী নাটক ও সাহিত্যিক ভাষার সন্দর্ভে ভারতেন্দুর একটি লক্ষণীয় উক্তি হল—

> 'যদ্যপি হিন্দী ভাষা মেঁ দস-বীস নাটক বন গয়ে হৈঁ, কিন্তু হম য়হী কহেঁগে কি অভী ইস ভাষা মেঁ নাটকোঁ কা বহুত হী অভাব হৈ। আশা হৈ কি কাল কী ক্রমোন্নতি কে সাথ গ্রন্থ ভী বনতে জায়েগেঁ ঔর অপনী সম্পত্তি-শালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ী বহন বঙ্গভাষা কে অক্ষয় ভণ্ডাগার কী সহায়তা সে হিন্দীভাষা বড়ী উন্নতি করে।'
>
> —ভারতেন্দু নাটকাবলী, পরিশিষ্ট (১৯২৭), পৃ. ৮৪০।

২. ভারতেন্দু গ্রন্থাবলীতে (না. প্র. স. সংস্করণ) 'প্রেমতরঙ্গ' অংশে 'অথ বাংলা গান' নামে ৪৬টি এবং অন্যত্র আরও একটি মোট ৪৭টি বাংলা পদ সংকলিত। এই বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য লেখকের প্রবন্ধ— 'হিন্দী কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দুর বাংলা পদ', সমকালীন, ফাল্গুন, ১৩৭৫।

৩. দ্রষ্টব্য—হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, খণ্ড-৮, (না. প্র. স., ২০২৯), 'হিন্দী খড়ীবোলী কাব্য', পৃ. ১৪৩।

৪. দ্রষ্টব্য লেখকের— 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ৯৫।

৫. পূর্ববৎ— পৃ. ৯৫-৯৭ এবং 'প্রিয়প্রবাস' কাব্যটির ভূমিকাংশ।

৬. বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের প্রবন্ধ— 'কাব্যের উপেক্ষিতার স্বীকৃতি', যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. গ এবং 'সাধক-সাধনা ঔর সিদ্ধি' (হিন্দী), 'হিন্দী বিদ্যাপীঠ' পত্রিকা মৈথিলীশরণ গুপ্ত জন্ম-শতাব্দী-অঙ্ক, দেওঘর, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ২১-২৮।

৭. দ্রষ্টব্য—রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (সং ২০২৯), 'ছায়াবাদ', পৃ. ৪৫২-৫৪।

৮. এই প্রসঙ্গে নিরালার দুইটি উক্তি স্মরণীয়—

ক. 'বঙ্গলা মেরী ওয়ৈসী হী মাতৃভাষা হৈ, জৈসী হিন্দী। রবীন্দ্রনাথ কা পূরা সাহিত্য মৈনেঁ পঢ়া হৈ ।।'

—প্রবন্ধ-প্রতিমা (১৯৪০), 'গান্ধীজী সে বাতচীত

খ. 'মৈঁ য়হাঁ অবশ্য বঙ্গলা কা বিরোধ নহীঁ কর রহা, উসকে আধুনিক অমর সাহিত্য কা মুঝ পর কাফী প্রভাব হৈ।'

—পরিমল, ভূমিকা, (১৯৫০), পৃ. ১৩

৯. হিন্দী কাব্যের মুক্তি ও ছন্দপ্রয়োগ সম্পর্কে 'মেরে গীত ঔর কলা' প্রবন্ধে নিরালার গুরুত্বপূর্ণ অভিমত হল—

'হিন্দী কাব্য কী মুক্তি কে মুঝে দো উপায় মালুম দিয়ে—এক বর্ণবৃত্ত মেঁ, দূসরা মাত্রাবৃত্ত মেঁ। 'জুহী কী কলী' কী বর্ণবৃত্ত ওয়ালী জমীন হৈ। ইসমেঁ অন্ত্যানুপ্রাস নহীঁ। য়হ গাঈ নহীঁ জাতী। ইসসে পঢ়নে কী কলা ব্যক্ত হোতী হৈ। পরিমল কে তীসরে খণ্ড মেঁ ইস তরহ কী রচনায়েঁ হৈঁ। ইনকে ছন্দ কো মৈঁ মুক্ত ছন্দ কহতা হূঁ। দূসরী—মাত্রাবৃত্ত ওয়ালী রচনায়েঁ পরিমল কে দূসরে খণ্ড মেঁ হৈঁ। ইনমেঁ লড়িয়াঁ অসমান হৈঁ, পর অন্ত্যানুপ্রাস হৈ। আধারমাত্রিক হোনেকে কারণ য়ে গাঈ জা সকতী হৈঁ। পর সংগীত অংরেজী— ঢঙ্গ কা হৈ। ইস গীত কো মৈঁ 'মুক্ত গীত' কহতা হূঁ।'

—প্রবন্ধ-প্রতিমা (১৯৪০), পৃ. ২৯৯।

১০. ভাষার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কেও নিরালা সজাগ ছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর অনুধাবনীয় উক্তি হল—

'প্রকৃতি কী স্বাভাবিক চাল সে ভাষা জিস তরফ ভী যায়—শক্তি, সামর্থ্য ঔর মুক্তি কী তরফ, য়া সুখানুশয়তা, মৃদুলতা ঔর ছন্দ-লালিত্য কী তরফ, য়দি উসকে সাথ জাতীয়

জীবন কা ভী সম্বন্ধ হৈ তো, য়হ নিশ্চিত রূপ সে কহা জায়গা কি প্রাণশক্তি উস ভাষা মেঁ হৈ।'

—পূর্ববৎ, পৃ. ২৭০-৭১।

১১. দ্রষ্টব্য লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দীছন্দ' (১৯৭৭) গ্রন্থের ২০৪-০৫ পৃষ্ঠা।

১২. সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী মেদিনীপুরের মহিষাদলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়াশোনা শুরু করেন। যথাসময়ে কলকাতায় 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা দিতে আসেন। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় কবিতা লিখে পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন। অবশ্য নানাভাবে পড়াশোনা করে জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ করতে থাকেন। সতেরো আঠারো বছর বয়সে তাঁর ঘাড়ে সংসারের দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে। তাই সংসারের খরচ-নির্বাহের জন্য তাঁকে নানা স্থানে ছোটাছুটিও করতে হয়— কর্মসংস্থানের জন্য। এই সময় রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সমন্বয়' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় তাঁর দার্শনিক সত্তা পরিপুষ্ট হবার সুযোগ লাভ করে। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকেই শেঠ মহাদেবপ্রসাদ 'মতওয়ালা' নামে হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সম্পাদকমণ্ডলীতে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীও ছিলেন। 'মতওয়ালা'র সঙ্গে ধ্বনিসাম্য রেখে তিনি 'নিরালা' নামে পরিচিত হলেন। 'মতওয়ালা'র প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় মুদ্রিত থাকত—

'অমিয়-গরল শশি সীকর রবিকর,
রাগবিরাগ ভরা প্যালা,
পীতে হৈঁ জো সাধক উনকা
প্যারা হৈ মতওয়ালা।'

বলাইবাহুল্য 'অমিয়-গরল' পানকারী সাধকদের অগ্রগণ্য হওয়ার রহস্যটি নিহিত তাঁর 'নিরালা' অর্থাৎ 'অদ্ভুত' বা অপূর্ব উপনামের

মধ্যে। তাঁর মুক্তক বা মুক্তছন্দ কবিতা এবং বিবিধ-বিচিত্র রচনা ছাপা হতে লাগল মতওয়ালার পৃষ্ঠায়। 'নিরালা'র সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পন্তকবির— 'পল্লব', গ্রন্থের 'প্রবেশক', 'আধুনিক কবি-২' গ্রন্থের 'পর্যালোচন', 'বাণী' কাব্যের 'আত্মিক' অংশের 'আত্মিকা' এবং 'যুগান্ত' কাব্যের 'কবীন্দ্র-রবীন্দ্র কে প্রতি'— প্রভৃতি কবিতা।

১৪. এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

ক. চার্বাক মুনির নির্দেশ—

'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ,
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ।'

খ. ইংরেজি প্রবাদ বচন—

'Eat, drink and be merry,
For tomorrow you may die'.

১৫. বাংলায় কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের ৫০টি সর্গের মধ্যে ৪১টি সর্গই— এই-জাতীয় নাট্যসংলাপে রচিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'রৈবতক' (১৮৮৭) কাব্যের একাদশ সর্গটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৬. দ্রষ্টব্য—'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' (না. প্র. স.) চতুর্দশ-খণ্ড (২০২৭), পৃ. ১৫৯-৬৩।

১৭. নিজের গদ্যকাব্য সম্পর্কে রায়কৃষ্ণ দাস বলেছেন—

'সাধনা কী ধারা তো গীতাঞ্জলি কে প্রভাব কী হৈ ঔর উসকী অভিব্যক্তি মেঁ কোঈ নয়াপন নহীঁ। ওয়হ রবিবাবু কী হী হৈ। হাঁ ছায়াপথ মেঁ কুছ অপনা মার্গ মৈঁনে খোজা হৈ।'

—পূর্ববৎ, পৃ. ১৭০।

নির্দেশিকা

ক. ব্যক্তিনাম

আ

ই

ঈ

উ

উ

ঋ

এ

ও

ঔ

ক

চ

ছ

জ

ফ

ব

ভ

শ

স

হ

খ. গ্রন্থনাম

আ

ই

ঈ

উ

খ

গ

ছ

জ

ঝ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

ফ

ব

ভ

য

ল

শ

ষ

স

হ

গ. পত্র-পত্রিকা

মূল্য : ১৫.০০